অধিকার
প্রণব সেনগুপ্ত

# অধিকার

প্রণব সেনগুপ্ত

# অধিকার

প্রণব সেনগুপ্ত, এম.এ, এল.এল.বি, জার্নালিজম (ডিপ্লমা)

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ ঃ গৌর দাস
মেক্যানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার, রাণীরবাজার

প্রকাশক ঃ পূর্ণিমা পাবলিসার্স
পূর্ণিমা সেনগুপ্ত
অফিসটিলা, বিশালগড়, ত্রিপুরা (পঃ)

প্রকাশ কাল ঃ জানুয়ারী ২০১০ ইং

মুদ্রণে ঃ রামকৃষ্ণ অফসেট প্রেস
আমতলী, রামকৃষ্ণালয়, এ. বি. রোড
ফোন -২৩৭৫৮৭৯

প্রাপ্তি স্থান ঃ সরস্বতী বুকডিপো
ওরিয়েন্ট চৌমুহনী , আগরতলা পশ্চিম ত্রিপুরা ।

মূল্য ঃ ২২৫ টাকা
(দুইশ পঁচিশ টাকা)

# ADHIKAR

## FOREWORD

*" Man is born free and he is every where in chains "- is an oft quoted sentence of Jean Jacques Rousseau who was a great philosopher of eighteenth century enlightenment. The chains are the bonds that civil society has put upon him and by breaking which alone can man regain his freedom and happiness . Sovereignty lies with the people and law should be the expression of the general will , of the deep instinctive conscience of the community . The establishment of the " Right of Man" which was enshrined in french Revolution , later on , becomes the guiding principle of any popular governance across the whole world. From monarchy to democracy , men have always fought a battle in favour of their Aidhikar , Popularly Known as 'right' . The battle of right which has been initiated by pranab Sen Gupta , in his book entitled " Aadhikar" is a sincere effort to present the various dimension and phases of right.*

*It is assumed that when 'right' of man' is discussed, ' the duty of man' is taken into account . In this book, the author has taken a great pain to discharge ' the duty of a responsible citizen' which has been always found as an unique and dominating characteristics in the personality of Pranab Sen Gupta . If one ventures into the history of the writings of the author , within a tight scheduled of ' the duty of police officer', the publication of three research books eight books on history, memories and culture , eight books on poems , three books in the form of essays and six books on short stories is a clear indication of ' virtuous duty' which Pranab Sen Gupta has performed in his short span of life . While discharging the assigned duty of the office and family life , the present writing on ' Aadhikar" is an expression of a police officer in terms of its deprivation which he has perhaps experienced in his day to day life . Through this book , he has tried to let the people know what their limitations are in a civil society . In this way this book will help in arousing*

*consciousness about the basic right of men which have been made available to them being a citizen of a democratic country .*

*This book is a documentation of the vividness of the Aadhikar . It has been divided into eleven chapters which contains 396 pages is perhaps a voluminous presentation of the social issues . The origin and perception of right has been dealt in first chapter . The right to independence and right to self determination have been touched in the second chapter . The right of children and women, right and reservation , right and mass communication , human rights civil right and right for the depressed classes are the main facets where the theme of the book concentrates . In short this book will widen the horizon of knowledge about the common perspective of daily life in terms of enjoying Aadhikar to make our life 'Protected' and ensure the life other people 'more secured' from the misrule of governance . In a material society , the realization of 'Aadhikar' is a prime 'duty' to every citizen and here lies the greatness of Sir pranab Sen Gupta who has taken a challenge to awaken the people from darkness to light i.e " Tamso maa Jyotirgamay" I wish all success for the wider circulation of this book for the greater interest of society . I also wish the sustenance of creative zeal of Sir pranab Sen Gupta in future .*


Satyadeo Poddar 30.9.2009

**(Dr.Satyadeo podder)**

Mahatma Gandhi professor of History

&

Head ,

Department of History.

Tripura University.

# অধিকার

- প্রণব সেনগুপ্ত

অধিকার হোক জীবনের পক্ষে, মানবতার পক্ষে, অধিকার ও স্বাধীনতা বিনা কে বাঁচিতে চায়? অধিকারের উপর বাধা আসিলেই মানুষ সংঘর্ষের পথে যেতে কুণ্ঠাবোধ করে না। এমনকি কোন প্রাণীকুল ও না। অধিকার আমৃত্যু, ইতিহাস, মৃত্যুহীন। দেহের অবসান ঘটে। জীবন জীবিকার গরিমা থেমে যায়। অধিকারের লড়াই চলতেই থাকবে। নায্যপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চনা, দীর্ঘ বঞ্চনা, ক্ষোভ থেকে লড়াই শুরু হয়। এ লড়াই অধিকারের লড়াই। দরিদ্রতা সর্ব্বদা, প্রকৃতির নিয়মে ঘটে না। পরাভূত —— শক্তির করণেই ঘটে বেশীর ভাগ, তবে তাদেরকে যেন অধিকার থেকে বঞ্চিত করা না হয়। যেমনটা ধর্ম্ম মানুষের ব্যক্তিগত, তাই বলে ধর্ম্মের নামে হুজ্জুতি কেন? যুদ্ধের প্রভাব, দাঙ্গার প্রভাব, সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব দেশের / রাজ্যের শিক্ষা, সংস্কৃতি, আর্থিক উন্নয়নের উপর আঘাত। এক মুহুর্তে সৃষ্টিকে ধ্বংস করে দওেয়া যায়। এক মুহুর্তে সৃষ্টিশীল মেধা খুন করা যায় কিন্তু শত বছরে ও এই ক্ষতিপূরণ সম্ভব নয়। সাধারন ঘর থেকে মেধা তৈরী হলে তাতে কারো গাত্রদহনই বা হবে কেন? সমাজ সমাজের জন্য, জীবনের পক্ষে মনুষ্যত্বের পক্ষে হোক। প্রকৃতির সত্যতা মানতেই হবে। শিক্ষা শুধু কেন একশ্রেণীর বিত্তবানদের জন্য হবে, শিক্ষা দরকার সবার অর্থ ঐশ্বর্য্য, আধিপত্য, কেনই বা অন্যের কাছে ভিতির কারণ হবে? যে কোন তত্ত্বই সর্বজনগৃহীত হয় যখন তা পর্যবেক্ষনের মাধ্যমে, গৃহীত হয়। যারা বেঁচে আছে তারা যেন জীবনের অধিকার নিয়ে বাঁচতে পারে। কাউকে দাঁড়াবার সুযোগ থেকে কেন বঞ্চিত করা। কারো চিন্তাধারার উপর নগ্ন আক্রমন, চিন্তাধারাকে খুনের সামিল। প্রশ্ন এবং উত্তর শুধু সময়ের অপেক্ষা। পরীক্ষা এবং তত্ত্বের থেকে বের হয়ে আসবে ফসল। প্রকৃতি খোলা তার থেকে বেছে নিতে হবে জীবন, কেড়ে নিতে হবে অধিকার। প্রকৃতি গরীব, প্রকৃত প্রাপককে বঞ্চিত করে ধনীকে আরো ঢালাও হারে ধনীতে পরিণত করা এবং প্রাপককে তার নায্য প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করা, তা তো বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার দিকেই আঙ্গুল দেখাই। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মানবিকতার দৃষ্টিতে সভ্যসমাজের কাছে তা কখনোই কাম্য নয়। আধিপত্যার কাছে যেন খড়গ দিয়ে অন্যের অধিকারকে বলি দেওয়া না হয়। অধিকার থেকে বঞ্চিত মানুষের জীবনে জীবন যুদ্ধের দামামা বাজে। সুরেলা সুপ্রাচ্য সংগীত ও তাদের কাছে বিষাক্ত এবং কর্কশ তার বজ্রনিনাদ। যাদের আধিপত্য আছে তাদের সাথে কেউয়ের মতো কতিপয় ছায়াসঙ্গী থাকেন। যাদের প্রভাব তপ্তবালুকা রাশির মতো। পেশীশক্তি আছে বলেই কি কোন শক্তিশালী মানুষ নিরীহ দুর্ব্বল মানুষকে অকারণ অত্যাচার করে তার অধিকার ছিনিয়ে নেবে? এ আবার কেমন কথা। এই রকম কত গ্রাম শহর, সমাজ থেকে শুরু করে সভ্যতার মানচিত্রে ও দেখা যায়। অনেক সময় অনেকে প্রতিবাদ করেন কিন্তু প্রতিরোধ করার সাহস নেই। সভ্যতার প্রাক্‌লগ্ন থেকেই চেষ্টা চলে আসছে সেইসব

বক্তাদের কণ্ঠরোধ করা যারা সুস্পষ্টভাবে মতামত প্রকাশ করতে সচেষ্ঠ । মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাকে দমন করে , অধিকার কেড়ে নেওয়া । ক্ষমতাবান ক্ষমতাশালীদের হাতে অনেক রকম অস্ত্র অর্থবল , জনবল আরো কত কী তবু তারা সত্যকে ভয় পায় , নানা রকম অত্যাচার , অবরোধ , এমনকি বেআইনী মিথ্যা প্রচার , মামলা হত্যা করে ও যে শেষ পর্যন্ত তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয় না , বরং পতনই হয় । যুগে যুগে স্বৈরাচারীরা দেখে শুনে ও তার থেকে শিক্ষা নেয় না , বরং ইতিহাসের পাতা স্বাক্ষী বারংবার একই ভুল করে । লেখকের লেখার উপর হুমকী আসে কিন্তু কলম থামে না । বইয়ের বহ্ণৎসব হয় । কিন্তু হাজারোবার দগ্ধ করলে ও কলম থামে না প্রয়োজনে প্রাণ থেমে যায় । লেখনী ও বইয়ের জয়যাত্রা অব্যাহত থাকে নানাহ্ অত্যাচার সহ্য করে । জীবনের ও ঝুঁকি নিয়ে ও কিছু মানুষ মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার দাবি অব্যাহত রেখেছেন , মানে অধিকারের নীরব আন্দোলন । এই সব মানুষদের সাহসের স্বীকৃতি অন্যদের কাছে প্রেরণা ও আদর্শস্বরূপ হতে পারে । উদাহরণ স্বরূপ শত শত উপমা দেওয়া যাবে তবু ও এক / দুটো ঘটনা উল্লেখ করছি , আজ থেকে আনুমানিক ২/৩ বৎসর পূর্বে মনিপুরের প্রধান গন্থাগারের প্রায় দেড় লক্ষ্য টাকার বই পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে কিন্তু তৎসত্ত্বে ও লেখকের কলম থামেনি । গামবিয়ার রাষ্ট্রপতি (স্বৈরাচারী) ইয়াইয়া জামের নানাহ অপর্কীতি ফাঁস করে দেন নির্ভীক সাংবাদিক দায়েদা হায়দার , ফলশ্রুতিতে তাকে গুলি করে হত্যা করা হয় । সৌদ্দি আরবের আলি আল দোমেইনি নামে এক সাংবাদিক সৌদি সরকারের মানবাধিকার কমিশনের নামে একটি উদ্দেশ্যমূলক মিথ্যা দলিলের সম্পর্কে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষন করেন সৌদ্দি আরবের শাসকরা তাদের বিরুদ্ধে মতামত সহ্য করতে নারাজ । সেই অপরাধে দোমেইনি কারাদন্ডে দন্ডিত । পরাক্রম শাসক ক্ষমতাশালীদের হাতে হেনস্তা , অত্যাচার , যুগে যুগে চলে আসছে পরাধীন ভারতবর্ষের ইতিহাস থেকে শুরু করে নব্য ইতিহাসের লুকানো পাতায় তার যথেষ্ঠ প্রমাণ বহন করছে । সমাজে প্রতিবাদী একটি শ্রেণী আছে যারা মৃত্যুভয় তুচ্ছ করেও অধিকারের লড়াই এ সামিল । তাদের অনেককে হয়ত নিঃশব্দে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় , তবু ও তারা ভয় পায় না , তা বলেই আজো সমাজ বেঁচে আছে । ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি থেকে লেলিহান আগুন ও লাভা নিঃসৃত হচ্ছে । জাগ্রত সমাজে সৃষ্টি হচ্ছে নবরুপে নতুন প্রতিবাদী ধ্রুবক ।

অধিকারের লড়াই সবর্ত্র , যেমনটা , সৃষ্টিলগ্ন থেকে দেখা যায় পৃথিবীর কোন ও কোনও দেশে পুত্রসন্তানের চেয়ে কন্যাসন্তান বাপ মায়ের কাছে অবাঞ্ছিত । শিশুকন্যাকে অবহেলায় , অযত্নে , অত্যাচারে এবং এমনকি অনেক সময় নির্দয় হাতে গলা টিপে হত্যা করার ঘটনা ও অহরহ ঘটেছে , ঘটছে আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় ও এই অবস্থান খুব লজ্জা জনক । ভাবতে অবাক লাগে অনেক মায়েরা ও নিজের কন্যা সন্তানদেরকে অস্পৃশ্যতার নজরে দেখে । সেখানে ও চরম বৈষম্য । শতাব্দী পুরানো ইতিহাস থেকে বর্তমান আধুনিক যুগে পর্যন্ত কন্যা সন্তানকে নানাহ বৈজ্ঞানিক উপায়ে পৃথিবীর আলো দেখার আগেই সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে । সভ্যতার লজ্জা ।আমাদের বিজ্ঞানের উন্নতির

ফলে তা সহজে অনুমেয় মাতৃগর্ভের শিশুটি কন্যা হবে না পুত্র হবে । যার ফলশ্রুতিতে জন্মদিনটির জন্য অপেক্ষা না করেই সেই শিশুকন্যার বীজটিকে অঙ্কুরেই বিনাশ করে দেওয়া হয় । আমরা ভুলে যাই সব পুরুষের জন্ম হয় নারীর গর্ভে । অনেকের মনেই উদ্ভট ধারনা পুত্রের দরকার , পুত্র বংশ রক্ষা করে বা করবে । বংশের ধারা বজায় থাকবে । রক্তের ধারা , এ তো নিছক গুজব মাত্র বংশরক্ষা পুত্র বা কন্যা যে কেউ করতে পারে । কারণ নিজের প্রবাহ বিজ্ঞান বলে পুত্র ও কন্যার মধ্যে সমান · । বংশরক্ষার বিশ্বাসটাই কুসংস্কার । বরংচ দেখা যায় অধিকার থেকে বঞ্চিত মেয়েরাই মা বাবার সাথে সম্পর্ক বেশী রাখে । বিপদের দিনে ছুটে আসে । আমাদের দেশের অনেক শহরে কন্যাসন্তানের সংখ্যা ক্রমশ কমে আসছে প্রতি বছর। এই অধিকারের লড়াই আরো বেশী তেজী হবে যদি মেয়েরা শিক্ষাকে আরো বেশী গুরুত্বরোপ করে । নারীশিক্ষা প্রচন্ড জরুরী জীবনে অধিকারের লড়াইটা যেন বন্ধ না হয়ে যায় তবে অর্থব হয়ে পড়বে সমাজ ব্যবস্থা । শিক্ষা ব্যবস্থা এবং ছাত্রদের মধ্যে একটি কুৎসিত প্রথা যেভাবেই হোক বন্ধ করতে হবে যার নাম র‍্যাগিং। আইন তৈরী হয়েছে । সুপ্রীমকোর্টের সুনির্দিষ্ট আদেশ আছে তারপরে ও চলছে গোপনে নরকীয় র‍্যাগিং প্রথা , নানা প্রতিষ্ঠানে এই র‍্যাগিং এর নামে চলে নানাহ নরকীয়তা বিভৎস কান্ড , অনেক ছাত্র আহত ও মানষিক রোগগ্রস্থ হয়ে পড়ে সম্মিলিত ও পেশীশক্তির কাছে । এই ভাবে ছিনিয়ে নেওয়া হয় অধিকার । লড়তে হবে এই নরকীয় র‍্যাগিং প্রথার বিরুদ্ধে । প্রতিবাদ শুরু হতে হবে ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে থেকে ।

আমানের মনে রাখতে হবে ধর্ম্ম মানুষের ব্যক্তিগত ধর্ম্মস্থান সব মানুষের জন্য , ক্ষমতাবানদের ক্ষমতার জেরে অধিকার ছিনিয়ে বহুবার আমাদের দেশে জ্বলেছে জাতিভেদের আগুন ও তা নিয়ে হয়েছে বহু রাজনীতি। অনেকে প্রশ্ন করেন পুলিশ কি করে ? এই প্রসঙ্গে ম্যাক্সিম গোর্কি এক সময় বলেছিলেন , পুলিশ হচ্ছে বড়লোকদের দারোয়ান । অনেক মতামত অনেক চুল ছেঁড়া বিশ্লেষণ তেমন আছে অনেক অপ্রকাশিত সমস্যা। অনেকে রাষ্ট্রশক্তির ভয়ে ঈশ্বরশক্তির কাছে আত্মসমর্পন করে , তা অনেক কথা , বাঙালি জাতির আত্মমর্যাদা , ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি দুর্মর ভালবাসার উপর ভিত্তি করে বিগত দিনে হয়ে গেছে বহুবার অধিকারের আন্দোলন প্রানপন লড়াই । মানুষ আজ অধিকারের শেষ আশ্রয় হিসাবে বিচারবিভাগের উপরই সবচেয়ে বেশী আস্থা রাখে অধিকারের আন্দোলনে সংকীর্ণচেতা ও সন্দেহপরায়ণতা দূর করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন । পরাধীন ভারতে ব্রিটিশ আমলে বাংলার একজন প্রাক্তন সাব ইন্সপেক্টর জ্যোতিলাল মুখার্জী সম্পাদিত " প্রতিজ্ঞা" পত্রে তিনি আবেদন নিবেদনের নীতি পরিবর্ত্তনের দাবি জানান । তিনি " ঘুষির আবেদন " শীষক প্রবন্ধে গুপ্তচর এবং বিশ্বাস ঘাতকের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন । তাতেই পাওয়া যাবে সুফল শিক্ষা অধিকারের সোপান অনেক উন্নত দেশে আইন আছে ছেলে মেয়ে স্কুলে ভর্ত্তি না হলে বাবা মাকে কৈফিয়ত দিতে বা শাস্তি পেতে হয় । আমাদের দেশে ও এ আইন বাস্তবে প্রয়োগ

করা প্রয়োজন । অধিকারের লড়াই লড়তে অনেক স্কুল আজ এসেছে নারী অধিকারের লড়াই সে অতীত থেকে শুরু জার্মান নেত্রী রোসা লুক থেকে শুরু করে ক্লারা ভারতীয় নারী শিক্ষার আন্দোলনে চন্দ্রলেখা বসু কাদম্বীনি গাঙ্গুলী তাদের পরিশ্রমের ফসল অধিকারের আন্দোলনের ফসল , আজ নারী শিক্ষা , নারী চেতনা সরকারী বিভাগ থেকে শুরু করে মহাকাশ বিজ্ঞান , সামরিক বিভাগ সর্বত্র নারীদের পদচারণা পরিলক্ষিত । অতীতের ইতিহাস থেকে দেখা যায় পুরুষ যেন বটবৃক্ষ আর নারী হচ্ছে সঞ্চারিনী কোমল পল্লবিনী লতা , বৃক্ষকে অবলম্বন করে বাঁচাই তার নিয়তী । এই অবলম্বন সর্বত্রই জন্ম নিয়েছিল বাল্য বিবাহ । এ যুগে নারী নিছক লতা নয় বরং অনেক ক্ষেত্রেই বহ্নিশিখা। স্বাধীন সত্তা নিয়ে অনেক মেয়ে আজ বেঁচে আছে । উগ্রবাদ , সন্ত্রাসবাদ , সমাজবিরোধীরা নির্বিচারে নিরীহ মানুষ, নারী শিশুদের প্রাণ কেড়ে নেয় । এদের হাতে থাকে মারণাস্ত্র , তবু ও কাপুরুষের মতো অধিকারের ভাষাকে স্তব্দ করে দেয় । শোষণ বঞ্চনা মুক্তির এবং অধিকারের লড়ায়ের সবচেয়ে শানিত তরবারি " শিক্ষা" অধিকার হোক - " শিক্ষা , অন্ন , বস্ত্র , আশ্রয় ও নিরাপত্তা , যা প্রতিটি নাগরিকের জন্য হোক ।

হাজরো অত্যাচারীর বিরুদ্ধে একজন সৎ প্রতিবাদী মানুষ যথেষ্ঠ প্রতিবাদী মানুষের শারীরিক মৃত্যু হলেও তাদের নীতির মৃত্যু হয় না । মুক্তিদুত হয়েই তারা যুগযুগ মানুষের মনমন্দিরে জীবিত থাকেন ।
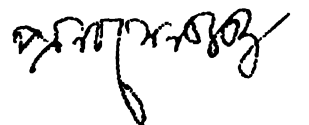
মিথ্যা দিয়ে কোন কিছু পেলে সেটা বজায় রাখতে সারাজীবন তাকে মিথ্যাবাদী হয়ে বাঁচতে হয়। কারণ চালাকি মিথ্যাচার আপাত সুন্দর তাতে কোন মহৎ কাজ সিদ্ধ হয় না ।

অধিকারের ভাষা ফুটে উঠুক শহর গ্রামের অলিগলি থেকে মানুষের শিরা উপশিরায় । অধিকার আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে তার কর্তব্যকে । সুতরাং কাউকে তার নায্যপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করা ঠিক নয় । যোগ্য ব্যক্তির যোগ্য সম্মান পাওয়া উচিত ।

অধিকার ছিনিয়ে নিতে হয় । প্রতিবাদী কণ্ঠ আপাত নীরব হলেও তা এগিয়ে যাবেই । যুগের ইতিহাস তাই প্রমাণ করে ।

আশা করি পাঠককুলের কাছে আমার সংগৃহীত তথ্য ও লেখনী দিয়ে লেখা বইটুকু গৃহীত হবে । ছাপাতে ও অক্ষর বিন্যাসে কিছু অনিচ্ছাকৃত ভুল থাকতে পারে , তাই আপনাদের কাছে বিনম্র অনুরোধ অনিচ্ছাকৃত ভুলগুলো পাঠক / পাঠিকারা মার্জ্জনা করে দেবেন । আপনাদের দেওয়া সম্মান আমার অনুপ্রেরণা ও আগামী পথ চলার / লেখার রসদ ।

ধন্যবাদান্তে

# লেখকের প্রকাশিত অন্যান্য বই গুলি

## কবিতা

১) রক্তচোখ

২) প্রলয়

৩) আক্ষেপ

৪) দুঃস্বপ্ন

৫) অব্যক্ত আর্তনাদ

৬) লেখার পেছনে

৭) জীবন প্রান্তরে

৮) ছবি কবিতা

## প্রবন্ধ

১) নিরন্তর

২) ছায়াপথ

৩) সীমান্ত সম্পর্ক

## সংবাদপত্র বিষয়ক (গবেষণামূলক)

১) স্মৃতির রোমন্থন সংবাদপত্র (১৯৮৭ -২০০৪)

২) সংবাদ সংস্কৃতি

৩) অধিকার

## অপরাধ/সন্ত্রাস/ঐতিহাসিক

১) অপরাধ অনুসন্ধান ও শাস্তি

২) রক্তাক্ত টাকারজলা

৩) সবুজ পাহাড়ের অভিযান

৪) অস্তিত্বের সংগ্রামে চাকমা জাতি ।

৫) My experience about Police work

## গল্প

১) উৎসর্গ

২) মুখোশ

৩) জীবন সংঘর্ষ

৪) সমাজের কান্না

৫) নীরব মরুদ্যান

৬) ভাঙ্গাঘর

৭) ফিরে দেখা

প্রকাশক ঃ পূর্ণিমা পাবলিকেশন্স
অফিসটিলা, বিশালগড়, ত্রিপুরা (পঃ)

# সূচীপত্র

# অধিকার , উৎস , ধারনা , উন্নতি , গুরুত্ব
# ও
# শ্রেণীবিন্যাস

# অধিকার , উৎস , ধারনা , উন্নতি , গুরুত্ব ও শ্রেণীবিন্যাস

**অধিকার ঃ-** মানুষের মর্যাদা এবং মানুষ ও তার প্রাকৃতিক অধিকার, অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত , যেহেতু প্রতিটি মানুষের মর্যাদা আছে পাশাপাশি আছে কতিপয় অধিকার , যখনই মানুষের অধিকারকে অস্বীকার করা হয় বা অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয় , তখন মানুষের মর্যাদা বিঘ্নিত ঘটে ।

**সম্মান মর্যাদা ঃ** অর্থ বা সম্পদ দিয়ে কেনা যায় না শক্তি দিয়ে ও সম্মান পাওয়া যায় না। প্রভাব প্রতিপত্তি , রাজনৈতিক সামাজিক , অর্থনৈতিক , জাতিগত , কোন কিছু দেখিয়ে সম্মান বা মর্যাদা লাভ করা যায় না । প্রকৃতির নিয়মে প্রতিটি মানুষ তার নিজস্ব মর্যাদা নিয়ে পৃথিবীতে আসে , সেখানে ধনী ,দরিদ্র , দক্ষ কিংবা অদক্ষ , শিক্ষিত কিংবা অশিক্ষিত , উন্নত সভ্য সমাজ কি অনুন্নত সমাজ এ সবের উপর নির্ভর করে না । মর্যাদা মানুষের চিহ্ন ।

এখানেই মানুষকে প্রাণী জগৎ কিংবা অন্য সৃষ্টি থেকে আলাদা করে রেখেছে। মানুষের অধিকার পারে সুন্দর সমাজ ও সভ্য সমাজ গড়তে । যেখানে থাকবে সম্মান ও নিরাপত্তা । অধিকারের মানে আরাম , আয়াসের জীবন অমনটা হতে পারে না। অধিকার প্রয়োজন মানুষের গুনগত মান বাড়ানোর জন্য এবং সুযোগ তৈরী করে দেওয়ার জন্য যাতে সামাজিক প্রতিটি দিক দিয়ে মানুষের উন্নয়ন সম্ভব হয় । মানুষের অধিকার প্রকৃতির নিয়মেই মৌলিক যা ব্যাতীত আমাদের পক্ষে মানুষ হয়ে বাঁচা অসম্ভব হয়ে যাবে । মানুষের অধিকারকে স্বীকৃতি না দিলে সামাজিক , রাজনৈতিক , অস্থিরতা ও উশৃঙ্খলতার সৃষ্টি হবে। দাঙ্গা , গৃহযুদ্ধ , হিংসা , হানাহানি শুরু হবে বৃহৎ স্বাধীনতা এবং ভালভাবে জীবন বাঁচানোর জন্য । সামাজিক , রাজনৈতিক অধিকারের পাশাপাশি অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ । ভেদাভেদবিহীন জীবন , স্বাধীন এবং তৃতীয় বিশ্বে দাসত্ব প্রথা , এই শব্দটাই মনে হয় অভিশাপ ইহার কাম্য ব্যাক্তি নয় । আইনের কাছে সবমানুষই সমান । বিচারের আগে যেন পরাক্রম শক্তির দম্ভে কাউকে দোষী বানানো না হয় ।

নাগরিক তার অধিকার , মানে তার নিজস্ব ভাবনা, চিন্তার অধিকার , ধর্মীয় অধিকার , মতামত ও ভাবপ্রকাশের অধিকার এবং যোগত্য অনুযায়ী সমভাবে কর্মসংস্থান ইত্যাদি থাকবে ।

অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অধিকার যার সাথে সংযোজিত , কাজের অধিকার , স্বাধীন ভাবে পেশা বেছে নেওয়া । কাজের উপযুক্ত পরিবেশ এবং বেকারত্বের বিরুদ্ধে ব্যাবস্থা , জাত , ধর্ম বর্ণ , স্ত্রী, পুরুষ ভেদাভেদ না করে সম কাজের জন্য/ সমশ্রমের জন্য সম মজুরী ।

বিশ্রামের অধিকার । জীবন জীবিকার মান , শিক্ষার আধিকার, এবং সংস্কৃতির অধিকার । আমাদের দেশ এবং সংবিধান মানুষের অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে । এই অধিকার মানুষের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক , সামাজিকঅধিকার । এই অধিকার প্রতিটি ব্যাক্তির উপভোগ করার অধিকার আছে । যেখানে জাতি , ভাষা ধর্ম জাতপাত , স্ত্রী , পুরুষ , রাজনৈতিক কোন ভেদাভেদ নেই , সবাই সমান ।

অধিকার এবং কর্তব্য অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত । মানুষের অধিকারকে সম্মান করা ও প্রতিটি মানুষের কর্তব্য । অন্যের অধিকার খর্ব করা বা তাতে হস্তক্ষেপ করার অধিকার কারো নেই । যদিও অধিকার রক্ষার্থে আমাদের সংবিধানে মৌলিক অধিকার প্রতিটি নাগরিকের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য । জাতীয় নিরাপত্তা , আইন শৃঙ্খলা জনস্বাস্থ্য এবং অন্যের অধিকার সুরক্ষার বন্দোবস্ত আইসন লিপিবদ্ধ ।

মানুষের জন্ম থেকেই স্বাধীন । কেহই তাকে প্রয়োজনীয় অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারে না , যেমন খাদ্য , বস্ত্র , আশ্রয় এবং শিক্ষা । কারো পক্ষে কোন ব্যাক্তি সংহতি , স্বাধীনতার অধিকার নেওয়ার বিধান নেই। এইগুলো অমান্য করলে আইনে তার রক্ষাকবচ আছে । মৌলিক অধিকার হচ্ছে সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকার । নানাহ্ কারণে সমস্ত বিশ্বেই মানুষের অধিকার এক হুমকীর মুখে

১) প্রচুর আর্থিক চাহিদা ।

২) জাতিবিদ্বেষ , নতুন অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ।

৩) সেনা নিয়ন্ত্রিত সরকার জনমতামত বিহীন

৪) স্বৈরতন্ত্র

৫) ধনীরাষ্ট্র বনাম , দরিদ্ররাষ্ট্র , ধনী বনাম গরীব ।

৬) ধর্মীয় উগ্রতা , সাম্প্রদায়িকতা উগ্রপন্থা ইত্যাদি অধিকারের অন্তরায় ।

ভারতবর্ষ বৃহত্তর চিন্তাভাবনা নিয়ে স্বাধীনতার জন্মলগ্ন থেকেই মানুষের চিন্তাধারা অধিকার রক্ষায় অগ্রনী ভুমিকা গ্রহন করে আমেরিকার তদানীন্তন রাজা ডঃ মার্টিন লুথার মানুষের অধিকার নিয়ে সোচ্চার হল , পরবর্ত্তীতে জুলিয়াস নায়েরে এবং (তানজেনিয়ার) এবং এশিয়া , আফ্রিকা এবং লাটিন আমেরিকার বহু ব্যাক্তিত্ব এই আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে ।

বিশেষ করে ভারতবর্ষে মানবাধিকার রক্ষায় অনেক পদক্ষেপ নেওয়া হয় এবং যুবকশ্রেণীর উন্নয়নের জন্য বিবিধ পরিকল্পনা গৃহীত হয় । ভারতীয় সংবিধান প্রতিজ্ঞা বদ্ধ প্রতিটি ভারতীয়ের সামাজিক সুরক্ষা , অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার , চিন্তার অধিকার, ভাবপ্রকাশের অধিকার , বিশ্বাস এবং ধর্মের প্রতি আস্থার অধিকার । সর্বক্ষেত্রে সমতা এবং উন্নতির সুযোগ এবং সমস্ত

নাগরিকের মর্যাদার অধিকার আমাদের সাংবিধানিক।

মানুষের মানুষ হিসাবে স্বাভাবিক যোগ্যতায় প্রাপ্য স্বাভাবিক অধিকারগুলিকেই মানবাধিকার বলে । মানুষের এই স্বাভাবিক অধিকার সমাজ সভ্যতা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের বৃহত্তর স্বার্থের প্রয়োজনে কিছুটা খর্ব হইলে ও মানবাধিকারের তালিকা প্রকৃতপক্ষে এতই দীর্ঘ যে তাহার তালিকা করা কষ্টসাধ্য । এক কথায় মানুষের জীবন , জীবিকা , ও মর্যাদার অধিকারই হইল মানবাধিকার.।

মানবাধিকারের বিষয়টি লইয়া বিশ্বব্যাপি আন্দোলন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হইতেই জোরদার হইয়াছে । এই বিষয়ে অগ্রনী ভূমিকা লইয়াছেন রাষ্ট্রসঙ্ঘ অর্থাৎ ১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিশ্বজনীন মানবাধিকার ঘোষনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ঐ ঘোষনায় রাষ্ট্রসঙ্ঘ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ঐ ঘোষনায় রাষ্ট্রসঙ্ঘ মানবাধিকারের বিষয়টি বিশদভাবে ব্যাখা করিয়াছেন । ঐ ঘোষনায় বলা আদর্শ গুলি ১৯৬৬ সালের ১৬ই ডিসেম্বর রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদ গৃহীত হইয়া দুইটি আন্তর্জার্তিক চুক্তিতে রূপান্তরিত হইয়াছে যাহা ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর হইতে ভারতবর্ষ সহ বিশ্বের প্রায় সকল দেশেই কার্যকর হইয়াছে ।

**চুক্তি দুইটি হইল -**

১) নাগরিক এবং রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ে আন্তর্জাতিক চুক্তি ।

২) অর্থনৈতিক , সামাজিক এবং সাস্কৃতিক অধিকারের বিষয়ে আন্তর্জাতিক চুক্তি ।

বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার স্বাধীন তার অধিকার এবং ব্যক্তির নিরাপত্তার অধিকার ,অযথা গ্রেপ্তার , কারাদন্ড বা নিষ্ঠাবান ব্যক্তির মুক্ত থাকিবার অধিকার , ন্যায্য বিচারের অধিকার , চিন্তা , বিবেক বুদ্ধি এবং ধর্ম স্বাধীনতার এবং শান্তিপূর্ণ ভাবে সমবেত হইবার এবং সভা করিবার অধিকার ইত্যাদি ।

কর্মের অধিকার , সামাজিক নিরাপত্তা, শিক্ষা পাইবার অধিকার সমাজের সাংস্কৃতিক জীবনে অংশ গ্রহন করিবার অধিকার এবং বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফসল ভাগ করিয়া লইবার অধিকার , শিল্প কলা উপভোগ করিবার অধিকার ইত্যাদি ।

প্রকৃত পক্ষে মানবাধিকারের পরিধি ক্রমবর্দ্ধমান । শিশু শ্রমিক নিয়োগ বদ্ধ করা , নারী পুরুষ সমানাধিকার। অন্ন - বস্ত্র - বাসস্থানের শিক্ষা - নির্মল পরিবেশ স্বাস্থের অধিকার সকলই মানব অধিকারের অর্ন্তভুক্ত।

এই প্রসঙ্গে ভারতের মানবাধিকার সুরক্ষা আইনে মানবাধিকারের যে সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে তাহা উল্লেখ করা প্রয়োজন। ঐ আইনের ২ ধারার (ডি) উপাংশ অনুযায়ী মানবাধিকার বলিতে " ভারতীয় সংবিধান কর্তৃক গ্যারান্টি প্রদত্ত অথবা আর্ন্তজার্তিক চুক্তিতে থাকা এবং ভারতের আদালত কর্তৃক বলবৎযেগ্য ব্যক্তির জীবন , স্বাধীনতা , সমতা এবং মর্যাদার সম্পর্কিত অধিকারকে বুঝায় ।

উপরোক্ত আর্ন্তজাতিক চুক্তি বলিতে ১৯৬৬ সালের ১৬ই ডিসেম্বর রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত নাগরিক এবং রাজনৈতিক অধিকারের উপর আর্ন্তজাতিক চুক্তি এবং অর্থনৈতিক , সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকারের উপর আন্তর্জাতিক চুক্তিকে বুঝান হইয়াছে ।

গণতন্ত্র হইল সেই ব্যবস্থা যেখানে জনগন কর্তৃক সরকার নির্বাচিত হইয়া জনগণের কল্যাণে কার্য করেন। এই ব্যবস্থায় চুড়ান্ত ক্ষমতা জনগণের উপরই ন্যস্ত থাকে । গণতন্ত্রে রাষ্ট্রের সকল বিষয়ই স্থির করিয়া দেন জনগণ অথাৎ জনমত।

প্রাচীন যুগে রাজাই ছিলেন সকল কর্তৃত্বের অধিকারী । কিন্তু সেই শাসকের স্বেচ্ছাচার যখন চরমে উঠিত তখন তাহাকে
স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইত যে ,রাজার ইচ্ছার ও উর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত আছে ধর্ম। গণতন্ত্রে জনগনকে বসান হইয়াছে রাজার আসনে । কিন্তু গনতন্ত্রের ও একটি ধর্ম আছে , বিরুদ্ধ মত শান্তি পূর্ণ ভাবে প্রকাশের অধিকার , সংগঠন করিবার অধিকার , আইনানুসারে বিচার পাইবার অধিকার , সমতার অধিকার , স্বাধীনতার অধিকার ইত্যাদি ।

মৌলিক অধিকার গুলি সেই গণতান্ত্রিক ধর্মেরই অংশ । গনতন্ত্রের ঐ ধর্মে অর্থাৎ মানবাধিকারে আঘাত দেওয়া হইলে জনগনের সরকার স্বেচ্ছাচারী রাজার মতই ধিকৃত হইয়া জনগন কর্তৃকই উৎখাত হইবেন । সেই কারণে মানবাধিকার সুরক্ষিত না হইলে গনতন্ত্র *ঠেকে* না । গনতান্ত্রিক সমাজে এই মানবাধিকারের গুরুত্ব অসীম ।এই গুরুত্বের কথা স্মরণে রাখিয়া প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র তাহাদের সংবিধানে মানবাধিকার রক্ষা করিবার অঙ্গিকার করিয়াছে ।ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় খন্ডে মৌলিক অধিকার সমূহের অঙ্গীকার মানবাধিকারের নামান্তর মাত্র।

**উৎসঃ-** মানুষের অধিকার প্রতিপালিত হয় সভ্য সমাজে ।আইন তৈরী হয়েছে অধিকার সুরক্ষিত করার জন্য । যাতে করে কারো অধিকার লুণ্ঠিত না হয় । অধিকার ও কর্তব্য দুটোই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ।দীর্ঘবঞ্চনা থেকে আন্দোলন , বিপ্লব ইত্যাদির জন্ম নেয় ।ইতিহাস বলে মানুষের অধিকার যেখানে লুণ্ঠিত হয়েছে সেখানেই বিপ্লবের সুত্রপাত হয়েছে ।উদাহরণস্বরুপ বলা যেতে পারে বঞ্চিত মানুষের সংঘঠিত আন্দোলন শুরু হয় ফ্রান্সে ১৭৮৯ এ । ফ্রান্সের সরকারকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছিল।রক্তের নদী বাহিত হয়েছিল , আন্দোলন প্রতিহত করতে শুরু হয়েছিল গিলেটিন ,পরবর্ত্তীতে ১৭৯৯ থেকে শুরু হয় নেপোলিয়ানের যুগ ।নিয়মিত অনুযায়ী ধীরে ধীরে মানুষ তার অধিকার ফিরে পেতে থাকে ।একই রকম ভাবে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ(১৭৭৫ - ৮৩)।চীনা বিপ্লব (১৯১১-১২) সান ইয়াট সানের নেতৃত্বে , মাঞ্চুরিয়ান সাম্রাজের পতন , প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ,মানুষের অধিকার এক বিশাল , বিস্তিন্ন ভুমি , বর্তমানে নারীমুক্তির আন্দোলন নারী অধিকারের আন্দোলন সমস্ত বিশ্বে

আলোড়িত হচ্ছে । গ্রাম , শহর , পাহাড় , রাজ্যে , রাজ্যে দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়ছে মানুষের অধিকারের শ্রেণীবিন্যাস এভাবে হতে পারে ।

১) বাঁচার অধিকার

২) কথা বলার অধিকার

৩) দল গঠনের বা অ্যাসোসিয়েশনের অধিকার।

৪) চলাফেরার অধিকার স্বাধীনভাবে ।

৫) বসবাসের অধিকার ।

৬) সম্পত্তির অধিকার ।

৭) জীবন বাঁচানোর জন্য রোজগারের অধিকার

৮) কাজের অধিকার

৯) সমকাজে সমবেতনের অধিকার।

এছাড়া রাজনৈতিক অধিকার, ভোটদানের অধিকার । তবে এটা তাৎপর্যপূর্ণ যে গনতান্ত্রিক ব্যাবস্থাপনায় মানুষ অনেক বেশী অধিকার ভোগ করতে পারে অনেক সময় আমরা কর্তব্য সমন্ধে ভুলে যায় ।আমাদের মনে রাখা উচিত অধিকারের সাথে আমাদের কর্তব্য নিহিত ।

## " স্বাধীনতা কখনো লাইসেন্স নয়"

মানবিক নিয়ম থেকেই কর্তব্যের জন্ম । একনায়কতন্ত্র থেকে বেশীর ভাগ মানুষের অধিকার লঙ্ঘিত হয়। সাম্রাজ্যবাদীরা অধিকার লঙ্ঘিত করে ১৯৪৮ সালে রাষ্ট্রসংঘের জেনারেল এ্যাসেম্বলী অনুষ্ঠিত হয় প্যারিসে । সেখানেই ঘোষিত হয় মানবাধিকারের ঘোষনা ।

১৯৪১ সালের জানুয়ারী মাসের ৬ তারিখ ফ্রাঙ্কলিন ডি রুশভেল্ট নাগরিকের অধিকার সম্বন্ধে বলেছিলেন **প্রথমত** - বিশ্বের সর্বস্থানে বলার ও ভাব প্রকাশের অধিকার থাকতে হবে ,

**২য়ত** - পৃথিবীর সর্বস্থানে নিজের ইচ্ছেমত ভগবানের প্রার্থনা ও ধর্মীয় মত প্রকাশের অধিকার থাকতে হবে।

**৩য়ত** - পৃথিবীর সর্বত্র স্বাধীনতা।

**চতুর্থত** পৃথিবীর যে কোন স্থানে ভয়হীন অর্থাৎ ভয়থেকে মুক্তি ।

অধিকার নিয়মানুবর্তিতার মাধ্যমে স্বাধীনতা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো লড়াই করছে সত্য ও স্বাধীনতার জন্য। অধিকারের ভিন্ন মতামত আছে । রবার্ট বার্নস (১৭৫৯-৯৬) বলেন স্বাধীনতা এবং আনন্দ একসাথে চলে ,জর্জ ওরওয়েস (১৯০৩-১৯৫০) ভিন্ন মত বর্ণনা করেন , যুদ্ধ, শান্তি , স্বাধীনতা ,

দাসত্ব , এ যুদ্ধ , পরমানু যুদ্ধ নয় , লড়াই মিলে মিশে থাকার লড়াই বাঁচার যুদ্ধ, কর্মসংস্থানের যুদ্ধ অধিকার রাষ্ট্র কতৃর্ক সুরক্ষিত হতে হবে । অধিকার এবং কর্তব্য রক্তবিন্দুতে থাকবে।

মানুষের মৌলিক স্বাধীনতা জন্ম থেকে পাপ্তি । সামাজিক অবস্থান , থেকে তৈরী হবে সামাজিক অধিকার , অর্থনৈতিক অধিকার ভালভাবে বাঁচার জন্য । তার জন্য অন্যের উপর চাপিয়ে দেওয়া নয়।

ব্যাক্তিগত মতামত প্রকাশ করা ব্যাক্তির ইচ্ছা তবে তা যেন অন্যের ক্ষতির কারণ না হয় ।

প্রকৃতির অধিকার এবং প্রকৃতির নিয়ম থেকেই অধিকারের জন্ম । গ্রীক এবং রোমান নানাহ্ গল্পে এই ধারনা গুলো প্রকাশ পেয়েছে ।

মানুষের অধিকার সম্পর্কে ১১৮৮ তে রাজা অলফোনসো মানুষের অধিকার সম্পর্কে একটি সুনির্দিষ্ট তালিকা প্রকাশ করেন, ১২২২ রাজা আন্দ্রে দ্বিতীয় নাগরিকের অধিকারের প্রস্তাব দেন , ১২১৫তে ইংল্যান্ডের রাজা জন , অধিকার প্রকাশ করেন মাগনা কার্টার মাধ্যমে ।

১৭র দশকে নিয়ম ব্যবহৃত হয় আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনের মাধ্যমে । ১৭ দশকের মধ্যভাগ থেকে আর্ন্তজাতিক চুক্তি রক্ষার কাজ শুরু হয় ।

মানুষের অধিকার সম্পর্কে পরিষ্কার ধারনা শুরু হয় " ভার্জিনিয়া ঘোষনা ১৭৭৬" থেকে , ১৭৭৬ সালে আমেরিকার স্বাধীনতার ১৭৯১ সালে প্রথম আমেরিকার সংবিধান সংশোধিত হয় । অধিকারের সম্বন্ধে ফ্রান্সের ঘোষণা ১৭৮৯ সালে নাগরিকের মৌলিক অধিকার এবং উন্নত রাষ্ট্রগুলিতে রাষ্ট্রগুলোর সংবিধান তৈরী হয় সুইডেন ১৮০৯ , স্পেন -১৮১২ নরওয়ে -১৮১৪ , বেলজিয়াম - ১৮৩১ , সার্দিনিয়া -১৮৩৮ , ডেনমার্ক - ১৮৪৯ , পার্সিয়া ১৮৫০ , বেশীর ভাগ জার্মান রাজ্য ১৮৭১, এবং সুইজারল্যান্ড - ১৮৭৪, ১৯১৮ সালের পর জার্মানি এবং বেশীর ভাগ ইউরোপীয় দেশগুলো সংবিধান এবং নাগরিক অধিকার সম্পর্কে বিশদভাবে ভাবনা চিন্তা শুরু করে ১৯৪৯ সালের পর লাটিন আমেরিকা এবং এশিযান ভুক্ত দেশগুলো ও ব্যাক্তিগত অধিকার সম্পর্কে অনেক বেশী পরিমাণে সোচ্চার হয় J.E.S Fawcett উনার "The Law of Nahinp" মানবাধিকারের ব্যাখা দিতে গিয়ে বলেছেন , মানব অধিকারকে কখনো মৌলিক অধিকার বা প্রাকৃতিক অধিকার হিসাবে বর্ণিত করেছেন , Dr.D.J.Harries উনার " cases and materials বইয়ে লিখেছেন আন্তর্জাতিক আইন মানবঅধিকারকে রক্ষার জন্য তৈরী হয়েছে । যেমন Art - I বলেছে" All Human being are born free and equal in dignity and right"

মানব অধিকার নিয়ে আন্তর্জাতিক ওয়ার্কশপে গুরুত্ব পেয়েছিল মুক্ত পৃথিবী , যেখানে উপস্থিত ছিল আইনজীবি, বিচারক , মানবঅধিকার কর্মীরা এবং বুদ্ধিজীবি , সমাজ আলোচ্যবিষয় ছিল ,

1) Human right and economic democracy

2) Human right - A live and vibrant issue
3) Human right are right of man.
4) Human right - A step towards Ideals.
5) Human rights - A Widly accepted ideology.
6) Human right in dignity and work.
7) Human right Jurisprudence.
8) Human right represents vital expression of Values.
9) Universal declaration of the rights of man - 24th October 1945.10th December , 1948 adopted the universal declarationof the rights of man .
10) Universality aleont Human rights.

মানব অধিকারের সু -বিশাল ইতিহাস ভারতীয় সুপ্রীম কোর্টের মাননীয় বিচারপতি পি.এন.ভাগবতী , মানব অধিকার বিষয়ক এক সেমিনারে বলেছিলেন অধিকারের বিষয়টুকু মানুষের অধিকারকে রক্ষা করা যা , ব্যাবলনীয় আইন , আশারিয়ান আইন এবং ভারতের বৈদিক ধর্মীয় যুগ থেকেই শুরু। অধিকার রক্ষার বিষয় টুকু সুচারু ভাবে ও বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করেছেন , প্লুটো , গ্রীক , এবং রোমান দার্শনিক । উনাদের আলোচনায় ছিল ধর্মীয় স্বাধীনতা , ভোটদানের অধিকার , ব্যাবসার অধিকার , নাগরিকের আইনগত অধিকার যা গ্রীসে দেওয়া হয়েছিল ।

## মানবাধিকার ঘোষনা সম্পর্কে আন্তর্জাতিক ঘোষনা ১৯৪৮

আর্ট - ১ - প্রতিটি মানুষ স্বাধীনভাবে মর্যাদা ও অধিকার নিয়ে বাঁচার আধিকার আছে ।

আর্ট - ২- প্রত্যেক মানুষ অধিকার এবং স্বাধীনতা প্রাপ্য যেখানে থাকবে না কোন ভেদাভেদ , জাতি, বর্ণ , ধর্ম , ভাষা রাজনৈতিক , সামাজিক , বৈষ্যম্যতা

আর্ট - ৩- প্রত্যেকের জীবনের স্বাধীনতার এবং নিরাপত্তার অধিকার আছে ।

আর্ট - ৪- দাস নিয়োগ আইনগত দন্ডনীয়।

আর্ট- ৫- কোন প্রকার নিষ্ঠুরতা, অত্যাচার শাস্তির যোগ্য ।

আর্ট- ৬- আইনের সম্মুখে সবার অধিকার সমান।

আর্ট -৭- বৈষম্যের বিরুদ্ধে আইন সমভাবে রক্ষা করে ।

আর্ট - ৮ - সংবিধান অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যাক্তি আইনী প্রতিকার চাইতে পারেন

আর্ট - ৯ - কোন ব্যাক্তিকে বেআইনী আটক বা গ্রেপ্তার করা যাইবে না

আর্ট -১০- প্রত্যেক ব্যাক্তি সমভাবে আইনী সাহায্য লাভ করিবে ।

আর্ট -১১- প্রত্যেক ব্যাক্তি জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক স্তরে আইনী সাহায্য পেতে পারেন ।

আর্ট ১২- কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনে , পারিবারিক জীবনে , বা উনার সম্মানে , খ্যাতিতে , আঘাত করিলে সেই ব্যক্তি আইনী সাহায্য নিতে পারেন।

আর্ট - ১৩- প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার আছে ।

আর্ট ১৪- প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ রাজ্য বা দেশের বাইরে যাওয়ার অধিকার আছে বৈধ অনুমতি নিয়ে পুনরায় দেশ বা রাজ্যে ফিরিয়া আসিতে পারেন ।

আর্ট- ১৫ - প্রত্যেক ব্যক্তির জাতীয় পরিচয়পত্র পাওয়ার অধিকার আছে ।

আর্ট - ১৬ - বৈধ বয়সে সম্মতিক্রমে জাতি ধর্ম , বর্ণ , নির্বিশেষে বিবাহ হইতে পারে ।

আর্ট - ১৭ - প্রত্যেকের নিজস্ব সম্পত্তির অধিকার আছে ।

আর্ট -১৮ - প্রত্যেক ব্যক্তি নিজস্ব চিন্তাধারার স্বাধীনতা আছে ।

আর্ট -১৯- প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব মতামত ও ভাবপ্রকাশের অধিকার আছে ।

আর্ট- ২০ - প্রত্যেক ব্যক্তির শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকার আছে ।

আর্ট ২১- প্রত্যেক ব্যক্তির তার সরকারে নিয়মানুযায়ী অংশগ্রহন করার অধিকার আছে ।

আর্ট - ২২- প্রত্যেক ব্যক্তির সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার আছে ।

আর্ট -২৩- প্রত্যেক ব্যক্তির কাজের অধিকার নিজের রুচী অনুযায়ী কাজ এবং কাজ পাওয়ার অধিকার আছে সমকাজে সমবেতন, নিজের স্বার্থে ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার আছে ।

আর্ট -২৪- প্রত্যেকের বিশ্রামের অধিকার আছে এবং কাজের সময়ের ও সীমাবদ্ধতা আছে এবং সবেতন ছুটির অধিকার আছে ।

আর্ট -২৫- প্রত্যেক ব্যক্তির জীবন ধারনের ,স্বাস্থ্যের , খাদ্যের , জীবনধারনের অধিকার আছে নিরাপত্তা সহ।

আর্ট ২৬- প্রত্যেকের শিক্ষার অধিকার আছে , শিক্ষাহবে ব্যয়হীন , প্রাথমিক শিক্ষা সবার জন্য,উচচশিক্ষা নিয়মঅনুসারে এবং মেধাভিত্তিক ।

আর্ট - ২৭- প্রত্যেকের উন্মুক্ত সংস্কৃতির অধিকার আছে ।

আর্ট - ২৮ - আন্তর্জাতিক ঘোষণা অনুযায়ী মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতা সমভাবে প্রয়োজ্য ।

আর্ট - ২৯ - প্রত্যেকব্যক্তি তার সামাজিক কর্তব্য আছে ।

তাছাড়া ও আছে আন্তর্জাতিক ঘোষনা রাজনৈতিক অধিকার সমূহ -১৯৬৬। আন্তর্জাতিক ঘোষনা, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সংস্কৃতির অধিকার সমূহ -১৯৬৬ আমেরিকান সম্মেলন মানব অধিকার সম্পর্কিত - ১৯৬৯। মানবঅধিকার এবং জনগনের অধিকার সম্পর্কিত আফ্রিকান দাবী সমূহ - ১৯৮১।

## আন্তর্জাতিক ঘোষনা অনুযায়ী কর্তব্য সমূহ ঃ-

আর্ট -২৭ প্রত্যেক ব্যক্তি তার পরিবারের প্রতি কর্তব্য আছে এবং সমাজের প্রতি কর্তব্য আছে। তথা রাজ্য, রাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক সমুহের প্রতি কর্তব্য আছে।

নিজের অধিকার এবং স্বাধীনতা থাকলে অন্যের অধিকারকে কখনো খর্ব করা যাবে না সকলের স্বার্থের পরিপন্থী হয় এমন হওয়া যাবে না।

আর্ট - ২৮ প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য অন্যকে সম্মান জানানো যেখানে কোন ভেদাভেদ থাকবে না। সম্পর্কের উন্নতি সাধন ঘটাতে হবে। সম্পর্কের উন্নতি সাধন ঘটাতে হবে। একে অপরের প্রতি সম্মান ও ধৈয্য সহকারে কাজ করিতে হইবে।

আর্ট - ২৯ প্রত্যেক ব্যক্তির কিছু কর্তব্য আছে, যেমন পারিবারিক এবং সামাজিক সম্প্রীতি রক্ষা করা, মাতাপিতাকে সর্ব্বদা সম্মান করা, তাদের প্রয়োজনে তাদের সর্ব্বদা সাহায্য করা।

সামর্থ অনুযায়ী রাষ্ট্র ও জাতির প্রতি কতর্ব্য করা দেশের নিরাপত্তা নিয়ে কখনো কারো সাথে আপোষ নয়।

সামাজিক ও জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করা রাষ্ট্রের সংহতি ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা আইন অনুযায়ী।
নিজের সামর্থ অনুযায়ী কাজ করা এবং সমাজের স্বার্থে আইন অনুযায়ী ট্যাক্স প্রদান করা।
জাতীয় সংহতি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা।

আর্ট - ৩০ জনগণের অধিকার সম্পর্কিত আফ্রিকান কমিশন অধিকার ও আফ্রিকাকে রক্ষা করা।

মানব অধিকার রক্ষা আইন -১৯৯৩।

আর্ট - ২১ (ভারতীয় সংবিধান) নাগরিকের জীবনের নিরাপত্তা। প্রতিটি মানুষের জীবনকে উপভোগ করার অধিকার আছে।

"কোন অপরাধে আক্রান্তেরর প্রতি মানব অধিকার" ঃ- আক্রান্তকে কোন প্রকার ভয়ভীতি প্রদর্শন করা যাবে না, তাকে আর্থিক এবং আইনী সাহায্য দিতে হবে। দ্রুত তদন্ত এবং বিচার।
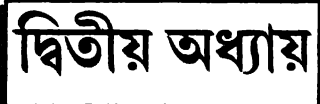
মানুষ দ্বারাই মানুষের অধিকার খর্ব হচ্ছে। ক্ষমতার দম্ভে ধুলোয় লুটোচ্ছে মানুষের মহিমা, আইন, আদালত, সমাজ, রাজ্য, দেশ সবই আছে তবু ও ভু-লুণ্ঠিত মানবতার উদ্ধারে নাগরিকদের অধিকার রক্ষায় দেশে দেশে গঠিত হয়েছে মানবাধিকার কমিশন। আমাদের ভারতবর্ষে ও জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠিত হয়েছে, আমাদের দেশে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ভারতীয় সংবিধানে

স্বীকৃত। যেমন - বেঁচে থাকার অধিকার , আত্মরক্ষার অধিকার, শিক্ষা , স্বাস্থ্য ইত্যাদির অধিকার আইনের চোখে সমান বিচার পাওয়ার অধিকার ইত্যাদি ।

রাষ্ট্রের কর্তব্য হচ্ছে নাগরিকদের অধিকার সুরক্ষিত করা । শুধু সমাজ কর্তৃক নয় প্রশাসন দ্বারা ও অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা বহু । অধিকার হরণ ও লঙ্ঘনের ঘটনা আকছার ঘটছে সমাজের বিত্তবান ও ক্ষমতাবানদের ক্ষমতার দম্ভে । সমগ্র সংকুচিত ,বাংলাদেশ, মায়ানমার , পাকিস্তান , আফগানিস্থান , ইরাক ইত্যাদি ।

অনেক সময় রাষ্ট্রীয়শক্তি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মানুষের অধিকারের উপর চরম আঘাত করে । তার জন্য দেশীয় স্তরে আন্তর্জাতিক স্তরে মানুষের অধিকার রক্ষায় কমিশন গঠিত হয়েছে । আমাদের ভারতবর্ষে ও জাতীয় স্তরে তৈরী হয়েছে মানবাধিকার কমিশন । প্রাক্তন বিচারপতি, প্রশাসক, আইনজীবি , সমাজসেবী ইত্যাদি । বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে কমিশন গঠিত মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে মানব অধিকার কমিশন গঠিত । মানুষকে অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করা এবং অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া কমিশনের কর্তব্য ।

*********************

মানুষের অধিকার - জীবন ও স্বাধীনতার অধিকার , ধর্মের অধিকার , আত্মরক্ষার অধিকার

# মানুষের অধিকার - জীবন ও স্বাধীনতার অধিকার, ধর্মের অধিকার , আত্মরক্ষার অধিকার

**জীবন ও স্বাধীনতার অধিকার ঃ-** যেমন বন্ধ ঘোষণা করা ব্যক্তির জীবন এবং স্বাধীনতার উপর সমস্যার সৃষ্টি হয়। তেমনি ভারতীয় সংবিধানের ২১ ধারা অনুযায়ী Citizen entitled to a life of dignity

আদালত অধিকার রক্ষায় সম্রাটের মতন অশুদ্ধ জল পরিশোধিত করা , স্বাস্থ্য রক্ষা করা, সু চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা , শিশুকে রক্ষা করা , সংবিধানের ১৪ ধারা অনুযায়ী ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুকে শিক্ষার ব্যবস্থা করা । কাজের পরিবেশ তৈরী করা সবই রাষ্ট্রের কর্তব্য এবং জনগণের অধিকারের মধ্যে পড়ে । অসৌন্দর্য সুন্দরী প্রতিযোগীতা অপরাধ ভারতীয় সংবিধানের আট/ - ১ মতে, জীবন এবং স্বাধীনতা (সংবিধান - ২১ ধারা) জীবনের অর্থ বিশাল , পারিশ্রমিক এবং কর্মচারী , কৃষি এবং পশুপালন , গ্রাম পঞ্চায়েত এবং গ্রামের মানুষ শিল্প কারখানা এবং শ্রমিক , ব্যক্তিগত স্বাধীনতা , পিছিয়ে পড়া সমাজের শিক্ষা ও আর্থিক উন্নয়ন । পরিবেশ রক্ষা , বন ও বণ্যপ্রাণী রক্ষা , জাতীয় পার্ক, স্মৃতিসৌধ, শিশুর বাধ্যতামূলক শিক্ষা , মায়ের চিকিৎসার বন্দোবস্ত। কাজের উপযুক্ত পরিস্থিতি এবং মাতৃকালীন সময়ের অবকাশ চিকিৎসা ব্যবস্থা ।

**শিক্ষার অধিকার জীবনের অধিকার** (আর্ট- ২১) খাদ্যের অধিকার জল এবং মুক্ত পরিবেশ এর সৌন্দয্যপূর্ণ জীবন (আর্ট -২১) জল পাওয়ার অধিকার জীবনের অধিকারের অংশ , মর্যাদা নিয়ে বাঁচা বা জীবন ধারন করা। জীবনের অধিকারের মধ্যে যে কোন জাতিসত্বার মধ্যে বৈবাহিক কোন বাধা নেই । সামাজিক বিচার এবং সমতা " কমপেনসেসান" ব্যক্তিগত অধিকার এবং সমষ্টিগত অধিকার চলাফেরার স্বাধীনতা গোপনীয়তার অধিকার (আর্ট - ১৯(২)) আশ্রয়ের অধিকার (আর্ট - ১৯((1)(e) এবং আর্ট - ২১) কাজ এবং শিক্ষার অধিকার নাগরিকের জীবনের নিরাপত্তা (আর্ট -১৯) সামাজিক বিচার জীবনের নিরাপত্তার সুনিশ্চিত করে (পৃঃ ৯৩৮, এ.আই.আর, ১৯৯৫ সু কো) বন্ধ মৌলিক অধিকার লংঘন করে (আর্ট -১৯ এবং ২১) (আর্ট - ২২৬) স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার নাগরিক অধিকার (খরক সিং বনাম , টেট অব .ইউ.পি)(আর্ট -২৩৬ এবং আর্ট ১৯ (১) (জি) অধিকার

সুরক্ষিত । রাস্তা ব্যবহারের স্বাধীনতা , নজরদারী কারো স্বাধীনতা হরণ করে না , রুল - (২৩(৪) অপরাধ প্রতিরোধ । অপরাধ প্রতিরোধ ।

কোন ব্যক্তি তার জীবন , স্বাধীনতা বা সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হতে পারে না , কোন আইনী কারণ ব্যাতীত , (আর্ট ১৯ এবং ২১)

## আত্মহত্যার অধিকার ঃ- (Right to comint Suicide)

In Mariti Shripati dubal Vs. State of Maharastra , bombay high count held that Sechin -309 of the penl code which prvides for punishment for attempt to commit Suicide was in violaton of Articles 14 and 21 . In p. Rathinam vs union of India , a two judges bench of the supreme court also held that right to life under Article 21 included right not to live a force life . I,e to commit suicide and therefore sechion 309 of the penal code was held to be unconstiutinal . But a Bench of five judges aerruled both the aleae cases in Gian kaur V. State of punjale and held that right to life is a natural right embodied in artical 21 but suicide is an unatural fermination or extinetion of life. Article 21 which guarantees protation of life cannot be constmed . So as to read there in extinction of life or right fo die.

## Rjght to life inculdes right against negligent death:-

The supreme conrt held that every ibjured person brought for Medical treatment should instantaneously be given Medical help to preserve life and thereafter the procedural Criminal Law be allowed to operate in order to avoid negligent death.

## Social Justice is a Fundamental night :-

The supreme court in Ashok kumar Gupta v. State of U.P held that Article 21 read with preamble and Article 38 guarantees serial justice as fundamental right.

(Ref - P.97 , Human right - A.N. SEN).

Right to privacy is implicit in right to life and liberty guaranteed under article 21 subject to certain exceptions recognized in the case.

## মৃতদেহের মর্যাদা দান - (আর্ট -২১)

## নাগরিকের অধিকার - আর্ট - ১৯

১) ভাবপ্রকাশ ও বলার স্বাধীনতা,

(২) অস্ত্রবিহীন শান্তিপ্রিয় জমায়েত

(৩) দল বা ইউনিয়ন গঠন করা

(৪) ভারতবর্ষে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করা।

(৫) ভারতের যে কোন জায়গায় বসবাস করা।

(৬) সম্পত্তি ক্রয় বা বিক্রয় করা

(৭) যে কোন জায়গায় পেশা চাকুরী বা ব্যবসা করা।

## ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার (আর্ট - ২৫)

ধর্ম ব্যক্তিগত,

ধর্ম মানে বিশ্বাস।

## " সংবিধান স্বীকৃত অধিকার সমুহ "

১৪) আইনের চোখে সবাই সমান এবং আইনের আশ্রয় সকলে সমভাবে পাবেন।

১৫)ধর্ম, জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ বা জন্মস্থানের কারণে নাগরিকদের মধ্যে বৈষম্য করা চলবে না, দোকানে হোটেলে, আমোদ প্রমোদের স্থানে, রাস্তায়, সরকারী অর্থে নির্মিত জলাশয়ে স্নানের ঘাটে প্রবেশ নিষেধ করা যাবে না। অবশ্য নারী, শিশু ও অনগ্রসর শ্রেণীর উন্নতির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা যাবে।

১৬) সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সমান সুযোগ থাকবে। ধর্ম বর্ণ জাতি, লিঙ্গ বা জন্মস্থানের কারণে কেউ অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না। অবশ্য অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা যাবে।

১৭) অস্পৃশ্যতা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হলো। কোন মানুষই অস্পৃশ্য নন্। অস্পৃশ্যতার কারণ দেখিয়ে কোন ব্যক্তিকে অযোগ্য বিবেচনা করা কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

১৮) সেনাবাহিনী বা শিক্ষাগত উপাধি ছাড়া অন্য কোন উপাধি দেয়া চলবে না।

১৯) সকল নাগরিকের থাকবে - (ক) মত প্রকাশের স্বাধীনতার (খ) শান্তিপূর্ণ সমাবেশের (অস্ত্র ছাড়া) স্বাধীনতা(গ) সংগঠন করার স্বাধীনতা (ঘ) ভারতের যে কোন স্থানে স্বাধীনভাবে চলাফেরার স্বাধীনতা (ঙ) দেশের যে কোন স্থানে বসবাসের স্বাধীনতা (চ) যে কোন প্রকার কাজ. ব্যবসা. বাণিজ্য করার স্বাধীনতা।

২০) শুধু চালু আছে এমন আইন ভঙ্গ ছাড়া অন্য কোন অপরাধে শাস্তি দেয়া চলবে না। আইন ভঙ্গের সময় সে আইনে যতটুকু শাস্তির বিধান ছিল তার বেশী শাস্তি হবে না। একই অপরাধের জন্য একবারের বেশী বিচার এবং শাস্তি হবে না। কোন ব্যক্তিকে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা যাবে না।

২১) আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোন ভাবে কোন ব্যক্তি জীবন এবং স্বাধীনতা হরণ করা যাবে না।

২২) গ্রেপ্তার হলে সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তারের কারণ জানাতে হবে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে। যিনি গ্রেপ্তার করলেন তার নাম, পরিচয় জানাতে হবে, গ্রেপ্তারের লিপি তৈরী করে লিখতে হবে কি অভিযোগে গ্রেপ্তার, কোথায় রাখা হবে আটক ব্যক্তিকে এবং গ্রেপ্তারের সময় আটক ব্যক্তির শারীরিক অবস্থা কি? গ্রেপ্তার লিপির কপি দিতে হবে পরিবারের লোক বা আত্মীয় বা প্রতিবেশীকে। আটক ব্যক্তিকে তার পছন্দমতো উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করার সুযোগ দিতে হবে। ২৪ ঘন্টার মধ্যে বিচার বিভাগীয় হাকিমের কাছে হাজির করতে হবে। অবশ্য গ্রেপ্তারের স্থান থেকে আদালত পর্যন্ত যাওয়ার সময়টুকু অতিরিক্ত পাওয়া যাবে। হাকিমের অনুমতি ছাড়া ২৪ ঘন্টার বেশী কাউকে আটক রাখা যাবে না। বিচারক আটক ব্যক্তিকে জানাবেন সে বিনামূল্যে আইনের সাহায্য পাবে যদি তার বাৎসরিক আয় ২৫ হাজার টাকার কম হয়। সে তপশীলি জাতি, তপশীলি উপজাতি বা মহিলা হলে বাৎসরিক আয়ের প্রশ্নটি থাকবে না।

২৩) মানুষকে নিয়ে, মানুষের দেহ নিয়ে বাণিজ্য বা বেগার খাটানো সম্পূর্ণ নিষেধ এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

২৪) ১৪ বছরের নীচে কোন শিশুকে কোন কারখানায়, খনিতে বা বিপজ্জনক কোন কাজে নিযুক্ত করা যাবে না।

৩২ও ২২৬, ৩৯ ক, ৫১ এ ঃ- নাগরিকের মৌলিক দায়িত্ব হলো সংবিধান, জাতীয় পতাকা এবং জাতীয় সঙ্গীতকে সম্মান করা, দেশের একতা এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা, প্রয়োজনে দেশের প্রতিরক্ষার কাজ করা, বিভিন্ন ধর্মীয়, ভাষা ও অঞ্চলিক গোষ্ঠীর লোকদের মধ্যে ঐক্যের জন্য কাজ করা, নারীর মর্যাদা হানিকর যে কোন প্রকার কাজকে নিন্দা করা, প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য কাজ করা, জাতীয় সম্পত্তি রক্ষা করা ইত্যাদি।

৩২এবং ২২৬ ঃ- মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করলে হাইকোর্ট বা সুপ্রীমকোর্ট আবেদন করা যাবে এবং প্রতিকার পাওয়া যাবে।

## ধর্ম সম্পর্কিত অপরাধ বিষয়ে

**২৯৫ ধারা** - কোন ধর্মকে অপমান করার উদ্দেশ্যে ধর্মস্থানের ক্ষতি করলে বা তার পবিত্রতা নষ্ট করলে [ Injuring or defiling place of worshop with intent the religion of any class] কেউ কোন ধর্মকে অপমান করার উদ্দেশ্যে কোন ধর্মস্থান , অথবা ঐ ধর্মের ব্যক্তিরা যে বস্তুকে পবিত্র বলে জানে সেই বস্তুকে ধ্বংস , ক্ষতি বা অপবিত্র করলে কিংবা ঐ ধর্মের ব্যক্তিরা ঐরূপ ধ্বংস , অনিষ্ট বা অপবিত্রকরণকে তাদের ধর্মের প্রতি অপমান বলে ধরবে এটা জেনেও ঐ ধর্ম্মস্থান বা পবিত্র ধর্মীয় বস্তুকে ধ্বংস , ক্ষতি বা অপবিত্র করলে , অনধিক দু'বছরের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ডে বা অর্থদন্ডে বা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডিত হবে ।

*(ধর্তব্য ও জামিন অযোগ্য অপরাধ)

**২৯৫ এ ধারা** - কোন সম্প্রদায়ের ধর্ম বা ধর্মীয় বিশ্বাসকে অপমান করে , ঐ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বোধকে অমর্যাদা করতে জ্ঞানতঃ বা বিদ্বেষ নিয়ে কোন কাজ করলে [ Deliberate and malicious acts intended to outrage religions feelings of any class by insulting its religion religious beliefs] কেউ, কোন ভারতীয় সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বোধকে religious feelings কে ) অমর্যাদা করার সুচিন্তিত ও বিদ্বেষপূর্ণ উদ্দেশ্যে ঐ সম্প্রদায়ের ধর্ম বা ধর্মীয় বিশ্বাস (religious beliefs) কে ।

কথিত বা লিখিত বাক্যে [Disturbing religious assembly]বা চিহ্নে বা দৃশ্যরূপণে [ Trespassing on burial places , etc.] কিম্বা অন্য কিছুর মাধ্যমে অপমান করলে বা অপমান করার চেষ্টা করলে , অনধিক তিন বছরের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ডে , বা অর্থদন্ডে , বা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডিত হবে ।

*(ধর্তব্য ও জামিন অযোগ্য অপরাধ)

**২৯৬ ধারা** - ধর্মীয় সমাবেশে গোলমাল করলে [Disturbing religious assembly] কেউ , ধর্মীয় উপাসনা (workship) অথবা ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে রত কোন আইনানুগ সমাবেশের স্বেচ্চায় / স্বেচ্ছাকৃতভাবে গোলমাল বাধালে অনধিক এক বছরের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ডে বা , অর্থদন্ডে বা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডিত হবে ।

*(ধর্তব্য ও জামিন অযোগ্য অপরাধ)

**২৯৭ ধারা** - সমাধিভূমি ইত্যাদি অনধিকার প্রবেশ করলে [ trespassing onburial places , etc.] কেউ , কোন ব্যক্তির মনে দুঃখ দেবার উদ্দেশ্যে অথবা কোন ধর্মকে অপমান করার উদ্দেশ্যে অথবা কোন ব্যক্তির মনে সম্ভবত দুঃখ লাগবে , অথবা কোন ব্যক্তির ধর্ম সম্ভবতঃ অপমানিত হবে এরূপ জেনে , কোন ধর্মস্থানে বা কোন সমাধিভূমিতে place of sepulture- এ) অথবা

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার (funeral rites- এর) জন্য বা মৃতের অবশেষ রেখে দেবার জন্যে আলাদা করে রাখা কোন স্থানে কোনরূপ অনধিকার প্রবেশ (trespass) করলে , অথবা কোন মনুষ্য মৃতদেহের (corpse- এর ) প্রতি অসম্মান দেখালে , অথবা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য সমবেত কোন ব্যক্তিদের অশান্তি ( disturbance) ঘটালে , অনধিক এক বছরের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ডে , বা অর্থদন্ডে, বা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডিত হবে ।

*(ধর্তব্য ও জামিনযোগ্য অপরাধ)

**২৯৮ ধারা** - ধর্মীয় বোধকে আঘাত করার সুচিন্তিত উদ্দেশ্যে কিছু বললে [uttering words etc, with deliberate intent to wound religious] কেউ, কোন ব্যক্তির ধর্মীয় বোধকে কে) আঘাত করার সুচিন্তিত উদ্দেশ্যে (with the deliberate intention) কোন কথা বললে বা ঐ ব্যক্তির শ্রুতিগোচরে (in the hearing) কোন আওয়াজ (in the sight) দিলে কিম্বা ঐ ব্যক্তির দৃষ্টিগোচরে কোন প্রকার অঙ্গভঙ্গি ( gesture) করলে বা কোন বস্তু রাখলে , অনধিক এক বছরের সশ্রম বা বিনাশ্রমে কারাদন্ডে , বা অর্থদন্ডে , বা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডিত হবে ।

*(অধর্তব্য জামিনযোগ্য অপরাধ)

## আত্মরক্ষার অধিকার

**৯৬ ধারা** - আত্মরক্ষা করতে গিয়ে করা কাজ [ Things done in private defence] কোন কিছুই একটি অপরাধ নয় - যা আত্মরক্ষার অধিকারে প্রয়োগ করতে গিয়ে করা হয়ে থাকে ।

**৯৭ ধারা** - শরীর ও সম্পত্তির ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার অধিকার [ Right of private defence to the body and of property] এই আইনের ৯৯ ধারায় যা বলা আছে সেই ব্যতিক্রম সাপেক্ষ - প্রত্যেক ব্যক্তিঃ

**প্রথমত ঃ**- নিজের শরীর বা অপরের শরীরকে , মানুষের দেহের / শরীরের ক্ষতিসাধনকারী যে কোন অপরাধের হাত থেকে, রক্ষা করতে পারে ।

**দ্বিতীয়ঃ**- নিজের বা অপরের স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তিকে চুরি (theft) দস্যুতা (robbery) অনিষ্টসাধক (mischief) বা অপরাধজনক অনধিকার প্রবেশের (criminal trespass - এর) অপরাধ বা ঐ সমস্ত অপরাধের চেষ্টা ( attempt) থেকে রক্ষা করতে পারে ।

**আলোচনা**

ভাঃদঃবিধির ৯৯ ধারার ব্যতিক্রম সাপেক্ষ নিজের অথবা অপরের শরীর কিংবা চুরি , দস্যুতা, অনিষ্টসাধন বা অপরাধজনক অনধিকার প্রবেশ অথবা তার চেষ্টার বিরুদ্ধে নিজের বা অপরের সম্পত্তি রক্ষা করার অধিকারকে আত্মরক্ষার অধিকার বলে।

ভাঃদঃ বিধির ৯৬ ধারা অনুযায়ী আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করতে গিয়ে অপরাধীর কোন

ক্ষতি করলে ৯৯ ধারার ব্যতিক্রম সাপেক্ষ তা অপরাধ বলে ধরা হবে না ।

**৯৮ধারা** - যে কাজ অপরাধ বলে বিবেচিত হয় না তার বিরুদ্ধেও আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করা চলে [Right of private defence against the act of a person of unsound mind , etc] যখন কোন কাজ যা অন্য ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই কোন অপরাধ হত কিন্তু তা কোন শিশু বুঝতে অপরিপক্ক কোন ব্যক্তি , বিকৃত মস্তিষ্ক কোন ব্যক্তি বা মদমত্ত কোন ব্যক্তি অথবা ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে কোন ব্যক্তির দ্বারা করা হয়ে থাকার হেতুতে যখন তা অপরাধ বলে বিবেচিত হয় না - তখনও প্রত্যেক ব্যক্তি ঐ কাজের বিরুদ্ধে একই রকম আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করতে পারবে - যে আত্মরক্ষার অধিকার , ঐ কাজ অপরাধ বলে বিবেচিত হলে প্রয়োগ করা যেত ।

**আলোচনা**

(এ) ভাঃদঃ বিধির ৯৮ ধারা অনুযায়ী নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের কাজ অপরাধ বলে বিবেচিত না হলেও তাদের বিরুদ্ধে একই আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করা যায়-

১) **পাগল** ( ভাঃদঃ বিধির ৮৪ ধারা মতে পাগলের কোন কাজ অপরাধ হয় না ।)

২) **মাতাল** - (ভাঃদঃ বিধির ৮৫ ও ৮৬ ধারা মতে বিশেষ অবস্থায় তাদের কোন কাজ অপরাধ হয় না।)

৩) ভাল ,মন্দ বুঝবার জ্ঞান সম্পর্কে ধারণা নেই এমন অপরিণত বুদ্ধির শিশু (ভাঃদঃবিধির ৮২ ও ৮৩ ধারা অনুযায়ী তাদের কোন কাজ অপরাধ হয় না।)

৪) **বৃত্তান্ত/ তথ্যঘটিত ভুলে কোন ব্যক্তি কাজ** - (ভাঃদঃ বিধির ৭৬ ও ৭৯ ধারা অনুযায়ী কোন অপরাধ হয় না ।)

**(বি) দৃষ্টান্ত বলা যায় -**

i)রাম নামে এক পাগল ব্যক্তি একজন পথচারীকে লাঠি নিয়ে মারতে গেল । পাগলের এই কাজ ৮৪ ধারা অনুযায়ী অপরাধ বলে বিবেচিত হবে না । তবুও ঐ পথচারী পাগলটির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করতে গিয়ে তার ক্ষতি করতে পারবে ।

ii) যদু নামে এক যুবক গভীর রাতে তার নিজের বাড়ীতে চুপি চুপি প্রবেশ করেছিল যাতে তার বাবা - মা টের না পায় । বাড়ীর দারোয়ান অন্ধকারে যদুকে চোর মনে করে আঘাত করতে উদ্যত হল। বৃত্তান্ত / তথ্যঘটিত ভুলের জন্য দারোয়ানের এই কাজ অপরাধ বলে বিবেচিত হবে না , তবুও যদু দারোয়ানের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করতে পারবে ।

**৯৯ ধারা ঃ-** যে কাজের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করা যায় না [Acts against which there is no right of private defence] যদি কোন লোকসেবক (public servant )তাঁর দপ্তরে ক্ষমতাবলে (under colour of his office) কোন কাজ সদ্ভাবে (in

good faith) করেন বা করার উদ্যোগ ( attempt) নেন এবং ঐ কাজের ফলে যদি কারোর যথাযথ মৃত্যু বা গুরুতর আঘাত পাবার আশঙ্কা না জন্মায় তবে ঐ কাজের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করা যাবে না । যদিও কাজটি মধ্যে আইনের সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতি থেকেও থাকে ।

দৃষ্টান্ত ঃ-

দুজন পুলিশ কনেস্টবল তাদের পরিচয় দিয়ে যদু নামে এক আসামীকে ধরতে গেল । যদু ধরা না দেবার জন্য পুলিশ দুজনকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলে পুলিশ তাকে লাটি দিয়ে সামান্য মারতে উদ্যত হল । পুলিশ দু জনার বিরুদ্ধে যদুর কোন আত্মরক্ষার অধিকার এক্ষেত্রে থাকবে না ।

কিন্তু ঐ দুজন পুলিশ যদি সাদা পোষাকে ঐ আসামীকে ধরতে যায় এবং আসামী তাদের পুলিশ অর্থাৎ লোকসেবক বলে চিনতে না পেরে মারধর করে তবে আসামীর কোন অপরাধ হবে না কারণ আসামী সেক্ষেত্রে আত্মরক্ষার অধিকার পাবে (এই ধারায় ১ নং ব্যাখ্যা দেখুন।)

২) যদি কোন লোকসেবক তাঁর দপ্তরের ক্ষমতায় (under colour of his office) সদ্ভাবে কোন কাজ করতে নির্দেশ দেন এবং সেই নির্দেশের বলে কোন কাজ করা হয় বা করার চেষ্টা করা হয় তবে সেই কাজের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগের করা যাবে না । যদি সেই কাজ যথাযথ মৃত্যু বা গুরুতর আঘাতের আশঙ্কা না জন্মায় এবং যদিও ঐ নির্দেশটিতে আইনের সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতি থেকেও থাকে ।

দৃষ্টান্ত ঃ-

দুজন পুলিশ কনেস্টবল ওয়ারেন্টবলে একজন আসামীকে ধরতে গেল । আসামী ওয়ারেন্টে আদালতের সিলমোহর দেখতে পেল না এবং সে কারণে সে গ্রেপ্তার বরণ করতে রাজী হল না । পুলিশ দুজন তবুও তাকে গ্রেপ্তার করতে গেলে সে তাদের মারধর করল । এখানে আসামী কোন আত্মরক্ষার অধিকার পাবে না , কারণ ওয়েরেন্টটি আইনসম্মত না হলেও একেবারে বেআইনি ছিল না ।)

৩) যদি সরকারি কর্তৃপক্ষের (public authorities -এর) শরণাপন্ন হয়ে উপযুক্ত রক্ষামূলক প্রতিকার পাবার মতো সময় থাকে তবে সেক্ষেত্রে কোন অপরাধমূলক কাজের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করা যাবে না ।

দৃষ্টান্ত ঃ-

আপনাদের ক্লাব ঘর থেকে পুলিশ থানার দুরত্ব আধ মাইল । হঠাৎ খবর পেলেন যে ৩ মাইল দূরের এক শত্রুভাবাপন্ন ক্লাবের ছেলেরা মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আপনাদের ক্লাবের ছেলেদের আক্রমণ করতে আসছে । এই খবর শুনে আপনারা নিজেরা নানা রকম অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ঐ আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য এগিয়ে গেলেন । মাইল খানেক দূরে দুইপক্ষে তুমুল সংঘর্ষ হল । এখানে

আপনারা আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করেছেন বলা যাবে না । কারণ , থানা খুব কাছাকাছি থাকা সত্ত্বে ও আপনারা ঐ আক্রমণ প্রতিহত করতে পুলিশের কোন সাহায্য নেন নি । সেকারণে , আপনাদের কাজ আইনসম্মত বলে বিবেচিত হবে না ।)

আত্মরক্ষার অধিকার কতদূর পর্যন্ত প্রয়োগ করা যাবে (Extent to which the right may be exercised) আত্মরক্ষার প্রয়োজনে ঠিক যতটুকু হানি ঘটানো দরকার তার বেশী হানি ঘটানো চলবে না ।

**১০০ ধারা** - শরীরের উপর হামলার ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করতে গিয়ে কখন আক্রমণকারীর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটানো যায় [ When the right of private defence of the body extends to causing death] - এই বিধির ৯৯ ধারায় বিধিনিষেধ অনুযায়ী যে ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করা যায় না সেই সমস্ত ক্ষেত্র বাদ দিয়ে - শরীরের উপর হামলা যদি নিম্নলিখিত কোন এক প্রকারের হয় তবে আত্মরক্ষার জন্য স্বেচ্ছায় / স্বেচ্ছাকৃতভাবে (voluntarily) হামলাকারীর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটানো যায় -

১) যে হামলায় (assault -এ) যথাযথভাবে মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে ,

২) যে হামলায় (assault- এ) যথাযথ গুরুতর আঘাতের (grievioushurt- এর ) আশঙ্কা থাকে ।

৩) হামলাকারী বলাৎকার /ধর্ষণ (rape) করার অভিপ্রায়ে হামলা করলে,

৪) হামলাকারী অস্বাভাবিক যৌন সংসর্গ (unnatural lust) চরিতার্থ করার অভিপ্রায়ে হামলা করলে ,

৫) হামলাকারী মনুষ্য অপহরণ অথবা বলপূর্বক বা ধোকা দিয়ে মনুষ্য হরণের (kidnapping or abducting - এর ) অভিপ্রায়ে হামলা করলে ,

৬) হামলাকারী এমনভাবে কোন ব্যক্তিকে অন্যায্য আটক করে যে সরকারি সাহায্য ছাড়া তার মুক্ত হবার কোন সম্ভাবনা নেই - এরূপ আশঙ্কার জন্ম দেয় ।

**১০১ ধারা** - কখন শরীরের উপর হামলার ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার অধিকারে মৃত্যু ঘটানো ছাড়া অপর কোন হানি ঘটানো যায় [ When such right extends to causing any harm other than death] শরীরের উপর যে সমস্ত হামলা এই আইনের ১০০ ধারায় বলা অপরাধগুলোর মধ্যে পড়ে না সেই সমস্ত অপরাধ বা হামলার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষায় হামলাকারীর মৃত্যু ঘটানো যায় না। কিন্তু এই বিধির ৯৯ ধারার বিধিনিষেধ সাপেক্ষ , হামলাকারীর মৃত্যু ছাড়া অন্য যে কোন হানি ঘটানো যায় ।

**১০২ ধারা** - শরীরের উপর হামলার ক্ষেত্রে কখন আত্মরক্ষার অধিকার জন্মায় এবং তা কতক্ষণ

বর্তমান থাকে [ commencncement and continuance of the right of private defence of the body ] - শরীরের উপর হামলার ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার অধিকার সেই মুহূর্ত থেকেই জন্মায় যে মুহূর্তে অপরাধ করার চেষ্টা বা ভীতি প্রদর্শনে শরীর বিপন্ন হবার যথাযথ আশঙ্কা (reasonable apprehension) দেখা দেয় যদিও সেই অপরাধটি নাও ঘটে থাকতে পারে -

যতক্ষণ পর্যন্ত শরীরের প্রতি ঐরূপ বিপদের আশঙ্কা বর্তমান থাকে আত্মরক্ষার অধিকারও ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকে ।

**১০৩ ধারা** - সম্পত্তির ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার অধিকারে কখন মৃত্যু পর্যন্ত ঘটানো যায় । [ When the right of private defence of property extends to causing death ] এই বিধির ৯৯ ধারার বিধিনিষেধ অনুযায়ী যে ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করা যায় না সেই সমস্ত ক্ষেত্র বাদ দিয়ে যদি সম্পত্তির উপর কোন আক্রমণ বা অপরাধ নিম্নলিখিত কোন এক প্রকারের হয় তবে ঐ আক্রমণ বা অপরাধের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করতে গিয়ে স্বেচ্ছায় /স্বেচ্ছাকৃতভাবে (voluntarily) অপরাধীর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটানো যায় -

১) দস্যুতা ( robbery)

২) রাত্রে গৃহভেদ (house breaking by night)

৩) বাসগৃহ , দালান , তাঁবু জলযান , যাতে হয় মানুষ বসবাস করে নয় তো সম্পত্তি / মালামাল রাখা থাকে তাতে , আগুন ধরিয়ে অনিষ্টসাধন( mischief) করলে বা তার চেষ্টা করলে ,

৪) চুরি (theft) অনিষ্টসাধন (mischief) বা অনধিকার গৃহপ্রবেশ ( house trespass) এমনভাবে করতে আসে যে আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগ না করা হলে মৃত্যুর (death) বা গুরুতর আঘাতের - (grievious hurt -এর সম্ভাবনা থাকে ।

**১০৪ ধারা** - কখন ঐরূপ অধিকারে মৃত্যু ছাড়া অন্য যেকোন হানি ঘটানো যায় (When such right extends to causing any harm other than death) যেক্ষেত্রে চুরি, অনিষ্টসাধন বা অনধিকার গৃহপ্রবেশ এই আইনের ১০৩ ধারায় উল্লিখিত পর্যায়ে পড়ে না কিন্তু যার সংঘটন বা সংঘটনের চেষ্টায় আত্মরক্ষায় অধিকার জন্মায় সেক্ষেত্রে এই বিধির ৯৯ ধারার বিধিনিষেধ সাপেক্ষ আত্মরক্ষার অধিকারে স্বেচ্ছায় / স্বেচ্ছাকৃতভাবে অপরাধীর মৃত্যু ঘটানো ছাড়া অন্য কোন হানি ঘটানো যায় ।

**১০৫ ধারা** - সম্পত্তির উপর আক্রমণের ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার অধিকার কখন শুরু হয় এবং তা কতক্ষন বর্তমান থাকে [ Commencement and continuance of the right of private defence of property]

১) যে মুহূর্তে সম্পত্তির উপর বিপদের যথাযথ আশঙ্কা শুরু হয় , সেই মুহূর্ত থেকেই আত্মরক্ষার

অধিকার শুরু হয় ।

২) চুরির ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার অধিকার ততক্ষণ পর্যন্ত চলে যতক্ষণ পর্যন্ত না অপরাধী চোরাইমাল সহ পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় অথবা যতক্ষণ পর্যন্ত না সরকারি কর্তৃপক্ষের সাহায্য পাওয়া যায় কিংবা চোরাই সম্পত্তি / মালামাল উদ্ধার হয় ।

৩) দস্যুতার (robbery এর) ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার অধিকার ততক্ষণ পর্যন্ত চলে যতক্ষণ পর্যন্ত অপরাধী কোন ব্যক্তির মৃত্যু বা আঘাত বা অন্যায্য গতিরোধ ( worngful restraint) ঘটায় বা ঘটাতে চেষ্টা করে কিংবা যতক্ষণ পর্যন্ত আশু মৃত্যুর instant death- এর) বা আশু আঘাতের ( instant hurt) বা আশু অন্যায্য গতিরোধের ( instant restraint) ভয় বর্তমান থাকে ।

৪) অপরাধজনক অনধিকার প্রবেশ বা অনিষ্টসাধনের বিরুদ্ধে সম্পত্তির ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার অধিকার ততক্ষণ পর্যন্ত চলে যতক্ষণ পর্যন্ত অপরাধী অপরাধজনক অনধিকার প্রবেশ বা অনিষ্টসাধনের কাজ চালাতে থাকে ।

৫) রাত্রে গৃহভেদের বিরুদ্ধে সম্পত্তির ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার অধিকার ততক্ষণ পর্যন্ত থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত গৃহভেদের এর ফলে ঘটা অপরাধজনক অনুপ্রবেশ ( criminal trespass) বর্তমান থাকে।

**১০৬ ধারা** - মারাত্মক হামলার ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার অধিকার - যেখানে নির্দোষ ব্যক্তির হানি ঘটার ঝুঁকি থাকে [ Right of private defence against deadly assault when there is risk of harm to innocent person ]যে হামলা (assault) যুক্তিযুক্তভাবে মৃত্যুর আশঙ্কা জন্মায় - সেরূপ আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগের যদি আত্মরক্ষাকারী এমন এক অবস্থানে থাকে যে সে কোন একজন নির্দোষ ব্যক্তির হানি (harm) ঘটায় ঝুঁকি না নিয়ে তার আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করতে পারে না , তবে সেক্ষেত্রে আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগে ঐরকম হানি ( harm)ঘটানোর ঝুঁকিও নেওয়া যাবে।

*********************

# নারী ও শিশু বিষয়ক পর্যালোচনা এবং আইনী সমাধান

# নারী ও শিশু বিষয়ক পর্যালোচনা এবং আইনী সমাধান

**নারী সমাজ একাল ও সেকাল ঃ-** যে কালে নারী সমাজ পরিচালিত হতো ধর্মীয় অনুশাসনের উপর যদিও অনেকেই তা মানেন আবার অনেকে তা মানেন না। কিন্তু ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ধর্মগুলোতে নারীদের সম্পর্কে কি মত পোষণ করা হয়েছে সে দিকে নজর দিলে দেখা যেতে পারে, হিন্দু, ইসলাম ও খ্রীষ্ট্র ধর্ম নারীকে উচ্চস্থানে রাখা হয়েছে, যদিও ব্যতিক্রম থাকতেই পারে। এটাও সত্য যে ধর্মীয় ও সামাজিক নিয়মাবলীতে নারীদের অবস্থান কোথাও কোথাও সীমাহীন অবনমন ঘটিয়েছে। আলোচনা করলে দেখা যায় " নিউ টেষ্টামেন্ট" যা খ্রীষ্ট ধর্মের মূল গ্রন্থ, যেখানে স্ত্রী / পুরুষ তাদের অবস্থান, অধিকার, পারস্পরিক সর্ম্পক প্রভৃতি তেমন কোন বিস্তারিত আলোচনা নেই। যদিও খ্রীষ্ট ধর্মে বিবাহ বন্ধনকে এক পবিত্র বন্ধন বলে উল্লেখ করা হইয়াছে। তেমনি কিছু বিতর্কিত বিষয়ও শোনা যায় যেমন স্ত্রী পিতার অধীনের চেয়ে ও স্বামীর কাছে নারীর অধীনতা কঠোর তাছাড়া নারীকে কোন গুরুত্ব পূর্ণ পদে দেওয়া উচিৎ নয় ইত্যাদি। যদিও পাশাপাশি ক্যাথলিক অংশে বিবাহ বিচ্ছেদ নিষিদ্ধ। একদা একসময়ে বিবাহ বিচ্ছেদেও নারীর অধিকার ছিল সীমিত। জন্মনিয়ন্ত্রন ছিল নিষিদ্ধ, নারীর গর্ভপাত বিবাহ বিচ্ছেদের কারণও হতে পারে। সন্তানহীনা নারী কোন দত্তক সন্তান গ্রহন করতে পারবে না। সন্তানের অধিকার ও খোরপোষে নারীর অধিকার অন্তত সীমিত, বিবাহ বিচ্ছেদের পরে। পিতার সম্পত্তি যে কেন ভাইয়ের চাইতে কম অংশ পাবে। ভিন্ন ধর্মে বিবাহ নিষিদ্ধ। ইতিহাস বলে ধর্মচ্যুতির শিকার অজস্র নারী। " ডাইনী শিকার " যা বর্তমানেও কখনো কখনো শোনা যায় এই উইচ হান্টিং নাম দিয়ে বহু নারীকে নির্মম ভাবে হত্যা করা হয়েছে। ১৯০৫ সালে রাশিয়াতে বিপ্লবের পর জার্মানি নেত্রী রোসা লুক সেম বার্গের 'Socilism and churches" রচনাতে নারী সমাজ নিয়ে চার্চ ও রাষ্ট্রের ভূমিকার এক চমৎকার বৃত্তান্ত তুলে ধরেছিলেন। ইসলাম ধর্মেও প্রধান উৎস সরিয়া (কোরান), হাদীস এবং ফুকার সম্মেলিত মতামত থেকে বলা হয় ইজমা। যদিও কাল পরিক্রমায় কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটলেও মৌলিক পরিবর্তন ঘটেনি। ইসলামি আইনে মুল ধারা গুলি হলো হানিফি, মালিকি, শফিই, হামবলি, প্রাহিরী ও সরিয়া। ঈশ্বর (আল্লা) পুরুষকে

নারীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন কারণ পুরুষ নারীর জন্য ধন ব্যয় করে । রক্ত ও বৈবাহিক সম্পর্কের নারীকে সাধারনভাবে বিবাহ নিসিদ্ধ ঘোষনা করা হলে ও স্ত্রীর পূবর্তন স্বামীর দ্বারা জাত কন্যাকে বিবাহ করা যাইতে পারে । পুরুষরাই নবী হবেন নারীরা নয় । অবাধ্য স্ত্রীর শয্যা বর্জন , প্রয়োজনে প্রহার । স্বামীর পক্ষ থেকে তিন বার তালাক উচ্চারন করার দ্বারা বিবাহ বিচ্ছেদ করা যায় , কিন্তু স্ত্রীর পক্ষে অনুমোদন নেই । সম্পত্তি উত্তরাধীকারীর ক্ষেত্রে এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার সমান হবে । দুইজন নারীর স্বাক্ষ্যকে একজন পুরুষের স্বাক্ষের সমান বলে বিবেচিত হবে । কোন নারী অন্য পুরুষের দিকে তাকাতে পারবে না । হিন্দুধর্মেও নারীর সম্পর্কে বলতে গেলে তেত্তিরয় সংহিতা দ্বারা বিবাহ বিচ্ছেদ করা যায় , কিন্তু স্ত্রীর পক্ষে অনুমোদ ন নেই। সম্পত্তি উত্তরাধীকারীর ক্ষেত্রে এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার সমান হবে । দুইজন নারীর স্বাক্ষ্যকে একজন পুরুষের স্বাক্ষের সমান বলে বিবেচিত হবে । কোন নারী অন্য পুরুষের দিকে তাকাতে পারবে না । হিন্দুধর্মেও নারীর সম্পর্কে বলতে গেলে তেত্তিরয় সঙ্গিতের উদ্ধতি দিয়ে বলা যায় । সর্ব গুন ান্বিতা শ্রেষ্ঠ মহিলাও অধমতম পুরুষের থেকে হীন । নারীকে ধর্ম উপাসনার প্রকাশ্য সভায় যাওয়ার , শিক্ষা অর্জনের , সম্পদ সংগ্রহ ও তা ইচ্ছা মত ভোগ করার সম্মতি ব্যতীত নিজ দেহকে অন্যের ভোগ করা থেকে নিবৃত করার , স্বামীর একাধিক পত্নী , উপপত্নী ও অন্য নারী সংসর্গ থাকলেও তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদটুকু করা প্রভৃতির অধিকারও নেই নারীর । স্ত্রীকে পরিত্যাগ করার অবারিত অধিকার দেওয়া আছে স্বামীর জন্য । স্বামীর অধিকার পরিপূর্ণভাবে কায়েম করতে স্ত্রীকে বেত, রজ্জু বা হাত দিয়ে প্রহার করার শাস্ত্রীয় অধিকার দেওয়া হয়েছে স্বামীকে । পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারে কন্যাকে প্রায় পুরোপুরি বঞ্চিত করা হয়েছে। পুরুষের আত্মরক্ষার জন্য ধনের মতো প্রয়োজনে অধিকার দেওয়া হয়েছে স্ত্রীকেও বিনিময়ের । বিধবাদের মৃত স্বামীর সাথে চিতায় আত্মদান , বিধবাদের পুনবিবাহ নিষিদ্ধ সহ কঠোর জীবনের বিধান , অনুঢ্য নারীদের জীবন্ত পাপীনী হিসাবে চিহ্নিত করা প্রভৃতি ভয়ঙ্কর দিকও রয়েছে হিন্দুশাস্ত্রে। বিভিন্ন আধুনিক রাষ্ট্রে সংশ্লিষ্ট ধর্মগুলিতে বর্ণিত নারীদের সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি সহ ধর্মীয় সামাজিক আচার বিচার নীতির বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটেছে । ইউরো পে খ্রীষ্টধর্মের ক্ষেত্রে বিশেষত ধর্ম সংস্কার আন্দোলন , নব জাগরণ ,নারীদের ধর্মীয় নানাবিধ বন্ধন থেকে কিছুটা মুক্ত করেছিল । উত্তর আফ্রিকা, মধ্য এশিয়া ,দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ইসলামী অধ্যুষিত দেশগুলিতে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন ও ইউরেপীয় ভাবাদর্শের প্রভাব বা কোথাও কোথাও সীমাবদ্ধ চরিত্রের বিপ্লব ইসলামের সামাজিক নীতির নানা সংস্কার সাধন করেছিল । নারীদের প্রসঙ্গে বহু ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে ছিল উক্ত ধর্ম দুটির সংস্কার আন্দোলন। ভারতের মধ্যযুগে ভক্তি ও সুফী আন্দোলন যে ধর্ম সমন্বয় ও সংস্কারের পথে এগিয়েছিল তার মধ্যে দিয়ে হিন্দুধর্মের বিভিন্ন মৌলবাদী ব্যবস্থার (বিশেষত ঃ নারীদের প্রসঙ্গে ) বিরুদ্ধে ও জোরালো আঘাত হেনেছিল । উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় তৃতীয় দশক

থেকে রামমোহন , দ্বারকানাথও ডিরোজিয়ানরা এবং পঞ্চাশের দশক থেকে বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে সংস্কার আন্দোলন হিন্দু ধর্মে নারীদের উপর নিপীড়ন মুলক বেশ কিছু ব্যবস্থার অপসারন ঘটাতে সমর্থ হয়েছিল । ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের শতমুখী ধারাও বিপ্লবের অসম্পূর্নতা সত্বেও নারী প্রগতির দ্বারা কিছুটা উন্মুক্ত করেছিল। ধর্মীয় সমস্ত ধরনের গোঁড়ামি থেকে মুক্তির ব্যাপক সুযোগ মিলেছিল রাষ্ট্রীয় সামাজিক ব্যবস্থা কেবল নারীদের অধঃস্তন ব্যস্তবতা থেকে পরিত্রান দেয়নি, অর্থনৈতিক ক্ষেত্র সহ জীবনের প্রায় সর্বস্তরেই নারী পুরুষের মধ্যে বহুলাংশে সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল ।

১৯৫১ সালে ভ্যাটিকানের পোপ প্রায়াস টুয়েলভথ নারীদের জন্মনিয়ন্ত্রণ , গর্ভপাত ও বিবাহ বিচ্ছেদ বন্ধ করার জন্য নতুন করে উদ্যোগ নেন ।

১৯৫৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হবার পর আইজেনহাওয়ার দেশকে এক ধরনের ধর্ম রাষ্ট্র হিসাবে পরিচিত করার চেষ্টা করেন । ষাট দশকের শুরু থেকেই আমেরিকার গোঁড়া চার্চগুলি জন্মনিয়ন্ত্রণ , গর্ভ সর্ম্পকে চিকিৎসকদের সাথে পরামর্শ, গর্ভপাত প্রভৃতির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে । নানা ধরনের সংস্থাও গড়ে ওঠে । ১৯৬৮ সালে ভ্যাটিকানের নতুন পোপ পলসিকস্থ তার রচিত " হিউমানেই ভিটেয়ি" পুস্তকে এই জাতীয় কঠোর অনুশাসন সংঘবদ্ধ করলেন ।

১৯৭১ সালে চার্চের অনুশাসনে এগুলিকে নারীদের পক্ষে পাপ ও ভ্রূণ হত্যাকে নরহত্যার সমতুল্য ঘোষনা করে শাস্তি হিসাবে ধর্ম থেকে বহিস্কার করার সিদ্ধান্ত দেওয়া হয় । এই সিদ্ধান্তের পর ইউরোপ সহ ক্যাথলিক প্রধান প্রায় প্রত্যেকটি দেশে নারীদের বিরুদ্ধে খ্রীষ্টান গোঁড়া ধর্মীয় ব্যবস্থা পত্তনের দাবির আন্দোলন বাড়তি উদ্যম পায় । যথা, আয়ারল্যান্ড , লোসেথো , আর্জেন্টিনা , বলিভিয়া, কানাডা , আমেরিকা , ইতালি , ফ্রান্স, জার্মানি প্রভৃতি দেশে । ফলে বহু দেশের সরকার গর্ভপাতকে বেআইনী ঘোষনা করে আইন করেছে অথবা করতে চলেছে । আমেরিকাতে ১৯৮০ সালে রাষ্ট্রপতি রেগন গর্ভসঞ্চার বিষয়ে ডাক্তারের পরামর্শ নেবার বিরুদ্ধে আইন করেন । ১৯৮৩ সালে ভাটিকানের পোপ জনপল দি সেকেন্ডে যে নতুন কি কোড অব ম্যানযুল প্রকাশ করে তাতে ধর্মান্ধ সিদ্ধান্তই ঘোষনা করা হয় । পাশাপাশি লক্ষনীয় যে , ইউরোপ মুল ভূখন্ডে বিগত কয়েক বছর হলো যে নয়া নারীবাদী বহু সংগঠন আন্দোলনের আর্বিভাব ঘটেছে , সেগুলি নারীবাদী দর্শনের ধারানুযায়ী নারীদের চাকুরী ও বৃত্তি থেকে অপসারন করার এবং একমাত্র গৃহস্থলী কাজে নারীদের যুক্ত রাখার দাবি তুলেছে । খ্রিষ্টান ধর্মান্ধতা ও নারী বিদ্বেষী ভূমিকার সম্প্রতিকতম নির্দশন হলো বসনিয়া ও ক্রোশিয়ার মুসলমান নারীদের উপর সংগঠিতভাবে খ্রিষ্টান সার্ব বাহিনীর অত্যাচার । এতে লক্ষাধিক মুসলমান নারী ধর্ষিতা ও গর্ভবতী হয়েছেন । রাষ্ট্রসংঘ বাহিনীর হাতে ধৃত দুষ্কৃতকারীদের জবান বন্দীতে জানা গেছে যে , মিলিশিয়াদের উপর সুনির্দিষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে মুসলমান রমনীদের এমনভাবে

ধর্ষন করতে হবে যাতে তারা ভবিষ্যতে খ্রিষ্টানের জননী হন । ইসলাম ধর্মীয় রাষ্ট্র হিসাবে যে গুলি ইতিমধ্যেই আত্মপ্রকাশ করেছে , যেমন সৌদি আরব , ইরান , ওমান ,আফগানিস্তান ,পাকিস্তান , কুয়েত, সুদান প্রভৃতি দেশে নারীদের বিষয়ে ধর্মীয় বিধিকে রাষ্ট্রীয় আইনে পরিণত করা হয়েছে । প্রাপ্ত বয়স্কা বিবাহিতার যৌন অপরাধের জন্য পাথর ছুঁড়ে হত্যা, , বাধ্যতামূলক ভাবে বোরখা পরা , প্রকাশ্যস্থানে চাকরি বা একাকী চলাফেরা করা বন্ধ , জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে অ - ইসলামি ঘোষনা , পুরুষের একচ্ছত্র তালাকের অধিকার , উত্তরাধিকার ও সম্পত্তিতে নারীদের কার্যত স্বীকৃতি না দেওয়া, পুরুষের বহু বিবাহের অধিকার , নারীদের জন্য আধুনিক শিক্ষা বন্ধ , স্কুলে একসাথে ছেলেমেয়েদের পড়া নিষিদ্ধ , বিচারকালে নারীর সাক্ষ্য পুরুষের সমান হিসাবে গন্য না করা , খেলাধুলাতে নারীদের অংশ গ্রহন নিষেধ ও ১২ বৎসরের উর্ধ্বে নারীদের প্রকাশ্য খেলা দেখাও বন্ধ প্রভৃতি হলো এইসব আইনের বিভিন্ন দিক । ইসলাম ধর্মীয় রাষ্ট্রে এখনও পরিনত না হলেও সম্প্রদায়িক শক্তির প্রবল চাপ এখন মিশর , ইরাক , লিবিয়া , জর্ডন , বাংলাদেশ , আলজিরিয়া , সিরিয়া , মরক্কো, টিউনিসিয়া , তুরস্ক প্রভৃতিতে পড়তে শুরু করেছে । এই পরিস্থিতির চাপে দেশগুলির কোন কোনটিতে নারীদের ক্ষেত্রে তৈরী হয়েছে কিছু গোঁড়ামিমূলক আইন ও তাছাড়া প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্গত বর্তমান আজারবাইজান , উজবেকিস্তান , আর্মেনিয়া, মোলদাভিয়া, জর্জিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রেও মুসলিম সাম্প্রদায়িক শক্তি এখন নারীদের প্রসঙ্গে ধীরে ধীরে অনুরূপ ব্যবস্থা চালু করতে শুরু করেছে । আন্তর্জাতিক স্তরে ইসলাম সম্প্রদায়িকতা বিস্তারে ইরান " ওয়াল্ড অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক লিবারেশন মুভমেন্ট " এবং সৌদি আরব অনান্য প্রতিষ্ঠান ছাড়াও ইনস্টিটিউট অফ মুসলিম মাইনরিটি অ্যাফেয়াস নামে দুটি স্বতন্ত্র আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান তৈরী করেছে । এগুলির মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে বিপুল অর্থ দেওয়া হয় ইসলামী সম্প্রদায়িকতা প্রসার ও তার প্রয়োজনীয় সংগঠন আন্দোলন বিস্তারের জন্য যার অন্যতম উপাদান হলো নারী প্রসঙ্গে ইসলামী মতাদর্শ প্রচার । এই সব সংস্থাগুলির মদতে সংখ্যালঘু ইসলাম অধ্যুষিত দেশগুলিতে ও যাতে রাষ্ট্র নারীদের জন্য অনুরূপ আইন তৈরী করে , সেইমতো রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করা হয় । হিন্দুরা কম বেশি বাস করেন পৃথিবীর ৮৮ টি দেশে যেমন ভারত, নেপাল, মরিসাস, গুয়ানা , সুরিনাম , ত্রিনিদাদ, টোবাগো , ভূটান , শ্রীলঙ্কা , বাংলাদেশ , মালয়েশিয়া , দক্ষিণ আফ্রিকা, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, ইংল্যান্ড , কানাডা , মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি। ভারতের হিন্দুবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তি এইসব দেশগুলিতেও শাখা প্রতিষ্ঠা করেছে । অনাবাসী ধনী ভারতীয় হিন্দুদের অনেকেই স্থানীয় মৌলবাদী সংস্থাগুলির মাধ্যমে ভারতের মূল সংগঠন গুলিকে আর্থিক সাহায্য করে থাকে ।

গত শতাব্দীর চল্লিশের দশকে ক্রোশিয়ার সম্রাট খ্রীষ্টান ধর্মীয় রাষ্ট্রের ধারনার সাথে নারীদের প্রসঙ্গে যে বক্তব্য বলেছিলেন নাজী জার্মানীতে হিটলার এই স্লোগানই দিয়েছিলেন ইংরেজী হরফের

তিন 'কে' ক্রোচি , কুচি কিন্দার (চার্চ, রান্না ঘর ও সন্তান সংখ্যা বৃদ্ধি )। আধুনিক খ্রীষ্টান মৌলবাদীদের স্লোগান একই , মিশরের মুসলিম ব্রাদারহুড মুঘফিরতিয়া , জুন্দু আল্লা মুন্মাজামাত আল জিহাদ , সিরিয়ার ন্যাশনাল এ্যালায়েন্স ফর লিবারেশন অব সিরিয়া ইরাক ও কুয়েত " অল দাওয়া' বাহারিনে ইসলামিক লিবারেশন ফ্রন্ট লেবাননে" পার্টি অব আল্লা , হিজবোল্লা ও " ইসলামিক আমন" আলজিরিয়ার " ইসলামিক স্যালভেশন ফ্রন্ট " বাংলা দেশে ও ভারতে " জামাত-ই - ইসলামি " প্রভৃতি সংগঠন নারীদের সম্পর্কে হুবহু একই দাবি তুলেছে । ইতিহাস ও সাহিত্যের পাপ থেকে সংকলিত কিছু ঘটনাবলি যা আধুনিক বিশ্বে তথা ভারত বর্ষে আলোরন সৃষ্টি করেছিল ।
যেমন - ১৮১৮ সালে রামমোহন রায়ের সহমরণ বিষয়ক " প্রবর্ত্তক ও নির্বত্তকের সংবাদ" প্রকাশিত। ১৮১৯ সালে কলকাতার গৌরী বাড়িতে বাঙালি মেয়েদের জন্য ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটির প্রথম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয় । একই সালে রামমোহনের সহমরন বিষয়ক " প্রবর্ত্তক ও নির্বত্তকের দ্বিতীয় সংবাদ" প্রকাশিত হয়।

১৮২৯ সালে ৪ই ডিসেম্বর লর্ড বেন্টিক সতীদাহ প্রথা রদ বিধিতে স্বাক্ষর করার সঙ্গে সঙ্গে এদেশে সতীদাহ নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হয় ।

১৮৪৯ সালে বাংলা প্রতিষ্ঠানিক নারী শিক্ষার সূচনা । মে মাসে জে. ই.ডি বেথুন কলকাতায় স্থাপন করলেন ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল , পরে যেটি বেথুন স্কুল নামে পরিচিতি লাভ করে । ১৮৫৫ সনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব (প্রথম ও দ্বিতীয় পুস্তক) প্রকাশিত হয়। ১৮৫৬ সালে ২৬ শে জুলাই বিধাব বিবাহ , আইন প্রবর্তিত হয় । বঙ্গ মহিলা রচিত সর্ব প্রথম পুস্তক কৃষ্ণকামিনী দাসীর চিত্র বিলাসীনী প্রকাশিত হয় । উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইনে পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারিনী হিসাবে পুত্রের সঙ্গে কন্যার স্বীকৃতি লাভ হয় ।

১৮৬৩ সালে " বামাবোধিনী " পত্রিকার প্রকাশ । প্রধান উদ্যোক্তা ও সম্পাদক উমেশ চন্দ্র দত্ত। উদ্দেশ্যে ছিল অন্তঃপুরের মহিলাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটানো ।

১৮৬৮ সালে রাম সুন্দরী দেবীর "আমার জীবন " বাঙালী মহিলার লেখা প্রথম আত্মজীবনি । (মতান্তরে ১৮৭৬), ১৮৮২ সালে মহারাষ্ট্রের নারীবাদী প্রত্রিকা বামাবাই কর্তৃক " আর্য মহিলা সমাজ " এর প্রতিষ্ঠা । (মতান্তরে ১৮৮৩ সালে) বাংলার প্রথম দুই মহিলা স্নাতক , কাদম্বিনী গঙ্গোঁপাধ্যায় ও চন্দ্রমুখি বসু । ১৮৮৬ সালে স্বর্ণ কুমারী দেবীর " সখী সমিতি " স্থাপিত হয় । এটিই বাংলার প্রথম মহিলা পরিচালিত প্রতিষ্ঠান ।

১৮৯১ সালে সহবাস সম্মতিসূচক আইন (Age of Consent bill) পাশ হয় । ১৯০৪ সালে রোকেয়ার বিপ্লবী প্রবন্ধ " আমাদের অবনতি" প্রকাশিত হয় নবনূর পত্রিকায় ।

১৯১০ সালে ভারতে পর্দানিষিদ মহিলাদের শিক্ষার জন্য সরলা দেবী " ভারত স্ত্রী মহামন্ডল "

স্থাপন করেন ।

১৯১৩ সালে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের " নারীর মূল্য " প্রকাশিত হয় ।

১৯২০ সালে ভারতীয় নারীদের প্রথম ভোটাধিকার লাভ মাদ্রাজ প্রদেশে, ১৯২১ এ বম্বেতে এবং বাংলায় ১৯২৫ - এ।

১৯২৭ সালে অল ইন্ডিয়া উইমেন্স কনফারেন্স ( ALWE) এর প্রতিষ্ঠা যার প্রথম অধিবেশনটি হয় পুনেতে ।

১৯২৯ সালে বাল্য বিবাহ নিরোধক আইন (সরদা আইন) পাশ হয় যার ফলে মেয়েদের বিবাহের ন্যুনতম বয়স ১৪ এবং ছেলেদের ১৭ । ১৯৪৩ সালে ৭-৮ মে , কলকাতার ওভারটুন হলে প্রথম প্রাদেশিক মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির অনুষ্ঠিত হয় । সভানেত্রী ছিলেন ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী ।

১৯৫৫ সালে হিন্দু বিবাহ আইন পাশ ।

১৯৬১ সালে পণ প্রতিষেধকআইন (Dowry prohibition Act) বলবত হয় যাকে পরবর্তী কালে ১৯৮৪ এবং ১৯৮৬ সালের সংশোধনীর মাধ্যমে আরও কার্যকরী করে তোলা হয়েছে । অবশ্য কয়েকটি রাজ্যে পণ প্রথা এখনও ব্যাপকভাবে চালু রয়েছে ।

১৯৭১ সালে মেডিক্যাল টারমিনেশন অব প্রেগন্যান্সি আইন বলবত । শারীরিক প্রয়োজনে এবং অবাঞ্ছিত মাতৃত্বের হাত থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য এই আইন বিধিবদ্ধ হয় ।

১৯৭৪ সেটটাস কমিটির রিপোর্ট Towards Eqvuality প্রকাশ হয় ।" মথুরা রেপ কেস " সংক্রান্ত কোর্টের রায়ের প্রতিবাদে দেশব্যাপী নারী আন্দোলন সংগঠিত হয় ।

১৯৭৬ সালে নারী শ্রমিকের পুরুষের সমান মজুরি পাওয়ার দাবি স্বীকৃত হয়েছে ।

১৯৮৩ সালে রেপ বিল সংশোধন করা হয় । বিচার হবে বন্ধ ঘরে এবং নির্যাতিতার নাম প্রকাশ করা হবে না ।

১৯৮৬ সালে ঐতিহাসিক শাহবানু মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায়কে কেন্দ্র করে যে বির্তক ও প্রতিরোধের সৃষ্টি হয় তারই পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমান মহিলাদের বিবাহবিচ্ছেদ সংক্রান্ত অধিকার সুরক্ষা " the muslim women (Protection of Rights on Divorce bill ) নামক বিলটি পাশ হয় । ১৯৮৫ সালের ২৩ এপ্রিল সুপ্রীম কোর্ট শাহবানু মামলায় ভূপাল হাইকোর্টের রায় বহাল রেখে শাহবানুকে প্রতিমাসে ২৫ টাকার পরিবর্তে ১৭৯.১০ টাকা খোর পোষ পাবার অধিকার দান করে । এর বিরুদ্ধে মৌলবাদীরা যে প্রবল চাপ সৃষ্টি করে তার কাছে তৎকালীন সরকার এমন কি শাহবানু পর্যন্ত নতি স্বীকার করতে বাধ্য হন এবং নতি স্বীকারেরই ফল হল উপরোক্ত আইনটি।

১৯৮৭ সালে ৪ সেপ্টেম্বর রাজস্থানের দেওরালায় ১৮ বছরের রূপকানোয়ার " সতী" হলেন। এর পর প্রবল জনমতের চাপে পড়ে ভারত সরকার ১৯৮৭ সালেই সতীদাহ প্রতিরোধ আইন পাশ

করে 'সতী' হওয়ার চেষ্টা করা কিংবা এই প্রথা চালু রাখার ব্যাপারে কোন ও উদ্যোগ নেওয়া দুইই এই আইন অনুযায়ী দন্ডনীয় অপরাধ হিসাবে গণ্য হবে । ১৯৯১ সালে জাতীয় মহিলা কমিশন গঠিত হয়। ১৯৯৭ সালের ১৩ই আগষ্ট , ভারতের সুপ্রীম কোর্ট কর্মক্ষেত্রে যৌন হেনস্থা সম্পর্কিত ঐতিহাসিক রায় দান করে । ১৯৯৯ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী , নাবালক সন্তানের উপর মায়ের অভিভাবকত্বের অধিকারকে স্বীকৃতি দিল সুপ্রীম কোর্ট ।

২০০০ সালে কলকাতা হাইকোর্ট বিবাহ বিচ্ছেন্ন মুসলমান মহিলাদের পুন বিবাহ না করা পর্যন্ত খোরপোষ পাবার অধিকারের পক্ষে রায় দান করে । এই রায়ের ফলে পরবর্তী বিবাহ বিচ্ছেদ প্রাপ্ত মুসলমান মহিলারা " the muslim women (Protection of Rights on Divorce bill )বলবৎ থাকা সত্বেও 'ইদ্দৎকাল এর পরেও খোরপোষ পেতে পারেন ।

১৯৭২ সালে মেরি উলস্টোনক্রাফটের (Suffragette) নামক গ্রন্থের প্রকাশ , বইটির প্রকাশের পর যথেষ্ঠ সমালোচিত হলেও পরবর্তী কালে প্রায় দেড়শো বছরের ব্যবধানে এটিই নারী বাদী আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রাথমিক আকার গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হয় ।

১৮৩৭ সালে আমেরিকায় প্রথম দাস প্রথা বিরোধী নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় । ১৮৪৮ সালের ১৯-২০ শে জুলাই " সেনেকা ফলস কন্‌ভেনশন " নামে খ্যাতি লাভ করে । নারী অধিকার আন্দোলনের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় নিউ ইয়র্কের সেনেকা ফস্‌স - এ ।

১৮৫৭ সালের ৮ই মার্চ আমেরিকায় বস্ত্রশিল্পের মহিলা শ্রমিকদের দৈনিক ১০ ঘন্টা কাজ ও মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয় । ১৮৯৩ সালে দীর্ঘ চেষ্টার পর আন্দোলন সাফল্য লাভ করল । মহিলারা প্রথম ভোটাধিকার পেলেন । নিউজিল্যান্ডের ১৯১০ সালে ডেনমার্কের কোপেন হেগেল কমিউনিষ্ট নেত্রী ক্লারা ভেটকিনের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত সমাজতান্ত্রিক নারী সম্মেলনে গৃহীত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপনের প্রস্তাব ।

১৯১৪ সালের ৮ই মার্চ , প্রথম আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয় ।

১৯১৮ সালে ব্রিটেনের মহিলাদের ভোটাধিকার লাভ ।

১৯২০ সালে আমেরিকায় মহিলাদের ভোটাধিকার লাভ ।

১৯২১ সালে মেরী স্টেপস ব্রিটেনে প্রথম জন্ম নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র চালু করেন ।

১৯২৯ সালে ভার্জিনিয়া উলফের ' A Room of one's own' প্রকাশিত এই প্রখ্যাত গ্রন্থে লেখিকা দাবি করেন যে , নারীদের যদি নিজস্ব পরিসর দেওয়া হয় , তাদের সৃজন ও সমান উৎকর্ষ অর্জন করবে ।

১৯৪৯ সালে পরবর্তী সমস্ত নারীবাদী চিন্তা ও আন্দোলনের অগ্রদূত সিমেনদ্য বোভায়ারের " The Second Sex" প্রকাশিত হল । বইটিতে লেখিকা বললেন, সমাজ পুরুষকে তৈরী করেছে

সদর্থক রূপে এবং নারীকে নঞর্থক রূপে, দ্বিতীয় লিঙ্গ বা পুরুষের 'অপর' হিসাবে। ফলে অস্বীকার করা হয়েছে নারীর স্বকীয়তা ও তার দায়িত্ব বহনের অধিকারকে। এই বইতে লেখিকার বিখ্যাত উক্তি হল " কন্যা সন্তান নারী হয়ে জন্মায় না, সমাজ তাকে নারী করে তোলে।

১৯৬৩ সালে আমেরিকান নয়া নারীবাদ প্রচারক প্রথম বই বেটি ফ্রিডানের "The Feminine Mystique" এর প্রকাশ হয়। বইটিতে সিমোন দ্য বোভোয়ারের ধারনাটিকেই গ্রহন করেন ফ্রিডান। নারী পুরুষের " অন্য " অংশ হিসাবেই সমাজ ও ইতিহাস চিহ্নিত। আমেরিকান নারীদের একটি প্রাঞ্জল পর্যালোচনাও আমরা এখানে দেখি।

১৯৭০ সালে কেট মিলেট এর ' Sexual Politics' প্রকাশিত হল। পাশ্চাত্যে নারী বাদী চিন্তা চেতনায় 'পিতৃতন্ত্র' সম্পর্কিত ধারনা স্পষ্ট আকার ধারন করে এই বইটি প্রকাশিত হওয়ার পর। কেট মিলেট -ই সর্ব প্রথম নারী পুরুষের সম্পর্ককে রাজনৈতিক সম্পর্ক বলে চিহ্নিত করেন এবং জনন ও যৌনতা সম্পর্কিত এই নতুন ধরনের চিন্তা ভাবনাই দ্বিতীয় ধারার নারীবাদী পথ প্রস্তুত করে।

১৯৭২ সালে প্যাট কারবানি, গ্লোরিয়া স্টেনেমস প্রমুখ Ms. পত্রিকার প্রকাশ করলেন Ms. এই প্রথম নারীদের কথা সকলের সামনে তুলে ধরেন।

১৯৭৫ সালে আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ হিসাবে এই বছরটিকে চিহ্নিত করল রাষ্ট্রসংঘ। সাম্য, উন্নয়ন এবং শান্তির স্লোগান কণ্ঠে নিয়ে আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ পালিত হল। আন্তর্জাতিক নারীদশকের শুরু মেক্সিকোতে ১৯ জুলাই, রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোগে প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৭৯ সালে মেয়েদের ক্ষেত্রে সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপের জন্য দাবিসনদ রাষ্ট্রপুঞ্জে গৃহীত হয়।

১৯৮০ সালে কোপেন হেগেল এ অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় বিশ্বনারী সম্মেলন।

১৯৮৫ সালে নাইরোবিতে অনুষ্ঠিত হয় তৃতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলন।

১৯৯৪ সালে কায়রোতে অনুষ্ঠিত জনসংখ্যা ও উন্নয়ন বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন।

১৯৯৫ সালে সাম্য, উন্নয়ন ও শান্তির লক্ষ্যে বেজিং এ অনুষ্ঠিত চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন।

১৯২৫ সাল থেকেই ভারতে মুসলমান নারীদের জন্য শরিয়তি আইন চালু করার দাবি তুলেছিল উলেমেয়ে -ই হিন্দু। ১৯৩৫ সালে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে অনুরূপ কিছু আইন চালু করতে সাম্প্রদায়িক শক্তি সক্ষমও হয়। ১৯৩৫ সালেই ফেডারাল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলিতে তারা ঐ দরনের কিছু আইনও পাশ করতে সাফল্য পায়। ১৯৩৭ সালে মৌলানা আসরফ তনভি রচিত। " অল হিতলাত নাজি জালিল হ্যালিম্মাৎ অল আজা' পুস্তক অনুযায়ী ও শরিয়ৎ ভিত্তিক আর একটি বিল তারা ফেডারেল লেজিসলেটিভে পেশ করেন ১৯৩৯ সালে সেটিকে আংশিক গ্রহন করে আইনও

পাশ হয় । স্বাধীনতার পর সেপশাল ম্যারেজ অ্যাক্ট ১৯৫৪ ক্রিমিনাল প্রসিডিওর কোড ১৯৭৩ এবং দি অ্যাড পশন বিল ১৯৭২ কে কেন্দ্র করে মৌলবাদীরা ভারতে সাধ্যমত প্রবল সম্প্রদায়িক উন্মাদনা ছড়ায় । ১৯৮৫ সালে শাহবানু মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে তারা সারা দেহে 'জিহাদ' ঘোষনা করে । ভারতের আইন কমিশনের ১৯৬০ সালের পঞ্চদশ রিপোর্টের ভিত্তিতে ভারত সরকার ১৯৬২ সালে ক্রিশ্চিয়ান ম্যারেজ অ্যাক্ট ম্যাটিমনিয়াল বিল পার্লামেন্টে পেশ করলেও খ্রিস্টান চার্চের চাপে তা পাশ হতে পারে নি।

১৯৮৩ সালেও আইন কমিশনের রিপোর্ট এর পরিনাম একই দাঁড়ায়। ১৯৮৬ সালে সুপ্রিম কোর্ট মেরিরায় বনাম কেরালা সরকার ও অন্যান্য মামলাতে ঐতিহাসিক রায় দিয়ে খ্রিস্টান নারীদের পুরুষের সমান উত্তরাধিকার দেবার সিদ্ধান্ত ঘোষনা করলে দেশের অধিকাংশ চার্চ ব্যাপক প্রতিবাদ জানায় ও বিক্ষোভ সংগঠিত করে । একেই সাথে ভারতের বিবাহ বিচ্ছেদ আইনকে আরও কঠোর ভাবে খ্রীষ্টান মহিলা বিরোধী করার দাবিও তোলে এরা ।

১৯৫৫ সালের হিন্দু -ম্যারেজ অ্যাক্ট এবং ১৯৫৬ সালের হিন্দু সাকশেসন অ্যাক্ট এ পুরুষের এক বিবাহ পিতার সম্পত্তিতে কন্যার ও সমান অধিকার প্রভৃতি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ও মৌলবাদীরা দেশব্যাপী তুমুল উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল । ১৯৮৭ সালে রাজস্থানের রূপ কানোয়ারকে জোর করে সতী তথা স্বামীর চিতায় সহমরনে বাধ্য করার পর 'সতী প্রিভেনশন(অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল রচনা হয় । এ সব সত্যেও মধ্যযুগীয় প্রথা শেষ হলেও একটি প্রথা কিন্তু এখনও শেষ হয়নি যার নাম '' পণ প্রথা''। আমার মনে হয় পণ প্রথা সামাজিক অভিশাপ । দেশের শত শত মেয়ের জীবনে পণপ্রথার করাল গ্রাস জীবনকে দুবির্সহ করে তুলেছে । আজও পণের টাকা দিতে না পেরে কন্যাদায়গ্রস্থ পিতারা বিপদাপন্ন হন । প্রতিদিনের খবরের কাগজের শিরোনাম , পণের জন্য বধূ হত্যা , বধূ পুড়িয়ে মারা ইত্যাদি ইত্যাদি ! পণপ্রথার প্রকোপ যেন দিনে দিনে বাড়ছে । আগে পণ ছিল শুধু টাকা ও গহনা , আরো অন্যধরনের ফ্রিজ টি ভি গাড়ী আরো মূল্যবান সামগ্রী , এ ক্ষেত্রে যেন শিক্ষিত / অশিক্ষিত কোন ভেদাভেদ নেই । ডাক্তার , ইঞ্জিনীয়ার , বড় চাকুরীওয়ালা যেন পণের বড়ো দাবিদার । হয়তো ভাবতেও অবাক লাগে যখন এ সমাজের শিক্ষিত লোকগুলি এই বর্বরোচিত পণ প্রথাকে পশ্রয় দিয়ে হতভাগ্য পিতাদেরকে রাস্তায় নামিয়ে দেয় । সত্যিই ভবিষ্যৎটা কি বলা মুশকিল ? পণপ্রথার বিরুদ্ধে এত আইন আছে আর আইনের ভয়ে এই প্রথাটিকে প্রকাশ্য রাস্তা ছেড়ে সুকৌশলে গোপন রাস্তা ধরেছে এ যেন গুপ্ত ভয়ংঙ্কর ব্যাধি । আমাদের সবার উচিত এই ভয়ংঙ্কর ব্যাধির বিরুদ্ধে প্রচার মাধ্যমে থেকে শুরু করে ব্যক্তির ব্যক্তিগত স্বার্থ ত্যাগ করে খোলামনে পণপ্রথার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো। তাহলে হয়ত এই অভিশাপ থেকে মুক্ত হওয়া যেতে পারে । মনে হয় প্রতিনিয়ত লেগে থাকাই বেঁচে থাকা । এ ভাবেই সমাজ বাঁচতে পারে মাথা উচু করে নিতে পারে কুসংস্কার মুক্ত নতুন সমাজ ।

# মহিলা সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন সমূহ
## অনৈতিক নিন্দার্হ বৃত্তি নিবারণী আইন , ১৯৫৬

অনৈতিক নিন্দার্হ বৃত্তি নিবারণ করার জন্য ১৯৫০ সালের ৯ই মে তারিখে নিউইয়র্কে স্বাক্ষরিত কনভেনশনের অনুসরণে বিধিত একটি আইন ।

১ ধারা - সংক্ষিপ্ত নাম , বিস্তৃতি এবং আরম্ভ [ Short title extent and commencement]

(১) এই আইনকে ১৯৫৬ সালের অনৈতিক নিন্দাহ বৃত্তি নিবারণী আইন বলা যেতে পারে ।

২) এই আইন ভারতবর্ষের সর্বত্র প্রযোজ্য ।

৩) এই ধারা ১৯৫৬ সালের ৩০শে ডিসেম্বর থেকে এবং বাদবাকি বিধানগুলি ১৯৫৮ সালের ১লা মে থেকে কার্যকর হয়েছে।

২ধারা - সংজ্ঞাদি [ Definitions]প্রসঙ্গ থেকে অন্যকিছু প্রতীয়মান না হলে এই আইনে -

(এ) " পতিতালয় ( Brothel) " বলতে বুঝায় যেকোন বাড়ী ,ঘর গাড়ি বা স্থান অথবা কোন বাড়ী ঘর , গাড়ি বা স্থানের কোন অংশ যা অপর কোন ব্যক্তি অথবা দুই বা ততোধিক পতিতার পারস্পরিক লাভের জন্য যৌনশোষন বা যৌন অপব্যবহার চালাবার কারণে ব্যবহৃত হয় ।

(এএ) " শিশু (child)" বলতে বুঝায় এমন ব্যক্তি যে ১৬ বছর বয়স পূর্ণ করেনি ,

(বি) " সংশোধনকারী প্রতিষ্ঠান (Corrective institution)" বলতে বুঝায় এমন প্রতিষ্ঠান তাকে যে নামেই হোক না কেন (এই আইনের ২১ ধারার আওতায় ঐরূপ প্রতিষ্ঠান হিসাবে গঠিত বা লাইসেন্সপ্রাপ্ত ) যেখানে সংশোধনের প্রয়োজন আছে এরূপ ব্যক্তিদের এই আইনের আওতায় আটক করা যেতে পারে , এবং এর মধ্যে সেরূপ আশ্রয়স্থলও অন্তর্ভুক্ত যেখানে বিচারাধীন ব্যক্তিদের আওতায় রাখা যেতে পারে ।

(সি) " ম্যাজিস্ট্রেট (Magistrate)" বলতে এরূপ কোন ম্যাজিস্ট্রেটকে বুঝায় যাকে সেই ধারা কর্তৃক , যে ধারায় ঐ শব্দটি উল্লিখিত হয়েছে , প্রদত্ত ক্ষমতাদির প্রয়োগ করার জন্য এই আইনের তপসিলের দ্বিতীয় কলামে সক্ষম বলে নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং যিনি তপসিলটির প্রথম কলামে নিদিষ্ট হয়েছেন ।

( সি - এ) " সাবালক / সাবালিকা (Major)" বলতে সেই ব্যক্তিকে বুঝায় যে ১৮ বছর পূর্ণ করেছেন ।

(সি - বি)" নাবালক / নাবালিকা minor" বলতে সেই ব্যক্তিকে বুঝায় যে ১৬ বছর বয়স পূর্ণ করেছে কিন্তু ১৮ বছর বয়স পূর্ণ করেনি ।

(ডি) " ঘোষিত (Prescribed)" বলতে এই আইনের আওতায় তৈরী নিয়মাবলীতে ঘোষিতকে

বুঝায় ।

(এফ্) " পতিতাবৃত্তি (Prosittution)" বলতে বাণিজ্যের কারণে ব্যক্তিদের যৌন শাসণ বা যৌন অপব্যবহারকে বুঝায় এবং " পতিতা (prostitute)" বলতে তদনুযায়ী অর্থ করতে হবে ।

(জি) " নিরাপত্তামূলক আবাস (protective home)" বলতে বুঝায় এমন এক প্রতিষ্ঠান , তাকে যে নামেই ডাকা হোক না কেন (এই আইনের ২১ ধারার আওতায় ঐরূপ প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত বা লাইসেন্সপ্রাপ্ত) যেখানে দেখভাল ও সুরক্ষার প্রয়োজন আছে এরূপ ব্যক্তিদের রাখা যেতে পারে এবং যেখানে উপযুক্ত প্রয়োগবিদ্যায় যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণের , উপকরণের এবং অন্যান্য সুযোগসুবিধার ব্যবস্থা রাখা আছে , কিন্তু নিম্নলিখিতগুলি এর মধ্যে পড়ে না -

(i) এমন কোন আশ্রয়স্থল যেখানে এই আইন অনুসারে বিচারাধীন ব্যক্তিদের রাখা যেতে পারে।

(ii) সংশোধনকারী প্রতিষ্ঠান ।

(এইচ্) "সার্বজনিক স্থান / জনসাধারনের স্থান (Public place) " বলতে বুঝায় জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য উদ্দিষ্ট , জনসাধারণের প্রবেশাধিকার আছে এমন যে কোন স্থানকে বুঝায় এবং এর মধ্যে জনসাধারণের গাড়ী ও অন্তর্ভুক্ত ।

(আই) " বিশেষ পুলিশ অফিসার (Special Police Officer)" বলতে এই আইনের প্রয়োজনে ঘোষিত এলাকার মধ্যে পুলিশ কর্তব্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত হ'তে রাজ্য সরকার কর্তৃক বা রাজ্য সরকারের পক্ষে নিযুক্ত পুলিশ অফিসারকে বুঝায় ।

(জে) " অর্থনৈতিক নিন্দার্হ বৃত্তি সংক্রান্ত পুলিশ অফিসার ( Traffiching police officer)" বলতে এই আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারায় কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তিকে বুঝায় ।

**৩ ধারা** - পতিতালয় চালানো অথবা পতিতালয় হিসাবে কোন স্থান ব্যবহার হ'তে দেওয়ার জন্য দন্ড [ Punishment for keeping a brothel or allowing premises to be as a borthel ] (১) যদি কোন ব্যক্তি পতিতালয় চালায় বা তা নিয়ন্ত্রণ করে অথবা তা চালাতে বা নিয়ন্ত্রণ করতে কাজ করে বা সহায়তা করে , তবে সে প্রথম দোষী সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে এক বছরের কম নয় এবং তিন বছরের বেশী নয় এরূপ কোন একটি মেয়াদের সশ্রম কারাদন্ডে এবং দুই হাজার টাকা পর্যন্ত হতে পারে এরূপ কোন অঙ্কের অর্থদন্ডের ও দন্ডনীয় হবে এবং দ্বিতীয় বা পরবর্তীবার দোষী সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে দুই বছরের কম নয় এবং পাঁচ বছরের বেশী নয় এরূপ কোন একটি মেয়াদের সশ্রম কারাদন্ডে সশ্রম কারাদন্ডে এবং দুই হাজার টাকা পর্যন্ত হতে পারে এরূপ কোন অঙ্কের অর্থদন্ডেরও দন্ডনীয় হবে ।

২) যদি কোন ব্যক্তি-

(এ) কোন স্থানের ভাড়াটে , পাট্টাদার , দখলীকার বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি হয়ে সেই স্থানকে বা সেই স্থানের কোন অংশকে পতিতালয় হিসাবে ব্যবহার করে অথবা জেনেশুনে অন্যকোন ব্যক্তিকে সেরূপভাবে ব্যবহার করতে দেয় অথবা

(বি) কোন স্থানের মালিক , পাট্টাদাতা বা ভূস্বামী অথবা ঐরূপ মালিক পাট্টাদাতা বা ভূস্বামীর প্রতিনিধি হয়ে সেই স্থান বা সেই স্থানের কোন অংশকে এটি জেনে ভাড়া দেয় যে ঐ স্থান বা ঐ স্থানের কোন অংশ পতিতালয় হিসাবে ব্যবহার হওয়ার জন্য উদ্দিষ্ট হয়েছে অথবা ঐরূপ স্থান বা ঐরূপ স্থানের কোন অংশ পতিতালয় হিসাবে ব্যবহার বিষয়ে জেনেশুনে একজন পক্ষ হয়,

তবে সে প্রথমবার দোষী সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে দুই বছর পর্যন্ত হতে পারে এরূপ কোন একটি মেয়াদের কারাদন্ডে এবং দুই হাজার টাকা পর্যন্ত হতে পারে এরূপ কোন অঙ্কের অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হবে এবং দ্বিতীয় বা পরবর্তীবার দোষী সাব্যস্তের ক্ষেত্রে পাঁচ বছর পর্যন্ত হতে পারে এরূপ কোন একটি মেয়াদের সশ্রম কারাদন্ডে এবং অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হবে ।

(২-এ) উপধারা (২) এর প্রয়োজনের কারণে , যতক্ষন না বিরুদ্ধ প্রমাণ করে দেওয়া হয় , এইটি ধরে নেওয়া হবে যে ঐ উপধারার (এ) বা (বি) উপাংশে বলা কোন ব্যক্তি , যেখানে যেমন হতে পারে , স্থানটিকে বা স্থানটির কোন অংশকে পতিতালয় হিসাবে ব্যবহার হওয়ার জন্য জেনেশুনে অনুমতি দিতে চলেছে অথবা তার এই জ্ঞান আছে যে ঐ স্থান বা স্থানটির কোন অংশ পতিতালয় হিসাবে ব্যবহার হচ্ছে , যদি-

(এ) কোন এরূপ সংবাদপত্রে , যার সেই এলাকায় প্রচার আছে যে এলাকার ঐরূপ ব্যক্তি বসবাস করছে , এই মর্মে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়ে থাকে যে এই আইনের আওতায় করা তল্লাসীর ফলে এইটি দেখা গেছে যে ঐ স্থানটি বা তার কোন অংশ পতিতালয় হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে, অথবা ,

(বি) উপাংশ (এ) - তে উল্লিখিত তল্লাসীর সময় প্রাপ্ত সকল জিনিসপত্রের তালিকার একটি কপি ব্যক্তিকে দেওয়া হয়।

(৩) প্রচলিত কোন আইনে যাই বলা যাক না কেন , উপধারা (২) -এর (এ) বা

(বি) উপাংশে বলা কোন ব্যক্তি কোন স্থান বা ঐ স্থানের কোন অংশের সম্পর্কে ঐ উপধারার আওতার কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হলে , এরূপ কোন পাট্টা বা চুক্তি যার অধীনে ঐ স্থান পাট্টায় দেওয়া হয়েছে অথবা ঐ অপরাধ করার সময় ধরে রাখা হয়েছে বা দখল করে রাখা হয়েছে , তা উক্ত দোষী সাব্যস্তের দিন থেকে বাতিল এবং অকার্যকর হবে ।

(৪) **ধারা** - পতিতাবৃত্তির উপার্জনের উপর জীবন নির্বাহ করার জন্য দন্ড [ Punishment for

living on the earnings of prostitution ] (১) ১৮ বছরের বেশী বয়সের কোন ব্যক্তি যে জেনেশুনে অন্যকোন ব্যক্তির পতিতাবৃত্তির উপার্জনের উপর পূর্ণতঃ বা অংশতঃ জীবন নির্বাহ করবে, সে দুই বছর পর্যন্ত হতে পারে এরূপ কোন একটি মেয়াদের কারাদন্ডে বা এক হাজার টাকা পর্যন্ত হতে পারে এরূপ কোন অঙ্কের অর্থদন্ডের বা , উভয়বিধ দন্ডে দন্ডীনীয় হবে এবং যেক্ষেত্রে ঐরূপ উপার্জন কোন শিশু বা কোন নাবালিকার পতিতাবৃত্তির সাথে সম্পর্কিত হয় সেক্ষেত্রে সে সাত বছরের কম নয় এবং দশ বছরের বেশী নয় এরূপ কোন একটি মেয়াদের কারাদন্ডে দন্ডনীয় হবে ।

(২) যেক্ষেত্রে ১৮ বছরের বেশী বয়সের কোন ব্যক্তির সম্পর্কে এটি প্রমাণিত হয়ে যায় যে সে -

(এ) কোন পতিতার সাথে বাস করছে বা অভ্যাসগতভাবে তার সঙ্গে থাকে বা ,

(বি) কোন পতিতার গতিবিধি এরূপ পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রণ বা নির্দেশ করছে বা তার উপর প্রভাব ফেলছে যে তা থেকে বইটি প্রতীয়মান হচ্ছে যে ঐ ব্যক্তি তাকে পতিতাবৃত্তি করার জন্য সহায়তা করছে বা প্ররোচনা দিচ্ছে বা বাধ্য করছে , বা

(সি) কোন পতিতার জন্য দালালগিরি বা কোটনাগিরি করছে ,

সে ক্ষেত্রে , যতক্ষন না বিরুদ্ধ প্রমাণ করে দেওয়া হচ্ছে এটি অনুমান করা হবে যে ঐ ব্যক্তি উপধারা (১) এরা অর্থে অন্য ব্যক্তির পতিতাবৃত্তির উপার্জনের উপর জেনেশুনে জীবন নির্বাহ করছে ।

**৫ ধারা** - পতিতাবৃত্তির জন্য ব্যক্তিকে সংগ্রহ করা , উসকানি দেওয়া বা নিয়ে যাওয়া [ procuring inducing or taking person for sake of prostitution ] (১) কোন ব্যক্তি যে -

(এ) কোন ব্যক্তিকে , তার সম্মতিতে হোক বা বিনা সম্মতিতে যাই হোক না কেন, পতিতাবৃত্তির প্রয়োজনে সংগ্রহ করে বা সংগ্রহ করার চেষ্টা করে , বা

(বি) কোন ব্যক্তিকে কোন স্থান থেকে চলে যাওয়ার জন্য এই অভিপ্রায়ে উসকানি দেয় যে সে পতিতাবৃত্তির প্রয়োজনের জন্য কোন পতিতালয়ের অন্তঃবাসী হয়ে যেতে পারে বা তথায় প্রায়শই যাতায়াত করতে পারে , বা

(সি) কোন ব্যক্তিকে এই দৃষ্টি থেকে যে সে পতিতাবৃত্তি করবে বা তাকে পতিতাবৃত্তি করার জন্য লালনপালন করা হবে , একস্থান থেকে অন্যস্থানে নিয়ে যায় বা নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে বা করায় , বা

(ডি) কোন ব্যক্তিকে দিয়ে পতিতাবৃত্তি করায় বা করবার জন্য উসকানি দেয় সে দোষী সাব্যস্তে, তিন বছরের কম নয় এবং সাত বছরের বেশী নয় এরূপ কোন একটি মেয়াদের সশ্রম কারাদন্ডে এবং

দুই হাজার টাকা পর্যন্ত হতে পারে এরূপ কোন অঙ্কের অর্থদন্ডের দন্ডনীয় হবে এবং এই উপধারার কোন অপরাধ যদি কোন ব্যক্তির ইচ্ছার বিরুদ্ধে করা হয় তবে সাত বছর মেয়াদের কারাদন্ড চৌদ্দ বছরের মেয়াদ পর্যন্ত বিস্তৃত হবে ঃ

শর্ত থাকে যে , যদি সেই ব্যক্তি যার সম্বন্ধে এই উপধারার আওতায় অপরাধ করা হয়েছে সে (i) শিশু হয় , তবে এই উপধারার বিধিত দন্ডটি সাত বছরের কম নয় এরূপ কোন মেয়াদের সশ্রম কারাদন্ড পর্যন্ত হবে এবং তা যাবজ্জীবন কারাদন্ডও হতে পারে এবং

(ii) যদি নাবালিকা হয় , তবে এই উপধারায় বিধিত দন্ডটি সাত বছরের কম নয় এবং চৌদ্দ বছরের বেশী নয় এরূপ কোন একটি মেয়াদের সশ্রম কারাদন্ড পর্যন্ত হবে

(২) ১৯৮৬ সালের ৪৪ নং সংশোধিত আইনে বাতিল হয়েছে ,

(৩) এই ধারার আওতায় অপরাধ -

(এ) সেই স্থানে বিচারযোগ্য হবে যেস্থান যেকে ব্যক্তি সংগ্রহ করা হয় , এবং যাওয়ার জন্য উসকানি দেওয়া হয় , বা নিয়ে যাওয়া হয় বা নেওয়ানো হয় অথবা যে স্থান থেকে ঐরূপ ব্যক্তিকে সংগ্রহ করতে বা নিয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করা হয় , বা

(বি) সেই স্থানে বিচারযোগ্য হবে যেস্থানে সে ঐ উস্‌কানির ফলস্বরূপ গিয়ে থাকতে পারে বা যে স্থানে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় বা নিয়ে যাওয়ানোর হয় বা নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয় ।

**৬ ধারা** - কোন ব্যক্তিকে এরূপ কোন স্থানে আটক করে রাখা যেখানে পতিতাবৃত্তি চালানো হয় [ Detaining a person in premises where posittution is carried on ](১) কোন ব্যক্তি যে অন্য ব্যক্তিকে , তার সম্মতি নিয়ে বা বিনা সম্মতিতে যাই হোক না কেন - (এ) কোন পতিতালয়ে আটক করে , বা

(বি) কোন স্থানের মধ্যে বা স্থানে এই অভিপ্রায়ে আটক করে যে ঐ ব্যক্তির এরূপ কোন ব্যক্তির সাথে যে ঐ ব্যক্তির স্ত্রী বা স্বামী নয় , যৌন সংগর্গে হতে পারে ;

সে , দোষী সাব্যস্ত , সাত বছরের কম নয় এরূপ কোন মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হবে কিন্তু তা যাবজ্জীবন অথবা দশ বছর পর্যন্ত হতে পারে এরূপ কোন মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ডও হতে পারে এবং অর্থদন্ডেও দায়ী হবে ঃ

শর্ত থাকে যে আদালত , পযার্প্ত এবং বিশেষ কারণের কথা রায়ে উল্লেখ করে সাত বছরের কম মেয়াদের কারাদন্ড আরোপ করতে পারেন ।

(২) যেক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিকে কোন পতিতালয়ে কোন শিশুর সাথে দেখতে পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে যতক্ষন না বিরুদ্ধ প্রমাণ করে দেওয়া হচ্ছে , এটি মনে করে নেওয়া হবে যে সেই ব্যক্তি উপধারা (১) এর আওতায় কোন অপরাধ করেছে ।

(২-এ) যেক্ষেত্রে কোন পতিতালয়ের মধ্যে পাওয়া কোন শিশু বা নাবালিকাকে মেডিক্যাল পরীক্ষার পরে আবিষ্কৃত হয় যে তার সাথে যৌন অপব্যবহার করা হয়েছে, সে ক্ষেত্রে যতক্ষণ না বিরুদ্ধ প্রমাণ করে দেওয়া হয়, এটি মনে করে নেওয়া হবে যে ঐ শিশু বা নাবালিকাকে, যেখানে যেমন হতে পারে, পতিতাবৃত্তির প্রয়োজনে আটক করা হয়েছে অথবা তাকে বাণিজ্যিক প্রয়োজনের জন্য যৌন শোষণ [ sexual exploitation] করা হয়েছে।

(৩) কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে এটি মনে করা হবে যে সে কোন মহিলা বা বালিকাকে কোন পতিতালয়ে বা তার আইনানুগ স্বামী ভিন্ন কোন পুরুষের সাথে যৌন সংর্গের প্রয়োজনে কোন স্থানের মধ্যে বা স্থানে আটক করছে, যদি ঐ ব্যক্তি তাকে সেই স্থানে থাকার জন্য বাধ্য বা উস্‌কানি দেওয়ার অভিপ্রায়ে

(এ) তার কোন অলঙ্কার, পরিধেয় বস্ত্র, টাকা বা অন্য সম্পত্তি তার কাঝ থেকে নিয়ে আটকিয়ে রাখে, বা

(বি) ঐরূপ ব্যক্তি কর্তৃক বা তার নির্দেশে তাকে ধার দেওয়া বা সরবরাহ করা কোন অলঙ্কার, পরিধেয় বস্ত্র, টাকা বা অন্য সম্পত্তি সে নিয়ে চলে গেলে তার বিরুদ্ধে আইনি কার্যবাহ চালানো হবে বলে তাকে হুমকী দেয়।

(৪) ঐরূপ স্ত্রীলোক বা বালিকার বিরুদ্ধে ঐ ব্যক্তির অভিযোগে, যে ব্যক্তি কর্তৃক সে আটক হয়েছে, এরূপ কোন অলঙ্কার, পরিধেয় বস্ত্র বা অন্য সম্পত্তির পুনরুদ্ধারের জন্য যা ঐ স্ত্রীলোক বা বালিকাকে ধার দেওয়া হয়েছে বা সরবরাহ করা হয়েছে অথবা ঐ স্ত্রীলোক বা বালিকা কর্তৃক বন্ধক দেওয়া হয়েছে বলে অভিকথিত হয়েছে অথবা কোন টাকার পুনরুদ্ধারের জন্য যা ঐ স্ত্রীলোক বা বালিকা কর্তৃক প্রদেয় বলে অভিকথিত হয়েছে, কোন মামলা, অভিযোজন বা অন্য আইনি কার্যবাহ, বিরুদ্ধে যে আইনই থাকুক না কেন, বর্তাবে না।

**৭ ধারা** - সার্বজনিক স্থানে বা তার অনতিদূরে পতিতাবৃত্তি [ Prostitution in or in the vicinity of public place ] (১) পতিতাবৃত্তিকারী কোন ব্যক্তি এবং সেই ব্যক্তি যার সাথে ঐরূপ পতিতাবৃত্তি এরূপ কোন স্থানে করা হয় -

(এ) যা উপধারা (৩) এর আওতায় বিজ্ঞাপিত কোন এলাকা বা এলাকার অন্তভুর্ক্ত, বা

(বি) যা কোন সার্বজনিক ধর্মীয় পূজার স্থান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ছাত্রাবাস হাসপাতাল, নার্সিং হোম বা অন্য কোন প্রকারের এরূপ সার্বজনিক স্থান দুশো মিটার দূরত্বের মধ্যে আছে, যাকে পুলিশ কমিশনার বা ম্যাজিস্টেট এই উদ্দেশ্যে ঘোসিত পদ্ধতিতে বিজ্ঞাপিত করতে পারেন।

তিনমাস পর্যন্ত হতে পারে এরূপ কোন একটি মেয়াদের কারাদন্ডে দন্ডনীয় হবে।

(১-এ) যেক্ষেত্রে উপধারা (১) এরা আওতায় করা অপরাধ কোন শিশু বা নাবালিকার সম্পর্কে

হয় সেক্ষেত্রে অপরাধকারী ব্যক্তি সাত বছরের কম নয় কিন্তু তা যাবজ্জীবন বা দশ বছর পর্যন্ত হতে পারে এরূপ কোন একটি মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রমে কারাদন্ডে দন্ডনীয় হবে এবং অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হবে ঃ

শর্ত থাকে যে আদালত পর্যাপ্ত এবং বিশেষ কারণাদির কথা রায়ে উল্লেখ করে সাত বছরের কম মেয়াদের কারাদন্ড আরোপ করতে পারেন ।

(২) কোন ব্যক্তি যে -

(এ) কোন সার্বজনিক স্থানের রক্ষক হয়ে পতিতাদের তাদের বৃত্তির প্রয়োজনের জন্য জেনেশুনে ঐ স্থানে আশ্রয় নিতে বা থাকতে দেয় বা ,

(বি) উপধারা (১) এ বলা কোন স্থানের ভাড়াটে , পাট্টাদার , দখলীকার বা ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি হয়ে জেনেশুনে ঐ স্থান বা স্থানের কোন অংশ পতিতাবৃত্তির প্রয়োজনের জন্য ব্যবহার হতে দেয় ; বা

(সি) উপধারা (১) - এ বলা কোন স্থানের মালিক , পাট্টাদাতা বা ভূস্বামী হয়ে অথবা ঐ মালিক, পাট্টাদাতা বা ভূস্বামীর প্রতিনিধি হয়ে ঐ স্থান বা স্থানের কোন অংশ এই জ্ঞান সহকারে ভাড়া দেয় যে ঐ স্থান বা স্থানের কোন অংশ পতিতাবৃত্তির জন্য ব্যবহার হতে পারে , অথবা ঐরূপ ব্যবহার হওয়ার বিষয়ে জেনেশুনেই একজন পক্ষ হয় ,

সে, প্রথম দোষী সাব্যস্তে , তিনমাস পর্যন্ত হতে পারে এরূপ কোন একটি মেয়াদের কারাদন্ডে বা দুশ টাকা পর্যন্ত হতে পারে এরূপ কোন অঙ্কের অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হবে এবং দ্বিতীয় বা পরবর্তীবারের ক্ষেত্রে ছয়মাস পর্যন্ত হতে পারে এরূপ কোন একটি মেয়াদের কারাদন্ডে এবং দুশ টাকা পর্যন্ত হতে পারে এরূপ কোন অঙ্কের অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হবে ,এবং যদি ঐ সার্বজনিক স্থান বা স্থানটি কোন হোটেল হয় তবে প্রচলিত কোন আইনের আওতায় ঐরূপ হোটেল ব্যবসায় চালানোর জন্য লাইসেন্স তিন মাসের কম নয় কিন্তু এক বছর পর্যন্ত হতে পারে এরূপ কোন সময়কালের জন্য অকার্যকর হওয়ার যোগ্য হবেঃ

শর্ত থাকে যে , যদি এই উপধারা আওতায় করা অপরাধটি কোন শিশু বা নাবালিকার সম্পর্কে হয় তবে ঐ লাইসেন্স বাতিলযোগ্যও হবে ।

**ব্যাখা [ Explanation ]** এই উপধারায় প্রয়োজনে " হোটেল" কথাটি অর্থ ১৯৮০ - সালের ৫৪ নং আইনের (হোটেল রিসিপ্ট ট্যাক্স আইনের ) ২ ধারা (৬) উপাংশে যে অর্থ করা হয়েছে তাই হবে।

(৩) রজ্য সরকার কোন এলাকা বা এলাকাগুলিতে কিরূপ ধরনের ব্যক্তি প্রায়শ যাতায়ত করছে , এবং সেখানকার লোকজনের প্রকৃতি এবং জনসংখ্যার ঘনত্ব তথা অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় বিবেচনা করে, সরকারি গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে , নির্দেশ দিতে পারেন যে বিজ্ঞপ্তিতে যেরূপ ঘোষিত হতে পারে সেরূপ এলাকা বা এলাকাগুলিতে পতিতাবৃত্তি চালানো যাবে না ।

(৪) যেক্ষেত্রে কোন এলাকা বা এলাকার সম্পর্কে উপধারা (৩) এর আওতায় কোন সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয় সেখানে রাজ্য সরকার উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে যুক্তি যুক্ত নিশ্চয়তায় উক্ত এলাকা বা এলাকাগুলির পরিসীমা নিধারণঅ করে দেবেন।

ঐরূপ কোন বিজ্ঞপ্তি জারি করার পর ৯০ দিন সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে কোন তারিখ থেকে কার্যকর হবে না।

**৮ ধারা** - পতিতাবৃত্তির প্রয়োজনের জন্য প্রলুব্ধ করা যা আহ্বান জানানো [ seducing of soliciting for purpose of prostitution ] যদি কেউ কোন সার্বজনিক স্থানে বা কোন সার্বজনিক স্থান থেকে দেখা যায় , এবং এরূপ পদ্ধতিতে যা সার্বজনিক স্থান থেকে দেখা যায় বা শুনা যায় , তা কোন দালানের বা গৃহের মধ্য থেকেই হোক অথবা নাই হোক-

(এ) কথা, অঙ্গভঙ্গি , জেনেশুনে নিজ দেহ প্রদর্শনের মাধ্যমে (তা জানালা অথবা দালান বা গৃহের ঝুল বারান্দায় বসে হোক বা অন্য যেকোন ভাবেই হোক) অথবা অন্য কোনভাবে কোন ব্যক্তিকে প্রতিতাবৃত্তির প্রয়োজনের জন্য প্রলোভিত করে বা প্রলোভিত করার প্রয়াস করে অথবা তার মনোযোগ আকর্ষণ করে বা আকর্ষিত করার প্রয়াস করে , বা

(বি) পতিতাবৃত্তির প্রয়োজনের জন্য কোন ব্যক্তিকে আহ্বান করে বা উত্যক্ত করে অথবা ঘোরাফেরা করে বা এরূপ পদ্ধতিতে কাজ করে যা থেকে আশেপাশে থাকা বা ঐরূপ সার্বজনিক স্থান দিয়ে যাতায়তকারী ব্যক্তিদের বাধা বা ক্ষোভ জন্মায় , অথবা সার্বজনিক শোভনতার লঙ্ঘন হয় ,

তবে সেই ব্যক্তি প্রথম দোষী সাব্যস্তে , ছয়মাস পর্যন্ত হতে পারে এরূপ কোন মেয়াদের কারাদন্ডে অথবা পাঁচশ টাকা পর্যন্ত হতে পারে এরূপ কোন অর্থদন্ডে , অথবা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডনীয় হবে এবং দ্বিতীয় বা পরবর্তীবার দোষী সাব্যস্তে এক বছর পর্যন্ত হতে পারে এরূপ কোন একটি মেয়াদে কারাদন্ডে; এবং পাঁশ টাকা পর্যন্ত হতে পারে এরূপ অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হবেঃ

শর্ত থাকে যে , যেক্ষেত্রে এই ধারার আওতায় কোন অপরাধ কোন পুরুষ ব্যক্তি করে, সেক্ষেত্রে সেই পুরুষ ব্যক্তি সাতদিনের কম নয় কিন্তু যা তিনমাস পর্যন্ত হতে পারে এরূপ কোন মেয়াদের কারাদন্ডে দন্ডনীয় হবে ।

**৯ ধারা** - জিম্মায় থাকা কোন ব্যক্তি প্রলুব্ধ করা [ Seduction of a person in custody ] যদি কেউ কোন ব্যক্তির জিম্মাদার , দায়িত্বপ্রাপ্ত বা তত্ত্বাবধানপ্রাপ্ত হয়ে বা তাকে নিয়ন্ত্রণ করার মত অবস্থায় থেকে সেই ব্যক্তিকে পতিতাবৃত্তির জন্য প্রলুব্ধ করায় বা তাতে সহায়তা বা প্ররোচনা দেয় , তবে সে দোষী সাব্যস্তে সাত বছরের কম নয় কিন্তু যাবজ্জীবন বা দশ বছর পর্যন্ত হতে পারে এরূপ কোন একটি মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ডে এবং অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হবে ঃ

শর্ত থাকে যে আদালত , পর্যাপ্ত এবং বিশেষ কারণাদির কথা রায়ে উল্লেখ করে সাত বছরের

কম মেয়াদের কারাদন্ডও দিতে পারেন ।

**১৪ ধারা** - অপরাধাদি ধর্তব্য হবে [ offences to be cogr.izable ] ১৯৭৩ সালের ফৌজদারী কার্যপ্রণালী বিধিতে (১৯৭৪ সালের ২নং আইনে ) যাই বলা থাক না কেন , এই আইনে দন্ডনীয় যেকোন অপরাধ ঐ বিধির অর্থে ধর্তব্য অপরাধ হবেঃ শর্ত থাকে যে , ঐ বিধিতে যাই বলা থাক না কেন ,-

(i) বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেপ্তার কেবল বিশেষ পুলিশ অফিসার কর্তৃক বা তাঁর নির্দেশ বা তত্ত্বাবধানে বা তাঁর পূর্ব অনুমোদন সাপেক্ষ হবে ;

(ii) বিশেষ পুশিস অফিসার তাঁর অধস্তন কোন অফিসারকে যখন এরূপ করতে বলেন যে তিনি এই আইনের আওতায় কোন অপরাধের জন্য কোন ব্যক্তিকে তাঁর অনুপস্থিতিসতে বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেপ্তার করবেন তখন তিনি উক্ত অধস্তন অফিসারকে একটি লিখিত আদেশ দেবেন যে আদেশে যে ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করতে হবে তা এবং সেই অপরাধ যার জন্য গ্রে প্তার করা হচ্ছে তা নির্দিষ্টভাবে বলে দেবেন; এবং শেযোক্ত অফিসার (অর্থাৎ উক্ত অধস্তন অফিসার) সেই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করার পূর্বে তাকে আদেশের সারর্মম জানাবেন , এবং ঐ ব্যক্তি চাইলে , তাকে আদেশটি দেখাবেন;

(iii) বিশেষ পুলিশ অফিসার কর্তৃক বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত সাব- ইন্সপেক্টরের নিম্নপদস্থ নন এমন কোন পুলিশ অফিসার সেই পরিস্থিতিতে - যে পরিস্থিতিতে তার কাঝে এইটি বিশ্বাস করার কারণ আছে যে বিশেষ পুলিশ অফিসারের আদেশ পেতে গিয়ে বিলম্বের কারণে এর সম্ভাবনা আছে যে এই আইনের আওতাধীন কোন অপরাধের সাথে সম্পর্কিত কোন মূল্যবান সাক্ষ্য নষ্ট করে দেওয়া হবে বা লুকিয়ে ফেলা হবে অথবা এর সম্ভবনা আছে যে সেই যে ব্যক্তি যে অপরাধ করেছে বা যার দ্বারা অপরাধ হয়েছে বলে সন্দেহ হয় সে পালিয়ে যাবে অথবা ঐরূপ ব্যক্তির নাম বা ঠিকানা জানা নেই অথবা এরূপ সন্দেহ করার কারণ আছে যে অসত্য নাম বা ঠিকানা দেওয়া হয়েছে - সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ঐরূপ আদেশ ছাড়াই গ্রেপ্তার করতে পারেন , কিন্তু সেরূপ ক্ষেত্রে তিনি সেই গ্রেপ্তার এবং যে পরিস্থিতিতে গ্রেপ্তারটি করা হয়েছে সেই পরিস্থিতির বিষয়ে যতশীঘ্র সম্ভব , বিশেষ পুলিশ অফিসারকে রিপোর্ট করবেন ।

**১৫ ধারা** - বিনা ওয়ারেন্টে তল্লাসী [ Search without warrant ]

(১) প্রচলিত অন্যকোন আইনে যাই বলা থাকনা কেন , যখনই , যেখানে যেমন হতে পারে , বিশেষ পুলিশ অফিসার ( Special police officer) বা অনৈতিক নিন্দার্হ বৃত্তি সংক্রান্ত পুলিশ অফিসারের (Trafficking police officer এর )কাছে এইটিবিশ্বাস করার যুক্তিযুক্ত ভিত্তি থাকে যে এই আইনের আওতায় দন্ডনীয় কোন অপরাধ কোন স্থানে বসবাসকারী কোন ব্যক্তির সম্পর্কে করা হয়েছে বা করা হচ্ছে এবং এই স্থানের ওয়ারেন্টসহ তল্লাসী অযথা বিলম্ব ছাড়া করা যাবে না ,

তখন ঐ অফিসার তার বিশ্বাসের ভিত্তি নথিবদ্ধ করার পর , ওয়ারেন্ট ছাড়া ঐ স্থানে প্রবেশ করে তল্লাসী করতে পারেন ।

(১) উপধারা (১) এর আওতায় তল্লাসীর পূর্বে বিশেষ পুলিশ অফিসার বা অনৈতিক নিন্দার্হ বৃত্তি সংক্রান্ত পুলিশ অফিসার , যেখানে যেমন হতে পারে , সেই এলাকার যে এলাকায় তল্লাসী করতে হবে এমন স্থানটি অবস্থিত , দুই বা ততোধিক সম্ভ্রান্ত অধিবাসিকে ( যাদের মধ্যে কমপক্ষে একজন স্ত্রীলোক হবেন) তল্লাসীতে উপস্থিত থেকে সাক্ষী হওয়ার জন্য ডাকবেন এবং ঐরূপ করতে তিনি তাদের বা তাদের কেউকে লিখিতভাবে আদেশও দিতে পারেন ঃ

শর্ত থাকে যে তল্লাস করা হবে এমন স্থানটি যে এলাকায় অবস্থিত সেই এলাকার সম্ভ্রান্ত অধিবাসিগণের সম্বন্ধে এই ধারার ফরমাশটি তল্লাসীতে উপস্থিত থেকে সাক্ষী হওয়ার জন্য ফরমায়েশিত স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না ।

(৩) কোন ব্যক্তি , যে এই ধারার আওতায় তল্লাসীতে উপস্থিত হয়ে তার সাক্ষী হতে সেই পরিস্থিতিতে - যে পরিস্থিতিতে ঐরূপ করার জন্য তাকে লিখিত আদেশ দেওয়া হয়েছিল , যথাযথ কারণ ছাড়া অস্বীকার করে বা উপেক্ষা করে , সে ভারতীয় দন্ড বিধির ১৮৭ ধারার আওতায় দন্ডনীয় অপরাধ করেছে বলে মনে করা হবে।

(৪) উপধারা(১) এর আওতায় কোন স্থানে প্রবেশকারী , বিশেষ পুলিশ অফিসার বা অনৈতিক নিন্দার্হ বৃত্তি সংক্রান্ত পুলিশ অফিসার , যেখানে যেমন হতে পারে , তথায় দেখতে পাওয়া সকল ব্যক্তিকে সেখঅন থেকে সরিয়ে দিতে হকদার হবেন।

(৫) বিশেষ পুলিশ অফিসার বা অনৈতিক নিন্দর্হ বৃত্তি সংক্রান্ত পুলিশ অফিসার , যেখানে যেমন হতে পারে , উপধারা (৪) এর আওতায় ব্যক্তিকে সরিয়ে দেওয়ার পর তাকে অবিলম্বে যথাযথ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে (মেট্রপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট , ১ম শ্রেণীর ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেট , জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে) পেশ করবেন ।

(৫-এ) কোন এরূপ ব্যক্তিকে , যাকে উপধারা (৫) এর আওতায় কোন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পেশ করা হয় , তার বয়স নির্ণয় করার প্রয়োজনে বা যৌন অপব্যবহারের পরিণতিতে তার হওয়া কোন ক্ষতির বা যৌনভাবে সঞ্চারিত কোন রোগের বিদ্যামানতার বিষয় জানার জন্য কোন রেজিস্ট্রীকৃত চিকিৎসক কর্তৃক পরীক্ষা করাতে হবে ।

ব্যাখা [ Explanation ] এই উপধারায় " রেজিস্ট্রীকৃত চিকিৎসক / ডাক্তার " বলতে ১৯৫৬ সালের ইন্ডয়ান মেডিকেল কাউন্সিল এ্যাক্টের (১৯৫৬ সালের ১০২ নং আইনে) যে অর্থ করা হয়েছে তাকেই বুঝতে হবে ।

(৬) বিশেষ পুলিশ অফিসার বা অনৈতিক নিন্দার্হ বৃত্তি সংক্রান্ত পুলিশ অফিসার, যেখানে

যেমন হতে পারে , এবং তল্লাসীতে অংশগ্রহনকারী বা হাজির হওয়া বা সাক্ষী হওয়া অন্য সকল ব্যক্তি ঐ তল্লাসীর সম্বন্ধে বা প্রয়োজনীয় আইনানুগ করা কোন কাজের কারণে কোন দেওয়ানি বা ফৌজদারী কার্যবাহে দায়ী হবে না ।

(৬-এ) এই ধারার আওতায় তল্লাসীকারী বিশেষ পুলিশ অফিসার বা অনৈতিক নিন্দার্হ বৃত্তি সংক্রান্ত পুলিশ অফিসারের সাথে , যেখানে যেমন হতে পারে , কমপক্ষে দুজন মহিলা পুলিশ অফিসার থাকবেন এবং যে ক্ষেত্রে উপধারা (৪) এর আওতায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া কোন মহিলা বা বালিকাকে জেরা করার প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে তার ঐরূপ কোন মহিলা পুলিশ অফিসারকে দিয়ে করাতে হবে এবং যদি কোন মহিলা পুলিশ অফিসারকে পাওয়া না যায় তবে কোন স্বীকৃত কল্যাণ প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের কোন মহিলা সদস্যের উপস্থিতিতেই কেবলমাত্র উক্ত জেরা করতে হবে ।

**ব্যাখা** [ Explanation ] - এই উপধারা এবং ১৭ -এ ধারার প্রয়োজনে " স্বীকৃত কল্যাণ প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন " বলতে সেরূপ প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনকে বুঝায় যা এই উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার কর্তৃক স্বীকৃত হয়ে থাকতে পারে ।

(৭) ১৯৭৩ সালের ফৌজদারী কার্যপ্রণালী বিধির (১৯৭৪ সালের ২ নং আইনের ) বিধানাদি এই ধারার আওতায় কোন তল্লাসীতে সেরূপভাবেই প্রযোজ্য হবে যেরূপে তা ঐ বিধির ৯৪ ধারার আওতায় জারি করা কোন ওয়ারেন্টের কর্তৃত্বের আওতায় করা কোন তল্লাসীতে প্রযোজ্য হয় ।

## মহিলাগণের অশোভন প্রতিমূর্তি প্রদর্শন (নিবারণী ) আইন , ১৯৮৬

বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে বা প্রকাশিত গ্রন্থাদিতে ,লিখনে , রঙিন চিত্রাঙ্কনে , নকশাতে বা অন্য কোনভাবে মহিলাগণের আশোভন প্রতিমূর্তি প্রদর্শন নিবারণ করতে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির জন্য একটি আইন

**১ ধারা** - সংক্ষিপ্ত নাম, বিস্তৃতি এবং আরম্ভ [ short title , extent and commencement ] (১) এই আইনকে ১০৮৬ সালের মহিলাগণের অশোভন প্রতিমূর্তি (নিবারণী) আইন বলা যেতে পারে ।

(২) জম্মু কাশ্মীর রাজ্য বাদ দিয়ে এই আইন ভারতবর্ষের সর্বত্র প্রযোজ্য ।

(৩) কেন্দ্রীয় সরকার, সরকারি রাজ্য গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে যেদিন থেকে ধার্য করে দিতে পারেন সেইদিন থেকে এই আইন কার্যকর হবে ।

**২ ধারা** - সংজ্ঞাদি [ definitions] - প্রসঙ্গ অন্য কিছু না বললে , এই আইনে -

(এ) " বিজ্ঞাপন (advertisement) বলতে যেকোন নোটিস , সারকুলার , লেবেল, মোড়ক বা অপরাপর দলিলও বুঝায় এবং আলো , শব্দ , ধোঁয়া বা গ্যাসের মাধ্যমে যে কোন দৃশ্যমান প্রতিমূর্তি প্রদর্শনকেও বুঝায় ।

(বি) " বিতরণ (distribution) বলতে বিনামূল্যে বা অন্যভাবে নমুনা বিতরণকেও বুঝায় ।

(সি) " মহিলাদিগের অশোভন প্রতিমূর্তি প্রদর্শন (indecent representation of women) " বলতে যেকোনভাবে কোন মহিলার চেহারা , তাঁর গঠন বা দেহ অথবা তাদের কোন অংশ এরূপভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খ অঙ্কন করা বুঝায় যা মহিলাগণকে অশোভন করে তোলার অথবা মহিলাগণের প্রতি হানিকর , বা কলঙ্ককর প্রভাব ফেলে থাকে , অথবা যা সম্ভবতঃ সার্বজনিক নৈতিকতা ,বা নৈতিক চরিত্র কলুষিত , বিকৃত বা ক্ষতি করবে ।

**৩ ধারা** - মহিলাগণের অশোভন প্রতিমূর্তি প্রদর্শিত থাকা বিজ্ঞাপনের নিষিদ্ধ করণ [ prohibition of advertisements containing indecent representation of women ] - মহিলাগণের অশোভন প্রতিমূর্তি কোনভাবে প্রদর্শিত থাকা কোন বিজ্ঞাপন কেউ জনসাধারণ্যে প্রকাশ করবেন না , বা তার সর্বসাধারণ্যে প্রকাশ বা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করবেন না বা তাতে অংশগ্রহন করবেন না ।

**৪ ধারা** - মহিলাগণের অশোভন প্রতিমূর্তি প্রদর্শিত থাকা গ্রন্থাদি , পুস্তিকা ইত্যাদির প্রকাশ বা ডাকের মাধ্যমে তা প্রেরণ করা নিষিদ্ধ [ prohibition of publication or sending by post of books , pamphlets etc.,containing indecent representention of women ] - কোন ব্যক্তি এরূপ কোন পুস্তক পুস্তিকা , কাগজ, স্লাইড , ফিল্ম , লিখন , অঙ্কন , রঙিন চিত্রাকন , আলোকচিত্র , দৃশ্যমান প্রতিমূর্তির উপস্থাপনা ,বা নকশা তৈরী করবেন না বা করাবেন না, বিক্রি করবেন না, ভাড়া দেবেন না , বিতরণ করবেন না , প্রচার করবেন না বা ডাকের মাধ্যমে পাঠাবেন না যার - মধ্যে মহিলাগণের অশোভন প্রতিমূর্তি কোনভাবে প্রদর্শিত করা থাকে ঃ
শর্ত থাকে যে , এই ধারার কোনকিছুই নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না -

(এ) কোন পুস্তক , পুস্তিকা , কাগজ , স্লাইড , ফিল্ম , লিখন , অঙ্কন , রঙিন , চিত্রাঙ্কন , আলোকচিত্র , দৃশ্যমান প্রতিমূর্তির উপস্থাপনা বা নকশা -

(ii) যার প্রকাশনা এই কারণে জনকল্যাণের খাতিরে যথার্থ প্রতিপন্ন হয় যে ঐরূপ পুস্তক পুস্তিকা , কাগজ , স্লাইড , ফিল্ম , লিখন , অঙ্কন , রঙিন চিত্রাঙ্কন, আলোকচিত্র , দৃশ্যমান প্রতিমূর্তির উপস্থাপনা বা নকশা - বিজ্ঞান , সাহিত্য , কলা অথবা শিক্ষা বা অপরাপর সাধারণে সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যের স্বার্থের অনুকূল ; বা

(i) যা ধর্মীয় কারণাদির জন্য খাঁটিভাবে রাখা বা ব্যবহৃত হয় ;

(বি) কোন দৃশ্যমান প্রতিমূর্তির উপস্থাপনার যা নিম্নলিখিতের উপরে বা ভিতরে ভাস্কর্যিত , খোদিত , রঙিন চিত্রায়িত বা অন্য কোনভাবে উপস্থাপিত আছে , যথা -

(ii) ১৯৫৮ সালের প্রাচীন মিনার ও প্রত্নতাত্ত্বিক জমি এবং ধ্বংসবশেষ আইনের অর্থে কোন

প্রাচীন মিনার ; বা

(ii) কোন মন্দির , বা উপাস্য দেবদেবীর পরিবহনের জন্য ব্যবহৃত , অথবা ধর্মীয় উদ্দেশ্যে রক্ষিত বা ব্যবহৃত কোনরথ;

(সি) কোন ফিল্ম যার সম্পর্কে ১৯৫২ সালের চলচিত্র গ্রহণ বা পরিদর্শন সম্বন্ধীয় আইনের দ্বিতীয় অংশের বিধানাদি প্রযোজ্য হয় ।

**৬ ধারা** - দন্ড [ Penalty ] কেউ ৩ ধারার বা ৪ ধারার বিধানাদি লঙ্ঘন করলে প্রথম দোষী সাব্যস্তের ক্ষেত্রে দুই বছর পর্যন্ত হতে পারে এরূপ কোন একটি মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ডে, এবং দুই হাজার টাকা পর্যন্ত হতে পারে এরূপ কোন একটি মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রমে কারাদন্ডে , এবং দুই হাজার টাকা পর্যন্ত হতে পারে এরূপ কোন অঙ্কের অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হবে , এবং দ্বিতীয় বা পরবর্তীবার দোষী সাব্যস্তের ক্ষেত্রে ছয়মাসের কম নয় কিন্তু পাঁচ বছর পর্যন্ত হতে পারে এরূপ কোন একটি মেয়াদের কারাদন্ডে এবং দশ হাজার টাকার কম নয় কিন্তু এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত হতে পারে এরূপ কোন অঙ্কের অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হবে ।

**৮ ধারা** - অপরাধাদি ধর্তব্য এবং জামিনযোগ্য হবে [ Offences to be cognizable and bailable ] - (১) ১৯৭৩ সালের ফৌজদারী কার্যপ্রণালী বিধিতে যাই বলা থাক না কেন, এই আইনের আওতায় দন্ডনীয় অপরাধ জামিনযোগ্য হবে ।

(২) এই আইনের আওতায় দন্ডনীয় অপরাধ ধর্তব্য অপরাধ হবে ।

## স্বামী বা স্বামীর আত্মীয়দের অত্যাচার সম্পর্কে

### of cruelty by Husband or relatives of husband

৪৯৮ এ ধারা - একজন স্ত্রীলোকের স্বামী বা স্বামীর আত্মীয় সেই স্ত্রীলোকের সাথে নিষ্ঠুর আচার আচরণ করলে [ Husband or relative of husband of a woman subjecting her to cruelty ] যদি কেউ , একজন স্ত্রীলোকের স্বামী বা স্বামীর আত্মীয় হয়ে সেই স্ত্রীলোকের সাথে নিষ্ঠুর আচার আচরণ করে , তবে সে তিন বছর পর্যন্ত হতে পারে এরূপ কোন একটি মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হবে এবং অর্থদন্ড দিতেও দায়ী হবে ।*( ধর্তব্য ও জামিন অযোগ্য অপরাধ)

**ব্যাখ্যা** ( Explanation ] এই ধারার অর্থে " নিষ্ঠুরতা " (cruelty) বলতে বুঝায় -

(এ) এরূপ ধরনের কোন ইচ্ছাকৃত আচরণ / ব্যবহার যা সম্ভবতঃ সেই স্ত্রীলোকের আত্মহত্যা করতে চালিত করবে কিম্বা সেই স্ত্রীলোকের জীবন , অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বা স্বাস্থ্যের (মানসিক হোক বা

দৈহিক হোক) গুরুতর ক্ষতি বা বিপদ ঘটাবে , অথবা

(বি) সেই মহিলাকে হয়রানি করা - যেক্ষেত্রে সেরূপ হয়রানি , সেই মহিলা বা সেই মহিলার সম্পর্কিত কোন ব্যক্তি - কোন সম্পত্তি নির্দশনপত্রর বেআইনি দাবি পূরণ করতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে, সেই মহিলাকে বা তার সম্পর্কিত কোন ব্যক্তিকে ঐরূপ দাবি মেটাতে বাধ্য করার জন্য করা হয় ।

আলোচনা

পণঘটিত বধু মৃত্যুর বিপদ থেকে সমাজকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে ১৯৮৩ সালের ৪৬ নং সংশোধন আইনে এই বিধানটি ভারতীয় দন্ড বিধিতে সংযোজন করা হয়েছে ।

**৫০৮ ধারা - ঐশ্বরিক ক্রোধে সমর্পণ করে দেওয়া হবে - কোন ব্যক্তি এরূপ বিশ্বাস করতে চালনা করে তাকে দিয়ে কোন কাজ করালে বা কোন কাজ করা থেকে বিরত করালে [ Act caused by inducing person to believe that he will be rendered an object of divine displeasure ]** স্বেচ্ছাকৃতভাবে যদি কেউ ,

কোন ব্যক্তি যে কাজ আইনত ঃ করতে বাধ্য নয় সেই কাজ তাকে দিয়ে করায় না করানো চেষ্টা করে , অথবা

কোন ব্যক্তি যে কাজ আইনত ঃ করার অধিকারী সেই কাজ করতে তাকে বিরত (omit) করানোর চেষ্টা করে ,

এবং তা যদি -

এরূপ বিশ্বাস করতে সেই ব্যক্তিকে চালিত করার বা চালিত করার চেষ্টার মাধ্যমে দিয়ে ( by inducing or attempting to induce that person) করে থাকে ,

যে সেই ব্যক্তি বা তার স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তিকে অপরাধীর কোন কাজের মাধ্যমে ঐশ্বরিক ক্রোধে সমর্পণ করে দেওয়া হবে (that he or any person in whom he is interested will be rendered by some act of the offender an object of Divine displeasure) যদি সে , যে কাজ তাকে দিয়ে করানোটা অপরাধীর লক্ষ্য সেই কাজ না করে , অথবা যে কাজটার থেকে তাকে বিরত করানোটা অপরাধীর লক্ষ্য সেই কাজ করে , তবে সেই অপরাধী এক বছর পর্যন্ত হতে পারে এরূপ কোন একটি মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ডে , অথবা অর্থদন্ডে, অথবা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডিত হবে ।

* (অধর্তব্য ও জামিনযোগ্য অপরাধ)

উদাহরণসকল [ Illustrations ]

(এ) এরূপ বিশ্বাস করানোর উদ্দেশ্যে A,Z দরজায় ধর্ণা দিল যেন ঐরূপ ধর্ণা দিয়ে সে ঐশ্বরিক ক্রোধে / কোপে Z কে সমর্পিত করেছে । A এই ধারায় বলা অপরাধ করেছে ।

(বি)A -Z কে ভয় দেখাল যে Z কোন এক নির্দিষ্ট কাজ না করলে A তার নিজের সন্তানদের মধ্যে থেকে একজনকে হত্যা করবে এবং তা এমন এক পরিস্থিতিতে যে এরূপ হত্যা z কে ঐশ্বরিক ক্রোধে/ কোপে সমর্পিত করাবে বলে বিশ্বাস হয় । A এই ধারায় বলা অপরাধ করেছে ।

**৫০৯ ধারা** - কোন স্ত্রীলোকের শালীনতা অমর্যাদা করার অভিপ্রায়ে কোন শব্দ , অঙ্গভঙ্গী বা কাজ করলে। [ word , gesture or act intended to insult the modsety of a woman ] - কেউ,

কোন স্ত্রীলোকের শালীনতা অমর্যাদা (to insult the modesty) করার অভিপ্রায়ে-

ঐ স্ত্রীলোক কোন শব্দ আওয়াজ শুনসত পারবে , অথবা কোন অঙ্গভঙ্গী বা সামগ্রী দেখতে পারবে এরূপ উদ্দেশ্যে যদি ঐরূপ কোন শব্দ (Word) উচ্চারণ করে , ঐরূপ কোন আওয়াজ বা অঙ্গভঙ্গী (sound or gesture) অথবা ঐরূপ কোন সামগ্রী প্রদর্শন করায় ।

অথবা ঐ স্ত্রীলোকের গোপনতায় যদি অনধিকার প্রবেশ (intrude upon the privacy od such woman) করে ,

তবে সেই ব্যক্তি এক বছর পর্যন্ত হতে পারে এরূপ কোন একটি মেয়াদের সাধারণ (বিনাশ্রম) কারাদন্ডে , তবা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডিত হবে ।

*( ধর্তব্য জামিনযোগ্য অপরাধ)

# পণপ্রথা নিবারণকারী আইন

**১ ধারা** - সংক্ষিপ্ত নাম , বিস্তৃতি এবং আরম্ভ [ Short title , extent and commence-ment ] - (১) এই আইনকে ১৯৬১ সালের পণপ্রথা নিবারণকারী আইন বলা যেতে পারে ।

(২) এই আনি 'জম্বু ও কাশ্মীর ' রাজ্য বাদ দিয়ে ভারতবর্ষের সর্বত্র প্রযোজ্য ।

**২ ধারা** - পণের সংজ্ঞা [Definition of 'Dowry "] - এই আইনে ' পণ [ Dowry ] বলতে বুঝায় এমন কোন স স্পত্তি বা মুল্যবান দলিল (সম্পত্তি নিদর্শনপত্র যা -

(এ) বিবাহের এক পক্ষ বিবাহের অন্য পক্ষকে বা

(বি) বিবাহোর যে কোন পক্ষের পিতামাতা বা অন্য কোন ব্যক্তি , বিবাহের যে কোন পক্ষকে বা অন্য কোন ব্যক্তিকে-

বিবাহের সময় বা বিবাহের পূর্বে বা বিবাহের পরে যেকোন সময়ে , উক্ত পক্ষদের বিবাহের সম্পর্কে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দেয় বা দিতে সম্মত হয় । কিন্তু যে সকল ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে মুসলিম ব্যক্তিগত আইন (শরিয়ত) প্রযোজ্য হয় সেই সকল ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে স্ত্রীধন (Dower) বা মেহর (mehr) 'পণ' নয় ।

**১ নং ব্যাখা** [ Explanation ] ১৯৮৪ সালের পণপ্রথা নিবারণকারী (সংশোধন ) আইনে

(১৯৮৪ সালের ৬৩ নং আইনে ) বাতিল হয়েছে ।

**২নং ব্যাখা** [ Explanation ] ভারতীয় দন্ড বিধির ৩০ ধারায় মূল্যবান দলিল/ সম্পত্তি নিদর্শনপত্র' বলতে যে অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে এক্ষেত্রেও সেই অর্থই বুঝতে হবে।

**৩ ধারা - পণ দেওয়া বা নেওয়ার জন্য দন্ড** [ penalty for giving or taking dowry ] - (১) এই আইন চালু হওয়ার পরে যদি কোন ব্যক্তি পণ দেয় বা নেয় কিম্বা পণ দিতে বা নিতে প্ররোচনা দেয় তবে সেই ব্যক্তি পাঁচ বছরের কম নয় এরূপ কোন একটি মেয়াদের কারাদন্ডে এবং ১৫ হাজার টাকার কম নয় এরূপ অথদন্ডে বা পণের যে মূল্য হবে তার সমমুল্যের অর্থদন্ডে (যেটি বেশী হবে) দন্ডিত হবে ঃ

শর্ত থাকে যে আদালত , যথেষ্ঠ এবং বিশেষ কারণে যা রায়ে উল্লেখ করতে হবে , পাঁচ বছরের কম মেয়াদের কোন কারাদন্ড দিতে পারেন।

(২) উপধারা (১) এর কোন কিছুই নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না -

(এ) বিবাহের সময় অনেকে যে উপহার সামগ্রী দেওয়া হয় (যদি সেই উদ্দেহ্যে কোন দাবি না করা হয়ে থাকে )ঃ

শর্ত থাকে যে , এই আইনের আওতায় তৈরী করা নিয়মবিধি অনুসারে রাখা তালিকায় উক্ত উপহার সামগ্রী অন্তভুর্ক্ত করে রাখা হয়েছে ।

(বি) বিবাহের সময় বরকে যে উপহার সামগ্রী দেওয়া হয় (যদি সেই উদ্দেশ্যে কোন দাবি না করা হয়ে থাকে)ঃ

শর্ত থাকে যে , এই আইনের আওতায় তৈরী করা নিয়মবিধি অনুসারে রাখা তালিকায় উক্ত উপহার সামগ্রী অন্তভুর্ক্ত করে রাখা হয়েছে ।

আরও শর্ত থাকে যে সেই উপহার সামগ্রী যেক্ষেত্রে কনে বা কনের পক্ষ হয়ে কেউ বা তার আত্মীয় স্বজন দেয় , সেক্ষেত্রে উক্ত উপহার সামগ্রী প্রথাগত ধরনের হবে এবং তার আর্থিকমূল্য সেই উপহার সামগ্রী দাতা বা যার পক্ষ হয়ে তা দেওয়া হয়েছে তার আর্থিক সঙ্গতির অতিরিক্ত হবে না ।

**৪ ধারা - পণ দাবি করার জন্য দন্ড** [ Penalty for demanding ] যদি কোন ব্যক্তি , কনে বা বরের পিতামাতা বা অন্য কোন আত্মীয়স্বজন বা অভিভাবকের কাছ থেকে , যেক্ষেত্রে যেরূপ হতে পারে , কোন পণ দাবি করে , তবে তার ছয় মাসের কম নয় কিন্তু দুই বছর পর্যন্ত হতে পারে এরূপ কোন একটি মেয়াদের কারাদন্ড এবং দশ হাজার টাকা পর্যন্ত হতে পারে এরূপ অর্থদন্ড হবেঃ

শর্ত থাকে যে , আদালত যথেষ্ঠ এবং বিশেষ কারণে যা আদালতের রায়ে উল্লেখ করতে হবে,ছয় মাসের কম এমন কোন মেয়াদের কারাদন্ড দিতে পারেন ।

**৪-এ ধারা** - বিজ্ঞাপন দেওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা [ Ban on advertisement ] যদি কোন ব্যক্তি

(এ) তার পুত্র বা কন্যা বা অন্যকোন আত্মীয়স্বজনের বিবাহের প্রতিদানে তার সম্পত্তির কোন অংশ বা কোন টাকা পয়সা অথবা কোন ব্যবসায়ের অংশ বা অপরাপর স্বার্থাদি দেওয়ার প্রস্তাব দিয়ে কোন সংবাদপত্র , সাময়িক , জার্নাল বা অন্য কোন মাধ্যমে কোন বিজ্ঞাপন দেয় ,

(বি) উপরোক্ত কোন বিজ্ঞাপন মুদ্রণ করে বা সর্বসাধারণ্যে প্রকাশ করে বা প্রচার করে ,

তবে সেই ব্যক্তি ছয় মাসের কম নয় কিন্তু পাঁচ বছর পর্যন্ত হতে পারে এরূপ কোন একটি মেয়াদের কারাদন্ডে দন্ডিত হবে , অথবা ১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত হতে পারে এরূপ অর্থদন্ডে দন্ডিত হবে ঃ

শর্ত থাকে যে আদালত, যথেষ্ঠ এবং বিশেষ কারণে যা আদালতের রায়ের উল্লেখ করতে হবে, ছয় মাসের কম এরূপ কোন মেয়াদের কারাদন্ড দিতে পারেন ।

**৫ ধারা** - পণ দেওয়া বা নেওয়ার জন্য করা চুক্তি অপ্রযোজ্য হবে । [ Agreement for giving or taking dowry to be void ] পণ দেওয়া বা নেওয়ার জন্য করা যেকোন চুক্তি কার্যকর করা যাবে না অর্থাৎ তা বাতিল হয়ে যাবে।

**৬ - ধারা** - পণ স্ত্রীর বা তার উত্তরাধিকারীর উপকারার্থের জন্য হবে । [ dowry to be for the benefit of the wife or her heires ] (১) যেক্ষেত্র কোন পণ বিবাহের সম্পর্কিত স্ত্রীলোক বাদ দিয়ে অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত হয়, সেক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট স্ত্রীলোকের কাছে উক্ত পণ হস্তান্তর করবেন।

(এ) যদি উক্ত পণ বিবাহের পূর্বে গৃহীত হয়ে থাকে তবে,বিবাহের তারিখের পর তিন মাসের মধ্যে বা

(বি) যদি উক্ত পণ বিবাহের সময় বা বিবাহের পর গৃহীত হয়ে থাকে তবে উক্ত পণ প্রাপ্ত হওয়ার তারিখের পর তিন মাসের মধ্যে , বা

(সি) যদি উক্ত পণ সংশ্লিষ্ট স্ত্রীলোক নাবালিকা থাকা অবস্থায় গৃহীত হয়ে থাকে তবে উক্ত স্ত্রীলোকের বয়স ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার পর তিন মাসের মধ্যে এবং যতদিন না উক্তরূপ হস্তান্তর করা হচ্ছে ততদিন তিনি উক্ত পণ সংশ্লিষ্ট স্ত্রীলোকের উপকারার্থে ট্রাস্টে রেখে দেবেন ।

(২) যদি কোন ব্যক্তি (১) নং উপধারাতে বলা সময়ের মধ্যে বা (৩) নং উপধারাতে বলা মতো সেই ধরনের কোন সম্পতিত্ত হস্তান্তর না করে , তবে সে কমপক্ষে ছয় মাসের এবং সর্বাধিক দুই বছরের কারাদন্ডে , অথবা কমপক্ষে পাঁচ হাজার টাকা এবং সর্বাধিক দশ হাজার টাকা অর্থদন্ডে অথবা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডিত হবে।

(৩) যেক্ষেত্রে উপধারা (১) এর আওতায় সম্পত্তি পাওয়ার অধিকারিণীর সম্পত্তি পাওয়ার আগেই মৃত্যু হয় সেক্ষেত্রে তার সকল উত্তরাধিকারী সেই সম্পত্তি দাবি করতে অধিকারী হবে ঃ

শর্ত থাকে যে সেই মহিলার যদি বিবাহের সাত বছরের মধ্যে স্বাভাবিক কারণ ছাড়া অন্য কোন কারণে মৃত্যু হয় তবে সেই সম্পত্তি নিম্নলিখিত ভাবে হস্তান্তরিত হবে -

(এ) সেই মহিলার যদি সন্তান সন্ততি না থাকে তবে তা সেই মহিলার মা - বাবার কাঝে হস্তান্তরিত হবে , - বা ,

(বি) সেই মহিলার যদি সন্তান সন্ততি থাকে তবে তা এ সন্তান সন্ততির কাছে হস্তান্তরিত হবে এবং যতদিন হস্তান্তরিত না হচ্ছে ততদিন তা সন্তান সন্ততির নামে ট্রাস্টে থাকবে ।

(৩-এ) যে ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি উপধারা (১) বা (৩) - এ বলা মতো কোন সম্পত্তি হস্তান্তর করতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য উপধারা (২) এর আওতায় দোষী সাব্যস্ত হয় , সেক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পূর্বে , উক্ত সম্পত্তি পাওয়ার অধিকারিণী মহিলাকে বা তার উত্তরাধিকারী , পিতামাতা বা সন্তান সন্ততিকে , যেখানে যেরূপ প্রযোজ্য উক্ত হস্তান্তরিত না করে থাকলে , আদালত উক্ত উপধারার আওতায় দন্ড দেওয়ার অতিরিক্ত , লিখিত আদেশ দিয়ে আদেশে বলা সময়ের মধ্যে উক্ত মহিলাকে বা তার উত্তরাধিকারী , পিতামাতা বা সন্তান সন্ততিকে , যেখানে যেরূপ প্রযোজ্য , উক্ত সম্পত্তি হস্তান্তর করতে বলবেন , এবং উক্ত ব্যক্তি যথা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঐ নির্দেশ পালন করতে ব্যর্থ হলে , উক্ত সম্পত্তির সমমূল্য উক্ত আদালত কর্তৃক আরোপ করা অর্থদন্ড হিসাবে তার থেকে আদায় করা যেতে পারে , এবং তা উক্ত মহিলা বা তার উত্তরাধিকারী , পিতামাতা বা সন্তান সন্ততিকে যেখানে যেরূপ প্রযোজ্য হবে দেওয়া যেতে পারে ।

(৪) এই ধারার কোন কিছুই ৩ বা ৪ ধারার বিধানকে প্রভাবিত করবে না ।

**৭ ধারা** - অপরাধের গ্রাহ্যকরণ [ Cognizance of offences ] সালের ফৌজদারী পার্যপ্রণালী বিধিতে যাই বলা থাক না কেন-

(এ) মেট্রপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা ১ম শ্রেণীর ন্যায়- ম্যাজিস্ট্রেটের নিম্ন কোন আদালত এই আইনের কোন অপরাধ বিচার করবেন না ,

(বি) এই আইনের কোন অপরাধ কোন আদালত গ্রাহ্য করবেন না অর্থাৎ বিচারার্থ গ্রহণ করবেন না যদি-

(i) সেই আদালত নিজের জ্ঞানে বা পুলিশ রিপোর্টে সেই অপরাধের সম্বন্ধে জানতে না পারেন, বা

(ii) অপরাধের ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি বা তার পিতামাতা বা অন্যান্য জ্ঞাতি কুটুম বা ান্য কোন হিতারী সংস্থা বা সংগঠন এই সম্বন্ধে নালিশ না জানায় ।

(সি) এই আইনের কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত যেকোন ব্যক্তিকে মেট্রপলিটন ম্যাজিষ্ট্রেট বা ১ম শ্রেণীর ন্যায় - ম্যাজিস্ট্রেট এই আইনে অনুমোদিত যেকোন দন্ড দিতে আইনানুগ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ।

(২) ১৯৭৩ সালের ফৌজদারী কার্যপ্রণালী বিধির ৩৬ অধ্যায়ের বিধানের কোন কিছুই এই আইনের আওতায় দন্ডযোগ্য কোন অপরাধে প্রযোজ্য হবে না ।

(৩) বর্তমানে চালু যেকোন আইনে যাই বলা থাক না কেন এই আইনের অপরাধে ক্ষতিগ্রস্থ কোন ব্যক্তির বিবৃতি কোন ব্যক্তিকে এই আইনের আওতায় মামলায় ফেলবে না ।

।। আলোচনা ।।

পঃবঃ রাজ্য সরকার এই আইনের ৭ ধারার (বি) উপধারার (ii) উপাংশের অর্থে নিম্নলিখিত সংস্থা বা সংগঠনগুলিকে হিতকারী সংস্থা বা সংগঠন বলে ঘোষণা করে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছেন [ Notification No . 225-6-SW/DPA - I.88dt. 22.5.1989 - published in the calcutta Gazette extraordinary . part 1 . No. 347dt. 9th June , 1989 ] যেমন-

(১) অল ইন্ডিয়াওমেন্স কনফারেন্স - ৮ বেথুন রোড , কলিকাতা - ৬

(২) নব দিগন্ত , ৩৮ চ্যাটার্জী পাড়া রোড , সরশুনা , কলিকাতা - ৬১

(৩) সারভিস টু দি হিউম্যানিটি , দমদম ।

(৪) বিকাশ ভারতী ওয়েলফেয়ার সোসাইটি , বিশালগড় , পোও শালবনী , ঝাড়গ্রাম জেঃ মেদিনীপুর ।

(৫) নিবেদিতা গ্রামীণ কর্মমন্দির , মানিক পাড়া , পোঃ মানিক পাড়া , জেঃ মেদিনীপুর ।

(৬) রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশন , ৭, রিভারসাইড রোড , ব্যারাকপুর , ২৪ পরগনা (উত্তর)

(৭)বালুরঘাট সোসাল ওয়েলফেয়ার অরগানাইজেশান , পোঃ বালুরঘাট জেঃ পশ্চিম দিনাজপুর। বর্তমানে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা ।

(৮) টেগর সোসাইটি ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট , ১৪ ক্ষুদিরাম বোস রোড, কলি - ৬

(৯) নিখিল বঙ্গ মহিলা সঙ্ঘ , ১২৪ সি, লেলিন সরণি , কলি - ১৩

(১০) পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি , ৩৩, আলিমুদ্দিন ষ্ট্রীট , কলিকাকা - ১৬

(১১) পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতি , ১৮৮ /২ বি.বি গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট , কলিকাতা - ১২

(১২) অগ্রগামী মহিলা সঙ্ঘ , হেমন্ত বসু ভবন , ৫২/৭ বি.বি গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট , কলি -১২

(১৩) পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কংগ্রেস , ২, হাজি মহম্মদ মহসিন স্কোয়ার , কলিকাতা ।

**৮ ধারা** - বিশেষ কিছু উদ্দেশ্যে অপরাধাদি কর্তব্য হবে এবং জামিনযোগ্য এবং রফা অযোগ্য হবে ।[ Offences to be cognizable for certain purposes and to be bailable and non- compoundable ] - (১) নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে এই আইনের অপরাধগুলিতে ১৯৭৩

সালের ফৌজদারী কার্যপ্রণালী বিধি প্রযোজ্য হবে যেন সেই অপরাধগুলি ধর্তব্য অপরাধ -

(এ) সেরূপ অপরাধ সমূহের তদন্তের উদ্দেশ্যে , এবং

(বি) (i) ফৌঃ কাঃ প্রঃ বিধির ৪২ ধারায় বলা বিষয় বাদ দিয়ে এবং

(ii) বিনা ওয়ারেন্টে বা ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ছাড়া গ্রেপ্তার করার বিষয়টি বাদ দিয়ে অন্যান্য বিষয়ের উদ্দেশ্যে;

(২) এই আইনের প্রত্যেকটি অপরাধ জামিনযোগ্য এবং রফা অযোগ্য হবে ।

**৮ - এ ধারা** - প্রমাণের দায়িত্ব [ Burden of proof ] যেক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি পণ নেওয়া বা নেওয়ার প্ররোচনা দেওয়ার কারণে এই আইনের ৩ ধারাতে অভিযুক্ত হয় , অথবা পণ দাবি করার কারণে এই আইনের ৪ ধারাতে অভিযুক্ত হয় সেক্ষেত্রে সে যে অপরাধ করেনি এটা প্রমাণ করার দায়িত্ব ও তার উপরেই বর্তায় ।

**৮ - বি ধারা** - পণপ্রথা নিবারণকারী অফিসার [ Dowry prohibition officers ] রাজ্য সরকার যেরূপ প্রয়োজন মনে করবেন সেরূপ সংখ্যক পণপ্রথা নিবারণকারী অফিসার নিয়োগ করতে পারেন এবং এই আইনে দেওয়া তাঁদের ক্ষমতা তাঁরা যে এলাকায় প্রয়োগ করবেন তা স্থির করে দেবেন ।

(২) প্রত্যেক পণপ্রথা নিবারণকারী অফিসার নিম্নলিখিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে কাজ কর্ম করবেন , যেমন -

(এ) এই আইনের বিধানসমূহ মেনে চলা হচ্ছে কিনা তা দেখবেন ,

(বি) পণ নেওয়া বা নেওয়ার প্ররোচনা দেওয়া বা পণ দাবি করা যতদূর সম্ভব নিবারণ করবেন

(সি) এই আইনের অপরাধীদের অভিযুক্ত করতে যেসকল প্রমাণাদি প্রয়োজন সেইগুলি সংগ্রহ করবেন , এবং

(ডি) রাজ্য সরকার যে সকল অতিরিক্ত কর্তব্যকাজ করতে দেবেন বা যে কর্তব্যকাজ সমূহ এই আইনের আওতায় তৈরী বিধিনিয়মে করতে বলা হবে সেগুলি করবেন ।

(৩) রাজ্য সরকার সরকারি গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে পণপ্রথা নিবারণকারী অফিসারদের বিজ্ঞপ্তিতে বলে দেওয়া পুলিশ অফিসারের কিছু ক্ষমতা অর্পণ করতে পারেন এবং পণপ্রথা নিবারণকারী অফিসারগণ এই আইনের বিধি বিধানের শর্তাদির মধ্যে থেকে সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন ।

(৪) পণপ্রথা নিবারণকারী অফিসারগণ যাতে দক্ষভাবে এই আইনের আওতায় কাজকর্ম করতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে উপদেশ ও সহায়তা দিতে রাজ্য সরকার একটি এড্‌ভাইসরি বোর্ড গঠন করতে পারেন ।

# সতীদাহ (প্রতিরোধক ) আইন , ১৯৮৭

সতীদাহ এবং তা: মহিমা প্রচার এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি অধিক কার্যকরভাবে প্রতিরোধ করার জন্য একটি আইন

## প্রারম্ভিক

**১ ধারা** - সংক্ষিপ্ত নাম , বিস্তৃতি এবং আরম্ভ [ Short title , extent and commencement ] (১) এই আইনকে ১৯৮৭ সালের সতীদাহ (প্রতিরোধক) আইন বলা যেতে পারে।

(২) জম্মু - কাশ্মীর রাজ্য বাদ দিয়ে এই আইন ভারতবর্ষের সর্বত্র প্রযোজ্য ।

(৩) এই আইন কোন রাজ্য সেইদিন থেকে কার্যকর হবে যেদিন থেকে তা কার্যকর হবে বলে কেন্দ্রীয় সরকার সরকারি গেজেটে বিজ্ঞপ্তি মারফৎ ধার্য করে দিতে পারেন এবং বিভিন্ন রাজ্যের জন্য বিভিন্ন দিন ধার্য হতে পারে ।

**২ধারা** - সংজ্ঞাদি [ Definitions] প্রসঙ্গ থেকে বিরুদ্ধ কিছু প্রতীয়মান না বা হলে , এই আইনে-

(এ) " বিধি (Code) " বলতে ১৯৭৩ সালের ফৌজদারী কার্যপ্রণালী বিধিকে (১৯৭৪সালের ২ নং আইনকে ) বুঝাবে ।

(বি) সতী সম্পর্কে, তা এই আইন চালু হওয়ার পূর্বে বা পরে যখনই হোক , "মহিমা প্রচার (glorification) " বলতে অন্যান্য বিষয়ের সাথে নিম্নলিখিতগুলি অন্তর্ভুক্ত -

(i) সতী সম্পাদন সম্পর্কে কোন শোভাযাত্রা বের করা বা কোন অনুষ্ঠান পালন করা , বা

(ii) যেকোন পদ্ধতিতে সতীদাহ প্রথার সমর্থন করা, ন্যায্যতা প্রতিপাদন করা বা জনে জনে প্রচার করা , বা

(iii) যে সতী হয়েছেন সেই ব্যক্তির প্রশংসা করতে কোন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা, বা

(iv) যে সতী হয়েছেন সেই ব্যক্তির সম্মান চিরস্থায়ী করতে বা, তার স্মৃতি সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্যে ট্রাষ্ট তৈরী করা , বা অর্থ সংগ্রহ করা , অথবা কোন মন্দির বা কোন কাঠামো তৈরী করা বা তথায় কোন ধরনের পূজা বা কোন অনুষ্ঠান সম্পাদন করা ।

(সি) " সতী (Sati)" (i) কোন বিধবাকে তার মৃত স্বামীর বা অন্য কোন আত্মীয়ের দেহ সহ অথবা সেই স্বামীর বা আত্মীয়ের সহিত সংশিষ্ট কোন দ্রব্য , সামগ্রী বা অন্য কোন জিনিসের সাথে জীবন্ত দাহ করা বা সমাধি দেওয়া ; বা

(ii) কোন মহিলাকে তার কোন আত্মীয়ের দেহ সহ জীবন্ত দাহ করা বা সমাধি দেওয়া ;

তা সেইরূপ দাহ বা সমাহিত করা কার্যটি উক্ত বিধবা মা মহিলা স্বেচ্ছায় চেয়ে থুকুন বা না

থাকুন ;

(ডি) বিশেষ আদালত (special court) ' - বলতে এই আইনের ৯ ধারায় গঠিত আদালকে বুঝায় ।

(ই) মন্দির (temple)' কথাটির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিও অন্তভুর্ক্ত , যেমন - যে ব্যক্তির সম্বন্ধে সতী সম্পাদিত হয়েছে সেই ব্যক্তির সমৃতি সংরক্ষণ করতে বা ঐরূপ সম্পাদন সম্পর্কে কোন ধরনের পূজা চালাতে বা কোন অনুষ্ঠান পালন করতে ব্যবহার হবে বা সেরূপ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে বানানো ছাদযুক্ত বা ছাদহীন যেকোন দালান বা অন্য কোন অবয়ব ।

## সতী সম্পর্কিত অপরাধাদির দন্ড

**৩ ধারা** - সতী সম্পাদন করার চেষ্টা [Attempt to commit sati] ভারতীয় দন্ড বিধিতে (১৮৬০ সালের ৪৫ নং আইনে) যাই বলা যাক না কেন , যদি সতী সম্পাদনের চেষ্টা করে এবং তা সম্পাদানার্থ কোন কাজ করে তবে সে একবছর পর্যন্ত হতে পারে এরূপ কোন মেয়াদের কারাদন্ডে বা অর্থদন্ডে বা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডনীয় হবে ঃ

শর্ত থাকে যে , এই ধারার আওয়াজ কোন অপরাধ বিচারকারী বিশেষ আদালত , কোন ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করার পূর্বে , যে পরিস্থিতি ঐ অপরাধ সম্পাদনে প্রবৃত্ত করে , যে কাজটি করা হয়েছে, কাজটি সম্পাদনের সময় অপরাধটিতে অভিযুক্ত ব্যক্তির মানসিক অবস্থা কী ছিল এবং অপরাপর প্রাসঙ্গিক উপাদানগুলি বিবেচনা করবেন ।

**৪ ধারা** - সতীদাহর প্ররোচনা [Abetment of sati] ভারতীয় দন্ড বিধিতে (১৮৬০ সালের ৪৫ নং আইনে ) যাই বলা থাক না কেন , যদি কোন ব্যক্তি সতী সম্পাদন করে তবে যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাকে প্ররোচনা দেয় , তারা মৃত্যুদন্ডে বা যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডনীয় হবে এবং অর্থদন্ড দিতেও দায়ী হবে ।

(২) যদি কোন ব্যক্তি সতী সম্পাদন করতে চেষ্টা করে , তবে যারা ঐ চেষ্টায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্ররোচনা দেয় , তারা যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডনীয় হবে এবং অর্থদন্ড দিতেও দায়ী হবে ।

ব্যাখা [ explanation ] - এই ধারার অর্থে নিম্নলিখিত কাজগুলির বা অনুরূপ কিছুর যে কোন কিছুকে প্ররোচনা বলে মনে করা হবে , যথা -

(এ) কোন বিধবা বা মহিলাকে তার মৃত স্বামীর বা অন্যকোন আত্মীয়ের দেহ সহ অথবা তার স্বামী বা উক্ত কোন আত্মীয়ের সংশ্লিষ্ট কোন দ্রব্য , সামগ্রী বা জিনিস সহ জীবন্ত দাহ বা সমাহিত হতে কোন প্ররোচনা , তা সেই বিধবা মহিলা মানসিক সুস্থ অবস্থায় থেকে থাকুক অথবা তার স্বাধীন ইচ্ছা

প্রয়োগে বাধাদানকারী মাদকে বা হতচেতনকারী দ্রব্যে বা অন্য কোন কারণে আচ্ছন্ন হয়ে থাকুক - যাই হোক না কেন,

(বি) কোন বিধবা বা মহিলাকে এরূপ বিশ্বাস করানো সে সতী সম্পাদিত হলে তা তার মৃত স্বামী বা আত্মীয়ের আধ্যাত্মিক মঙ্গল ঘটাবে বা তার পরিবারের সাধারণ ভাবে মঙ্গল ঘটাবে ,

(সি) কোন বিধবা বা মহিলাকে তার সতী হওয়ার সংকল্পে অবিচল থাকতে উৎসাহ দেওয়া এবং এইভাবে তাকে সতী হতে উসকানি দেওয়া ,

(ডি) সতী সম্পাদন সম্পর্কিত কোন শোভাযাত্রায় অংশগ্রহন করা অথবা বিধবা বা মহিলাকে তার মৃত স্বামী বা আত্মীয়ের দেহের সাথে শ্মশান বা সমাধিভূমিতে নিয়ে গিয়ে তার সতী হওয়ার সিদ্ধান্তে সহায়তা করা ,

(ই) সে স্থানে সতী সম্পাদিত হয় সেই স্থানে এ কাজে বা ঐ কাজের সম্পর্কিত কোন অনুষ্ঠানে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হিসাবে উপস্থিত থাকা ,

(এফ্) জীবন্ত দগ্ধ বা সমাহিত হওয়া থেকে বিধবা বা মহিলার বাঁচার প্রয়াসকে পতিহত বা বাধা দেওয়া।

(জি) সতী সম্পাদন প্রতিরোধ করতে পুলিশের কর্তব্য সম্পাদনে গৃহীত পদক্ষেপে বাধা বা হস্তক্ষেপ করা।

**৫ ধারা** - সতী মহিমান্বিত করার দন্ড [ Punishment for glorification of sati] - কেউ সতীর মহিমা প্রচার করতে কোন কাজ করলে এক বছরের কম নয় কিন্তু সাত বছর পর্যন্ত হতে পারে এরূপ কোন একটি মেয়াদের কারাদন্ডে এবং পাঁচ হাজার টাকার কম নয় কিন্তু ত্রিশ হাজার টাকা পর্যন্ত হতে পারে এরূপ কোন এক অঙ্কের অর্থদন্ডে দন্ডিত হবে ।

বিবিধ

**১৫ ধারা** - এই আইনের আওতায় গৃহীত পদক্ষেপের সুরক্ষা [ Pertection of action taken under this Act ] এই আইন বা আইনের আওতায় তৈরী নিয়মাবলী বা আদেশাদি অনুসারে সদ্‌ভাবে করা কোন কাজের জন্য রাজ্য সরকার বা রাজ্য সরকারের কোন অফিসার বা কতৃপক্ষের বিরুদ্ধে কোন মামলা , অভিযোজন বা অন্যান্য আইনি কার্যবাহ বর্তাবে না ।

**১৭ ধারা** - এই আইনের অপরাধ সংঘটনের বিষয়ে রিপোর্ট করতে নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তিগণের দায়বদ্ধতা [ Obligation of certain persons to report about the commission of offence under this Act] (১) সরকারের সকল অফিসারকে এতদ্বারা বলা হচ্ছে এবং ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে যে তাঁরা এই আইনের বা এই আইনের আওতায় তৈরী নিয়মাবলীর বা আদেশের বিধানদি কার্যকর করতে , পুলিশকে সহায়তা করবেন ।

(২) সকল গ্রামীণ অফিসার এবং কালেক্টর বা জেলা শাসক কর্তৃক যেরূপ ঘোষিত হতে পারে সেরূপ কোন অঞ্চল এবং অঞ্চলের অধিবাসিগণের সম্পর্কে অপরাপর অফিসাগণের , যদি এরূপ বিশ্বাস করার কারণ থাকে বা জানা থাকে যে ঐ অঞ্চলে সতী সম্পাদন হতে চলেছে বা হয়েছে তবে তারা অবিলম্বে নিকটবর্তী থানায় ঐ ঘটনা রিপোর্ট করবেন।

(৩) কেউ উপধারা (১) বা (২) এর বিধানাদি লঙ্ঘন করলে দুই বছর পর্যন্ত হতে পারে এরূপ কোন একটি মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হবে এবং অর্থদন্ড দিতেও দায়ী হবে ।

২৯২ ধারা - অশ্লীল বইপত্র বিক্রি , বন্টন ইত্যাদি করলে [ Sale etc . of obscene books etc.]

(১) এই ধারার (২) উপধারায় বলা বই , পুস্তিকা , কাগজ , লিপি (Writing) অঙ্কন (drawing) রঙিন চিত্রাঙ্কন (Painting) বর্ণনা (representation) নকশা ( figure) বা অপর কোন ইন্দ্রিয়গোচর বস্তুকে (lascivious) কে অশ্লীল বলে মনে করা হবে যদি তা কামোদ্দীপক ( prurient interest) হয় বা বিকৃত কামনায় নাড়া দেয় , অথবা এর প্রভাব (effect) যদি এরূপ হয় যে তারা তাতে দেওয়া বিষয় সম্ভবত ঃ পড়বে , দেখবে বা শুনবে তাদের নৈতিক চরিত্র কুলষিত হবার দিকে চালিত হবে ।

(২) কেউ , -

(এ) কোন অশ্লীল (obscene) বই পুস্তিকা , কাগজ , লিপি, অঙ্কন , রঙিন চিত্রাঙ্কন , বর্ণনা, নক্শা বা অপর কোন অশ্লীল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু বিক্রি করলে , ভাড়া দিলে , বিতরণ করলে , সর্বসাধারণ্যে প্রদর্শন করলে বা প্রচার করলে কিম্বা ঐ সমস্ত উদ্দেশ্যে তা তৈরী করলে , উৎপাদন করলে , অধিকারে রাখলে , অথবা

(বি) উপরোক্ত উদ্দেশ্যে , অথবা সেরূপ করা হবে এরূপ জেনে বা তা বিশ্বাস করারূ মত কারণ থাকা সত্ত্বেও কোন অশ্লীল বস্তু আমদানী , রপ্তানি করলে বা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পাঠালে, অথবা

(সি) যে ব্যবসায়ে থাকাকালীন জানতে পারে বা বিশ্বাস করার কারণ পায় সে ঐ ব্যবসায় উপরোক্ত কোন উদ্দেশ্যে ঐরূপ কোন অশ্লীল বস্তু ( obscene object) তৈরী করা হয় , উৎপাদন করা হয় , ক্রয় করা হয় , রাখা থাকে , আমদানি করা হয় , রপ্তানি করা হয় , এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পাঠানো হয় বা সর্বসাধারণ্যে প্রদর্শন করা হয় বা প্রচার করা হয় - সেই ব্যবসায়ে অংশগ্রহন করলে বা তার থেকে লাভ নিলে , অথবা

(ডি) এই ধারায় বলা কোন অপরাধজনক কাজে কোন ব্যক্তি নিযুক্ত বা নিযুক্ত হতে প্রস্তুত , অথবা ঐরূপ কোন অশ্লীল বস্তু (object) কোথা থেকে বা কোন ব্যক্তিদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা

যাবে তার সম্বন্ধে বিজ্ঞাপন দিলে বা অন্য কোন উপায়ে তা জানালে , অথবা

(ই) এই ধারায় বলা কোন অপরাধজনক কাজ করার প্রস্তাব দিলে বা তার চেষ্টা করলে , প্রথমবার দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় ক্ষেত্রে অনধিক দু'বছরের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ডে এবং অনধিক দু'হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত হবে এবং দ্বিতীয় এবং তার পরবর্তী সময় দোষী সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে অনধিক পাঁচ বছরের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ডে , এবং অনধিক পাঁচ হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত হবে ।

* ( ধর্তব্য ও জামিনযোগ্য অপরাধ)

ব্যতিক্রম (Exception) (১) কোন বই , পুস্তিকা ,কাগজ , লিপি , অঙ্কন রঙিন চিত্রাঙ্কন , বর্ণনা বা নকশা , - বিজ্ঞান , সাহিত্য , কলা (act) বা অপরাপর শিক্ষনীয় বিষয়ের স্বার্থে যথার্থ বলে প্রমাণিত হয়ে থাকলে এই ধারার অপরাধ হবে না।

২) কোন বই , পুস্তিকা ইত্যাদি ধর্মের খাতিরে সাধু (bonafide) উদ্দেশ্যে রাখা থাকলে বা ব্যবহৃত হলে এই ধারার অপরাধ হয় না ।

(৩) কোন বর্ণনা , ভাস্কর্য , যদি প্রাচীন মিনারে গাথা থাকে , চিত্রিত থাকে বা অন্য কোনভাবে বর্ণিত থাকে যা ১৯৫৮ সালের প্রাচীন মিনার এবং প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান বা ভগ্নস্তূপ আইনের অন্তগর্ত - তার ক্ষেত্রেও এই ধারার অপরাধ হয় না ।

*(৪) কোন বর্ণনা , ভাস্কর্য যদি কোন মন্দির বা দেবীমূর্তির গাড়ীতে (রথে) গাথা থাকে বা কোন* ধর্মীয় উদ্দেশ্যে রাখা থাকে বা ব্যবহৃত হয় - সেক্ষেত্রেও এই ধারার অপরাধ হয় না ।

**২৯৩ ধারা** - তরুন ব্যক্তিদের কাছে অশ্লীল বইপত্র বিক্রি করলে [ Sale etc , of obsceneobjects to young person ] কেউ , ২৯২ ধারায় বলা অশ্লীল বইপত্র ২০ বছরের কম বয়সী ব্যক্তিদের কাছে বিক্রি করলে , ভাড়া দিলে , বিতরণ করলে , প্রদর্শন করলে বা প্রচার করলে , অথবা সেরকম করার প্রস্তাব দিলে বা সেরকম করার চেষ্টা করলে ,প্রথমবাব দোষী সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে অনধিক তিন বছরের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ডে , এবং অনধিক দু'হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত হবে , এবং দ্বিতীয়বার বা পরবর্তী দোষী সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে অনধিক সাত বছরের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ডে , এবং অনধিক পাঁচ হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত হবে ।

*( ধর্তব্য ও জামিনযোগ্য অপরাধ)

**২৯৪ ধারা** - অশ্লীল কাজ ও গান করলে [ Obscene acts and songs] কেউ , অপরের বিরক্তি উৎপাদন করে

(এ) কোন সর্বসাধারণের স্থানে (Public Place- এ) কোন অশ্লীল কাজ করলে , অথবা

(বি) কোন সর্বসাধারণের স্থানে (Public Place- এ) কোন অশ্লীল গান , গাঁথা গাইলে বা আবৃত্তি

করলে কিম্বা কোন অশ্লীল শব্দ উচ্চারণ করলে অনধিক তিন মাসের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ডে, বা অর্থদন্ডে বা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডিত হবে ।

* (ধর্তব্য ও জামিনযোগ্য অপরাধ)

মানুষ অপহরণ, বলপূর্বক মানুষ, দাসত্ব ও রেগারশ্রম সম্পের্কে
of Kidnapping Abduction, Slavery and Force Labour
(৩৫৯ ধারা থেকে ৩৭৪ ধারা)

**৩৫৯ ধারা** - মানুষ অপহরণ [ Kidnapping ] মানুষ অপহরণ দুই সরকারের

i) ভারতবর্ষ থেকে মানুষ অপহরণ [ Kidnapping from India ]

ii) আইনানুক অভিভাবকের হেফাজত থেকে মানুষ অপহরণ [ kidnapping from lawsent of that person]

**৩৬০ ধারা** - ভারতবর্ষ থেকে মানুষ অপহরণ [ kidnapping from India], যদি কেউ, অপর কোন ব্যক্তিকে, সেই ব্যক্তির সম্মতি ছাড়া (without the consent of that person),অথবা সেই ব্যক্তির পক্ষে আইনানুগ সম্মতি দিতে অধিকার প্রাপ্ত কোন ব্যক্তির সম্মতি ছাড়া, ভারতবর্ষের সীমানার বাইরে নিয়ে যায়, তবে ভারতবর্ষ থেকে ঐ ব্যক্তিকে (মানুষ) অপহরণ করা হয়েছে বলা হবে ।

**।। আলোচনা ।।**

এখানে অপহরণ করা মানুষের বয়সের কোন উল্লেখ নেই । অর্থাৎ ৩৬০ ধারা অনুসারে যেকোন বয়সের ভারতবর্ষ থেকে মানুষ অপহরণ করা হয়েছে বলা হবে ।

**৩৬১ ধারা** - আইনানুগ অভিভাবকের হেফাজত থেকে মানুষ অপহরণ [ kidnapping from lawful guardianship] যদি কেউ - ১৬ বছরের কম বয়সী কোন নাবালক, অথবা ১৮ বছরের কম বয়সী কোন নাবালিকা, অথ বা মানসিক বিকারগ্রস্থ কোন ব্যক্তিকে [ Person of unsound mind] কে তাদের আইনানুগ অভিভাবকের হেফাজত থেকে (out of the keeping of the lawful guardian of such minor or person of unsound mind) এরূপ অভিভাবকের সম্মতি ছাড়া, (takes) বা নিয়ে যেতে প্রলোভিত করে ( entices) তবে, আইনানুগ অভিভাবক হেফাজতে থেকে ঐরূপ নাবালক বা নাবালিকা বা মানসিক বিকারগ্রস্থ (unsound )ব্যক্তিকে অপহরণ করা হয়েছে বলা হবে ।

ব্যাখ্যা [Explanation ] এই ধারায় বলা " আইনানুগ অভিভাবক (lawful guardian) " বলতে এরূপ যেকোন ব্যক্তিকেই বুঝাবে যে ব্যক্তি ঐরূপ নাবালক বা নাবালিকা বা মানসিক বিকারগ্রস্থ ব্যক্তিকে হেফাজত রাখতে বা লালন পালন (care) করতে আইনানুগ দায়িত্ব পেয়েছেন ।

**ব্যতিক্রম ঃ** যে ব্যক্তি কোন অবৈধ শিশুর পিতা (father of an illegitimate child) বলে নিজেকে সদ্‌ভাবে (in good faith) বিশ্বাস করে অথবা যে ব্যক্তি ঐরূপ শিশুকে নিতে নিজেকে আইনানুগ অধিকারী (entitled to the lawful custody of such child ) বলে সদ্‌ভাবে বিশ্বাস করে - তাঁর ঐ শিশু সম্পর্কে এই ধারায় বলা কোন কাজের ক্ষেত্রে এই ধারা প্রযোজ্য হবে না, যদি না ঐ ব্যক্তি (পিতা ) কোন অমানবিক (immoral) বা বেআইনী উদ্দেশ্যে (unlawful purpose এ) ঐ কাজ করে থাকে ।

**৩৬২ ধারা** - বলপূর্বক বা ধোকা দিয়ে মানুষ হরণ (Abduction ) যদি কেউ , কোন ব্যক্তিকে বলপূর্বক (by force) কোন স্থান থেকে চলে যেতে বাধ্য করে ( compels any person to go from any place ) অথবা কোন ব্যক্তিকে কোনরূপ ধোকা দিয়ে ( by any deceitful means ) কোন স্থান থেকে চলে যেতে চালিত করে , তবে সে ঐ ব্যক্তিকে " বলপূর্বক ধোকা দিয়ে হরণ ( Abduction) করেছে বলা হবে ।

আলোচনা

**৩৬২ ধারা** - অনুসারে বলপূর্বক বা ধোকা দিয়ে মানুষ হরণ অর্থাৎ ( Abduction ) এর জন্য দুটি উপাদান (ingredient) অবশ্যই প্রয়োজন -

(i)বলপূর্বক বাধ্য করা বা ধোকা দিয়ে প্রলুব্ধ করা , এবং

(ii) এইরূপ বাধ্য করা বা প্রলব্ধ করার উদ্দেশ্যে অবশ্যই ঐ ব্যক্তিকে কোন স্থান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া ।

আমরা এখন , " মানুষ অপহরণ" এবং বলপূর্বক বা ধোকা দিয়ে মানুষ হরণ " অর্থাৎ kidnapping ও Abduction এর মধ্যে কি কি পার্থক্য বর্তমান তা বিবেচনা করব । kidnapping দুই প্রকারের -

1 ) kidnapping from India যা ৩৬০ ধারায় বলা আছে , এবং

2) kidnapping from lawful guardianship যা ৩৬১ ধারায় বলা আছে ।

সুতরাং kidnapping এর সাথে Abduction এর পার্থক্য দেখাতে গেলে উপরোক্ত দুই প্রকারের kidnapping এর কথা আমাদের স্মরণ রাখতে হবে ।

i) Abduction এর ক্ষেত্রে যেকোন বয়সের যেকোন প্রকার মানুষ অপহরণ হতে পারে । কিন্তু kidnapping from lawful guardianship এর ক্ষেত্রে নাবালক , নাবালিকা (minor) বা মানসিক বিকারগ্রস্থ ব্যক্তি অপহরণ হয়ে থাকতে হবে । আবার kidnapping from India- র ক্ষেত্রে যেকোন বয়সের অপহরণ হতে পারে ।

( ii) Abduction এর ক্ষেত্রে যে কোন জায়গা থেকে (from any place) অপহরণ

হতে পারে , কিন্তু Kidnapping from lawful guardianship এর ক্ষেত্রে আনিসম্মত অভিভাবকের হেফাজত থেকে (out of the keeping of the lawful guardian) অপহরণ হতে হবে ।আবার Kidnapping from India) র ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ থেকে (from India)ভারতের সীমানার বাইরে অপহরণ করে নিয়ে যেতে হবে।

ii) Abduction এর ক্ষেত্রে যে কোন জায়গা থেকে (from any place) অপহরণ হতে পারে , কিন্তু (Kidnapping from law guardianship -এর ক্ষেত্রে আইনসম্মত অভিভাবকের হেফাজত থেকে out of the keeping of the lawful guardian) অপহরণ হতে পারে । আবার , Kidnapping from India- র ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ থেকে from India ভারতের সীমানার বাইরে করে নিয়ে যেতে হবে।

ii) Kidnapping from lawful guardianship - এর ক্ষেত্রে অভিভাবকের সম্মতি ছাড়া (with out consent) অপহরণহয়ে থাকতে হবে - এখানে অপহৃত ব্যক্তির সম্মতির কোন মুল্য নেই । আবার (kidnapping from India - র ক্ষেত্রে অপহৃত ব্যক্তির বা তার পক্ষে আইনানুগ সম্মতি (consent) দিতে পারে এমন কোন ব্যক্তির সম্মতি ছাড়া (without consent) অপহরণ হয়ে থাকতে হবে । কিন্তু Abduction এর ক্ষেত্রে সম্মতি (consent) বিষয়টির কোন রকম উল্লেখ নেই ।

iv) Kidanpping from India অথবা Kidnapping from lawful guardianship এর ক্ষেত্রে বল প্রয়োগের (use of force - এর) কোন প্রশ্ন নেই । কিন্তু Abduction এর ক্ষেত্রে হয় বল প্রয়োগে বাধ্য করা হয় (by force compels ) নতুবা ধোকার মাধ্যমে প্রলুব্ধ (by deceitful means induces ) করা হয় ।

v) kidnapping দুই প্রকারের যে কোন এক প্রকারের হলেই তা নিজেই একটা অপরাধ (independent offence) । কিন্তু Abduction সেরকম নয় । Abduction এর সাথে ৩৬৪ থেকে ৩৬৯ ধারায় বলা উদ্দেশ্য জড়িয়ে থাকলেই তবে তা অপরাধ হবে ।

**৩৬৩ ধারা** - মানুষ অপহরণের দন্ড [ Punishment for Kidnapping ] যদি কেউ , ভারতবর্ষ থেকে বা আইনানুগ অভিভাবকের হেফাজত থেকে কোন ব্যক্তিকে অপহরণ করে (Kindnaps any person from India or from lawful guardianship] তবে তার অনধিক সাত বছরের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ড হবে , এবং সে অর্থদন্ড দিতেও দাযী হবে ।

* (ধর্তব্য ও জামিনযোগ্য অপরাধ)

**৩৬৩ এ ধারা** - ভিক্ষা করাবার উদ্দেশ্যে নাবালক অপহরণ করলে বা কোন নাবালকের অঙ্গহানী করলে [ Kidnapping or maiming a minor for purpose of begging ] (১) ভিক্ষায়

নিযুক্ত করাবার উদ্দেশ্যে বা তাতে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে যদি কেউ , - কোন নাবালক অপহরণ করে বা কোন নাবালকের আইনানুগ অভিভাবক না হয়ে ও ঐ নাবালকের হেফাজতে নেয় , তবে তার অনধিক দশবছরের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ড হবে , এবং সে অর্থদন্ড (fine) দিতে ও দায়ী হবে।

(২) যদি কেউ - কোন নাবালকের অঙ্গহানী করে (maims any minor )এবং এর পেছনে তার যদি উদ্দেশ্য থাকে ঐ নাবালককে ভিক্ষায় নিযুক্ত করা বা তাতে ব্যবহার করা তবে তার যাবজ্জীবন কারাদন্ড হবে , এবং সে অর্থদন্ড দিতেও দায়ী হবে ।

* (ধর্তব্য ও জামিন অযোগ্য অপরাধ)

৩) যেক্ষেত্রে কেউ কোন নাবালকের আইনানুগ অভিভাবক না হয়ে ঐ নাবালকের ভিক্ষায় নিযুক্ত করে বা তাতে ব্যবহার করে ( employs or uses such minor for the purposes of begging) সেক্ষেত্রে , বিরুদ্ধ কিছু প্রমাণিত না হলে ( Unless the countary is proved) এটা ধরে নেওয়া হবে যে ঐ ব্যক্তি ঐ নাবালিককে যাতে ভিক্ষায় নিযুক্ত করা যায় বা তাতে ব্যবহার করা যায় সেই উদ্দেশ্যে তাকে অপহরণ করেছিল বা হেফাজত নিয়েছিল ।

(৪) এই ধারায় -

(এ) ভিক্ষা (begging) বলতে বুঝায়

(i) গান ,নাচ , গণৎকারী (fortune - telling ), ছলচাতুরী কিংবা জিনিস পত্র বিক্রি বা অন্য কোন ছতায় সর্বসাধারণের কোন এক স্থানে (in a public place) ভিক্ষা ( alms) চাওয়া বা নেওয়া

ii) ভিক্ষা (alms) চাওয়া বা নেবার উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত জায়গায় ( private premises) এ প্রবেশ করা

(iii) ভিক্ষা (alms) নেওয়া বা আদায় করার উদ্দেশ্যে , নিজের কিম্বা অপর কোন ব্যক্তির বা কেনা পশুর (animal) এর কোন ফোড়া (sore) ,ঘা (wound) ক্ষত (injury) বিকলতা (dis-ease) বা কোন রোগ প্রদর্শন (expose or exhobit) করা ।

(iv) ভিক্ষা চাওয়া বা নেওয়ার উদ্দেশ্যে কোন নাবালকে ( minor - কে) প্রকাশ্যে হাজির করা

(v) নাবালক (minor) বলতে বুঝায় ।

i) পুরুষের ক্ষেত্রে - ১৬ বছরের কম বয়সী কোন পুরুষ ব্যক্তি ,

ii) স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে - ১৮ বছরের কম বয়সী কোন স্ত্রীলোক ব্যক্তি,

**৩৬৮ ধারা** - খুন করার উদ্দেশ্যে মানুষ অপহরণ কিম্বা বলপূর্বক বা ধোকা দিয়ে মানুষ হরণউ করলে [ Kidnapping or abducting in order to murder] - যদি কেউ , কোন ব্যক্তিকে

খুন (murder) করার উদ্দেশ্যে বা খুন হবার মত বিপদে যাতে তাকে ফেলে দেওয়া যায় (may be so disposed of as to be put in danger of being murder) এরূপ উদ্দেশ্য নিয়ে, সেই ব্যক্তিকে অপহরণ (kidnap) করে কিংবা বলপূর্বক বা ধোকা দিয়ে হরণ (Abduct) করে তবে তার যাবজ্জীবন কারাদন্ড (imprisonment for life) বা অনধিক দশ বছরের সশ্রম কারাদন্ড ( rigorious imprisonment for a term whish may extend to ten years) হবে , এবং সে অর্থদন্ড দিতেও দায়ী (and shall also be liable to fine) হবে ।

* ধর্তব্য ও জামিন অযোগ্য অপরাধ

উদাহরণসকল (Illustrations)

(এ) A, Z কে ভারতবর্ষ থেকে অপহরণ করলো । Z কে কোন দেবতার কাছে যাতে উৎসর্গ (may be sacrificed to an idol) করা যায় এরূপ উদ্দেশ্যে বা সম্ভবত ঃ সেরূপ হতে পারে এরূপ জেনেই A, Z কে অপহরণ করেছিল । এক্ষেত্রে A এই ধারায় অপরাধ করেছে।

(বি) B কে যাতে খুন করা যায় সেরূপ উদ্দেশ্য নিয়ে A , B কে তার বাড়ী থেকে বলপূর্বক বা প্রলুব্ধ করে বের করে নিয়ে এল। A এই ধারায় বলা অপরাধ করেছে।

[১]৩৬৪ -এ ধারা - মুক্তিপণ , ইত্যাদির জন্য মানুষ অপহরণ (kidnapping for ransom , etc) যদি কেউ , কোন ব্যক্তিকে অপহরণ (kidnap) অথবা বলপূর্বক বা ধোকা দিয়ে হরণ (abduct) করে কিম্বা উক্ত অপহরণ অথবা বলপূর্বক বা ধোকা দিয়ে হরণের পর কোন ব্যক্তিকে আটক অবস্থায় রাখে , এবং সরকারকে বা [২] ( যে কোন বিদেশী রাষ্ট্র বা আর্ন্তজাতিক আন্তঃ সরকারি সংস্থা ( internatonal inter- Governmental organisation) অথবা অন্য কোন ব্যক্তিকে ) কোন কাজ করতে বা কোন কাজ করা থেকে বিরত হতে অথবা কোন মুক্তিপণ দিতে বাধ্য করানোর উদ্দেশ্যে -

সেই ব্যক্তির মৃত্যু বা আঘাত ঘটানোর হুমকি দেয় , অথবা তার আচরণের মাধ্যামে এরূপ যথাযথ আশঙ্কার জন্ম দেয় যে সেই ব্যক্তির মৃত্যু বা আঘাত ঘটানো হতে পারে , অথবা সেই ব্যক্তির আঘাত বা মৃত্যু ঘটায় ,

তবে সে মৃত্যুদন্ডে , বা যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডনীয় হবে , এবং অর্থদন্ড দিতেও দায়ী হবে ।

* (ধর্তব্য ও জামিন অযোগ্য অপরাধ , এবং অপরাধটি দায়রা আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য )

**৩৬৫ ধারা** - গোপনে এবং অন্যায্যভাবে আটক করার উদ্দেশ্যে মানুষ অপহরণ কিম্বা বলপূর্বক বা ধোকা দিয়ে মানুষ হরণ করলে ( kidnapping or abducting with intent secretly and worngfully to confine person]) যদি কেউ কোন ব্যক্তিকে গোপনে এবং অন্যায্যভাবে আটক করে রাখার উদ্দেশ্যে সেই ব্যক্তিকে অপহরণ (kidnap) করে কিম্বা বলপূর্বক বা ধোকা দিয়ে হরণ (Abduct) করে , তবে তার অনধিক সাত বছরের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ড [ imprison-

ment of either description for a term which may extend to seven years ] হবে এবং সে অর্থদন্ড দিতেও দায়ী হবে ।

* (ধর্তব্য ও জামিন অযোগ্য অপরাধ)

**৩৬৬ ধারা** - বিবাহ ইত্যাদি , দেবার উদ্দেশ্যে স্ত্রীলোক অপহরণ কিম্বা বলপূর্বক বা ধোকা দিয়ে স্ত্রীলোক হরণ করলে (kindnapping abducting or inducing woman to compel her marriage , etc.] কোন স্ত্রীলোকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে (against her will ) কোন ব্যক্তির সাথে তাকে বিয়ে বসতে বাধ্য করানো এরূপ উদ্দেশ্যে , অথবা তাকে সম্ভবত ঃ সেরূপ বাধ্য করা হবে এরূপ জেনে , অথবা তাকে অবৈধ সহবাসে (illicit intercourse এ) লিপ্ত হতে বলপ্রয়োগ বা প্রলুব্ধ (force or seduce) করা যাবে এরূপ কারণে, অথবা তাকে সম্ভবত ঃ অবৈধ সহবাসে লিপ্ত করতে বলপ্রয়োগ বা প্রলুব্ধ করা হবে এরূপ জেনে , কেউ যদি , - ঐ স্ত্রীলোককে অপহরণ (kidnap) কিংবা বলপূর্বক বা ধোকা দিয়ে হরণ (abduct) করে , তবে ঐ অপহরণকারীর অনধিক দশ বছরের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ড হবে , এবং সে অর্থদন্ড দিতেও দায়ী হবে ।

এবং যদি কেউ - কোন স্ত্রীলোককে অপর কোন ব্যক্তির সাথে অবৈধ সহবাসে (illicit intercourse এ) লিপ্ত হতে বলপ্রয়োগে বা প্রলুব্ধ করা যেতে পারে এরূপ উদ্দেশ্যে , অথবা তাকে সম্ভবত ঃ ঐরূপ অবৈধ সহবাসে লিপ্ত করতে বলপ্রয়োগ বা প্রলুব্ধ করা হবে এরূপ জেনে ,

এই আইনে বলা 'অপরাধজনক ভীতি প্রদর্শনের ' ( criminal intimidation এর ) মাধ্যমে বা ক্ষমতার অপব্যবহার (abuse of authority ) বা অন্য কোন প্রকার বাধ্য করানোর পদ্ধতির [ any other method of compulsion এর ) মারফৎ ঐ স্ত্রীলোককে একস্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে প্রলুব্ধ করে , তবে সে উপরোক্ত একই দন্ডে দন্ডিত হবে ।

* ( ধর্তব্য ও জামিন অযোগ্য অপরাধ)

।। আলোচনা ।।

স্ত্রীলোকটি বিবাহিতাও হতে পারে আবার অবিবাহিতাও হতে পারে ।

**৩৬৬ এ ধারা** - নাবালিকা সংগ্রহ [ Proccuration of minor girl ] যদি কেউ , ১৮ বছরের কম বয়সী কোন নাবালিকাকে অপর কোন ব্যক্তির সাথে অবৈধ সহবাসে লিপ্ত হতে বলপ্রয়োগ বা প্রলুব্ধ করা যেতে পারে এরূপ উদ্দেশ্যে , অথবা তাকে সম্ভবতঃ ঐরূপ অবৈধ সহবাসে লিপ্ত করতে বলপ্রয়োগের বা প্রলুব্ধ করা হবে এরূপ জেনে , ঐ নাবালিকাকে একস্থান থেকে অন্য কোন স্থানে যেতে বা কোন কাজ করতে প্রবৃত্ত [ induce ] করে , তবে তার অনধিন দশ বছরের কারাদন্ড হবে , এবং সে অর্থদন্ড নিতেও দায়ী হবে ।

* ধর্তব্য ও জামিন অযোগ্য অপরাধ

**৩৬৬ - ধারা** - বিদেশ থেকে স্ত্রীলোক আমদানি করলে [ Importing of girl from foreign country ] অপর কোন ব্যক্তির সাথে অবৈধ সহবাসে লিপ্ত হতে বলপ্রয়োগ বা প্রলুব্ধ করা যেতে পারে এরূপ উদ্দেশ্যে , অথবা ঐরূপ অবৈধ সহবাসে সম্ভবতঃ লিপ্ত করতে বলপ্রয়োগ বা প্রলুব্ধ করা হবে এরূপ জেনে , কেউ যদি - ২১ বছরের কম বয়সী কোন স্ত্রীলোককে ভারতের বাইরের কোন দেশ থেকে কিম্বা 'জম্মু ও কাশ্মীর ' রাজ্য থেকে ভারতে আমদানি [ Import ] করে ; তবে তার অনধিক দশ বছরের কারাদন্ড হবে , এবং সে অর্থদন্ড দিতেও দায়ী হবে ।

* (ধর্তব্য ও জামিন অযোগ্য অপরাধ)

**৩৬৭ বি ধারা** - গুরুতর আঘাত করা বা দাসত্ব ইত্যাদি করানোর উদ্দেশ্যে মানুষ অপহরণ কিম্বা বলপূর্বক বা ধোকা দিয়ে মানুষ হরণ করলে [ Kidnapping or abducting in order to subject person to grievous hurt , slavery etc.] কোন ব্যক্তির গুরুতর আঘাত [ grievous hurt ] অথবা তাকে দিয়ে দাসত্ব [ slavery ] অথবা তাকে দিয়ে কোন ব্যক্তির অস্বাভাবিক যৌন বাসনা [ unnatural lust ] চরিতার্থ করানো যেতে পারে অথবা ঐ সমস্ত হবার মত বিপদে তাকে ফেলে দেওয়া যেতে পারে [ may be so disposed of as to be put in danger of being subjected to grievious hurt , or slavery or to the unnatural lust of any person ] এরূপ উদ্দেশ্য নিয়ে অথবা ঐ ব্যক্তিকে সম্ভবতঃ সেরূপ করা হবে এরূপ জেনে , যদি কউে - ঐ ব্যক্তিকে অপহরণ [ Kidnap ] করে কিংবা বলপূর্বক বা ধোকা দিয়ে হরণ [ abduct ] করে , তবে তার অনধিক দশ বছরের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ড হবে এবং সে অর্থদন্ড দিতেও দায়ী হবে ।

* (ধর্তব্য ও জামিন অযোগ্য অপরাধ)

**৩৬৮ ধারা** - অপহৃত ব্যক্তিকে অন্যায্যভাবে গোপন বা আটক করে রাখলে [ Wrongfully concealing or keeping in confinement , Kidnapped or abducted personal ] - কোন ব্যক্তিকে অপহরণ কিম্বা বলপূর্বক বা ধোকা দিয়ে হরণ [ kidnap or abduct ] করা হয়েছে এরূপ জেনে , কেউ যদি - ঐ অপহৃত ব্যক্তিকে অন্যায্যভাবে গোপন বা আটক করে [ wrongfully conceals pr confines ] রাখে , তবে সে যে উদ্দেশ্যে ঐরূপভাবে লুকিয়ে বা আটক করে রেখেছে , সেই একই উদ্দেশ্যে [ with same intention or knowledge or for the same purpose ] ঐ ব্যক্তিকে অপহরণ কিম্বা বলপূর্বক বা ধোকা দিয়ে হরণ [ Kidnap or abduct ] করলে সে যে দন্ড পেত এক্ষেত্রে ও সে সেই দন্ডই পাবে ।

* (ধর্তব্য ও জামিন অযোগ্য অপরাধ)

**৩৬৯ ধারা** - দশ বছরের কম বয়সী শিশুর কাছ থেকে অস্থাবর সম্পত্তি/ মামামাল চুরি করার উদ্দেশ্যে শিশুটি অপহরণ কিম্বা বলপূর্বক বা ধোকা দিয়ে হরণ করলে [ Kidnapping or ab-

ducting child under ten years with intet to steal from its person ] দশ বছরের কম বয়সী কোন শিশুর কাছ থেকে অসাধুভাবে [ Dishonestly ] কোন অস্থাবর সম্পত্তি [ Movable property ] নিয়ে নেবার উদ্দেশ্যে কেউ - ঐ শিশুটিকে অপহরণকিম্বা বলপূর্বক বা ধোকা দিয়ে হরণ [ kidnap or abduct ] করলে , সে অনধিক ৭তে বছরের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হবে এবং অর্থদন্ড দিতেও দায়ী হবে ।

* (ধর্তব্য ও জামিন অযোগ্য অপরাধ)

**৩৭০ ধারা** - ক্রীতদাস হিসাবে কোন ব্যক্তিকে কিনলে বা বেচলে [ Buying or disposing of any person as a slave ] যদি কেউ কোন ব্যক্তিকে ক্রীতদাস [ Slave ] হিসাবে আমদানি [ import ] রপ্তানি [export ] অপসারণ [ removes ] , ক্রয় , বিক্রয় বা হস্তান্তর [ dispose of ] করে অথবা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে [ against his will ] তাকে ক্রীতদাস হিসাবে স্বীকার করে [accepts ] গ্রহণ করে [ receives ] বা আটক [ detains] রাখে , তবে তার অনধিক সাত বছরের বা বিনাশ্রম কারাদন্ড হবে এবং সে অর্থদন্ড দিতেও দায়ী হবে ।

*(অর্ধতব্য ও জামিনযোগ্য অপরাধ)

**৩৭১ ধারা** - ক্রীতদাস নিয়ে স্বভাবজাতভাবে ব্যবসায় [ Habitual dealing in slaves ] যদি কেউ - স্বভাবজাতভাবে ক্রীতদাস আমদানি , রপ্তানি , অপসারণ , ক্রয় , বিক্রয় করে বা ক্রীতদাস নিয়ে ব্যবসায় করে তবে তার যাবজ্জীবন কারাদন্ড বা অনধিক দশ বছরের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ড হবে এবং সে অর্থদন্ড দিতেও দায়ী হবে ।

* (ধর্তব্য ও জামিন অযোগ্য অপরাধ)

**৩৭২ ধারা** - বেশ্যাবৃত্তি ইত্যাদির জন্য নাবালিকা বিক্রয় করলে [ Selling minor for purpose of prostitution ] ১৮ বছরের কম বয়সী কোন নাবালিকাকে [ any person under the age of eighteen years ] যে কোন বয়সে [ at any age] বেশ্যাবৃত্তি বা কোন ব্যক্তির সাথে অবৈধ সহবাসে [ illicit intercourse ] এ কিংবা কোন বেআইনী ও নীতিহীন কাজে [ for any unlawful and immoral purpose এ ] নিযুক্ত বা ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে , অথবা তাকে সম্ভবতঃ যেকোন বয়সে ঐরূপ কোন উদ্দেশ্যে ,নিযুক্ত বা ব্যবহার করা হবে বলে জেনে যদি কেউ , - ঐ নাবালিকাকে বিক্রি , ভাড়া অথবা অন্য কোন প্রকাররে হস্তান্তরিত করে , তবে তার অনধিক দশ বছরের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ড হবে , এবং সে অর্থদন্ড দিতেও দায়ী হবে ।

* (ধর্তব্য ও জামিন অযোগ্য অপরাধ)

**১নং ব্যাখা** [ Explanation - 1] যখন ১৮ বছরের কম বয়সী কোন স্ত্রীলোককে কোন বেশ্যা বা বেশ্যালয়ের [ brothel এর ]রক্ষক বা ম্যানাজারের কাছে বিক্রি করা , ভাড়া দেওয়া , অথবা অন্য

কোন প্রকারে হস্তান্তরিত করা হয় - তখন বিরুদ্ধ কিছু প্রমাণিত না হলে , যে ব্যক্তি ঐ স্ত্রীলোককে ঐরূপ হস্তান্তর করে তাকে ধরে নেওয়া হবে যে সেই ব্যক্তি , বেশ্যাবৃত্তির জন্য ব্যবহারের উদ্দেশ্যে , ঐ স্ত্রীলোককে হস্তান্তরিত করেছে ।

**২নং ব্যাখা** [ Explanation -2 ] এই ধারার উদ্দেশ্যে অবৈধ সহবাস বলতে বুঝায় - বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়নি এমন ব্যক্তিদের মধ্যে যৌন সংসর্গ , অথবা ঠিক বিবাহ নয় , কিন্তু ব্যক্তিরা যে সম্প্রদায়ের লোক সেই সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগত আইন [ personal law] বা প্রথা [ custom এর] স্বীকৃত কোন বন্ধনে [ union or tie তে] , অথবা যেক্ষেত্রে ব্যক্তিরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক সেক্ষেত্রে উভয় সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগত আইন প্রথায় স্বীকৃত বিবাহের সমপর্যায়ের বন্ধনে [ quasi - marital relation এ ] আবদ্ধ না হয়ে ঐ ব্যক্তিদের মধ্যে হওয়া যৌন সংসর্গ ।

**৩৭৩ ধারা** - বেশ্যাবৃত্তি ইত্যাদির জন্য নাবালিকা ক্রয় করলে [ Buying minor for purposes of prostitution etc .] ১৮ বছরের কম বয়সী কোন নাবালিকাকে [ any person under the age of eighteen years ] তার যেকোন বয়সে বেশ্যাবৃত্তি বা কোন ব্যক্তির সাথে অবৈধ সহবাসে [ illicit intercourse এ) কিংবা কোন বেআইনী ও নীতিহীন কাজে [ for any unlawful and immoral purpose ] এ নিযুক্ত বা ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে, অথবা তাকে সম্ভবতঃ যেকোন বয়সে এরূপ কোন উদ্দেশ্যে নিযুক্ত বা ব্যবহার করা হবে জেনে , যদি কেউ , - এ নাবালিকাকে ক্রয় করে , ভাড়া নেয় অথবা অন্য কোন প্রকারে অধিকারে [ otherwise obtains possession ] নেয় তবে তার অনধিক দশবছরের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ড হবে , এবং সে অর্থদন্ড দিতেও দায়ী হবে । * (ধর্তব্য ও জামিন অযোগ্য অপরাধ)

**১ নং ব্যাখ্যা** [ Explanation - 1 ] যখন কোন বেশ্যা বা বেশ্যালয়ের ( Brothel এর ) রক্ষক বা ম্যানেজার ১৮ বছরের কম বয়সী কোন স্ত্রীলোক ক্রয় কের , ভাড়া নেয় বা অন্য কোন প্রকারে অধিকারে নেয় তখন বিরুদ্ধ কিছু প্রমাণিত না হলে , ঐ বেশ্যা বা বেশ্যালয়ের রক্ষক বা ম্যানেজার ঐ স্ত্রীলোককে বেশ্যাবৃত্তিতে ব্যবহার করার জন্য অধিকারে নিয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে।

**২নং ব্যাখ্যা** [ Explanation - 2] অবৈধ সহবাস [ illicit intercourse] এর অর্থ ৩৭২ ধারায় দেওয়া ২ নং ব্যাখ্যার অনুরূপ হবে ।

**৩৭৪ ধারা** - বেআইনী বাধ্যতামূলক শ্রম (Unlawful compulsory labour) যদি কেউ কোন ব্যক্তিকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে (against the will of that person) শ্রম (labour) দিতে বেআইনীভাবে বাধ্য করে (unlawfully compels ) , তবে তার অনধিক এক বছরের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ড হবে , বা অর্থদন্ড হবে , বা উভয়বিধ দন্ড হবে ।

* (ধর্তব্য ও জামিনযোগ্য অপরাধ)

৩৭৬ ধারা - ধর্ষন বা বলাৎকারের দন্ড

**নারী -ইসলামিক আইন , ভরণপোষণ আইন , ভ্রুন সম্পর্কিত আইন , দত্তক ও ভরণপোষণ আইন হিন্দু বিবাহ আইন , মাতৃত্বকালীন সুযোগ সুবিধার আইন -১৯৬১ , মানব অধিকার আইন ১৯৯৪৩**

## মুসলিম মহিলাদের আইনগত অবস্থান

মানুষের সভ্যতার সবচেয়ে বড় কলঙ্ক নারী নির্যাতন । পৃথিবীর প্রায় সব মানুষই নারী নির্যাতনের একটি ঐতিহাসিক ধারা আছে । নিজেদের আধিপত্যকে সুরক্ষিত করার জন্য এবং প্রভুত্বকে বজায় রাখার জন্য পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থা নারীকে তার সহজাত অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে , তাকে ভোগের পণ্য হিসাবে ব্যবহার করেছে, বাজারে কেনা বেচা করছে। শিক্ষার অধিকার , জীবন ধারণের অধিকার সম্পত্তির অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করেছে । হিন্দু সমাজে স্ত্রীকে স্বামীর চিতায় পুরিয়ে মারার মত বর্বর পাথা ধর্মের নামে প্রচলিত ছিল । অনেক সংস্কারের ফলে ১৯৫৬ সালে আইন সংশোধন করে হিন্দু মহিলাদের সম অধিকার দেওয়া হয়েছে । কিন্তু মুসলিম আইনের সেরকম কোন সংশোধন হয়নি । এখনও মুসলিম আইন মহিলা স্বার্থবিরোধী এবং বৈষম্য সৃষ্টিকারী সংক্ষিপ্তভাবে এখানে মুসলিম আইনের পর্যালোচনা করা হলো ।

## সম্পত্তির অধিকার

ইসলামিক উত্তরাধিকার আইন খুবই জটিল । একজন মুসলমান (পুরুষ বা নারী )তার জীবদ্দশায় সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির মালিক থাকেন । শুধু মৃত্যুর পরই উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সম্পত্তি বন্টন হয় ।

যদি প্রায়াত ব্যক্তির পুত্র না থাকে তবে তাঁর কন্যা পাবেন ১/২ অংশ , বাবা (জীবিত থাকলে ) পাবেন ১/৩ অংশ , মা পাবেন (জীবিত থাকলে )১/৬ অংশ । ভাই , বোন কিছুই পাবে না । পুত্র এবং কন্যা থাকলে পুত্র পাবে ৫/৯ অংশ এবং কন্যা পাবে ৫/১৮ অংশ । বাবা না থাকলে ঠার্কুদা পাবেন ১/৬ অংশ । বাবা থাকলে পাবেন ১/৬ অংশ । মা পাবেন না ।

কন্যা , বাবা , মা ভাই বোন , থাকলে (পুত্র না থাকলে ) - কন্যা পাবে ১/২ অংশ , বাবা ১/৩ অংশ এবং মা ১/৬ অংশ।

কোন সন্তান না রেখে মারা গেলে স্ত্রী ১/৪ অংশ , মা ১/৪ অংশ এবং বাবা ১/২ অংশ পাবেন।

কিন্তু সন্তান না রেখে মৃত ব্যক্তি মহিলা হলে স্বামী পাবেন ১/২ অংশ , বাবা ১/৩ অংশ , মা ১/৬ অংশ।

১৪৫ ধারায় পরিষ্কার বলা আছে পুরুষ উত্তরাধিকারী সব সময় মহিলা উত্তরাধিকারীণীর দ্বিগুণ

অংশ পাবেন । এই আইনে পুরুষ ও মহিলার মধ্যে বৈষম্য সৃস্টি করে রেখেছে ।

## বিবাহ

স্থায়ী ও শর্তহীন বিবাহকে নিকা বলে । যৌবন শুরু হলেই সাবালক হয় এবং সাবালক হলেই নিকা করা যায় । যদিও ৯৫ ধারায় বলা হয়েছে যৌবন শুরু হলে বা ১৮ বছর হলে সাবালকত্ব আসে, কিন্তু ছেলেদের ক্ষেত্রে ১২ বছর এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে ৯ বছর হলেই যৌবন আসে বলে ধরা হয় । এর ফলে শিশু বিবাহ মুসলমান সমাজে প্রচলিত আছে যার কুফল অল্প বয়সে বার বার সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে শরীর স্বাস্থ্য হারিয়ে জীবনের সব সুখ ও আনন্দ থেকে বঞ্চিত হওয়া ।

বিবাহকে একটি চুক্তি হিসাবে ধরা হয়, আধ্যাত্মিক পবিত্র কোন বন্ধন নয় । এক পক্ষ (স্বামী) প্রস্তাব করবেন এবং অন্য পক্ষ (স্ত্রী) গ্রহণ করবেন বা রাজী হবেন সাক্ষী রেখে । বৈধ মুসলিম বিবাহের জন্য এইটুকুই যথেষ্ঠ ।

একজন মুসলমান পুরুষের একসঙ্গে চারজন স্ত্রী থাকতে পারে, কিন্তু একজন মুসলমান মহিলার একের বেশী স্বামী থাকতে পারবে না ।

**১৩ ধারা**

একজন মুসলমান পুরুষ অমুসলমান মহিলাকে বিয়ে করতে পারে কিন্তু একজন মুসলমান মহিলা অমুসলমান পুরুষকে বিয়ে করতে পারে না ।

**১৪ ধারা**

তালাক দেয়া সত্বেও পুনরায় বিয়ে করা যায় না । তবে সেই স্ত্রীকে যদি অন্য পুরুষ বিয়ে করে সহবাস করে এবং তালাক দেয় তখন পূর্বের স্বামী সেই স্ত্রীকে পুনরায় বিয়ে করতে পারে । (২১ ধারা)

## স্ত্রীর কর্তব্য সমূহ ঃ (২৬ ধারা )

১) স্বামীর প্রতি সম্পূর্ণ দাম্পত্য অনুরাগ থাকবে, অর্থাৎ অন্য পুরুষে অনুরক্ত হওয়া যাবে না।

২) স্বামী চাইলেই সহবাস করতে বাধ্য থাকবে ।

৩) স্বামীর মৃত্যু হলে অথবা স্বামী তালাক দিলে ইদ্দত মানতে হবে । অর্থাৎ একটা নিদির্ষ্ট সময় (তিন মাস ) পুনরায় বিয়ে করা যাবে না ।

৪) স্বামীর যুক্তিপূর্ণ সমস্ত আদেশ স্ত্রীকে মানতে হবে ।

৫) স্বামীর সাঙ্গ স্বামরি গৃহে বসবাস করতে হবে ।

৬) স্বামীর অনুমতি ছাড়া কোথাও যাওয়া নিষেধ ।

## স্ত্রীর অধিকার সমূহ ঃ (২৬ ধারা )

১) স্বামরি কাছ থেকে বিবাহের মূল্য বাবদ অর্থ বা সম্পত্তি (dower) ।

২) বিবাহ সম্পর্ক যত দিন অটুট থাকবে তত দিন এবং তালাকের পর তিন মাস (ইদ্দতের সময়) স্বামীর কাছে থেকে ভরণপোষণ পাবে । কিন্তু তালাকের পর ইদ্দতের সময় পার হয়ে গেলে আর ভরণপোষণ পাবে না।

৩) স্বামীগৃহে বসবাস করার অধিকার , অবশ্য যত দিন স্বামী তালাক না দিচ্ছেন শুধু তত দিন।

৪) সপ্তাহে একদিন , শুক্রবার , মা বাবাকে দেখতে যেতে পারবে অথবা মা বাবা দেখতে আসতে পারবেন। আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে দেখা করা যাবে বছরে একবার এবং প্রাক্তন স্বামীর ঔরসজাত ও নিজের গর্ভজাত সন্তানের সঙ্গে মাঝে মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ করা যাবে ।

৫) স্বামীর অন্য স্ত্রী থাকলে তাদের সঙ্গে সমান অধিকার ভোগ করবেন ।

৬) স্বামীর নিষ্ঠুরতা , অমমতা ও অন্যান্য কারণে আদালতের কাছে বিবাহ বিচ্ছেদ চাইতে পারেন ।

অবৈধ বিবাহের সন্তানেরা বৈধ সন্তানের পরিচয় এবং অধিকার পাবেন ( ২৮ ধারা)

শিয়া (ইস্না আশারী ) মুসলমানদের মধ্যে স্বল্প সময়ের জন্য অস্থায়ী বিবাহের প্রচলন আছে । এই বিবাহকে বলে মুতা বিবাহ। এই বিয়ের জন্য একটা চুক্তিপত্র করতে হয় । কতো দিন সহবাসের উদ্দেশ্যে এই বিবাহ তা চুক্তিপত্রে উল্লেখ করতে হবে । সাধারণতঃ কোন কারণে স্বামীকে স্ত্রীদের ছেড়ে কিছু দিন যদি বাইরে থাকতে হয় তখনই এই অস্থায়ী বিবাহ সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্বামী করতে পারেন ।

সুন্নী বা অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে এই অস্থায়ী বিবাহের প্রথা চালু নাই ।

## বিবাহের মূল্য (মহর ) ৩৪ ধারা

বিবাহ যেহেতু একটি চুক্তি তাই চক্তির মূল্যস্বরউপ স্বামী স্ত্রীকে কিছু অর্থ বা অন্য সম্পত্তি দিতে বাধয। স্ত্রীকে দেয়া সম্পত্তির এবং মহরকে মূল্য বলে ধরা হয় । সহবাসের জন্য এই মূল্য । তাই সহবাসের আগে মহব দেয়া হয় না। স্বামী স্ত্রীর প্রথম মিলনের সময় এই মহর দেয়া হয় । জিনিসের মূল্যের মতো সহবাসের মূল্য সঙ্গে সাঙ্গ দেয়া নিয়ম । যদিও মুসলমান স্বামীরা এই মহর করে দেবেন বলে অনেকে কখনই দেন না । তবে মহর বিবাহের মূল্য কিনা এ নিয়ে মতভেদ আছে মহর যে বিবাহের অপরিহার্য শর্ত এ ব্যাপরে দিবমত নেই । বিবাহ বিচ্ছেদ হলে এই মহরের অর্থ অবহ্যই স্বামী স্ত্রীকে দেবেন । মহরের অর্থ থেকে স্ত্রী তার ভরণপোষণ চালাবেন । মহরের অর্থ সফরৎ না দিলে স্ত্রী সবাকীর বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবেন ।

## ভরণপোষণ (৮২ ধারা )

যত দিন বৈধ বিবাহ অটুট থাকবে তত দিন স্বামী স্ত্রীর ভরণপোষণ চালাবেন । স্ত্রীর নিজস্ব সম্পদ যাই থাকুক কিন্তু এই নিয়মের ব্যতিক্রম হবে না । এণ ভরণপোষণ শর্তহীন নয় । স্ত্রী কখনই ভরণপোষণ প্রাপ্ত হবেন যখন তিনি সাবালকত্ব প্রাপ্ত হয়ে স্বামীর প্রতি দাম্পত্য কর্তব্য পালন করবেন , স্বামীকে সহবাসের সুযোগ দেবেন , স্বামীগৃহে বাস করবেন এবং স্বামীর আদেশ মেনে চলবেন । কখনো এই শর্তের কোন একটি ভঙ্গ হলে স্বামী স্ত্রীর ভরণপোষণ বন্ধ করে দিতে পারবেন ।

## পিতৃত্ব (৭৩ ধারা )

সন্তানের পিতা কে এ ধরণের প্রশ্ন দেখা দিলে এর উত্তর খুঁজতে হবে নিম্নোক্ত অবস্থার বিচারে

১) স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক থাকাকালীন সন্তান গর্ভে এসেছে । ঐ স্বামী হবেন সন্তানের পিতা ।
২) সন্তানের জন্ম হয়েছে দাম্পত্য সম্পর্ক অটুট থাকাকালীন । স্বামী হবেন সন্তানের পিতা ।
৩) বিবাহ বিচ্ছেদের ২৮০ দিনের মধ্যে সন্তানের জন্ম হয়েছে এবং এই সময়ের মধ্যে স্ত্রী পুনরায় বিবাহ করেননি । স্বামী হবেন সন্তানের পিতা ।
৪) স্বামী যদি স্বীকার করেন এ সন্তান তাঁর বা মহিলাটি তাঁরই স্ত্রী । তবে স্বামী ঐ সন্তানের পিতা হবেন।
৫) মা যদি ঘোষণা করেন সন্তানের পিতা কে এবং উক্ত ব্যক্তি যদি সন্তানটিকে নিজের সন্তান বা মা'টিকে নিজের স্ত্রী বলে স্বীকার করেন তবে সন্তানের পিতৃত্ব নিয়ে সমস্যা থাকে না ।

## অভিভাবকত্ব (৯৯ ধারা)

নাবালক ছেলে মেয়ের কে অভিভাবক হবেন ? বাবা না মা ? নাবালকের বিয়ের ব্যাপারে বাবা, ঠাকুর্দ্দা বা পিতৃকুলের পুরুষ উত্তরাধিকারীরা অভিভাবক হবেন । পিতার দিকে কেউ না থাকলে তখনই শুধু মা মাতৃকুলের অন্য আত্মীয়রা অভিভাবকত্বের দাবীদার হবেন । যদি পিতা , মাতা , মাতা না থাকেন বা তাদের সম্পর্কীয় আত্মীয় না থাকেন তবেই আদালত হবে ঐ নাবালক ছেলেমেয়ের অভিভাবক ।

সাত বছরের কম ছেলে বা নয় বছরের কম মেয়ে সন্তান মায়ের তত্ত্বাবধানে থাকবে , মা না থাকলে মায়ের মা ,বাবার মা , বোন ক্রমান্বয়ে নাবালকের দায়িত্ব আসবেন । পিতা আসবেন প্রায় সবার শেষে।

মা বা অন্য মহিলারা বৈধ বা আইনসম্মত অভিভাবক নন্ । বাবা , ঠাকুর্দ্দা অর্থাৎ পুরুষই হবেন আইনসম্মত অভিভাবক । ১০৫ ধারায় সহজাত বা আইনসম্মত অভিভাবকের তালিকায় মা বা মাতৃস্থানীয় কারো স্থান নেই।

নাবালক সন্তানের (৭ বছর বা ৯ বছর পর্যন্ত) তত্তবধানের অধিকার মায়ের থাকলেও এই অধিকারকে ঠিক অভিভাবকত্ব বলা হয় না , বলা হয় হিজান্ত । ৭ বা ৯ বছর বয়স পার হলে পুত্র বা কন্যার তত্ত্বাবধানের অধিকারও বাবাই পাবেন ।এমনকি মায়ের তত্ত্বাবধানের সময় বাবা মা'র বিবাহ বিচ্ছেদ হলেও বাবার অধিকার থাকবে সন্তানের কাছে যাওয়া আসার এবং তাদের যত্ন ও অন্যান্য বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেয়ার ।

## ১। ভারণপোষণ বলতে কী বুঝায়ঃ

ভরণপোষণ বলতে বুঝায় , ভাত , কাপড় , বাসস্থান , শিক্ষা এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা । সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির জীবনধারণের জন্য এ সবের অবশ্যই প্রয়োজন । স্ত্রী , সন্তান এবং বৃদ্ধ মা বাবার ভরণপোষণ প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক , সক্ষম ব্যক্তির পবিত্র ও আইন সংঘত কর্তব্য । সক্ষম মহিলার ও কর্তব্য বৃদ্ধ , অক্ষম পিতামাতার এবং সন্তানের ভরণপোষণ দেওয়া। হিন্দু বিবাহ আইনে অক্ষম স্বামীর ভরণপোষণের দায়িত্ব স্ত্রীকে নিতে হবে ।

## ২) ভারণপোষণের আইনগুলো ঃ

ক) ফৌজদারী কার্যবিধির (ক্রিমিন্যাল প্রসিডিওর কোড) ১২৫ -১২৮ ধারা ।

খ) হিন্দু দত্তক ও ভরণপোষণ আইনের ১৮ - ২৩ ধারা ।

গ) হিন্দু বিবাহ আইনের ২৪ ও ২৫ ধারা ।

ঘ) মুসলিম মহিলা সুরক্ষা আইন ১৯৮৬ ।

## ৩) কারা পাবেন ভরণপোষণ ঃ

যদি কোন ব্যক্তি সংগতি থাকা সত্ত্বেও তার

১) স্ত্রী

২) অপ্রাপ্ত বয়স্ক এবং অবিবাহিত বৈধ বা অবৈধ সন্তান ।

৩) অপ্রাপ্ত বয়স্ক কিন্তু শারীরিক বা মানসিক দিক থেকে অক্ষম বৈধ বা অবৈধ সন্তান ।

৪) উপার্জন - অক্ষম মা বাবা এদের ভরণপোষণ দিতে অবহেলা করেন সেইক্ষেত্রে ক্রিমিন্যাল প্রসিডিওর কোডের ১২৫ ধারায় প্রথম শ্রেণীর বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দরখাস্ত করলে উপরোক্ত ব্যক্তিগণ মাসিক ১৫০০ টাকা পর্যন্ত ভরণপোষণ পেতে পারেন ।

বিবাহ বিচ্ছে হওয়ার পরও হিন্দু স্ত্রী পুনর্বার বিবাহ না করা অবধি স্বামীর কাছ থেকে ভরণপোষণ পাবেন। কিন্তু মুসলিম নারী সুরক্ষা আইনে স্ত্রী বিবাহ বিচ্ছেদের পর তি ন মাসের বেশী ভরণপোষণের অধিকারী নন্ । তবে তালাকের সময় মোহরের টাকা স্বামী যদি ফেরৎ না দেন সেক্ষেত্রে স্ত্রী অবশ্যই ভরণপোষণের জন্য মামলা করতে পারেন ।

সৎ মাতা বা সৎ পিতার নিজের সন্তান না থাকলে সৎ পুত্র বা সৎ কন্যার কাছ থেকে ভরণপোষণ পেতে পারেন ।

নুরসবা খাতুন বনাম মহঃ কাসিম মামলায় সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এ.এস. আনন্দ রায় দিলেন মুসলিম পিতামাতার ছেলে মেয়েরা প্রাপ্ত বয়স্ক না হওয়া অবধি ভরণপোষণ পাবে, তবে মেয়েদের ক্ষেত্রে যত দিন বিয়ে না হয় তত দিন ভরণপোষণ পাবে ।

হিন্দু দত্তক ও ভরণপোষণ আইনে একজন হিন্দু মহিলা তার ভাত কাপড় , বাসস্থান , চিকিৎসা, অবিবাহিত সন্তানের বিয়ের খরচ ইত্যাদি ভরণপোষণ হিসেবে পেতে পারেন (১৮ -২৩ ধারা)

ফৌজদারী কার্যবিধির ১২৫ ধারায় সর্বোচ্চ খরপোষ প্রতি জনে ১৫০০ টাকার বেশী হবে না। কিন্তু হিন্দু দত্তক ও ভরণপোষণ আইনে ভরণপোষণের সুনির্দিষ্ট সীমা নাই ।

হিন্দু বিবাহ আইনের ২৪ ধারা অনুযায়ী বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা চলাকালীন হিন্দু স্ত্রী তার পতির কাছ থেকে ভরণপোষণ ছাড়া ও মামলার যাবতীয় খরচ পাবেন ।

ঐ আইনে ২৫ ধারা অনুযায়ী স্বামী স্ত্রীর বিবাহ বিচ্ছেদের পরও স্ত্রী তার স্বামীর কাছ থেকে স্থায়ী ভরণপোষণ পেতে পারে ।এর জন্য বিচ্ছেদের পর যে কোন সময় দরখাস্ত করা যাবে ।অবশ্যই স্ত্রী পুনরায় বিবাহ করলে ভরণপোষণ পাবেন না। প্রাক্তন স্বামীর আয়ের সংগে সংগতি রেখে আদালত আদেশ দেবেন ।

## ৪) স্ত্রী কীভাবে ভরণপোষণ পাবেন ঃ

ফৌজদারী কার্যবিধির ১২৫ ধারায় সব ধর্মের মহিলারাই স্বামীর কাছ থেকে ভরণপোষণ পাবার অধিকারী যদি তিনি নিজের ভরণপোষণ অসমর্থ হন । বিবাহ বিচ্ছেদের পরও এই অধিকার বজায় থাকবে । প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (CJM , SDJM included) বা পারিবারিক আদালতে দরখাস্ত করতে হবে । ত্রিপুরায় একটি পারিবারিক আদালত শুধু আগরতলার জন্য গঠিত হয়েছে । মুসলিম নারী সুরক্ষা আইনে তালাকপ্রাপ্ত মহিলা ইদ্দত সময়ের পর (তিন মাস) স্বামীর কাছে থেকে ভরণপোষণ পাবে না । কোন কোন হাইকোর্ট রায় দিয়েছেন এই আইনের দ্বারা ফৌজদারী কার্যবিধির ১২৫ ধারায় তালাকপ্রাপ্ত মুসলিম মহিলার ভরণপোষণের অধিকার ক্ষুন্ন হয়নি । তাছাড়া পারিবারিক আদালত আইন অনুযায়ী ভরণপোষণের দাবী তালাক প্রাপ্ত মহিলা যে কোন সময় করতে পারেন ।

ভরণপোষণের দাবী শুধু বৈধ বিবাহের স্ত্রী করতে পারেন । প্রত্যেক ধর্মের নিজস্ব আইন বা রীতিনীতি অনুযায়ী বা বিশেষ বিবাহ আইন অনুযায়ী বিবাহ বৈধ হতে হবে । মনে রাখতে হবে মালা বদলে বিবাহ বৈধ বিবাহ নয় , শুধু এফিডিভেট করে বৈধ বিবাহ হয় না ।

হিন্দু দত্তক ও ভরণপোষণ আইনে হিন্দু স্ত্রী ভরণপোষণ পেতে পারেন । ফৌজদারী কার্যবিধির

১২৫ ধারায় ভরণপোষণ পাওয়ার পরও এই দাবী জেলা জজ বা পারিবারিক আদালতে করা যায় সেক্ষেত্রে ১২৫ ধারায় দেয়া ভরণপোষণের টাকার অংকটি মাথায় রেখে আদালত রায় দেবেন ।

## ৫) বৃদ্ধ মাতা - পিতার ভরণপোষণ

বৃদ্ধ অসমর্থ পিতামাতার ভরণপোষণের দায়িত্ব সক্ষম পুত্র বা কন্যাকে নিতে হবে । আগে এ দায়িত্ব শুধু পুত্রের ছিল । বর্তমানে আইনে কন্যাকে এ দায়িত্বের মধ্যে আনা হয়েছে । বিবাহিত হোক বা অবিবাহিত উপার্জনশীল পুত্র বা কন্যাকে এ দায়িত্ব নিতে হবে । না নিলে ভারতীয় কার্যবিধির পুত্র বা কন্যাকে এ দায়িত্ব নিতে হবে । না নিলে ভারতীয় কার্যবিধির ১২৫ ধারায় দরখাস্ত করলে প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ভরণপোষণের আদেশ দেবেন ।এই আইনে হিন্দু মুসলমান সব ধর্মের লোকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ।

বিবাহিত মেয়ের নিজস্ব উপার্জন না থাকলে স্বামীর অনুমতি ছাড়া তার আয় থেকে মা বাবার ভরণপোষণ করতে বাধ্য নয় । নিজস্ব পর্যাপ্ত আয় থাকলেই কন্যার উপর এই দায়িত্ব বর্তাবে ।

হিন্দু দত্তক ও ভরণপোষণ আইনের ২০ ধারায় বলা হয়েছে । উর্পাজন অক্ষম , সহায়সম্বলহীন পিতামাতার ভরণপোষণের দায়িত্ব প্রতিটি সন্তানের ।

## ৬। সন্তানের ভরণপোষণ ঃ

ফৌজদারী কার্য্য বিধির ১২৫ ধারায় অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান , বৈধ হোক বা অবৈধ , বিবাহিত হোক বা অবিবাহিত , পিতার কাছে থেকে খরপোষ পাওয়ার অধিকারী ।

অপ্রাপ্ত বয়স্ক বলতে বুঝায় ১৮ বছরের কম মেয়ে বা ২১ বছরের কম ছেলে ।

ফৌজদারী কার্যবিধির ১২৫ ধারায় যে কোন ধর্মেই ছেলে মেয়েরা ভরণপোষণ পাওয়ার অধিকারী।

মুসলিম নারী সুরক্ষা আইন ১৯৮৬ সত্বে ও অন্ধ্রপ্রদেশ হাইকোর্ট রায় দিয়েছেন মুসলিম অপ্রাপ্তবয়স্কা বিবাহিতা কন্যা পিতার কাছ থেকে খরপোষ পাওয়ার অধিকারী ।

প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরও সন্তান যদি শারীরিক বা মানসিক অসুস্থতার কারণে নিজের ভরণপোষণে অসমর্থ হয় , সেক্ষেত্রে সক্ষম পিতার কাছে থেকে সে খরপোষ পাওয়ার অধিকারী । কিন্তু ১২৫ ধারায় প্রাপ্তবয়স্ক বিবাহিতা কন্যার পিতামাতার নয় , তার স্বামীর ।

১২৫ধারা মোতাবেক খরপোষের দায়িত্ব

১) স্ত্রীর প্রতি স্বামীর

২) সন্তানের প্রতি পিতার

৩) পিতামাতার প্রতি পুত্র বা কন্যার ।

স্বামীর প্রতি স্ত্রীর বা সন্তানের প্রতি মায়ের ভরণপোষণের দায়িত্ব নাই ।

কিন্তু হিন্দু দত্তক ও ভরণপোষণ আইনে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন । এই আইনের ২০ ধারায়

সন্তান মা - বাবা উভয়ের কাছ থেকেই ভরণপোষণের অধিকার । সন্তান বৈধ হোক বা অবৈধ , শুধু বাবা নয় , মার কাছ থেকেও ভরণপোষণ দাবী করতে পারে ।

পুত্র প্রাপ্তবয়স্ক হলে আর ভরণপোষণ পাওয়ার অধিকারী নয় । কিন্তু অবিবাহিত কন্যা প্রাপ্তবয়স্ক হলেও তার নিজস্ব আয় না থাকলে পিতামাতার কাছ থেকে ভরণপোষণ পাবে ।

অপ্রাপ্তবয়স্ক কন্যার বিবাহ দিলে স্বামীর ভরণপোষণের ক্ষমতা না থাকে তখন সেই কন্যার ভরণপোষণের দায়িত্ব পিতাকে বহন করতে হবে ।

অক্ষম স্বামীর ভরণপোষণের দায়িত্ব উপার্জনক্ষম স্ত্রীকে নিতে হবে ।

## ৭) ভরণপোষণ পাওয়ার জন্য আবেদন ঃ

ভরণপোষণের দায়িত্ব পালন না করলে ফৌজদারী আদালত বা পারিবারিক আদালতে আবেদন করা যায়। আবেদনপত্রে চারটি বিষয় অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে -

১) যিনি আবেদন করছেন তার নিজস্ব আয়ের উৎস নাই, অর্থাৎ নিজের ভরণপোষণে অক্ষম।

২) যার বিরুদ্ধে আবেদন করছেন তার যথেষ্ঠ সংগতি আছে ।

৩) ভরণপোষণ দিতে বিরোধী পক্ষ অস্বীকার বা অবহেলা করেছেন ।

৪) উভয় পক্ষের সম্পর্ক উল্লেখ করে দাবী করতে হবে যে ঐ সম্পর্কের আবেদনকারীকে ভরণপোষণ দিতে দ্বিতীয় পক্ষ বাধ্য ।

হিন্দুদের ক্ষেত্রে যদি বিবাহ সম্পর্কীয় কোন মামলা আদালতে বিচারাধীন থাকে তাকে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যে কেউ উপার্জন অক্ষম হলে এবং অপরপক্ষের সংগতি থাকলে হিন্দু বিবাহ আইনের ২৪ ধারায় সেই আদালতের মামলা চলাকালীন ভরণপোষণের আবেদন করতে পারে । জেলা জজ আদালতে এই আবেদন করা যায় ।

অন্তবর্তীকালীন ভরণপোষণের আদেশ আদালত যে কোন সময় আবেদনের ভিত্তিতে দিতে পারেন ।

ভরণপোষণের জন্য আদালতে আবেদন করার কোন সময়সীমা নেই ।

বিরোধী পক্ষ ইচ্ছাকৃত ভাবে হাজির না হলে আদালত এক তরফা আদেশ দিতে পারেন ।

মাসিক ভাতা হিসাবে ভরণপোষনের আদেশ দেয়া যায় ।

কোন মাসের খরপোষে না দিলেই আদালতের আদেশ অমান্য করা হবে এবং প্রতিটি আদেশ অমান্যের জন্য ওয়ারেন্ট জারী করা যাবে , যেমন জারী করা হয় জরিমানা আদায়ের জন্য । অবশ্য খরপোষ যে তারিখ থেকে দেয় সেই তারিখ থেকে এক বছরের মধ্যে ওয়ারেন্ট জারীর জন্য আবেদন করতে হবে । খরপোষ আদায় না করা গেলে অনাদায়ের প্রতিটি ক্ষেত্রে এক মাস পর্যন্ত জেল হতে পারে ।

পরিস্থিতি পরিবর্তন হলে খরপোষের আদেশও সংশোধন করা যাবে ।

## ৮) মুসলিম মহিলা সুরক্ষা আইন ১৯৮৬ ঃ

এই আইনে মুসলিম স্ত্রী তালাকের পর শুধু তিন মাস (ইদ্দত ) স্বামীর কাছ থেকে ভরণপোষণ পাবে । তিন মাস পর সে যদি নিজ ভরণপোষণে অসমর্থ হয় তখন তার ভরণপোষণের দায়িত্ব নিতে হবে সেই সব আত্মীয় স্বজনকে যারা তার উত্তরাধিকারী। যদি সক্ষম কোন আত্মীয় স্বজন না থাকে তবে ওয়াকফ্ বোর্ড দায়িত্ব নেবে । আবেদন করলে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট অনুরূপ আদেশ দেবেন । অবশ্য উপযুক্ত পরিমাণ মোহরের টাকা ফেরৎ না দিলে ইদ্দতের পরও স্বামীর বিরুদ্ধে খরপোষের দাবী করা যাবে । তাছাড়া পারিবারিক আইনেও এই অধিকার বজায় আছে ।

## ৯) বিনামূল্যে আইন সেবা ঃ

খরপোষ আদায়ের জন্য মামলা করতে আইনসেবা কর্তৃপক্ষ সাহায্য করবে । রাজ্যস্তরে রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষ , জেলাস্তরে জেলা কর্তৃপক্ষ ও মহকুমাস্তরে মহকুমা কমিটি আছে। আদালত চত্বরে খোঁজ করুন। বিনামূল্যে কাজ করার জন্য আইনসেবা এড্ভোকেট আছেন । প্রতি এলাকায় আছে আইনসেবা স্বেচ্ছাসেবক । এদের সংগে যোগাযোগ করলে সব রকমের সাহায্য পাওয়া যাবে । মামলার যাবতীয় ব্যয় আইনসেবা কর্তৃপক্ষ বহন করবে ।

মাতৃগর্ভে ভ্রূণের অবস্থা জানার প্রকৌশল বিজ্ঞান আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে । এই প্রকৌশলের দ্বারা ভ্রূণের অস্বাভাবিক কোন অবস্থা , শারীরিক বিকৃতি ও রোগ নির্ণয় যেমন সম্ভব হয় - তেমনি ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ণয়ও করা যায় । মাতৃগর্ভের সন্তান ছেলে না মেয়ে , জন্মের অনেক আগেই তা জানা যায় । কিন্তু পণ প্রথা এবং অন্যান্য সামাজিক কুসংস্কারের জন্য আমাদের দেশে বহু মাতাপিতা এখনও কন্যাসন্তান চান না । জন্মের সাথে কন্যাসন্তানকে বিভিন্ন কৌশলে মেরে ফেলার রীতি এই একবিংশ শতাব্দীতেও দেশের কিছু অংশের মানুষের মধ্যে প্রচলিত আছে । মাতৃজঠরে ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ণয়ের প্রকৌশল আবিষ্কারের ফলে দ্রুতগতিতে গজিয়ে উঠছে প্রচুর সংখ্যক পরীক্ষাগার । এইসব পরীক্ষাগারে ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ণয় হয় এবং কন্যাভ্রূণ হলে বহু মা - বাবা ভ্রূণ হত্যা করেন । এর ফলে কন্যা ভ্রূণ হত্যার সংখ্যা বিপজ্জনকভাবে বেড়ে চলেছে এবং পুরুষের আনুপাতিক হারে নারী সংখ্যা কমে যাচ্ছে । এই অবস্থা চলতে থাকলে নিঃসন্দেহে মানুষের সভ্যতার বিপন্ন হবে ।

এই পরিস্থিতিতে মোকাবিলা করার জন্য ১৯৯৪ সালে Prenatal Diagnostic Techniques (Regulation and prevention of Mis use ) Act, 1994 . এই নামে পার্লামেন্ট একটি আইন পাশ করেন । এই আইনের গুরুত্বপূর্ণ ধারাগুলো নীচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

**৬ ধারাঃ-**

ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ণয় সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হলো । কোন গর্ভবতী মহিলাকে গর্ভস্থ সন্তানের লিঙ্গ

নির্ণয়ের জন্য যে কোন প্রকার পরীক্ষা বেআইনী বলে ঘোষণা করা হলো । কোন Clinic , Laboratory বা পরামর্শদান কেন্দ্র লিঙ্গ নির্ণয়ের কোন প্রকা র পরীক্ষা করতে পারবে না ।

**২৩ ধারাঃ-**

এই আইন ভঙ্গ করলে তিন বছরের সশ্রম কারাদন্ড এবং দশ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে ।

অপরাধীর তালিকায় থাকছেন , ডাক্তার প্রকৌশলী এবং তাদের সাহায্যকারী এবং আবেদনকারী । গর্ভবতী মহিলা যদি স্বেচ্ছায় এই পরীক্ষা করাতে আবেদন করেন তবে তিনি ও অপরাধী । যিনি তাঁকে পরামর্শ দেবেন বা বাধ্য করবেন লিঙ্গ নির্ণয়ের পরীক্ষা করাতে , তিনিও অপরাধী । গর্ভবতী মা যদি প্রমাণ করতে পারেন এ ধরনের পরীক্ষায় তাঁর সম্মতি ছিল না স্বামী , শ্বশুর -শাশুড়ী বা অন্য কারো দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বাধ্য হয়ে তাকে সম্মতি দিতে হয়েছে সেক্ষেত্রে তাকে অপরাধী বলে গণ্য করা হবে না ।

**৩ ধারা ঃ-**

ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ণয় ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে , যেমন ভ্রূণের রোগ বা শারীরিক কোন অসঙ্গতি নির্ণয়ে জন্য কোন পরীক্ষাগার বা কেন্দ্র খুলতে গেলে এই আইনে রেজিস্ট্রেশন নিতে হবে ।

**৪ ধারাঃ-**

কি ধরণের পরীক্ষা করা যাবে তা পরিষ্কার বলা আছে ৪ ধারায় । সব পরীক্ষাগুলোই মূলতঃ গর্ভস্থ সন্তানের রোগ এবং শারীরিক অসঙ্গতি সম্পর্কীয় । নিদির্ষ্ট পরীক্ষাগুলো ছাড়া অন্য কোন পরীক্ষা করলেই এই আইনে দন্ডনীয় অপরাধ ।

**৫ ধারাঃ-**

এমনকি সুনির্দিষ্ট এই পরীক্ষাগুলো করতে গেলেও গর্ভবতী মহিলার লিখিত অনুমতি নিতে হবে । এই অনুমতি নেয়ার দায়িত্ব যিনি পরীক্ষা করবেন তাঁর । কি উদ্দেশ্যে , কেন এই পরীক্ষা এবং তার ফলাফল কী তে পারে তিনি মহিলাটিকে বুঝিয়ে বলবেন । অনুমতি নিয়ে ভ্রূণের রোগ , অবস্থান , অসঙ্গতি ইত্যাদি পরীক্ষা চালাতে গিয়ে যদি ভ্রূণের লি, নির্ণয় হয়ে যায় তবে কোন অবস্থায় এই পরীক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি গর্ভবতী মহিলাকে বা অন্য কাউকে ভ্রূণের লিঙ্গ পরিচয় দেবেন না, দিলে তা দন্ডনীয় অপরাধ বলে বিবেচিত হবে ।

**৭ও ১৬ ধারাঃ-**

সরকারকে পরার্মশদান , আইনটি পর্যালোচনা এবং লিঙ্গ নির্ণয় ও কন্যাভ্রূণ হত্যার মতো সামাজিক অপরাধের বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন করার জন্যে একটি কেন্দ্রীয় বোর্ড গঠিত হয়েছে । এছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির জন্য এবং সরকার প্রতিটি রাজ্যের জন্য এক বা

একাধিক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ নিয়োগ করেছেন এই আইনের যথাযথ প্রয়োগকে সুনিশ্চিত করার জন্যে।

**১৭ (৪) ধারাঃ-**

পরীক্ষাকেন্দ্র বা পরামর্শ কেন্দ্রগুলোকে রেজিষ্ট্রেশন দেওয়া , বাতিল করা , অভিযোগের তদন্ত করা , এইসব কাজ করবে কতৃপক্ষগুলো ।

**১৮ ধারাঃ-**

রেজিষ্ট্রেশন ছাড়া জন্মসংক্রান্ত কোন গবেষণাগার , পরীক্ষাকেন্দ্র বা পরামর্শ কেন্দ্র খোলা যাবে না । খুললে তা হবে দন্ডনীয় অপরাধ ।

**১৯ ধারাঃ-**

রেজিষ্ট্রেশন দেয়ার আগে কর্তৃপক্ষ অবশ্যই দেখবেন আবেদনকারীর পরীক্ষাকেন্দ্রে বা গবেষণাগারে পরীক্ষার সরঞ্জাম ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি আছে কিনা ।

**২০ ধারাঃ-**

সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে কর্তৃপক্ষ তাদের দেয়া রেজিস্ট্রেশন বাতিল বা সাময়িক বাতিল করতে পারেন ।

**২১ ধারা ঃ-**

তবে এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকারের কাছে আপীল করার বিধান আছে ।

কোন ব্যক্তি বা সংগঠন , পরীক্ষাকেন্দ্র বা গবেষণাকেন্দ্র ভ্রূণের লিঙ্গ নিরূপন সংক্রান্ত কোন প্রচার করতে পারবেন না, বিজ্ঞপ্তি দিতে পারবেন না । জন্মের পূর্বেই সন্তানের লিঙ্গ, (অর্থাৎ ছেলে না মেয়ে ) নিরূপন করা যায় এ ধরনের যে কোন প্রকার প্রচার দন্ডনীয় অপরাধ । তিন বছর কারাদন্ড এবং দশ হাজার টাকা জরিমানা হতে পারে ।

১৯৫৬ সালে দত্তক ও ভরণপোষণ সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় আইন আমাদের দেশে চালু হয় । এর ইংরেজী নাম Hindu Adoption And Maintenance Act , 1956.

**৭ ধারা ও ৮ ধারাঃ-** সাবালক ও মানসিক সুস্থ যে কোন হিন্দু দত্তক নিতে পারেন । পুরুষ হলে বিবাহিত বা অবিবাহিত যে কোন অবস্থায় দত্তক নিতে পারেন । মহিলা হলে অবিবাহিত হতে হবে । বিবাহিত হলে এবং স্বামী জীবিত থাকলে তার দত্তক নেয়ার অধিকার নাই । তবে স্বামী মারা গেলে বা বিবাহ বিচ্ছেদ হলে , বা স্বামী যদি সংসার ত্যাগী হন বা অন্য ধর্ম গ্রহণ করেন বা মানসিক রোগ গ্রস্থ সেই ক্ষেত্রে মহিলা দত্তক নিতে পারেন । (স্বীকার করতে হবে এই আইনে পুরুষ ও নারীর মধ্যে বৈষম্যের সৃস্টি করা হয়েছে ।

**৯ ধারা ঃ-** দত্তক দিতে পারেন বাবা , মা , অভিভাবক । বাবা জীবিত থাকলে মা দত্তক দিতে পারেন না। শুধু বাবাই দত্তক দেয়ার অধিকারী । তবে মায়ের অনুমতি নিতে হবে । বাবার যদি মৃত্যু

হয় বা তিনি যদি সংসারত্যাগী হন বা অন্যধর্ম গ্রহণ করেন বা মানসিক অসুস্থ হন তখন মা দত্তক দিতে পারেন । ( স্বীকারে করতে হবে এ ক্ষেত্রে ও স্ত্রী পুরুষের বৈষম্য রয়ে গেছে)

**৯ধারা ঃ-**

যদি মা বাবা উভয়েরই মৃত্যু হয়ে থাকে বা দুজনেই যদি সংসারত্যাগী হন বা সন্তানকে পরিত্যাগ করে থাকেন , বা দুজনকেই মানসিক অসুস্থ বলে আদালত ঘোষণা করে থাকেন বা যে শিশুর মা বাবার পরিচয় থাকেন , বা দুজনকেই মানসিক অসুস্থ বলে আদালত ঘোষণা করে থাকেন বা যে শিশুর মা বাবার পরিচয় জানা নেই এইসব ক্ষেত্রে আদালতের অনুমতি নিয়ে ঐ শিশুর অভিভাবক দত্তক দিতে পারেন , নিতেও পারেন ।

মনে রাখতে হবে মা বাবা বলতে যিনি দত্তক নিয়েছেন তাঁকে বুঝাবে না । অর্থাৎ , দত্তক নেয়া মা বাবার দত্তক দেয়ার ক্ষমতা নাই ।

**১০ ধারা ঃ-**

কাকে দত্তক নেয়া যায় এই আইনে ? ১৫ বছরের কম বয়সী যে কোন নারী বা পুরুষ হিন্দু , অবিবাহিত এবং কেউ দত্তক নেয়নি , এই শর্তগুলো পূরণ করলেই তাকে দত্তক নেয়া যাবে ।

**১১ ধারা ঃ-**

নিজের পুত্র বা নাতি থাকলে দত্তক পুত্র নেয়া যায় না । নিজের কন্যা বা নাতনি থাকলে দত্তক কন্যা নেয়া যায় না ।

দত্তক পিতা দত্তক কন্যার চেয়ে কমপক্ষে ২১ বছরের বড় হবেন । তেমনি দত্তক মাতা দত্তক পুত্রের চেয়ে কমপক্ষে ২১ বছরের বড় হবেন ।

**১৭ ধারা ঃ-**

অর্থের বা অন্য কোন সম্পদের বিনিময়ে দত্তক দেয়া বা নেয়া দন্ডনীয় অপরাধ ।

ভরণপোষণ

**১৮ ধারা (ক)**

স্ত্রীর সারা জীবন ভরণপোষণের দায়িত্ব স্বামীর ।

ভরণপোষণের অধিকার নিয়েই স্ত্রী স্বামীর কাছ থেকে আলাদা বসবাস করতে পারেন যদি -

(১) স্বামী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেন ;

(২) স্বামী শরীর ও মনের পক্ষে হানিকর নিষ্ঠুর ব্যবহার স্ত্রীর প্রতি করেন ,

(৩) স্বামী দ্বিতীয় বার বিয়ে করেন , বা রক্ষিতা রাখেন ।

**১৯ ধারা ঃ-** স্বামীর মৃত্যুর পর কোন মহিলার ভরণপোষণের জন্য যদি নিজস্ব আয়ের উৎস না থাকে তবে শ্বশুর সেই দায়িত্ব পালন করবেন । যদি স্বামীর রেখে যাওয়া সম্পতি থেকে আয় আসে বা

পুত্র কন্যার দায়িত্ব নেন সেক্ষেত্রে শ্বশুরের দায়িত্ব থাকবে না ।

**২৩ ধারাঃ** - ভরণপোষণের আর্থিক অংক কি হবে তা আদালত স্থির করবেন উভয় পক্ষের সামাজিক ও আর্থিক সংগতি এবং অবস্থানের কথা মাথায় রেখে ।

বহু বিবাহ হিন্দু আইনে নিষিদ্ধ করা হয়েছে । স্ত্রীর জীবদ্দশায় স্বামী বা স্বামীর জীবদ্দশায় স্ত্রী দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে পারবেন না । করাটা দন্ডনীয় অপরাধ ।

**৫ ধারাঃ** - ২১ বছর পূর্ণ হওয়ার আগে কোন হিন্দু পুরুষের বিবাহ আইনসংগত নয় । তেমনি ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার আগে কোনো মেয়ের বিবাহ বে-আইনী । মানসিক রোগগ্রস্থ ও ফলতঃ প্রজনন ক্ষমতারহিত ব্যক্তির বিবাহ আইনানুগ নয় ।

**৭ ধারা** - সামাজিক রীতি এবং অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হবে হিন্দু বিবাহ । যদি সপ্তপদী এই অনুষ্ঠানের অঙ্গ হয় তবে সেই অনুষ্ঠান পালনের সাথে সাথে বিবাহ সম্পূর্ণ হবে ।

**৯ ধারা** - বিবাহের পর যদি স্বামী বা স্ত্রী যথেষ্ঠ কারণ ছাড়া একে অপরকে পরিত্যাগ করে আলাদা বাস করেন সেক্ষেত্রে দাম্পত্য সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের জন্য আদালতে দরখাস্ত করা যাবে ।

**১০ ধারা** - যে কারণে ১৩ ধারায় স্বামী বা স্ত্রী বিবাহ বিচ্ছেদ চাইতে পারেন সেই একই কারণে ১০ ধারায় বিচার - বিচ্ছেদও (Judicial Seperation) চাইতে পারেন । এ ধরনের বিচ্ছেদ চলাকালীন যৌন সম্পর্ক রক্ষা করা বাধ্যতামূলক নয় ।

**১২ও ১৩ ধারা** - স্বামী বা স্ত্রী বিবাহ বিচ্ছেদ চাইতে পারেন বিভিন্ন কারণে । দ্বিতীয় বিবাহ হিন্দু রীতি অনুযায়ী নিষিদ্ধ। ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মধ্যে বিবাহ , সপিন্ডের মধ্যে বিবাহ যৌন অক্ষমতা নিষ্ঠুরতা , মানসিক অসুস্থতা এইসব কারণগুলোর অন্যতম । বিয়ের এক বছরের মধ্যে বিচ্ছেদের দরখাস্ত করা চলেনা । দরখাস্ত করার ছয় মাস পর বিচ্ছেদের আদেশ দেয়া যায় ।

**১৩ (খ) ধারা** - দুই পক্ষ একমত হলে দীর্ঘ বিচার পদ্ধতিতে যেতে হয় না । দরখাস্ত করার পর ছয় মাস গেলেই বিচ্ছেদের আদেশ পাওয়া যায় ।

**১৫ ধারা** - বিচ্ছেদের পর আপীলের সময়সীমা পার হলে যে কোন পক্ষ পুনরায় বিবাহ করতে পারেন।

**১৬ ধারা** - আইনতঃ অশুদ্ধবিবাহের সন্তানেরা আইনসিদ্ধ সন্তান হিসাবে বিবেচিত হবেন । কোন প্রকার অশুদ্ধতার প্রশ্ন আনা যাবে না । পিতামাতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী তারাই হবেন ।

**১৪ ধারা** - এই আইনে কোন ধারায় স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মামলা চলাকালীন এক পক্ষ আর্থিক অসংগতির কারণে মামলার খরচ বা ভরণপোষণের খরচ অন্য পক্ষের কাছে চেয়ে আদালতে আবেদন করতে পারেন এবং আদালত সেই আবেদন মঞ্জুর করতে পারেন ।

**২৫ ধারা** - মামলার শেষে যে কোন সময় এক পক্ষের আবেদনে তার সারাজীবনের ভরণপোষণের

খরচ দেয়ার জন্য আদালত অন্য পক্ষকে নির্দেশ দিতে পারেন । অবশ্যই উভয়পক্ষের আর্থিক সংগতি এবং সামাজিক অবস্থানের প্রশ্নটি আদালতের বিবেচনায় থাকবে ।

**২৬ ধারা** - নাবালক সন্তান কার আশ্রয়ে থাকবে , তার ভরণপোষণ শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়গুলো সম্পর্কে মাঝে মাঝে আদালত নির্দেশ দিতে পারেন , অবশ্যই নাবালকের ইচ্ছা বা তার কল্যাণে প্রশ্নগুলো বিবেচনার মধ্যে থাকবে ।

The Dowry Prohibition Act 1961 ঐ বছরের জুন মাসো ২০ তারিখ থেকে চালু হয়। পণ প্রথার কুফল থেকে সমাজকে মুক্ত করার প্রয়াসে এই আইন।

**২ ধারা** - বিয়ের মূল্য স্বরূপ দেয়া সম্পত্তিকে বলে পণ । এই পণ বিয়ের আগে বা পরে দেয়া হতে পারে , কিন্তু পণের জন্য চুক্তি বা সহমত হলেই এই আইনের আওতায় আসবে ।
৩ধারা - বিয়ের মূল্য স্বরূপ দেয়া সম্পত্তিকে বলে পণ । এই পণ বিয়ের আগে বা পরে দেয়া হতে পারে , কিন্তু পণের জন্য চুক্তি বা সহমত হলেই এই আইনের আওতায় আসবে ।

**৪ধারা** - পণ দাবী করাও অপরাধ । এই অপরাধের শাস্তি দুই বছর পর্যন্ত জেল হতে পারে কিন্তু কোন অবস্থায় ছয় মাসের কম হবে না , সঙ্গে থাকবে জরিমানা যা দশ হাজার টাকা পর্যন্ত হতে পারে।

পণের দাবী আইনের চোখে নিষ্ঠুরতা (Curelty) এই নিষ্ঠুরতার কারণে কোন পক্ষ (স্ত্রী) বিবাহ বিচ্ছেদ চাইতে পারেন ।

**৪(ক) ধারা** - পুত্র ,কন্যা বা আত্মীয়ের বিয়ের মূল্য স্বরূপ অর্থ অন্য সম্পত্তি বা মূল্যবান অন্য কিছু দেয়া বা চাপানো শাস্তিযোগ্য অপরাধ । কারাদন্ড হতে পারে ৫ বছর পর্যন্ত , কিন্তু কোন অবস্থাতেই ছয় মাসের কম হবে না , সঙ্গে ১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে ।

**৫ ধারা** - পণের জন্য যে কোন প্রকার চুক্তি বে-আইনী ।

**৬ ধারা** - পণ প্রথা বে- আইনী এবং শাস্তিযোগ্য বলা হলো । কিন্তু যে পণ নেয়া বা দেয়া হয়ে গেছে তার কি হবে ? যদি বিয়ের আগে নেয়া হয়ে থাকে তবে তিন মাসের মধ্যে পাত্রীকে ফেরৎ দিতে হবে , বিয়ের সময় বা পরে নিলে নেয়ার তারিখ থেকে তিন মাসের মধ্যে , আর পাত্রী যদি নাবালিকা হয় তবে সাবালিকা হওয়ার তিন মাসের মধ্যে.পাত্রীকে দিতে হবে ।

**৬ (খ) ধারা** - যদি উপরোক্ত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দিতে না পারেন তবে যিনি পণ নিয়েছেন তার কারাদন্ড হতে পারে দু'বছর পর্যন্ত কিন্তু কোন অবস্থাতেই ছয় মাসের কম হবে না । সঙ্গে থাকতে পারে অর্থদন্ড যা দশ হাজার টাকা পর্যন্ত হতে পারে কিন্তু পাঁচ হাজারের কম হবে না ।

**৬ (৩) (ক) ধারা** - যদি কারাদন্ডের পূর্বে পণ ফেরৎ না দেন সেক্ষেত্রে কারাদন্ডের আদেশ দেয়ার পর আদালত একটা নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেবেন পণের মূল্য ফেরৎ দেয়ার জন্য । এই নির্দেশ অমান্য করলে পণের মূল্য অর্থদন্ড হিসাবে গণ্য করা হবে এবং পণ গ্রহণকারীর কাছ থেকে

জরিমানা আদায়ের পদ্ধতিতে পণের মূল্য আদায় করা হবে ।

**৬ (৩) ধারা** - পণের মূল্য ফেরৎ পাওয়ার আগেই যদি মহিলার মৃত্যু হয় তবে তার সন্তান থাকলে তাদের কাছে অথবা সন্তান না থাকলে তার মা বাবার কাছে এই পণ হস্তান্তর করতে হবে ।

এই অপরাধের বিচার করবেন প্রথম শ্রেণীর বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট ।

**৭ ধারা** - পুলিশের রিপোর্ট , হাকিমের নিজস্ব খবর , পণের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ বা ক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা কোন স্বীকৃত কল্যাণমূলক সংস্থার আবেদনের ভিত্তিতে মামলা গ্রহণ করা যেতে পারে । কোন ওয়ারেন্ট ছাড়া পুলিশ অপরাধীদের গ্রেপ্তার করতে পারে , অপরাধগুলো জামিনের অযোগ্য এবং মীমাংসার অযোগ্য ।

মনে রাখতে হবে - স্ত্রী ধন , উপহার , স্নেহের দান পণ নয় । সামাজিক প্রথা অনুযায়ী যে কোনো রকম দান বা উপহার তাও পণ নয় এবং এই আইনের আওতায় আসে না ।

## এই আইনের উদ্দেশ্য

যে সব মহিলার কাজ করেন কোন প্রতিষ্ঠানে , কারখানায় , বাগানে খনিতে বা দোকানে - তাঁদের জন্য সন্তান জন্মানোর আগে ও পরে ছুটি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা ।

### সুবিধাগুলো কি -

**ধারা ৫ (৩)** ১২ সপ্তাহের সবেতন ছুটি ।

**৪ (১)** সন্তান জন্মানোর সম্ভাব্য তারিখের পূর্বে ছয় সপ্তাহ এবং পরে ছয় সপ্তাহ ।

**৪(৩)** সম্ভাব্য তারিখের পূর্বে যে ছয় সপ্তাহ ছুটি ভোগ করবেন সেই ছুটি শুরু হওয়ার পূর্বে একমাস কোন ভারী কাজ , দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে করার কাজ দেয়া চলবে না । তবে এ ধরনের কাজ না দেয়ার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে সংশ্লিষ্ট মহিলা কর্মীকে অবশ্যই আবেদন করতে হবে ।

**৫ (১)** ছুটির পূর্বে তিন মাসের বেতনের গড় হবে ছুটির বেতন ।

**৫ (২)** ছুটির পূর্বে এক বছরের মধ্যে কমপক্ষে ৮০ দিন কাজ করলে সবেতন ছুটির অধিকার জন্মাবে ।

**(৯)** গর্ভপাতের ক্ষেত্রেও এই সুবিধা পাওয়া যাবে , গর্ভপাতের তারিখ থেকে ছয় সপ্তাহ সবেতন ছুটি ।

**৬ (১)** গর্ভাবস্থার সুবিধাগুলো পাওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে দরখাস্ত করতে হবে ।

**৬ (৫)** প্রথম ছয় সপ্তাহের বেতন অগ্রিম পাওয়ার যাবে । মনোনীত ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট কর্মীর পক্ষে বেতন নিতে পারবেন ।

**(৮)** আড়াইশ টাকা মেডিকেল বোনাস পাবেন । (১৯৮৮ সালের সংশোধন)

১০ গর্ভকালীন অসুস্থতার কারণে অতিরিক্ত একমাস বেতন ছুটি পাওয়া যাবে ।

১১ প্রসবের পর ছুটি কাটিয়ে কাজে যোগ দিলে প্রতিদিন অতিরিক্ত দুই বার বিরতি পাবেন সন্তানের দেখাশোনার জন্য যতদিন না সন্তানের বয়স ১৫ মাস হচ্ছে।

১২ গর্ভাবস্থার দরুন ছুটি বা অনুপস্থিতির কারণে কোন মহিলা কর্মীকে কর্মচ্যুত করা বে - আইনী ।

১৩ কর্ম কাজ , হাল্কা কাজ বা সন্তানের দেখাশোনার জন্য বিরতির কারণে স্বাভাবিক বেতনের কোন অংশ কাটা বে - আইনী।

২১ এই আইনকে অমান্য করলে শাস্তির বিধান আছে কমপক্ষে ৩ মাস এবং সর্বাধিক এক বছরের কারাদন্ড । সঙ্গে সর্বনিম্ন দু'হাজার টাকা এবং সর্বাধিক পাঁচ হাজার টাকা ।

১৪ এই আইনকে কার্যকরী করার জন্য পরিদর্শক নিয়োগের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে সরকারকে।

## মানব অধিকার আইন - ১৯৯৩

এটি একটি কেন্দ্রীয় আইন । সংবিধান এবং আন্তর্জাতিক চুক্তিতে মানুষের যে সব মৌলিক অধিকার ঘোষণা করা হয়েছে সেইসব অধিকারকে সুরক্ষিত করার জন্য এই আইন প্রণয়ন করা হয়েছে ১৯৯৩ সালে ।

**২ ঘ ধারা -**

জীবন , স্বাধীনতা , সাম্য এবং ব্যক্তির মর্যাদা সুরক্ষিত করার ঘোষণা আছে আমাদের সংবিধানে , ১৯৯৬ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের দ্বারা স্বাক্ষরিত রাষ্ট্রসংঘের দলিলে ।

**৩ ধারা-**

মানুষের হাতেই মানুষের জীবন , স্বাধীনতা সমতা এবং মর্যাদার বার বার লুণ্ঠিত হয়েছে , আজও হচ্ছে । সবলের দ্বারা দুর্বলের জীবনের এই বঞ্চনা এবং নিপীড়নকে বন্ধ করার জন্য জাতীয় মানব অধিকার কমিশন গঠিত হয়েছে । সুপ্রীমকোর্টের একজন প্রাক্তন প্রধান বিচারপতিকে সভাপতি করে আরও চারজন সদস্যকে নিয়ে গঠিত হয়েছে এই কমিশন । এই চারজনের মধ্যে একজন সুপ্রীমকোর্টের বর্তমান বা প্রাক্তন বিচারপতি , একজন কোন হাইকোর্টের প্রাক্তন বা বর্তমান বিচারপতি এবং দুইজন বিশিষ্ট ব্যক্তি মানবাধিকার বিষয়ে যাঁদের যথেষ্ট জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আছে ।

**১২ ধারা -**

মানব অধিকার কমিশনকে যেসব গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব এই আইনে দেওয়া হয়েছে সেগুলো সংক্ষেপে নীচে বর্ণনা করা হলো ঃ-

১) মানব অধিকার লঙ্ঘন বা মানব অধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধ করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা

গ্রহণে নিযুক্ত সরকারী কর্মচারীর অবহেলা , এই দুইটি বিষয়ে কোন অভিযোগ পেলে বা অন্যভাবে জানতে পারলে কমিশন তদন্ত করবেন ।

২) মানব অধিকার সংক্রান্ত কোন বিচারাধীন মামলায় , আদালতের অনুমতি নিয়ে কমিশন অংশগ্রহন করতে পারেন।

৩) রাজ্য সরকারকে খবর দিয়ে সেই রাজ্যে অবস্থিত কারাগার বা আসামীদের রাখার জন্য অন্যান্য স্থান প্রতিষ্ঠানগুলো কমিশন পরিদর্শন করবেন এবং এইসব স্থানগুলো সুস্থভাবে বাস করার জন্য কতটা উপযুক্ত তা খতিয়ে দেখবেন ।বন্দীদের নিরাপত্তা , চিকিৎসা এবং সংশোধনের ব্যবস্থাগুলোও পরিদর্শনের আওতায় থাকবে ।

৪) সংবিধান ঘোষিত মানব অধিকারগুলো সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সরকারের কাছে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহনের সুপারিশ করবেন ।

৫) বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থা , বিশেষ করে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের ফলে যে সব স্থানে মানব অধিকার প্রতিষ্ঠায় বাধা সৃষ্টি হচ্ছে - কমিশন এইসব বাধা দূর করার জন্য সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পেশ করবেন ।

৬) মানব অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক বিভিন্ন চুক্তি নিয়ে গবেষণা করবেন , গবেষণা ক্ষেত্রে তৈরী করবেন এবং গবেষণা উৎসাহ দেবেন ।

৭) মানব অধিকার সম্পর্কে এবং সেই অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে যেসব ব্যবস্থা আছে সেসব সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করবেন , বেসরকারী সংস্থা সমূহকে মানব অধিকার নিয়ে কাজ করার জন্য উৎসাহ দেবেন ।

**১৩ নং ধারা -**

কমিশন যখন মানব অধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ নিয়ে তদন্ত করবেন তখন দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন , যেমন -

১) সাক্ষীকে শপথ নিয়ে সাক্ষ্য করতে পারবেন , যেমন -

২) কোন প্রয়োজনীয় দলিল কমিশনের কাছে পেশ করার আদেশ দিতে পারেন,

৩) এফিডেভিটে দেয়া কোন ব্যক্তির বক্তব্যকে প্রমাণ করতে পারেন,

৪) যে কোন আদালত থেকে বা সরকারী অফিস থেকে প্রয়োজনীয় নথী তলব করতে পারেন,

৫) সাক্ষী নেয়ার জন্য নথীপত্র দেখার জন্য কমিশন নিয়োগ করতে পারেন , কোন ব্যক্তিকে বিশেষ কোন তথ্য দেয়ার জন্য কমিশন কোন আদেশ দিলে সেই আদেশ পালনে ব্যক্তি বাধ্য থাকবেন। কোন প্রয়োজনীয় দলিল বা লিখিতকোন প্রমাণপত্র উদ্ধারের জন্য কিমশন বা কমিশনের দ্বারা নিযুক্ত অফিসার যে কোন স্থানে বা ঘরে প্রবেশ করতে পারবেন ।

**১৪ নং ধারা -**

তদন্তের উদ্দেশ্যে কমিশন কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের তদন্তকারী সংগঠন বা ব্যক্তির সাহায্য নিতে পারেন । কমিশনের নির্দেশে বা পক্ষে তদন্ত করার সময় তদন্তকারী অফিসার যে কোন ব্যক্তিকে ডাকতে পারেন , বক্তব্য নথীভুক্ত করতে পারেন , দলিলপত্র পেশ করার জন্য নির্দেশ দিতে পারেন , কোন অফিস থেকে সরকারী কাগজপত্র তলব করতে পারেন । তদন্ত শেষে কমিশনের কাছে রিপোর্ট জমা দিতে হবে ।

**১৫ নং ধারা-**

মনে রাখতে হবে কমিশনের কাছে দেয়া কোন বিবৃতি সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনভাবেই ব্যবহার করা যাবে না কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলায় প্রমাণ হিসাবে গ্রহণযোগ্য হবে না ।

**১৮ ধারা-**

তদন্তের শেষে যদি প্রমাণিত হয় যে মানব অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে অথবা মানব অধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে অবহেলা করা হয়েছে , সেইসব ক্ষেত্রে দোষী ব্যক্তির বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়ার জন্য কমিশন কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকারের কাছে সুপারিশ করতে পারবেন । সুপ্রীমকোর্টের কাছে উপযুক্ত নির্দেশ বা আদেশের জন্য আবেদন করতে পারবেন । মানব অধিকার লঙ্ঘনের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি বা তার পরিবারকে অন্তর্বর্তীকালীন সাহায্যের জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ করতে পারবেন ।

কমিশন তদন্ত রিপোর্টের প্রতিলিপি সরকার এবং অন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠাবেন । সরকার কতৃপক্ষ সেই রিপোর্টের উপর কি ব্যবস্থা নিয়েছেন এক মাসের মধ্যে কমিশনকে জানাবেন। একমাস সময় যথেষ্ঠ না হলে অতিরিক্ত সময় কমিশন অনুমোদন করতে পারেন ।

তদন্তের রিপোর্ট ও সেই রিপোর্টের উপর সরকারের মন্তব্য এবং যেসব ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তার বিবরণ কমিশন সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করবেন ।

**১৯ নং ধারা -**

সশস্ত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে মানব অধিকার ভঙ্গের অভিযোগে পাওয়া গেলে বা অন্য কোনভাবে জানা গেলে কমিশন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এ সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ চাইতে পারেন । সরকারী বিবরণ পাওয়ার পর কমিশন স্থির করবেন কী ধরনের সুপারিশ করা যেতে পারে । যে সুপারিশই করুন কেন্দ্রীয় সরকার কমিশনকে তিন মাসের মধ্যে জানাবেন কমিশনের সুপারিশগুলির উপর সরকার কী ব্যবস্থা নিয়েছেন ।

**২১ ও ২৯ নং ধারা -**

রাজ্য সরকার নিজস্ব মানব অধিকার কমিশন গঠন করতে পারেন । এই কমিশন শুধু রাজ্য

তালিকা ও যুগ্ম তালিকার বিষয়সমূহ নিয়ে অনুসন্ধান বা তদন্ত করতে পারেন । উচ্চ আদালতের একজন বর্তমান বা প্রাক্তন বিচারপতি , একজন বিচারপতি , একজন বর্তমান বা প্রাক্তন জেলা জজ এবং মানব অধিকার বিষয়ে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন দুই জন সদস্যকে নিয়ে এই কমিশন গঠন করা যেতে পারে । রাজ্য কমিশন গঠন বাধ্যতামূলক নয় । কেন্দ্রীয় কমিশনের প্রায় যাবতীয় ক্ষমতাই রাজ্য কমিশনের থাকবে ।

রাজ্য সরকার প্রতিটি জেলায় একজন দায়রা জজকে নিয়ে একটি মানব অধিকার আদালত গঠন করতে পারেন । মানব অধিকার সংক্রান্ত অপরাধগুলির বিচার করবে এই আদালত ।

# শিশু ও কিশোর কিশোরী সংক্রান্ত বিষয়ক আইন

## গর্ভপাত ঘটানো , ভূমিষ্ট হয়নি এমন শিশুর ক্ষতি করা ,শিশুকে অনাবৃত ক'রে রাখা এবং জন্ম গোপন ক'রে রাখা ইত্যাদি অপরাধ সম্পর্কে

**৩১২ ধারা** - গর্ভপাত ঘটালে ( Causing miscarriage ) কেউ যদি স্বেচ্ছাকৃতভাবে ( voluntarily) কোন সন্তানসম্ভবা মহিলার ( woman with child) গর্ভপাত ঘটায় এবং তা যদি সদ্ ( in good faith) ঐ মহিলার জীবন বাঁচাবার জন্য না করা হয়ে থাকে , তবে তার অনধিক তিন বছরের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ড, বা অর্থদন্ড বা উভয়বিধ দন্ড হবে , এবং ঐ মহিলা যদি অতিশীঘ্র সন্তান প্রসব করার অবস্থায় ( quick with child) থেকে থাকে , তবে অপরাধী অনধিক সাত বছরের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হবে এবং অর্থদন্ড দিতেও দায়ী হবে ।

* (অধর্তব্য ও জামিনযোগ্য অপরাধ)

ব্যাখা (Explanation) কোন মহিলা যদি নিজেই নিজের গর্ভপাত ঘটায় তবে সে নিজেই এই ধারামতে অপরাধী হবে ।

**৩১৩ ধারা** - মহিলাটির সম্মতি ছাড়া গর্ভপাত ঘটালে (Causing miscarriage without woman's consent ) কেউ যদি ৩১২ ধারায় বলা অপরাধ মহিলাটির সম্মতি (consent) ছাড়াই তবে তার , যাবজ্জীবন কারাদন্ড বা অনধিক দশ বছরের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ড হবে - তা ঐ মহিলা আসন্নপ্রসবা হয়ে থাকুক বা না থকুক।

* (ধর্তব্য ও জামিন অযোগ্য অপরাধ)

**৩১৪ ধারা** - গর্ভপাত করার উদ্দেশ্যে করা কাজে মৃত্যু ঘটলে ( Causing miscarriage without woman's consent ) কেউ যদি সন্তানসম্ভবা কোন মহিলার (woman with child)

গর্ভপাত ঘটানোর উদ্দেশ্যে কোন কাজ করে এবং কাজের ফলে যদি ঐ মহিলার মৃত্যু ঘটে, তবে তার অনধিক দশ বছরের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ড হবে এবং সে অর্থদন্ড দিতেও দায়ী হবে ।

ঐ কাজ মহিলাটির সম্মতি ছাড়া করা হলে ( If act done without woman's consent ) অপরাধী যাবজ্জীবন কারাদন্ডে বা উপরে বলা দন্ডে দন্ডিত হবে ।

ব্যাখ্যা (Explanation) এই ধারার অপরাধ হতে গেলে, ঐ কাজটি সম্ভবতঃ মৃত্যু ঘটাতে পারে বলে অপরাধীর জানতে হবে - এমন কোন প্রয়োজন নেই ।

**৩১৫ ধারা** - জীবিত শিশু যাতে না জন্মায় বা শিশু ভূমিষ্ট হবার পর তার যাতে মৃত্যু ঘটে এরূপ উদ্দেশ্যে কোন কাজ করা হলে (Act done with intent to prevent child born alive or to cause it to die after birth ) জীবিত শিশু যাতে না জন্মায় বা শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পর তার যাতে মৃত্যু ঘটে এরূপ উদ্দেশ্যে, কোন শিশুর জন্মের পূর্বে কেউ যদি - কোন কাজ করে এবং সেরূপ কাজের ফলে যদি ঐ শিশু জীবিত ( alive) না জন্মায়, বা ঐ শিশু ভূমিষ্ট হবার পর মারা যায় এবং ঐরূপ কাজ সদ্ভাবে ( in good faith) শিশুটির মায়ের (mother) এর জীবন বাঁচানোর উদ্দেশ্যে যদি করা না হয়ে থাকে, তবে সে অনধিক দশ বছরের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ডে বা অর্থদন্ডে বা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডিত হবে।

* (ধর্তব্য ও জামিন অযোগ্য অপরাধ)

**৩১৬ ধারা** - অপরাধজনক নরহত্যার তুল্য কোন কাজের দ্বারা শিঘ্র জন্ম নেবে এমন কোন শিশুর মৃত্যু ঘটে গেলে (Causing death of quick unborn child by act amounting to culpable homiside) কেউ যদি - এমন কোন পরিস্থিতিতে এমন কোন কাজ করে যে সেই কাজে মৃত্যু ঘটলে সে অপরাধজনক নরহত্যার ( culpable homicide এর ) অপরাধে অপরাধী হহত এবং সেরূপ কাজের দ্বারা সে যদি শিঘ্র জন্মাবে এমন কোন শিশুর ( quick UN born child) এর মৃত্যু ঘটায়, তবে সে অনধিক দশ বছরের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হবে, এবং অর্থদন্ড দিতেও দায়ী হবে।

**উদাহরণ (Illustration)**

A জানতো যে কোন একজন গর্ভবতী মহিলার সম্ভবত ঃ মৃত্যু ঘটাতে পারে । এরূপ জেনেও A ঐরূপ কাজ করলো । ঐ কাজের ফলে গর্ভবতী মহিলাটি মারা গেলে সে অপরাধজনক নরহত্যার (culpable homicide) এর অপরাধে অপরাধী হত । কিন্তু ঐ কাজের ফলে গর্ভবতী মহিলা মারা না গেলেও আহত (Injured) হল এবং তাতে ঐ মহিলার গর্ভে থাকা শিঘ্র জন্ম নিতে যাচ্ছে এমন শিশুটি (unborn quick child) মারা গেল । A এক্ষেত্রে এই ধারায় দন্ড পাবে ।

**৩১৭ ধারা** - ১২ বছরের কম বয়সী শিশুর পিতামাতা বা তত্ত্বাবধায়ক ঐরূপ শিশুদের অরক্ষিত

এবং পরিত্যাগ করলে ( Exposure and abandonment of child under twelve years , by parent or person having care of it) কেউ , - ১২ বছরের কম বয়সী কোন শিশুর পিতামাতা বা তত্ত্বাবধায়ক হয়েও ( having the care of such child) ঐ শিশুটিকে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ (abandoning) করার উদ্দেশ্যে , ঐ শিশুটিকে কোন স্থানে অরক্ষিত অবস্থায় রেখে চলে এলে বা ছেড়ে চলে গেলে , অনধিক সাত বছরের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ডে , বা অর্থদন্ডে , বা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডিত হবে ।

* (ধর্তব্য ও জামিনযোগ্য অপরাধ)

ব্যাখা ( Explanation ) ঐরূপ কোন শিশু ঐভাবে অরক্ষিত থাকার ফলে মারা গেলে ঘটনা অনুসারে খুন ( murder) বা অপরাধজনক নরহত্যার (culpable homicide ) এর অপরাধ হবে এবং এই ধারা অপরাধীর ঐ অপরাধের বিচারকে বাধা দেবার জন্য উদ্দিষ্ট নয় ।

।। আলোচনা ।।

একজন মহিলা তার সদ্যজাত শিশুটিকে একটি মন্দিরের দরজায় রেখে চলে এল ।তার উদ্দেশ্য ছিল শিশুটি মন্দিরের পুরোহিতের চোখে পড়বে এবং তার দ্বারা লালিত পালিত হবে ।এখানে ঐ মহিলাটি এই ধারামতে সাজা পাবে ।

**৩১৮ ধারা** - জন্ম গোপন করে রাখতে মৃতদেহ চুপি চুপি অপসারণ করলে (Concealment of birth by secret disposal of dead body ) কেউ , - কোন শিশুর মৃতদেহ ( শিশুটি জন্মের আগে মরে থাকুক বা পরে মরে থাকুক কিংবা জন্মের সময় মরে থাকুক - সেটা বিবেচ্য বিষয় নয় ) গোপন মাটিতে পুতেঁ বা অন্য কোন প্রকারে অপসারণ (disposing of) করে উদ্দেশ্যকৃতভাবে (intentionally) ঐ শিশুর জন্ম গোপন করলে বা তা করার চেষ্টা ( endeavours ) করলে অনধিক দু'বছরের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ডে , বা অর্থদন্ডে , বা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডিত হবে ।

* (ধর্তব্য ও জামিনযোগ্য অপরাধ)

# কিশোর কিশোরীদের সম্পর্কে ন্যায় - বিচার

## (শিশুদের যত্ন ও সুরক্ষা ) আইন , ২০০০ (২০০০ সালের ৫৬ নং আইন)

**১ ধারা** - সক্ষিপ্ত নাম , বিস্তৃতি এবং আরম্ভ Short title , extent and commencement)

(১) এই আইনকে ২০০০ সালের কিশোর - কিশোরীদের সম্পর্কে ন্যায় বিচার (শিশুদের যত্ন ও সুরক্ষা )আইন বলা যেতে পারে ।

২) এই আইন জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য বাদ দিয়ে ভারতবর্ষের সর্বত্র প্রযোজ্য।

৩) এই আইন ২০০১ সালের ১লা এপ্রিল থেকে কার্যকর হয়েছে ।

**।। আলোচনা ।।**

এই আইন দ্বারা ১৯৮৬ সালের কিশোর কিশোরীদের সম্পর্কে ন্যায়বিচার আইনটি অর্থাৎ Juvenile justice Act , 1986 বাতিল হয়ে গেছে ।

**২ ধারা** - সংজ্ঞাদি (Definitions) প্রসঙ্গ থেকে বিরুদ্ধ প্রতীয়মান না হলে এই আইনে -

(এ) উপদেষ্টা পর্ষদ (advisory board )বলতে এই আইনে ৬২ ধারায় গঠিত কেন্দ্রীয় বা কোন রাজ্য উপদেষ্টা পর্ষদ অথবা কোন জেলা ও নগর স্তরের উপদেষ্টা পর্ষদকে বুঝায় ।

(বি) ভিক্ষাবৃত্তি (begging) বলতে বুঝায় ঃ

(i) জনসাধারণের স্থানে ভিক্ষা চাওয়া বা নেওয়া অথবা কোনরূপ ভান করে হোক বা না হোক, ভিক্ষা চাওয়া বা নেওয়ার জন্য কোন ব্যক্তিগত স্থানাদিতে প্রবেশ করা

(ii) ভিক্ষা পাওয়ার বা আদায় করার লক্ষ্যে , নিজের বা অন্য কোন ব্যক্তির অথবা কোন পশুর ঘা, ক্ষত , আঘাত , বিকলাঙ্গতা বা রোগ অনাবৃত বা প্রদর্শন করে দেখানো,

(সি) পর্ষদ (Board) বলতে এই আইনের ৪ ধারায় গঠিত কিশোর কিশোরীদের ন্যায়বচিার পর্ষদকে বুঝায় ,

(ডি) যত্ন ও সুরক্ষার প্রয়োজন আছে এমন শিশু (Child in need of care and protection) বলতে এমন শিশুকে বুঝায় -

(i) যার কোন গৃহ বা স্থিতিবান স্থল বা আবাস নাই এবং যার খোরাকির প্রকাশ্য কোন বন্দোবস্ত নাই ।

(ii) যে এমন কোন ব্যক্তির সাথে (শিশুর অভিভাবক হোক বা না হোক ) বসবাস করে যে ব্যক্তি -

(এ) ঐ শিশুকে হত্যা বা আহত করার হুমকি দিয়েছে এবং ঐ হুমকি কার্যকর হওয়ার তথায় যথাযথ সম্ভাবনা আছে , বা

(বি) অন্য কোন শিশুকে বা শিশুদের হত্যা পিড়ন বা অবহেলা করেছে এবং প্রশ্নাধীন শিশুকে হত্যা , বকাঝকা বা অবহেলা ঐ ব্যক্তি করবে বলে তথায় যথাযথ সম্ভাবনা আছে ,

(iii) যে মানসিকভাবে বা শারীরিকভাবে অসুস্থ অথবা মরণরোগে আক্রান্ত বা আরোগ্য হবে না এমন অসুখে ভুগছে এবং যাকে ভরসা দেওয়ার বা যত্ন নেওয়ার কোথাও কেউ নেই ।

(iv) যার কোন পিতামাতা বা অভিভাবক আছে এবং ঐ পিতা বা মাতা বা অভিভাবক তার উপরে নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করতে অনুপযুক্ত বা অসমর্থ

(v) যার কোন পিতা বা মাতা নাই এবং কেউ তার দেখভাল করতে ইচ্ছুক নয় অথবা যার পিতামাতা তাকে পরিত্যাগ করেছে অথবা যে হারানো ও পালিয়ে যাওয়া শিশু এবং যার পিতামাতাকে যথাযথ অনুসন্ধান করেও পাওয়া যাবে না,

(vi) যাকে যৌন পিড়ন বা অবৈধ কাজের উদ্দেশ্যে জবরদস্ত পিড়ন, অত্যাচার বা শোষণ করা হচ্ছে অথবা সেরূপ করার সম্ভাবনা আছে ,

(vii) যাকে মাদক দ্রব্যের চোরাচালানের পক্ষে স্পর্শকাতর এবং সম্ভতঃ তাতে কাজে লাগান হবে বলে বোঝা যাচ্ছে,

(viii) যাকে অথাযথ মুনাফা অর্জনের জন্য পিড়ন করা হচ্ছে বা সম্ভবত ঃ হবে ,

(xi) যে , কোন সশস্ত্র সংঘর্ষ , অসামরিক গন্ডগোল বা প্রাকৃতিক দুযোর্গে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ,

(ই) শিশুদের আবাস (Children's home) বলতে

কোন রাজ্য সরকার বা স্বেচ্ছা সংগঠন কর্তক প্রতিষ্ঠিত এবং যে প্রতিষ্ঠান এই আইনের ৩৪ ধারার আওতায় ঐ সরকার কর্তৃক শংসায়িত ( Certified) হয়েছে ,

(এফ) সমিতি (Committee) বলতে এই আইনের ২৯ ধারায় গঠিত কোন শিশু কল্যাণ সমিতিকে বুঝায় ,

(জি) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ( Competeent authority) বলতে যত্ন ও সুরক্ষার প্রয়োজন আছে এমন কোন শিশু সম্পর্কে সমিতিকে এবং আইনের সাথে বিরোধ থাকা কিশোর - কিশোরী সম্পর্কে পর্ষদকে বুঝায় ,

(এইচ্) উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান ( Fit institution) বলতে

সরকারি বা রেজিস্ট্রীভূক্ত বেসরকারি সংগঠন বা কোন স্বেচ্ছা সংগঠন যা কোন শিশুর দায়দাযিত্ব নিতে প্রস্তুত এবং যে সংগঠনকে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত বলে বুঝতে পারেন ,

(জে) অভিভাবক (guardian) কোন শিশু সম্পর্কে অভিভাবক বলতে বুঝায় তার স্বাভাবিক অভিভাবককে অথবা অপর কোন ব্যক্তিকে যার কাছে ঐ শিশুর প্রকৃতপক্ষে দায়িত্ব বা নিয়ন্ত্রণ আছে এবং যাকে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ তাঁর কাছে কার্যবাহ চলাকালীন একজন অভিভাবক হিসাবে স্বীকৃত দেন,

(কে) কিশোর - কিশোরী ( Juvenile) বা শিশু (Child) বলতে এমন ব্যক্তিকে বুঝায় যে তার ১৮ বছর বয়স সম্পর্ণ করেনি ,

(এল) আইনের সাথে বিরোধে থাকা কিশোর কিশোরী (Juvenile in conflict with law) বলতে বুঝায় এমন কিশোর কিশোরী যে কোন অপরাধ করেছে বলে অভিকথিত হয় ,

(এম) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ (local authority ) বলতে বুঝায় -

গ্রামের ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত এবং জেলা স্তরে জেলা পরিষদ এবং মিউনিসিপাল কমিটি বা করপোরেশন

বা ক্যানট্নমেন্ট বোর্ড অথবা কর্তৃক স্থানীয় কতৃপক্ষ হিসাবে কাজ করতে আইনানুগভাবে অধিকার প্রাপ্ত অনুরূপ অন্যকোন সংস্থাও এর অর্ন্তভূক্ত,

(এন) চেতনানাশকারী মাদক দ্রব্য ( narcotic drug ) এবং মনোবিকারক পদার্থ (Phychotropic Substance ) বলতে ১৯৮৫ সালের চেতনানাশকারী মাদকদ্রব্য এবং মনোবিকারক পদার্থ আইনে (১৯৮৫ সালের ৬১ নং আইনে ) যথাক্রমে তাদের যে অর্থ করা হয়েছে তাকেই বুঝায় ,

(ও) পর্যবেক্ষণ আবাস (observation home ) বলতে বুঝায়-

কোন রাজ্য সরকার বা স্বেচ্ছা সংগঠন কর্তৃক কোন আবাস এবং যা আইনের সাথে বিরোধ থাকা কিশোর - কিশোরীর জন্য পর্যবেক্ষণ আবাস হিসাবে এই আইনের ৮ ধারার আওতায় ঐ রাজ্য সরকার কর্তৃক শংসায়িত (Certified)

(পি) অপরাধ ( Offence ) বলতে প্রচলিত যে কোন আইনে দন্ডনীয় কোন অপরাধকে বুঝায়,

(কিউ) নিরাপদ স্থান (Place of safety) বলতে এমন যে কোন স্থান বা প্রতিষ্ঠানকে ( যা থানা বা জেল নয় ) বুঝায় যার ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি কোন কিশোর - কিশোরীকে সাময়িকভাবে গ্রহণ করে দেখভাল করতে ইচ্ছুক আছেন এবং যে স্থান উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের মতামতে ঐ কিশোর কিশোরীর একটি নিরাপদ স্থান হতে পারে ,

(আর) ঘোষিত ( Prescribed ) বলতে এই আইনের আওতায় তৈরী নিয়মাবলীতে ঘোষিত কে বুঝায় ,

(এস) বন্ধুত্বপূর্ণ উপদেশ দ্বারা প্রথম অপরাধীদের সংশোধনার্থ নিযুক্ত অফিসার / প্রবেশন অফিসার (Probation Officer) বলতে ১৯৫৮ সালের ২০ নং আইনে ঐরূপ অফিসার হিসাবে নিযুক্ত ব্যক্তিকে বুঝায় ,

(টি) জনসাধারণের স্থান (Public place) বলতে ১৯৫৬ সালের ১০৪ নং আইনে অর্থাৎ ১৯৫৬ সালের অনৈতিক নিন্দার্হ বৃত্তি নিবারণী আইনে ' জনসাধারণের স্থানের ' যে অর্থ করা হয়েছে তাকেই বুঝাবে ,

(ইউ) আশ্রয় আবাস (Shelter home ) বলতে এই আইনের ৩৭ ধারায় স্থাপিত কোন আবাস বা আশ্রয় কেন্দ্রকে বুঝায়,

( ভি) বিশেষ আবাস (Special home ) বলতে বুঝায় কোন রাজ্য সরকার বা কোন স্বেচ্ছাসেবকসংগঠন কর্তৃক স্থাপিত কোন প্রতিষ্ঠান এবং যা এই আনির ৯ ধারার আওতায় ঐ রাজ্য সরকার কর্তৃক শংসায়িত ( Certified) হয়েছে ।

(ডাবলিউ ) কিশোর কিশোরীদের বিশেষ পুলিশ ইউনিট (Special juvenile police unit ) বলতে বুঝায় কোন রাজ্যর পুলিশ বাহিনীর একটি ইউনিট যা এই আইনের ৬৩ ধারার আওতায় কিশোর কিশোরী বা শিশুদের নিয়ে আচার - আচরণ করার জন্য আখ্যয়িত করা হয়েছে,

(একস্) রাজ্য সরকার (State Government ) বলতে কোন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সম্পর্কে সংবিধানের ২৩৯ অনুচ্ছেদের আওতায় রাষ্ট্রপতি কর্তৃকঐ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জন্য নিযুক্ত প্রশাসককে বুঝাবে ,

(আই) সকল শব্দ ও অভিব্যক্তি যা এই আইনে ব্যবহৃত হয়েছে কিন্তু এই আইনে সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি এবং যার ১৯৭৩ সালের ফৌজদারী কার্যপ্রণালী বিধিতে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে সেই সকল শব্দ ও অভিব্যক্তিগুলির অর্থ যথাক্রমে ঐ বিধিতে যা আছে তাই বুঝাবে ।

**৩ ধারা** - যে কিশোর - কিশোরী কিশোর - কিশোরীর পর্যায় থেকে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে তাদের সম্পর্কে কিশোর কিশোরী থাকাকালীন আরম্ভ হয়ে থাকা অনুসন্ধান চলতে থাকবে (Continuation of inquiry in respect of juvenile who has ceased to be a juvenile ] যে ক্ষেত্রে আইনের সাথে বিরোধ থাকা কিশোর কিশোরী অথবা যত্ন ও সুরক্ষার প্রয়োজন আছে এমন শিশুর বিরুদ্ধে কোন অনুসন্ধান আরম্ভ করা হয়েছে এবং ঐ অনুসন্ধান চলাকালীন উক্ত কিশোর কিশোরী বা শিশু - কিশোর কিশোরী বা শিশুর পর্যায় থেকে উত্তীর্ণ হয়ে যায় সেক্ষেত্রে এই আইন বা প্রচলিত অন্য কোন আইনে যাই বলা থাক না কেন , ঐ অনুসন্ধান চালিয়ে যাওয়া যেতে পারে এবং তাদের সম্পর্কে এমনভাবে আদেশ দেওয়া যেতে পারে যেন তারা তখনও কিশোর কিশোরী বা শিশুই আছে ।

## আইনের সাথে বিরোধ থাকা কিশোর কিশোরী
### Juvenile in conflict with law

**৪ ধারা** - কিশোর কিশোরী ন্যায়বিচার পর্ষদ [ Juvenile Justice Board ] (১) ১৯৭৩ সালের ফৌজদারী কার্যপ্রণালী বিধিতে যাই বলা থাক না কেন , রাজ্য সরকার সরকারি গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষিত কোন জেলা বা একাধিক জেলা নিয়ে গঠিত কোন অঞ্চলের জন্য আইনের সাথে বিরোধ থাকা কিশোর - কিশোরীদের সম্পর্কে এই আইনের আওতায় দেওয়া ক্ষমতাদি ও কর্তব্যাদি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে এক বা একাদিক কিশোর - কিশোরী ন্যায়বিচার পর্ষদ গঠন করতে পারেন ।

(২) পর্ষদ একজন মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা যেখানে যেমন হবে একজন প্রথম শ্রেণীর ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেট (Judicial Magistrate) এবং দুইজন সমাজসেবীকে ( যাদের মধ্যে অন্ততঃ

একজন মহিলা হবেন ) নিয়ে গঠিত হয়ে একটি ন্যায়পীঠ হবে এবং ঐরূপ প্রত্যেক ন্যায়পীঠের ১৯৭৩ সালের ফৌজদারী কার্যপ্রণালী বিধি একজন মেট্রপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটকে , যেখানে যেমন হবে, একজন প্রথম শ্রেণীর ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেটকে যে সকল ক্ষমতা দিয়েছে সেই সকল ক্ষমতাদি থাকবে এবং পর্ষদের ম্যাজিষ্ট্রেট প্রধান ম্যাজিস্ট্রেট (Principal Magistrate ) বলে আখ্যায়িত হবেন।

(৩) কোন ম্যাজিস্ট্রেট পর্ষদের সদস্য হিসাবে নিযুক্ত হতে পারবেন না যদি না তার শিশুমনস্তত্বে বা শিশু কল্যাণে বিশেষ জ্ঞান থাকে বা শিক্ষাপ্রাপ্ত হন এবং কোন সমাজসেবী পর্ষদের সদস্য হিসাবে নিযুক্ত হতে পারবেন না যদি না তিনি অন্ততঃ সাত বছর শিশুদের স্বাস্থ্য , শিক্ষা বা কল্যাণমূলক কাজে সক্রিয়ভাবে জড়িত না থেকে থাকেন ।

(৪) পর্ষদের সদস্যদের মেয়াদ এবং যে পদ্ধতিতে ঐরূপ সদস্য পদত্যাগ করতে পারেন তা যেরূপ ঘোষিত হতে পারে সেরূপে হবে ।

(৫) রাজ্য সরকার অনুসন্ধান করে যদি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি দেখতে পান তবে পর্ষদের যেকোন সদস্যের সদস্যপদ খারিজ করে দিতে পারেন , যথা -

(i) যদি কোন সদস্যকে এই আইনের ক্ষমতাদির অপপ্রয়োগ করেছেন বলে

(ii) যদি কোন সদস্য নৈতিক ভ্রষ্টাচারের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত ( convicted ) হয়ে থাকে , এবং ঐ দোষী সাব্যস্তকরণ বাতিল না হয়ে থাকে অথবা তাকে যদি ঐ অপরাধের সম্পর্কে পুরোপুরি ক্ষমা মঞ্জুর না করা হয় ,

(iii) যদি কোন সদস্য পরপর তিনমাস যথাযথ কোন কারণ ছাড়াই পর্ষদের কার্যবাহে উপস্থিত থাকতে ব্যর্থ হয় অথবা যদি তিনি কোন এক বছরে হওয়া মোট সভাগুলির তিন - চতুর্থাংশের কম সভায় উপস্থিত থাকতে ব্যর্থ হয় ।

**৫ ধারা- পর্ষদ সম্পর্কে কার্যপদ্ধতি আদি** [ Procedure etc in relation to Board ]

(১) পর্ষদ সেই সময়ে মিলিত হবে এবং তার সভাগুলিতে কাজকারবার সম্পর্কে কার্যপদ্ধতির সেই নিয়মাবলী পালন করবেন যেরূপ ঘোষিত হতে পারে ।

(২) যখন পর্ষদের সভা বসে না তখন আইনের সাথে বিরোধ থাকা শিশুকে পর্ষদের কোন ব্যক্তি সদস্যের কাজে হাজির করানো যেতে পারে ।

(৩) পর্ষদের কোন সদস্য অনুপস্থিত থাকলে ও পর্ষদ কাজ করতে পারেন , এবং কার্যবাহের কোন ধাপে কোন সদস্য অনুপস্থিত ছিলেন শুধুমাত্র এই কারণে পর্ষদের দেওয়া কোন আদেশ অকার্যকর (invalid) হবে নাঃ

শর্ত থাকে যে মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির সময়ে প্রধান ম্যাজিস্ট্রেট [ Principal Magistrate] সমেত অন্ততঃ দুইজন সদস্যকে উপস্থিত থাকতে হবে ।

(৪) অন্তবর্তী বা চূড়ান্ত নিষ্টত্তিতে সদস্যদের মধ্যে মত পার্থক্যের ক্ষেত্রে, সংখ্যাগুরুর মতামত প্রাধান্য পাবে, কিন্তু যেক্ষেত্রে ঐরূপ সংখ্যাগুরুর মতামত পাওয়া যায় না সেক্ষেত্রে প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেটের মতামতই প্রাধান্য পাবে ।

**৬ ধারা** - কিশোর - কিশোরী ন্যায়বিচার পর্ষদের ক্ষমতা [ Powers of Juvenile justice Board] (১) যেক্ষেত্রে কোন জেলা অথবা একাধিক জেলা নিয়ে গঠিত কোন এলাকার জন্য কোন পর্ষদ গঠিত সেক্ষেত্রে প্রচলিত অন্য আইনে যাই বলা থাক না কেন কিন্তু এই আইনে অন্যরূপে ব্যক্তভাবে যা বিধিত তা বাদ দিয়ে, ঐ পর্ষদের আইনের সাথে বিরোধ থাকা কিশোর - কিশোরীদের সম্পর্কে এই আইনের আওতায় সকল কার্যবাহ একান্তভাবে নিষ্পত্তি করার ক্ষমতা থাকবে ।

(২) এই আইনের দ্বারা বা তার আওতায় পর্ষদকে অর্পণ করা সকল ক্ষমতাদি হাইকোর্ট এবং সেশন কোর্টও প্রয়োগ করতে পারেন যখন তাদের সামনে আপীল রিভিসন বা ন্যাযভাবে কার্যবাহ (proceeding ) উপস্থিত হয় ।

**৭ ধারা** - এই আইনে ক্ষমতাপন্ন নন এমন ম্যাজিষ্ট্রেটকে যে পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে [ procedure to be followed by a magistrate not empowered under the Act] - (১) এই আইনে পর্ষদের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে ক্ষমতাসম্পন্ন নন এমন কোন ম্যাজিষ্ট্রেট যখন এই অভিমত পোষণ করেন যে এই আইনের কোন বিধানের আওতায় তার কাছে হাজির করানো (সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য হাজির করানোর ক্ষেত্র বাদ দিয়ে) কোন ব্যক্তি একজন কিশোর কিশোরী বা শিশু, তখন তিনি বিলম্ব না করে তাঁর অভিমত রেকর্ড করে ঐ কিশোর কিশোরী বা শিশুকে এবং কার্যবাহের রেকর্ডপত্রগুলিকে ঐ কার্যবাহের শাসনাধীন ক্ষেত্র সম্পূর্ণ উপযুক্ত কতৃপক্ষের নিকট পাঠিয়ে দেবেন।

(২) যে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে উপধারা (১) এর আওতায় কার্যবাহ (Proceeding ) পাঠান হয়েছে সেই কর্তৃপক্ষ এমনভাবে অনুসন্ধান করবেন যেন ঐ কিশোর কিশোরী বা শিশুকে ঐ কতৃপক্ষের কাছেই মূলত ঃ হাজির করানো হয়েছিল ।

**৮ ধারা** - পর্যবেক্ষণ আবাস (Observation homes ] (১) এই আইনের আওতায় অনুসন্ধান চলাকালীন আইনের সাথে বিরোধ থাকা যে কোন কিশোর - কিশোরীকে সাময়িকভাবে গ্রহণ করার জন্য যেকোন সরকার নিজেই অথবা স্বেচ্ছা সংগঠনের [ Voluntary Organisation] এর সাথে কোন চুক্তির আওতায় প্রত্যেক জেলায় বা কতগুলি জেলা নিয়ে গঠিত কোন এলকার জন্য প্রয়োজন হতে পারে, পর্যবেক্ষণ আবাস স্থাপন ও রক্ষা করতে পারেন ।

(২) যেক্ষেত্রে রাজ্য সরকার এই অভিমত পোষণ করেন যে উপধারা (১) এর আওতায় স্থাপিত বা রক্ষিত আবাস বাদ দিয়ে কোন প্রতিষ্ঠান এই আইনের আওতায় অনুসন্ধান চলাকালীন আইনের সাথে বিরোধ থাকা যেকোন কিশোর কিশোরীকে সাময়িকভাবে গ্রহণ করার পক্ষে উপযুক্ত সে ক্ষেত্রে

এই আইনের প্রয়োজনে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে পর্যবেক্ষন আবাস বলে শংসায়িত ( certify) করতে পারেন ।

৩) রাজ্য সরকার , কিশোর - কিশোরীর পুনর্বাসন ও সামাজিক সংহতির প্রয়োজনে যে সকল সেবা দান করা হবে এবং তার মান যা হবে সেই সকল বিষয় সহ পর্যবক্ষেণ আবাসের পরিচালনা এবং যে পরিস্থিতিতে এবং যেভাবে পর্যবেক্ষন আবাসের শংসাপত্র মঞ্জুর বা নামঞ্জুর হবে সেই বিষয়ে এই আইনের আওতায় নিয়মাবলীর মাধ্যমে বিধানাদি দিতে পারেন

(৪) প্রত্যেক কিশোর - কিশোরী যাদের পিতামাতা বা অভিভাবকের দায়িত্বে না রেখে পর্যবেক্ষা আবাসে পাঠান হয় তাদের প্রাথমিক অনুসন্ধান , যত্ন এবং দৈহিক ও মানসিক স্তর ও কৃত অপরাধের গুরুত্ব যথাযথ বিবেচনা করে বয়স অনুসারে যেমন সাত থেকে বারো বছর , বারো থেকে ষোল বছর এবং ষোল থেকে আঠারো বছর এমন দলে ভাগ করে বিন্যাস করার জন্য পরবর্তীকালে পর্যবেক্ষণ আবাসে গ্রহণ করার পূর্বে , প্রাথমিক পর্বে পর্যবেক্ষণ আবাসের অভ্যর্থনা রাখতে হবে ।

**৯ ধারা - বিশেষ আবাস (Special homes )** (১) এই আইনের আওতায় আইনের সাথে বিরোধ থাকা কিশোর - কিশোরীকে গ্রহণ ও পর্ববাসের জন্য যেকোন রাজ্য সরকার নিজেই বা স্বেচ্ছা সংগঠনের সাথে কোন চুক্তির আওতায় প্রত্যেক জেলায় বা কতগুলি জেলা নিয়ে গঠিত কোন এলাকার জন্য , যেরূপ প্রয়োজন হতে পারে , বিশেষ আবাস স্থাপন ও রক্ষা করতে পারেন ।

(২) যে ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার এই অভিমত পোষণ করেন যে উপধারা (১) এর আওতায় স্থাপিত বা রক্ষতি আবাস বাদ দিয়ে কোন প্রতিষ্ঠান এই আইনের আওতায় তথায় পাঠান হবে আইনের সাথে বিরোধ থাকা এমন কিশোর- কিশোরীকে গ্রহণ করার পক্ষে উপযুক্ত সেক্ষেত্রে এই আইনের প্রয়োজনে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ আবাস বলে শংসায়িত [ certify ] করতে পারেন ।

(৩) রাজ্য সরকার , কিশোর কিশোরীকে পুনঃসমাজবদ্ধ করার প্রয়োজনে সে সকল সেবা দান করা হবে এবং তার মান যা হবে সেই সকল বিষয় সহ বিশেষ আবাসের পরিচালনা এবং যে পরিস্থিতিতে এবং সে পদ্ধতিতে বিশেষ আবাসের শংসাপত্র মঞ্জুর বা নামঞ্জুর হবে সেই বিষয়ে এই আইনের আওতায় নিয়মাবলীর মাধ্যমে বিধানাদি দিতে পারেন ।

(৪) উপধারা (৩) এর আওতায় তৈরী নিয়মাবলী কিশোর কিশোরীর বয়স এবং তাদের করা অপরাধের প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে আইনের সাথে বিরোধে থাকা কিশোর কিশোরীর শ্রেণী বিন্যাস ও বিভক্ত করার বিধানও দিতে পারেন ।

**১০ ধারা** - আইনের সাথে বিরোধে থাকা কিশোর কিশোরীর গ্রেপ্তার [ Apprehension of Juvenile in conflict with law ] (১) আইনের সাথে বিরোধে থাকা কোন কিশোর - কিশোরীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করা মাত্রই তাকে কিশোর - কিশোরীদের বিশেষ পুলিশ ইউনিট বা

আখ্যায়িত পুলিশ অফিসারের (designated police officer) এর দায়িত্ব অর্পণ করতে হবে যিনি অবিলম্বে পর্ষদের কোন সদস্যের কাছে বিষয়টি রিপোর্ট করবেন ।

(২) রাজ্য সরকার এই আইনের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে নিম্নলিখিত নিয়মাবলী রচনা করতে পারেন , যথা -

(i) রেজিষ্ট্রীভুক্ত স্বেচ্ছা সংগঠনগুলি সমেত যে ব্যক্তি আইনের সাথে বিরোধ থাকা কোন কিশোর - কিশোরীকে পর্ষদের কাছে হাজির করতে পারবে - সেই বিষয়ে বিধানাদি ,

(ii) যে পদ্ধতিতে ঐরূপ কিশোর কিশোরীদের পর্যবেক্ষণ আবাসে পাঠানো যাবে - সেই বিষয়ে বিধানাদি -

**১১ ধারা**- কিশোর কিশোরীদের উপর হেফাজতগ্রহণকারীর নিয়ন্ত্রণ ( Control of custodian over juvenile ) এই আইনের মোতাবেক কোন কিশোর - কিশোরীকে যে ব্যক্তির জিম্মায় দেওয়া হয় সেই ব্যক্তি সম্পর্কিত আদেশ বলবৎ থাকাকালীন ঐ কিশোর কিশোরীর উপর তিনি তার পিতামাতা হয়ে থাকলে যেমন নিয়ন্ত্রণ থাকত তেমনই নিয়ন্ত্রণ থাকবে , এবং তিনি তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়ী থাকবেন , এবং ঐ কিশোর কিশোরীর উপর তার পিতামাতা বা অপর কোন ব্যক্তি যে দাবিই করে থাকুন না কেন , উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের বলে দেওয়া সময়কালের জন্য ঐ কিশোর কিশোরী তার জিম্মায় থেকে চলবে ।

**১২ ধারা** - কিশোর কিশোরীর জামিন (Bail of Juvenile ) (১) জামিনযোগ্য বা জামিন অযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে এবং যাকে কিশোর - কিশোরী বলে প্রতীয়মান হচ্ছে তাকে যখন গ্রেপ্তার বা আটক করা হয় অথবা সে কোন পর্ষদের কাছে হাজির হয় বা তাকে হাজির করানো হয় , তখন ১৯৭৩ সালের ফৌজদারী কার্যপ্রণালী বিধিতে বা প্রচলিত অন্য কোন আইনে যাই বলা থাক না কেন , ঐ ব্যক্তি জামিনদার সহ বা বিনা জামিনদারে জামিনে মুক্তি পাবে কিন্তু ঐ ব্যক্তিকে ঐরূপে মুক্তি দেওয়া হবে না যদি সেখানে ঐইরূপ বিশ্বাস করার যথাযথ কারণ দেখা যায় যে তাকে ঐরূপে মুক্তি দিলে সে সম্ভবতঃ পরিচিতি অপরাধীর সংস্পর্শে আসবে বা তা তাকে নৈতিক, দৈহিক বা মানসিক বিপদে ফেলবে অথবা তার মুক্তি বিচারের পরিণামকে পরাজিত করবে ।

(২) যখন ধৃত ঐ ব্যক্তিকে থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার উপধারা (১) এর আওতায় জামিনে মুক্তি দেন না তখন, উক্ত অফিসার যতক্ষন না ঐ পর্ষদের কাছে হাজির করাতে পারছেন ততক্ষণ ঘোষিত পদ্ধতিতে কোন পর্যবেক্ষন আবাসে রাখার ব্যবস্থা করবেন ।

(৩) যখন ঐ ব্যক্তি পর্ষদ কর্তৃক উপধারা (১) এর আওতায় জামিনে মুক্ত হন না তখন পর্ষদ , ঐ ব্যক্তিকে কারাগারে সোর্পদ করার পরিবর্তে , আদেশ দিয়ে অনুসন্ধান চলাকালীন আদেশে যেরূপ ঘোষিত হতে পারে সেরূপ সময়কালের জন্য কোন পর্যবেক্ষণ আবাসে বা কোন নিরাপদ স্থানে পাঠাবেন ।

**১৩ ধারা** - পিতামাতা , অভিভাবক বা প্রবেশন অফিসারকে সংবাদ প্রদান (In formation to parent , guardian or probation officer ] যেক্ষেত্রে কোন কিশোর কিশোরীকে গ্রেপ্তার করা হয় সেক্ষেত্রে থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার অথবা কিশোর কিশোরীদের বিশেষ পুলিশ ইউনিট যার কাছে ঐ কিশোর - কিশোরীকে হাজির করা হয় , তিনি বা উক্ত ইউনিট গ্রেপ্তার করার পর যতশীঘ্র সম্ভব ,-

(এ) ঐ কিশোর - কিশোরীর পিতামাতা বা অভিভাবককে পাওয়া গেলে গ্রেপ্তারের বিষয়ে তাদের সংবাদ দেবেন এবং তাদের পর্ষদের কাছে, যার কাছে , ঐ কিশোর - কিশোরী হাজির হবে , উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দেবেন , এবং

(বি) ঐ কিশোর কিশোরীর পূর্ব বৃত্তান্ত ও পারিবারিক ইতিহাস সম্বন্ধে এবং অনুসন্ধান পর্ষদের সম্ভবতঃ সহায়ক হবে এমন অপরাপর গুরুত্বপূর্ণ সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহে সমর্থ করতে ঐ প্রেপ্তারের বিষয়ে প্রবেশন অফিসারকে সংবাদ দেবেন ।

**১৪ ধারা** - কিশোর কিশোরীর বিষয়ে পর্ষদের অনুসন্ধান (Inquiry by Board regarding Juvenile ] যেক্ষেত্রে কোন কিশোর - কিশোরী অপরাধে দোষারোপিত হয়ে পর্ষদের কাছে পেশ হয় সেক্ষেত্রে পর্ষদ এই আইনের বিধানাদি মোতাবেক অনুসন্ধান করবেন এবং ঐ কিশোর কিশোরীর সম্পর্কে সেরূপ উপযুক্ত মনে করবেন সেরূপ আদেশ দিতে পারেন ।

শর্ত থাকে যে অনুসন্ধান আরম্ভ হওয়ার দিন থেকে চার মাসের মধ্যে অনুসন্ধানটি সম্পন্ন করতে হবে , যদি না ক্ষেত্রটির পরিস্থিতি বিবেচনা করে এবং বিশেষ পরিস্থিতিতে লিখিতভাবে কারণাদি নথিভুক্ত করে ঐ সময়কাল পর্ষদ বাড়িয়ে দেন ।

**১৫ ধারা** - কিশোর - কিশোরীর বিষয়ে যে আদেশ দেওয়া যেতে পারে ( Order that may be passed regarding Juvenile ] (১) যেক্ষেত্রে অনুসন্ধান করে পর্ষদ সন্দেহমুক্ত হন যে কোন কিশোর কিশোরী কোন একটি অপরাধ করেছে সেক্ষেত্রে প্রচলিত অন্যকোন আইনে বিরুদ্ধে যাই বিধান দেওয়া থাক না কেন , পর্ষদ যদি উপযুক্ত মনে করেন -

(এ) ঐ কিশোর কিশোরীর বিরুদ্ধে যথাযথ অনুসন্ধান করার পরে এবং পিতামাতা বা অভিভাবক ও ঐ কিশোর কিশোরীকে মন্ত্রণা দেওয়ার পরে উপদেশ দিয়ে বা সতর্ক করে ঐ কিশোর কিশোরীকে বাড়িতে যাওয়ার অনুমতি দিতে পারেন।

(বি) দলবদ্ধ মন্ত্রণা এবং অনুরূপ কার্যকলাপ ঐ কিশোর - কিশোরীকে অংশগ্রহণ করার নির্দেশ দিতে পারেন ,

(সি) সমষ্টির সেবাকার্য সম্পাদন করার জন্য ঐ কিশোর - কিশোরীকে আদেশ দিতে পারেন ,

(ডি) ঐ কিশোর - কিশোরীর পিতামাতা বা ঐ কিশোর - কিশোরীকেই , যদি সে ১৪ বছরের

বেশী বয়েসী হয় ও অর্থ উপার্জন করে , অর্থদন্ড দেওয়ার আদেশ দিতে পারেন ,

(ই) ঐ কিশোর কিশোরী সৎ আচরণ করবে এবং তাকে পিতামাতা , অভিভাবক বা অপরাপর উপযুক্ত ব্যাক্তির তত্ত্বাবধানে রাখতে হবে যারা অনধিক তিন বছরের সময়কালের জন্য ঐ কিশোর - কিশোরীর ভাল ব্যবহার ও তার মঙ্গলের জন্য , পর্ষদ যেরূপ চাইতে পারেন সেরূপে জামিন সহ বা বিনা জামিনে মুচলেকা (bond) সম্পাদন করবেন - এই শর্তে ঐ কিশোর কিশোরীকে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দিতে পারেন ।

(এফ্) ঐ কিশোর কিশোরী সৎআচরণ করবে এবং অনধিক তিন বছর সময়কালের জন্য ঐ কিশোর - কিশোরীর ভাল ব্যবহার এবং মঙ্গলের জন্য তাকে কোন উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে রাখতে হবে এই শর্তে ঐ কিশোর কিশোরীকে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দিতে পারেন ।

(জি) কিশোর - কিশোরীকে বিশেষ আবাসে পাঠানোর নির্দেশ দিয়ে আদেশ দিতে পারেন -

(i) ১৭ বছরের বেশী কিন্তু ১৮ বছরের কম বয়েসী কিশোর - কিশোরীর ক্ষেত্রে দুই বছরের কম নয় এরূপ কোন সময়কালের জন্য ,

(ii) অন্য কোন কিশোর - কিশোরীর ক্ষেত্রে যতক্ষণ না তার কিশোরকাল উত্তীর্ণ হয় সেই সময়কালের জন্য ,

শর্ত থাকে যে পর্ষদ , অপরাধের প্রকৃতি এবং ক্ষেত্রটির পরিস্থিতি বিবেচনা করে যদি সন্দেহমুক্ত হন তবে কারণাদি নথিভুক্ত করে বিশেষ আবাসে থাকার সময়কাল যেরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করতে পারেন সেরূপ সময়কালের জন্য কমাতে পারেন ।

(২) পর্ষদ হয় প্রবেশন অফিসার বা স্বীকৃত স্বেচ্ছা সংগঠনের মাধ্যমে বা অন্যভাবে কিশোর - কিশোরীর সামাজিক তদন্ত প্রতিবেদন সংগ্রহ করবেন , এবং কোন আদেশ দেওয়ার আগে ঐ প্রতিবেদনটি বিবেচনা করবেন ।

(৩) যেক্ষেত্রে উপধারা (১) এর (ডি) , (ই) বা (এফ্) এর আওতায় কোন আদেশ দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে পর্ষদ যদি এই অভিমত পোষণ করনে যে কিশোর কিশোরীর এবং জনসাধারণের স্বার্থে এটা করা যথাযথ হবে তবে উক্ত আদেশের অতিরিক্ত এরূপ একটি আদেশ দিতে পারেন যে আইনের সাথে বিরোধে থাকা কিশোর কিশোরী অনধিক তিন বছরের কোন সময়কালের জন্য আদেশে বলে দেওয়া কোন প্রবেশন অফিসারের তত্ত্বাবধানে থাকবেন এবং ঐরূপ তত্ত্বাবধান করার আদেশ আইনের সাথে বিরোধে থাকা কিশোর কিশোরীর যথাযথ তত্ত্বাবধানের জন্য যেরূপ প্রয়োজন বলে মনে হবে সেরূপ শর্তাদি অরোপ করতে পারেন ।

শর্ত থাকে যে প্রবেশন অফিসারের কাছ থেকে প্রতিবেদন পেয়ে বা অন্যভাবে , পরবর্তী কোন সময়ে , যদি এটি পর্ষদের কাছে প্রতীয়মান হয় যে আইনের সাথে বিরোধ থাকা কিশোর - কিশোরী

তত্ত্বাবধানে থাকাকালীন ভাল ব্যবহার করেনি অথবা উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান যার তত্ত্বাবধানে কিশোর কিশোরীকে রাখা হয়েছিল সেই প্রতিষ্ঠান কিশোর কিশোরীর ভাল ব্যবহার ও তার মঙ্গল সুনিশ্চিত করতে আর পারছে না বা ইচ্ছুকও নয় সেক্ষেত্রে যেরূপ উপযুক্ত বলে মনে করতে পারেন সেরূপ অনুসন্ধানের

পর , আইনের সাথে বিরোধ থাকা কিশোর কিশোরীকে কোন বিশেষ আবাসে ( special home) এ পাঠানোর আদেশ দিতে পারেন ।

(৪) পর্ষদ উপধারা (৩) এর আওতায় তত্ত্বাবধানের আদেশ দেওয়ার সময় কিশোর কিশোরী এবং পিতামাতা , অভিভাবক বা অপরাপর উপযুক্ত ব্যক্তি বা উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানকে , যেখানে যেমন হতে পারে , যার তত্ত্বাবধানে কিশোর - কিশোরীকে রাখা হয়েছে তাকে অভিভাবক বা অপরাপর উপযুক্ত ব্যক্তি বা উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানকে , যেখানে যেমন হতে পারে জামিনদারকে , যদি কেউ থাকেন, এবং প্রবেশন অফিসারকে তত্ত্বাবধান আদেশের একটি করে কপি দেবেন ।

**১৬ ধারা** - কিশোর কিশোরীর বিরুদ্ধে যে আদেশ দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয় [ Order that may not be passed against Juvenile ] (১) প্রচলিত অন্য কোন আইনে বিরুদ্ধে যাই বলা থাক না কেন, আইনের সাথে বিরোধে থাকা কোন কিশোর কিশোরীকেই মৃত্যুদন্ড বা যাবজ্জীবন কারাদন্ড দেওয়া যাবে না , বা অর্থদন্ড দেওয়ার খেলাপে বা জামিনদার দেওয়ার ব্যর্থতার জন্য কারাগারে সোর্পদ করা যাবে না ,

শর্ত থাকে যে যেক্ষেত্রে ১৬ বছরে পা দেওয়া কোন কিশোর কিশোরী কোন একটি অপরাধ করে এবং পর্ষদ সন্দেহমুক্ত হন যে করা ঐ অপরাধটি এমনই মারাত্মক প্রকৃতির বা ঐ কিশোর - কিশোরীর আচরণ ও ব্যবহার এমনই যে ঐ কিশোর - কিশোরীর নিজ স্বার্থে বা বিশেষ আবাসের অপর কিশোর - কিশোরীর স্বার্থে তাকে বিশেষ আবাসে পাঠানো ঠিক হবে না এবং এই আইনে বিধিত অপর কোন উপায়ই তার পক্ষে উপযুক্ত বা পর্যাপ্ত নয় সেক্ষেত্রে পর্ষদ আইনের সাথে বিরোধ থাকা কিশোর - কিশোরীকে যেরূপ যথাযথ মনে করবেন সেরূপ নিরাপদ স্থানে এবং সেরূপ পদ্ধতিতে রাখার আদেশ দিতে পারেন এবং রাজ্য সরকারের আদেশের জন্য বিষয়টি রিপোর্ট করবেন ।

(২) রাজ্য সরকার উপধারা (১) এর আওতায় পর্ষদের থেকে রিপোর্ট পাওয়ার পর ঐ কিশোর - কিশোরীর সম্পর্কে যেরূপ উপযুক্ত মনে করবেন সেরূপ ব্যবস্থাদি নিতে পারেন এবং ঐ কিশোর - কিশোরীকে সেরূপ স্থানে ও সেরূপ শর্তে সংরক্ষণ জিম্মায় [ Protective custody ] তে রাখার আদেশ দিতে পারেন যেরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করবেন ,

শর্ত থাকে যে ঐরূপ আদেশ দেওয়া আটকের সময়কাল ঘটানো ঐ অপরাধের জন্য ঐ কিশোর কিশোরী সবোর্চ্চ যে মেয়াদে দন্ডিত হয়ে থাকতে পারত তার অতিরিক্ত হবে না ।

**১৭ ধারা** - ফৌজদারী কার্যপ্রণালী বিধির আট অধ্যায়ের আওতায় কার্যবাহ্ কিশোর কিশোরীর বিরূদ্ধে উপযুক্ত নয় । [Proceeding under chapter VIII of the Code of Criminal Procedure not competent against Juvenile ] ১৯৭৩ সালের ফৌজদারী কার্যপ্রণালী বিধিতে (১৯৭৪ সালের ২ নং আইনে ) বিরুদ্ধে যাই বলা থাক না কেন , ঐ বিধির আট অধ্যায়ের আওতায় কিশোর - কিশোরীর বিরুদ্ধে কোন কার্যবাহ [ Proceeding ] রুজু করা যাবে না এবং কোন আদেশ দেওয়া যাবে না ।

**১৮ ধারা** - কিশোর কিশোরী এবং কিশোর -কাল উত্তীর্ণ কোন ব্যক্তির যৌথভাবে কার্যবাহ্ হবে না [ No Joint proceeding of juvenile not a juvenile ] (১') ১৯৭৩ সালের ফৌজদারী কার্যপ্রণালী বিধির (১৯৭৪ সালের ২ নং আইনের )২২৩ ধারায় বা প্রচলিত অন্য কোন আইনে যাই বলা থাক না কেন , কোন কিশোর - কিশোরীকে কোন অপরাধের জন্য কিশোর - কিশোরী নয় এমন কোন ব্যক্তির সাথে দোষারোপিত করা যাবে না বা বিচার করা যাবে না ।

(৩) যদি কোন কিশোর কিশোরী এমন কোন অপরাধে অভিযুক্ত হয় যে তার জন্য ১৯৭৩ সালের ফৌজদারী কার্যপ্রণালী বিধির (১৯৭৪ সালের ২ নং আইনের ) ২২৩ ধারায় অথবা প্রচলিত অন্য কোন আইনে ঐ কিশোর কিশোরীর , উপধারা (১) এ বলে দেওয়া নিষেধাজ্ঞাটি না থাকলে , কিশোর কিশোরী নয় এমন অন্য কোন ব্যক্তির সাথে যৌথভাবে দোষারোপ হতে পারত , তাহলে সেক্ষেত্রে ঐ অপরাধ গ্রাহ্যকারী পর্ষদ ঐ কিশোর কিশোরী এবং কিশোরকাল উত্তীর্ণ অপর ব্যক্তিটির পৃথক বিচার করার জন্য নির্দেশ দেবেন ।

**১৯ ধারা** - দোষী সাব্যস্তকরণের সাথে যুক্ত থাকা অযোগ্যতার অপসারণ [Removal of disqualification to conviction ] (১) অন্য যেকোন আইনে যাই বলা থাক না কেন , কোন কিশোর কিশোরী যে কোন অপরাধ করেছে এবং এই আইনের বিধানাদি মোতাবেক আচরিত হয়েছে সে ঐরূপ আইনের আওতায় দোষীসাব্যস্তকরণের (Conviction এর ) সাথে যুক্ত কোন অযোগ্যতা (Disqualification ) ভোগ করবে না ।

(২) আপীলের সময়কাল বা নিয়মাবলীর মাধ্যমে যেরূপ ঘোষিত হতে পারে সেরূপ যুক্তিসঙ্গত কোন সময়কাল , যেখানে যেমন হতে পারে , অতিক্রান্ত হওয়ার পর ঐরূপ দোষীসাব্যস্তকরণের প্রাসঙ্গিক রেকর্ডপত্রাদি সরিয়ে ফেলতে হবে বলে নির্দেশ দিয়ে পর্ষদ একটি আদেশ দেবেন ।

**২০ ধারা** - চলতে থাকা মামলাদির বিষয়ে বিশেষ বিধানাদি [ Special provision in respect of pending cases ) এই আইনে যাই বলা থাক না কেন , যে দিন এই আইন কার্যকর হল সেই দিন কোন এলাকায় কোন আদালতে কোন কিশোর - কিশোরীর সম্পর্কে চলতে থাকা সকল কার্যবাহ্ ঐ আদালতে এমন ভাবে চলতে থাকবে যেন এই আইন চালু হয়নি এবং ঐ আদালত যদি

দেখেন যে ঐ কিশোর কিশোরী কোন অপরাধ করেছে তবে সেই আদালত তাঁর সিদ্ধান্ত রেকর্ড করবেন এবং ঐ কিশোর কিশোরীর সম্পর্কে কোন দন্ড দেওয়ার পরিবর্তে ঐ কিশেআর কিশোরীকে পর্ষদের কাছে পাঠিয়ে দেবেন এবং পর্ষদ তখন ঐ কিশোর কিশোরী সম্পর্কে এই আইনের বিধানাদি মোতাবেক এমন আদেশ দেবেন যেন পর্ষদ এই আইনের আওতায় অনুসন্ধান করে সন্দেহমুক্ত হয়েছেন যে ঐ কিশোর কিশোরী ঐ অপরাধটি করেছে ।

**২১ ধারা** - এই আইনের আওতায় কোন কার্যবাহে জড়িত কিশোর - কিশোরীর নাম ইত্যাদি সর্বসাধারণ্যে প্রকাশ করা নিষিদ্ধ [ prohibition of publication of name etc, of juvenile involved in any proceeding under the Act ]

(১) এই আইনের আওতায় আইনের সাথে বিরোধ থাকা কোন কিশোর কিশোরীর সম্পর্কে কোন অনুসন্ধানের বিষয়ে খবরের কাগজ , ম্যাগাজিন , সংবাদপত্র পত্রিকা অথবা দর্শন সংক্রান্ত মাধ্যমে (অর্থাৎ টি.ভি.সিনেমা ইত্যাদিতে) করা কোন রিপোর্ট ঐ কিশোর - কিশোরীর নাম , ঠিকানা বা স্কুল বা তাকে সনাক্ত করতে পারে এমন অন্যকোন বিশদ ব্যাখা প্রকাশ করবে না এবং ঐরূপ কোন কিশোর কিশোরীর কোন ছবিও সর্বসাধারণ্যে প্রকাশ করবে না ।

শর্ত থাকে যে অনুসন্ধানকারী কতৃপর্ক্ষ লিখিতভাবে কারণ নথিবদ্ধ ক'রে ঐরূপ বিষয়গুলি প্রকাশের অনুমতি দিতে পারেন , যদি তাঁর মতামতে ঐরূপ বিষয়গুলির প্রকাশ করা ঐ কিশোর - কিশোরীর স্বার্থেই হয়ে থাকে ।

(২) কেউ উপধারা (৩) এর বিধানাদি লঙ্ঘন করলে অনধিক এক হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হবে ।

**২২ ধারা** - পালিয়ে যাওয়া কিশোর কিশোরী বিষয়ে বিধানাদি [ provision in respect pof escaped juvenile ] প্রচলিত অন্য কোন আইনে বিরুদ্ধ যাই বলা থাক না কেন , আইনের সাথে বিরোধ থাকা কিশোর কিশোরী কোন বিশেষ আবাস বা কোন পর্যবেক্ষণ আবাস বা যে ব্যক্তির দায়িত্বে এই আইনের আওতায় তাকে রেখা হয়েছে , সেখান থেকে পালিয়ে গেলে তাকে যেকোন পুলিশ অফিসার ওয়ারেন্ট ছাড়াই জিম্মায় নিতে পারেন এবং তখন তাকে সেই বিশেষ আবাস বা পর্যবেক্ষণ আবাস বা সেই ব্যক্তির কাছে , যেখানে যেমন হতে পারে , ফেরত পাঠিয়ে দেবেন , এবং ঐরূপ পালিয়ে যাওয়ার কারণে ও ঐ কিশোর কিশোরীর সম্পর্কে কোন কার্যবাহ রুজু হবে না , কিন্তু বিশেষ আবাস , বা পর্যবেক্ষণ আবাস বা সেই ব্যক্তি , ঐ কিশোর কিশোরীর সম্পর্কে যে পর্ষদ আদেশ দিয়েছিলেন সেই পর্ষদকে সংবাদটি দিয়ে , ঐ কিশোর কিশোরী সম্পর্কে এই আইনের আওতায় যেরূপ প্রয়োজন বলে মনে হতে পারে সেরূপ পদক্ষেপ নিতে পারেন ।

**২৩ ধারা** - কিশোর কিশোরী বা শিশুর প্রতি নিষ্ঠুরতার দন্ড ( (Punishment for cruelty to juvenile or child) যে ব্যক্তির কোন কিশোর- কিশোরী বা শিশুর উপরপ্রকৃত দায়িত্ব বা নিয়ন্ত্রণ আছে সেইরূপ কোন ব্যক্তি যদি ঐ কিশোর কিশোরী বা শিশুকে হঠাৎ আক্রমণ করে , পরিত্যাগ করে বিপন্ন করে বা ইচ্ছা করে অবহেলা করে অথবা এমনভাবে তাকে আক্রমণ , পরিত্যাগ, বিপন্ন বা অবহেলা করার বা করানোর চেষ্টা করে যে তা সম্ভবতঃ ঐ কিশোর কিশোরী বা শিশুর অযথা মানসিক ও দৈহিক যন্ত্রণা ভোগ করেবে , তবে সেই ব্যক্তি অনধিক ছয় মাসের কারাদন্ডে বা অর্থদন্ডে , বা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডনীয় হবে ।

**২৪ ধারা** - ভিক্ষাবৃত্তিতে কিশোর কিশোরী বা শিশুকে নিয়োগ [ Employment of juvenile or child for begging ] (১) কেউ কোন কিশোর কিশোরী বা শিশুকে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োগ করলে বা ব্যবহার করলে অথবা কোন কিশোর কিশোরী বা শিশুকে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োগ করলে বা ব্যবহার করলে অথবা কোন কিশোর - কিশোরীকে ভিক্ষা করালে অনধিক তিন বছরের কারাদন্ডে দন্ডনীয় হবে এবং অর্থদন্ডেও দায়ী হবে ।

(২) যে ব্যক্তি কোন কিশোর - কিশোরী বা শিশুর প্রকৃত দায়িত্ব আছে সেরূপ কোন ব্যক্তি উপধারা (১) এর আওতায় দন্ডনীয় কোন অপরাধ করার জন্য প্ররোচনা দিলে অনধিক এক বছরের কারাদন্ডে দন্ডনীয় হবে এবং অর্থদন্ড দিতেও দায়ী হবে ।

**২৫ ধারা** - কিশোর কিশোরী বা শিশুকে উত্তেজক সুরা বা চেতনানাশকারী মাদকদ্রব্য বা মনোবিকারক পদার্থ দেওয়ার দন্ড [ penalty for giving intoxicating liquor or narcotic drug or phychotropic substance to juvenile or child ] যদি কেউ কোন কিশোর - কিশোরী বা শিশুকে , যথাযথ ডাক্তারের আদেশ বা অসুস্থতার ক্ষেত্র বাদ দিয়ে , জনসাধারণের কোন স্থানে উত্তেজক সুরা দেয় বা দেওয়ায় অথবা কোন চেতনানাশকারী মাদকদ্রব্য বা মনোবিকারক পদার্থ দেয় বা দেওয়ায তবে সে অনধিক তিন বছরের কারাদন্ডে দন্ডনীয় হবে এবং অর্থদন্ড দিতেও দায়ী হবে ।

**২৬ ধারা** - কিশোর কিশোরী বা শিশুকর্মীকে শোষণ [ Explotitation of juvenile or child employee ] যদি কেউ কোন কিশোর কিশোরী বা শিশুকে বিপজ্জনক কাজের জন্য প্রকাশ্যে সংগ্রহ করে , দাসত্ববন্ধনে রাখে এবং তার রোজগার আটকিয়ে রাখে বা ঐ রোজগার নিজ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে তবে সে অনধিক তিন বছরের কারাদন্ডে দন্ডনীয় হবে এবং অর্থদন্ড দিতেও দায়ী হবে।

**২৭ ধারা** - বিশেষ অপরাধদি [ Special offences] এই আইনের ২৩, ২৪ , ২৫ এবং ২৬ ধারার অপরাধগুলি ধর্তব্য অপরাধ হবে ।

**২৮ ধারা** - বিকল্প দন্ড [ Alternative punishment ] যেক্ষেত্রে কোন কাজ বা কাজ থেকে

বিরাত থাকা এই আইনের আওতায় এবং অন্য কোন কেন্দ্রীয় বা রাজ্য আইনের আওতাতেও দন্ডনীয় অপরাধ হয় , সেক্ষেত্রে প্রচলিত যেকোন আইনে যাই বলা থাক না কেন , ঐ অপরাধে দোষী পাওয়া অপরাধী কেবলমাত্র সেই আইনের আওতায় দন্ডনীয় হবে যে আইনে দন্ডের পরিমাণ অধিকতর।

## যত্ন ও সুরক্ষার প্রয়োজন আছে এমন শিশু

**২৯ ধারা - শিশু কল্যাণ সমিতি [ Child Welfare Commottee ]**

(১) রাজ্য সরকার সরকারি গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে বলে দেওয়া , প্রত্যেক জেলা বা একাধিক জেলা নিয়ে গঠিত কোন অঞ্চলের জন্য যত্ন ও সুরক্ষার প্রয়োজন আছে এমন শিশুর সম্পর্কে এই আইনের আওতায় দেওয়া ক্ষমতা ও কর্তব্যসকল সম্পাদনের উদ্দেশ্যে এক বা একাধিক শিশু কল্যাণ সমিতি গঠন করতে পারেন ।

(২) ঐ সমিতি একজন চেয়ারপার্সন ও অন্য চারজন সদস্য নিয়ে , যেমন রাজ্য সরকার নিয়োগ করার জন্য সঠিক বলে মনে করতে পারেন , গঠিত হবে , যাদের মধ্যে অন্ততঃ একজন মহিলা থাকবেন এবং অপর একজন শিশুদের বিষয়ে বিশেষজ্ঞ থাকবেন ।

(৩) চেয়ারপার্সন ও সদস্যদের গুণাবলী এবং তাদের যে মেয়াদকালের জন্য নিয়োগ করা যেতে পারে তা যেরূপে ঘোষিত হতে পারে সেরূপে হবে ।

(৪) রাজ্য সরকার অনুসন্ধান করে যদি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি দেখতে পান তবে সমিতির যেকোন সদস্যের সদস্যপদ খারিজ করে দিতে পারেন , যথা-

(i) যদি কোন সদস্যকে এই আইনের ক্ষমতাদির অপপ্রয়োগ করেছেন বলে দোষী করা যায় ,

(ii) যদি কোন সদস্য নৈতিক ভ্রষ্টাচারের অপরাধে দোষীসাব্যস্ত হয়ে থাকে , এবং ঐ দোষীসাব্যস্তকরণ বাতিল না হয়ে থাকে অথবা তাকে যদি ঐ অপরাধের সম্পর্কে পুরোপুরি ক্ষমা মঞ্জুর না করা হয় ,

(iii) যদি কোন সদস্য পরপর তিন মাস যথাযথ কোন কারণ ছাড়াই সমিতির কার্য বাহে উপস্থিত থাকতে ব্যর্থ হয় অথবা যদি তিনি কোন এক বছরে হওয়া মোট সভাগুলির তিন চতুর্থাংশের কম সভায় উপস্থিত থাকতে ব্যর্থ হয় ।

(৫) সমিতি ম্যাজিস্ট্রেটদের একটি বিচারকমন্ডলী/ ন্যায়পীঠ (Bench ) হিসাবে কাজ করবেন এবং ১৯৭৩ সালের ফৌজদারী কার্যপ্রণালী বিধি (১৯৭৪ সালের ২নং আইন ) মেট্রপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটকে , অথবা যেখানে যেমন হবে , ১ম শ্রেণীর ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেটকে যে ক্ষমতা অর্পণ করেছে সমিতির সেই সকল ক্ষমতাই থাকবে ।

**৩০ ধারা - সমিতি** সম্পর্কিত কার্যপদ্ধতি ইত্যাদি [ Procedure , etc , in realtion to committee ] (১) সমিতি সেই সময়ে মিলিত হবে এবং তার সভাগুলিতে কাজকরবার সম্পর্কে

কার্যপদ্ধতির সেই নিয়মাবলী পালন করবেন যেরূপ ঘোষিত হতে পারে ।

(২) যখন সমিতির সভা বসে না তখন যত্ন ও সুরক্ষার প্রয়োজন আছে এমন শিশুর নিরাপদ জিম্মায় বা অন্য কোনভাবে রাখার জন্য শিশুকে সমিতির কোন ব্যক্তি সদস্যের কাছে হাজির করানো যেতে পারে ।

(৩) অন্তবর্তী সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে সমিতির সদস্যদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য দেখা দিলে সংখ্যাগুরু সদস্যের মতামত প্রাধান্য পাবে কিন্তু যেক্ষেত্রে ঐরূপ সংখ্যাগুরুর মতামত পাওয়া যায় না সেক্ষেত্রে চেয়ারপার্সনের মতামত প্রাধান্য পাবে ।

(৪) সমিতির কোন সদস্য অনুপস্থিত থাকলেও সমিতির কাজ করতে পারেন এবং কার্যবাহের কোন ধাপে কোন সদস্য অনুপস্থিত ছিলেন শুধুমাত্র এই কারণে সমিতির দেওয়া কোন আদেশ অকার্যকর (invalid)` হবে না ।

**৩১ ধারা** - সমিতির ক্ষমতাসকল [ powers of committee ] (১) শিশুদের যত্ন , সুরক্ষা, চিকিৎসা , উন্নতি ও পুনর্বাসন এবং মৌলিক প্রয়োজন ও মানবাধিকার সুরক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রগুলির নিষ্পত্তি করতে সমিতির চূড়ান্ত কতৃত্ব থাকবে ।

(২) যেক্ষেত্রে কোন এলাকার জন্য কোন সমিতি গঠিত হয়েছে , সেই সমিতির প্রচলিত অন্য আইনের যাই বলা থাক না কেন কিন্তু এই আইনের ব্যক্তভাবে অন্য কিছু বলা থাকলে , সেই ব্যতিক্রম সাপেক্ষ , যত্ন ও সুরক্ষার প্রয়োজন আছে এমন শিশুদের সম্পর্কিত এই আইনের সকল কার্যবাহ একান্তভাবে নিষ্পত্তি করার ক্ষমতা থাকবে ।

**৩২ ধারা** - সমিতির কাছে হাজির করানো (producction before committee) (১) যত্ন ও সুরক্ষার প্রয়োজন আছে এমন যেকোন শিশুকে নিম্নলিখিত যেকেউ একজন সমিতির কাছে হাজির করাতে পারেন , যথা -

(i) যেকোন পুলিশ অফিসার বা কিশোর - কিশোরীদের বিশেষ পুলিশ ইউনিট (Special Juvenile Police Unit) বা আখ্যায়িত কোন পুলিশ অফিসার (designated police officer)

(ii) যে কোন লোক সেবক (Public servant)

(iii) চাইল্ডলাইন - নামক একটি রেজিষ্ট্রীকৃত স্বেচ্ছা সংগঠন অথবা অনুরূপ অপর কোন স্বেচ্ছাসংগঠন বা রাজ্য সরকার স্বীকৃতি দিতে পারে এমন কোন প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থা ,

(vi) রাজ্য সরকারের অনুমোদিত যেকোন সমাজকর্মী বা কোন গণচেতনাধারী নাগরিক , বা

iv) শিশু নিজেই।

(2) পুলিশকে বা সমিতিকে রিপোর্ট করার পদ্ধতি এবং অনুসন্ধান চলাকালীন শিশুকে আবাসে পাঠানো ও তার দায়িত্ব অর্পণ করার পদ্ধতির বিষয়ে এই আইনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে রাজ্য

সরকার নিয়মাবলী তৈরী করতে পারেন ।

**৩৩ ধারা** - অনুসন্ধান (Inquiry) (১) এই আইনের ৩২ ধারার আওতায় রিপোর্ট পাওয়ার পর সমিতি বা যেকোন পুলিশ অফিসার বা কিশোর-কিশোরীদের বিশেষ পুলিশ ইউনিট বা আখ্যায়িত পুলিশ অফিসার ঘোষিত পদ্ধতিতে একটি অনুসন্ধান করবেন এবং সমিতি নিজে থেকে বা ৩২ ধারার (১) উপধারায় উল্লিখিত কোন ব্যক্তি বা প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থার থেকে রিপোর্ট পেয়ে কোন সমাজকর্মী বা শিশুকল্যাণ অফিসার কর্তৃক দ্রুত অনুসন্ধানের জন্য শিশুকে শিশু আবাসে পাঠানোর আদেশ দিতে পারেন ।

(২) এই ধারার আওতায় করা অনুসন্ধান আদেশপ্রাপ্তির চার মাসের মধ্যে অথবা সমিতি যেরূপ ধার্য করতে পারেন সেরূপ আরও স্বল্প কালের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে ,

শর্ত থাকে যে অনুসন্ধান রিপোর্ট জমা দেবার সময়কাল , ক্ষেত্রটির পরিস্থিতি বিবেচনা করে এবং কারণদি লিখিতভাবে নথিভূক্ত করে , সমিতি যেরূপ স্থির করতে পারেন সেরূপ সময়ের জন্য বাড়িয়ে দিতে পারেন ।

(৩) অনুসন্ধান সম্পন্ন হওয়ার পর যদি সমিতি এই অভিমত পোষণ করেন যে ঐ শিশুটির কোন পরিচয় নেই বা প্রকাশ্যে কোন সাহারা নেই , তবে সমিতি যতক্ষণ না ঐ শিশুর জন্য উপযুক্ত পুনবার্সন দেওয়া যায় বা যতক্ষণ না শিশুটি ১৮ বছর পূর্ণ করে ততক্ষণ শিশুটিকে শিশু আবাসে রেখে দেওয়ার জন্য অনুমতি দিতে পারেন ।

**৩৪ ধারা** - শিশু আবাস (Children's home ) (১) রাজ্য সরকার প্রত্যেক জেলা বা কতকগুলি জেলা নিয়ে গঠিত কোন এলাকার জন্য , যেখানে যেমন হতে পারে , নিজে থেকে বা স্বেচ্ছা সংগঠনগুলির সাথে মিলেমিশে কোন অনুসন্ধান চলাকালীন যত্ন ও সুরক্ষার প্রয়োজন আছে এমন শিশুদের গ্রহণ এবং পরবর্তীকালে তাদের যত্ন চিকিৎসা , শিক্ষা , হাতে কলমে শিক্ষাদান , উন্নতি এবং পুনর্বাসনের জন্য শিশু আবাস স্থাপন ও রক্ষা করতে পারেন ।

(২) রাজ্য সরকার শিশু আবাসে যে সকল সেবাদান করা হবে তার মান ও প্রকৃতিসহ শিশু আবাসের পরিচালনা এবং যে পরিস্থিতিতে এবং যে পদ্ধতিতে শিশু আবাসের জন্য শংসাপত্র (Certificate) অথবা স্বেচ্ছাসংগঠনের জন্য স্বাকৃতি মঞ্জুর বা নামঞ্জুর হবে সেই বিষয়ে এই আইনের আওতায় নিয়মাবলীর মাধ্যমে বিধান দিতে পারেন ।

**৩৫ ধারা** - পরিদর্শন (Inspection ) (১) যেরূপ ঘোষিত হতে পারে সেই সময়কাল এবং উদ্দেশ্যের কারণে রাজ্য , জেলা ও নগরের জন্য , যেখানে যেমন হতে পারে , শিশু আবাসগুলির নিমিত্ত রাজ্য সরকার পরিদর্শন সমিতিসকল (Inspection committees) নিযুক্ত করতে পারেন।

(২) রাজ্য , জেলা বা নগরের পরিদর্শন সমিতি রাজ্য সরকার , স্থানীয় কতৃপক্ষ , সমিতি ,

স্বেচ্ছে সংগঠনসকল এবং ঐরূপ অপর চিকিৎসা শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিসকল এবং সমাজকর্মীদের মধ্যে থেকে এরূপ সংখ্যক প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত হবে যেরূপ ঘোষিত হয়ে থাকতে পারে ।

**৩৬ ধারা** - সামাজিক নিরীক্ষা (Social auditing ) কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকার , যেরূপ সরকার কর্তৃক ঘোষিত হতে পারে সেরূপ সময়কালের জন্য এবং সেরূপ ব্যক্তিদের প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শিশু আবাসগুলির কাজকর্মের দেখভাল ও মূল্যায়ন করতে পারেন ।

**৩৭ ধারা** - আশ্রয় আবাস (Shelter homes ) (১) রাজ্য সরকার যেরূপ প্রয়োজন হতে পারে সেরূপ সংখ্যক আশ্রয় আবাস স্থাপন ও পরিচালনার জন্য সুনামে থাকা ও সামর্থ্য থাকা সংগঠনগুলিকে স্বীকৃতি দিতে পারেন এবং তাদের সহায়তা দিতে পারেন ।

(২) উপধারা (১) এ উল্লিখিত আশ্রয় আবাস এই আইনের ৩২ ধারার (১) উপধারা যেরূপ উল্লিখিত আছে সেরূপ ব্যক্তিদের মাধ্যমে আশ্রয় আবাসে নিয়ে আসা জরুরী সাহারার ( support) এর প্রয়োজন আছে এমন শিশুদের আশ্রয় কেন্দ্র ( drop in centre ) হিসাবে কাজ করবে ।

(৩) নিয়মাবলীতে যেরূপ ঘোষিত হতে পারে আশ্রয় আবাসে যতদূর সম্ভব সেই সুযোগ সুবিধা থাকবে ।

**৩৮ ধারা**- বদলী ( Transfer ) (১) অনুসন্ধান চলাকালীন যদি এটি দেখা যায় যে শিশুটি সমিতির শাসনাধীন ক্ষেত্রে বাইরের কোন অঞ্চলের তবে সমিতি ঐ শিশুটির বাসস্থানের এলাকায় শাসনাধীন ক্ষেত্র সম্পন্ন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে বদলী করে দেবার আদেশ দেবেন ।

(২) ঐরূপ কিশোর - কিশোরী বা শিশুকে সেই আবাসের কর্মচারীগণ পাহারা দিয়ে নিয়ে যাবেন যে আবাসে তাকে প্রথমে রাখা হয়েছিল ।

(৩) ঐ শিশুর রাহা খরচ দেওয়ার বিষয়ে বিদান দিতে রাজ্য সরকার নিয়মাবলী তৈরী করতে পারেন ।

**৩৯ ধারা** - প্রত্যার্পণ (Restoration) (১) যে কোন শিশু আবাস বা আশ্রয় আবাসের প্রাথমিক লক্ষ্য হবে শিশু প্রত্যার্পণ ও সুরক্ষা।

(২) শিশু আবাস বা আশ্রয় আবাস , যেখানে যেমন হবে , পারিবারিক পরিবেশ থেকে সাময়িকভাবে বা স্থায়ীভাবে বঞ্চিত শিশুকে প্রত্যর্পণ ও সুরক্ষা দেওয়ার জন্য প্রয়োজন বলে যেরূপ বিবেচিত হয় সেরূপ পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করবে , যেক্ষেত্রে ঐরূপ শিশু শিশু আবাস বা আশ্রয় আবাসের , যেখানে যেমন হবে যত্ন ও সুরক্ষায় আছে।

(৩) যত্ন ও সুরক্ষার প্রয়োজন আছে এমন যেকোন শিশুকে তার পিতামাতা , অভিভাবক , উপযুক্ত ব্যক্তি বা উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানের কাছে , যেখানে যেমন হতে পারে , প্রত্যর্পণ করার ক্ষমতা সমিতির থাকবে ।

ব্যাখা (Explanation ) এই ধারার প্রয়োজনে " শিশুর প্রত্যার্পণ " বলতে

(এ) পিতামাতা ,

(বি) দত্তকগ্রহণকারী পিতামাতা

(সি) পালক পিতামাতার,

কাছে প্রত্যার্পণ (restoration ) করাকে বুঝায় ।

**৪০ ধারা** - পুর্নবাসন ও সামাজিক প্রক্রিয়া [ Process of rehabilitation and social integration ] শিশু আবাস বা বিশেষ আবাসে থাকাকালীন শিশুর পুর্নবাসন ও সামাজিক সংহতি আরম্ভ হবে এবং শিশুদের পুনর্বাসন ও সামাজিক সংহতি (i) দত্তকগ্রহণ (ii) ধাত্রীস্বরূপ যত্নাদি (iii) পোষকতা দেওয়া এবং (iv) যত্নপরবর্তী সংগঠনে শিশুকে পাঠানো ইত্যাদির মাধ্যমে বিকল্পভাবে চালিয়ে যেতে হবে ।

**৪১ ধারা** - দত্তক গ্রহণ / পোষ্য গ্রহণ [ Adoption ] (১) শিশুর যত্ন ও সুরক্ষা দেওয়ার প্রাথমিক দায়িত্ব হল তার পরিবারের ।

(২) যে সকল শিশু অনাথ , পরিত্যাক্ত , অবহেলিত হয়েছে এবং প্রতিষ্ঠানিক বা অপ্রতিষ্ঠানিক পদ্ধতির মাধ্যমে পিড়িত হয়েছে সেই সকল শিশুর পুনবাসনে দত্তক প্রথায় আশ্রয় নেওয়া যাবে ।

(৩) রাজ্য সরকার সময়াস্তরে দত্তক গ্রহণের বিষয়ে জারি করা নির্দেশিকা অনুসারে পর্ষদ শিশুদের দত্তক দিতে ক্ষমতাপন্ন হবেন এবং এই সম্পর্কে রাজ্য সরকারের সময়াস্তরে জারি করা নির্দেশিকা অনুযায়ী শিশুদের দত্তক দিতে যা প্রয়োজনীয় সেরূপ তদন্ত পর্ষদ করবেন ।

(৪) শিশু আবাসে বা রাজ্য সরকার পরিচালিত অনাথ শিশুদের প্রতিষ্ঠানগুলি ঐ শিশুদের খুটিনাটি পরীক্ষা ও স্থানার্পণ , উপধারা (৩) এর আওতায় জারি করা নির্দেশিকা অনুসারে দত্তক দেওয়ার নিমিত্ত দেওয়ার প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থা হিসাবে স্বীকৃত হবে ।

(৫) কোন শিশুকে দত্তক নেওয়ার জন্য প্রস্তাব দেওয়া হবে না -

(এ) যতক্ষন না পরিত্যক্ত শিশুদের ক্ষেত্রে সমিতির দুইজন স্থানাপর্ণের ( placement এর) জন্য শিশুটিকে আইনি বাধাযুক্ত বলে ঘোষনা করেন ,

(বি) যতক্ষণ না সমর্পণ করে দেওয়া শিশুদের ক্ষেত্রে শিশুর পিতামাতাকে পুনর্বিবেচনা করার জন্য দেওয়া দুই মাসের সময়কাল উত্তীর্ণ হয় ,

(সি) তার সম্মতির [ consent ] এর বিষয়টি বুঝতে পারে এবং ব্যক্ত করতে পারে এমন শিশুর ক্ষেত্রে ঐ শিশুটির সম্মতি ছাড়া ।

(৬) কোন শিশুকে নিম্নলিখিতদের কাছে দত্তক দিতে পর্ষদ অনুমতি দিতে পারেন -

(এ) কোন একক পিতা মা মাতাকে , এবং

(বি) বেঁচে থাকা নিজের জৈব সঞ্জাত ছেলে বা মেয়ের যে সংখ্যাই থাক না কেন একই লিঙ্গের শিশুকে দত্তক গ্রহণ করতে পিতামাতাকে ।

**৪২ ধারা** - ধাত্রীস্বরূপ যত্ন [ Foster Care ] (১) যে সকল শিশুদের শেষ পর্যন্ত দত্তক দেওয়া হবে তাদের সাময়িকভাবে যত্ন রাখার জন্য ধাত্রীস্বরূপ যত্ন ব্যবহার করা যেতে পারে ।

(২)ধাত্রীস্বরূপ যত্নের ক্ষেত্রে শিশুটিকে অন্য পরিবারের কোন স্বল্প অথবা বর্ধিত সময়কালের জন্য রাখা যেতে পারে যা নির্ভর করে সেই পরিস্থিতির উপর যেক্ষেত্রে শিশুর নিজ পিতামাতা সাধারণতঃ নিয়মিতভাবে দেখা করে এবং পুনর্বাসনের পরে পরিমাণস্বরূপ যেক্ষেত্রে শিশুগুলি তাদের নিজ গৃহে ফিরে যেতে পারে ।

(৩) ধাত্রীস্বরূপ যত্নের কর্মসূচী চালানো উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার নিয়মাবলী তৈরী করতে পারেন।

**৪৩ ধারা** - পোষকতা [Sponsorship] (১) পোষকতা কর্মসূচী শিশুদের জীবনের মান বাড়ানোর জন্য তাদের স্বাস্থ্য , পুষ্টি , শিক্ষা ও অন্যান্য প্রয়োজন মেটানোর নিমিত্ব পরিসর , শিশু আবাস এবং বিশেষ আবাসগুলিকে অনুপূরক সাহারা (support ] যোগান দিতে পারে ।

(২) রাজ্য সরকার পোষকতার বিভিন্ন পরিকল্পনা যেমন ব্যক্তি থেকে ব্যক্তি পোষকতা দল পোষকতা বা সমষ্টি পোষকতা চালানোর নিমিত্ত নিয়মাবলী তৈরী করতে পারেন ।

**৪৪ ধারা** - যত্ন পরবর্তী সংগঠন [ After care organisation ] রাজ্য সরকার এই আইনের আওতায় নিয়মাবলী তৈরী করে নিম্নলিখিতের জন্য বিধানাদি দিতে পারেন যথা ,

(এ) যত্ন পরবর্তী সংগঠনসকল স্থাপন ও স্বীকৃতির বিষয় এবং এই আইনের আওতায় তাদের যে কাজ হবে সেই বিষয়ে,

(বি) যত্ন পরবর্তী কর্মসূচীর পরিকল্পনার বিষয়ে যা যত্ন পরবর্তী সংগঠনগুলি এই জন্য অনুসরণ করবেন যাতে কিশোর - কিশোরীরা বা শিশুরা বিশেষ আবাস , শিশু আবাস ছেড়ে আসার পরে সৎ পরিশ্রমী ও কাজে এমন জীবন যাপন করতে পারে,

(সি) বিশেষ আবাস , শিশু আবাস থেকে ছেড়ে দেওয়ার পূর্বে প্রত্যেক কিশোর কিশোরী বা শিশুর সম্পর্কে , ঐ কিশোর কিশোরী বা শিশুর যত্ন পরবর্তী তত্বাবধানের প্রয়োজনীয়তা ও প্রকৃতি , কত সময়ের জন্য ঐরূপ তত্বাবধান প্রয়োজন সেই সকল বিষয়ে প্রবেশন অফিসার বা সরকারের নিযুক্ত অপর কোন অফিসারের থেকে রিপোর্ট তৈরী , দাখিল বিষয়ে এবং প্রত্যেক কিশোর কিশোরী বা শিশুর অগ্রগতির উপর প্রবেশন অফিসার বা এই উদ্দেশ্যে নিযুক্ত অফিসারের রিপোর্ট দাখিলের বিষয়ে ,

(ডি) ঐরূপ যত্ন পরবর্তী সংগঠনের পক্ষ থেকে যে মান ও প্রকৃতির সেবাদান করা হবে সেই বিষয়ে ,

(ই) কিশোর কিশোরী বা শিশুর যত্ন পরবর্তী কর্মসূচী চালিয়ে যাওয়ার বিষয়ে অপরাপর যে বিষয়াদি প্রয়োজন হতে পারে সেই বিষয়ে ,

শর্ত থাকে যে ঐ ধারার আওতায় তৈরী নিয়মাবলী ঐরূপ কিশোর -কিশোরী বা শিশুর তিন বছরের অধিক সময়ের জন্য যত্ন পরবর্তী সংগঠনে থাকার বিধান দেবে না ,

আরও শর্ত থাকে যে ১৭ বছরের বেশী কিন্তু ১৮ বছরের কম বয়েসী কিশোর কিশোরী বা শিশু যতক্ষণ না সে ২০ বছর বয়সে পা দিচ্ছে ততদিন যত্ন পরবর্তী সংগঠনে থাকবে ।

**৪৫ ধারা** - যোগসূত্র ও সমন্বয় বিধান [ Linkages and coordination ] রাজ্য সরকার শিশুর পুর্নবাসন ও সামাজিক পুনঃসংহতি কাজে সুবিধা ক'রে দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সরকারি , বেসরকারী কারপোরেট এবং অন্যান্য সমষ্টির প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থার মধ্যে যোগসূত্র ও সমন্বয় বিধান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিয়মাবলী তৈরী করতে পারেন ।

**৪৬ ধারা** - কিশোর কিশোরী বা শিশুর পিতামাতা বা অভিভাবকের হাজিরা ( Attendance of parent or guardian of juvenile or child) যে কোন উপযুক্ত কর্তপক্ষ যার কাছে এই আইনের যেকোন বিধানাদির আওতায় কোন কিশোর - কিশোরী বা শিশুকে হাজির করা হয় সেই কর্তৃপক্ষ , যখনই যথাযথ বলে মনে করবেন , ঐ কিশোর - কিশোরী বা শিশুর সম্পর্কে যে কোন কার্যবাহে ঐ কিশোর কিশোরী বা শিশুর প্রকৃত দায়িত্বে থাকা বা নিয়ন্ত্রণকারী পিতা মাতা বা অভিভাবককে হাজির হওয়ার জন্য ফরমাশ করতে পারেন ।

**৪৭ ধারা** - কিশোর - কিশোরী বা শিশুর হাজিরায় অব্যহতি [ Attendance of parent or guardian of juvenile or child ] যদি , অনুসন্ধান চলাকালীন কোন ধাপে, কোন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে সন্দেহমুক্ত হন যে অনুসন্ধানের প্রয়োজনে কিএশার - কিশোরী বা শিশুর হাজির থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন নয় , তবে ঐ উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ তার হাজিরায় অব্যহতি দিতে পারেন এবং কিশোর - কিশোরী বা শিশুর অনুপস্থিতিতেই অনুসন্ধানটি চালিয়ে যেতে পারেন ।

**৪৮ ধারা** - মারাত্মক ব্যধিতে ভুগছে এমন কিশোর - কিশোরী বা শিশুর অনুমোদিত স্থানে সোপর্দকরণ এবং তার ভবিষ্যত নিষ্পত্তি [ Committal to approved of juvenile or child suffering from dangerous diseases and his future disposal ] (১) যখন কোন কিশোর - কিশোরী বা শিশুকে এই আইনের আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে হাজির করানো হয় যে নাকি দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসক প্রয়োজন মানষিকঅসুখে ভুগছে অথবা চিকিৎসায় সাড়া দেবে এমন দৈহিক বা মানসিক অসুখে ভুগছে তখন প্রয়োজনীয় চিকিৎসার জন্য যে সময়কাল প্রয়োজন বলে মনে হতে পারে সেই সময়কালের জন্য এই আইনের আওতায় তৈরী নিয়মাবলী অনুসারে অনুমোদিত বলে স্বীকৃত যেকোন স্থানে ঐ কিশোর - কিশোরী বা শিশুকে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ পাঠিয়ে দিতে পারেন।

(২) যেক্ষেত্রে কোন কিশোর - কিশোরী বা শিশু কুষ্ঠ , যৌনভাবে সংক্রামিত রোগ, হেপাটাইটিস বি, টি.বি এবং অনুরূপ অন্যান্য রোগে মানসিক বিকারগ্রস্ততায় ভুগছে সেক্ষেত্রে তাকে পৃথকভাবে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে এথবা প্রাসঙ্গিক আইনে যেভাবে বলা আছে সেভাবে আরোগ্যের ব্যবস্থা করতে হবে ।

**৪৯ ধারা** - বয়সের বিষয়ে অনুমান ও নির্ধারণ (Presumption and determination of age ] (১) যেক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে এই আইনের কোন বিধানের আওতায় হাজির করানো কোন ব্যক্তিকে (সাক্ষ্য দেওয়ার উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কারণে) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের ভাবনায় কিশোর - কিশোরী বা শিশু বলে প্রতীয়মান হয় , সেক্ষেত্র উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ঐ ব্যক্তির বয়সের বিষয়ে যথাযথ অনুসন্ধান করবেন এবং এই উদ্দেশ্যে যেরূপ প্রয়োজন হতে পারে সেরূপ সাক্ষ্যপ্রমাণ (হলফনামা বাদ দিয়ে ) নেবেন এবং যতদূর সম্ভব কাছাকাছি হতে পারে সেরূপ বয়স উল্লেখ ক'রে ঐ ব্যক্তি একজন কিশোর - কিশোরী বা শিশু কন্যা সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নথিভুক্ত করবেন।

(২) কোন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কোন আদেশ শুধুমাত্র এই কারণে বাতিল হয়েছে বলে মনে করা হবে না যে পরবর্তীকালে দেওয়া প্রমাণে যে ব্যক্তির সম্পর্কে আদেশ দেওয়া হয়েছে সে কিশোর - কিশোরী বা শিশু নয় , এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ তাঁর কাছে হাজির করা ব্যক্তির যে বয়স নথিভুক্ত করেন সেটাই এই আইনের উদ্দেশ্যে ঐ ব্যক্তির সত্য বয়স বলে মনে করা হবে

**৬৩ ধারা** - কিশোর - কিশোরীদের বিশেষ পুলিশ ইউনিট [Special Juvenile Police Unit ] অফিসারগণ এই আইনের আওতায় হামেশাই বা একান্তভাবেই কিশোর - কিশোরীদের বিষয়াদিই দেখাশুনা করেন অথবা কিশোর অপরাধের নিবারণমূলক কাজে অথবা কিশোর - কিশোরী বা শিশুদের বিষয়াদি দেখাশুনা করেন সেই পুলিশ অফিসাগণ যাতে তাদের কাজকর্ম আরও কার্যকর ভাবে করতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে তাদের বিশেষভাবে নির্দেশ ও হাতেকলমে শিক্ষাদান করতে হবে।

(২) এই বিষয়ে আগ্রহ ও যথাযথ শিক্ষা আছে এমন অন্ততঃ একজন পুলিশ অফিসার প্রত্যেক থানায় থাকবেন যাকে " কিশোর - কিশোরী বা শিশু কল্যাণ অফিসার বলে আখ্যায়িত করা যেতে পারবে যিনি পুলিশের সাথে সমন্বয় রেখে কিশোর কিশোরী বা শিশুদের বিষয়গুলি দেখভাল করবেন।

(৩) কিশোর - কিশোরীদের বিশেষ পুলিশ ইউনিট যা নাকি উপরোক্ত আখ্যায়িত অফিসারগণ নিয়ে কিশোর - কিশোরী বা শিশুদের বিষয়গুলি দেখাশুনা করার জন্য গঠিত হবে এবং কিশোর - কিশোরী ও শিশুদের প্রতি পুলিশি আচরণকে সমন্বয় সাধন ও উচ্চমানের পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রত্যেক জেলায় ও নগরে উক্ত ইউনিট গঠন করা যেতে পারে ।

## "অধিকার ও আরক্ষা"

# অধিকার ও আরক্ষা

অধিকার , আরক্ষা অর্থাৎ আইন শৃঙ্খলা রক্ষা অপরাধ আবিষ্কার , অপরাধরোধ , এবং আইনের মাধ্যমে বিচারের ব্যবস্থা করে দেওয়া মহামান্য আদালতের মাধ্যমে ।

আমি আমাদের ছোট রাজ্য ত্রিপুরাকে দৃষ্টান্ত দিয়ে যদি শুরু করি আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় ত্রিপুরা পুলিশের ভুমিকা সহ , দেখা যাবে গত দু- দশকের বেশী সময় ধরে ত্রিপুরার প্রত্যন্ত উপজাতি অধ্যুষিত এলাকার মানুষ , মিশ্র জনবসতি এলাকার , জাতি উপজাতি অংশের মানুষ তথা আমাদের রাজ্যের বিশাল সীমান্ত বাংলাদেশের সাথে সেই সীমান্তবর্তী উপজাতি অধ্যুষিত এলাকার বসবাসকারী মানুষ প্রত্যক্ষভাবে উগ্রপন্থীদের আক্রমণের সম্মুখীন হচ্ছেন । সশস্ত্র উগ্রপন্থীরা নিরীহ নিরস্ত্র মানুষের উপর অমানবিক আক্রমণ চালিয়েছিল বহু মানুষ উগ্রপন্থীদের আক্রমণে প্রাণ হারিয়েছেন , সারাজীবনের জন্য পঙ্গু হয়েছেন , ঘরবাড়ি , ভিটেমাটি পুড়ে ছারখার করে দিয়েছে , অগণিত পরিবার ভিটেমাটি ছাড়া হয়ে বাস্তুচ্যুত হয়েছেন , বহু মানুষ অপহৃত হয়েছেন এবং বহু মানুষ অপহৃত হয়ে উগ্রবাদী হায়নাদের কবলে খুন হয়েছেন । দেশের অখন্ডতা রক্ষায় , মানুষের জীবন , ধন , মান , সম্পত্তি রক্ষায় উগ্রবাদীদের হাতে রাজ্যের বহু পুলিশ টি. এস.আর এবং নিরাপত্তা বাহিনীর জোওয়ান অফিসার প্রাণ বলি দিয়েছেন । ত্রিপুরা রাজ্যের সম্মিলিত পুলিশ বাহিনী প্রবল সন্ত্রাসী কার্যপলাপের কাছে মাথা নোয়াইনি বরংচ অসীম সাহসে লড়াই করে রাজ্যের উগ্রবাদীদের বিষদাত ভেঙ্গে দিয়েছে ।

২০০১ থেকে ২০০৭ সালের জুন পর্যন্ত উগ্রপন্থীরা আক্রমণের পরিসংখ্যান (সরকারী তথ্য অনুসারে ) উগ্রপন্থী হামলা - ২০০১ সালে ১৮৭ টি ২০০২ সালে ১৯৬ , ২০০৩ সালে ৩০৫ টি ২০০৪ সালে ১৮৪ টি , ২০০৫ সালে ১১৫টি, ২০০৬ সালে ১০২ টি ২০০৭ সালের জুন মাস পর্যন্ত ৫৯ টি,

## উগ্রপন্থী আক্রমণে নিহত সাধারণ মানুষ

২০০১ সালে ১৩৪ জন, ২০০২ সালে ৯৩ জন ২০০৩ সালে ১৮৪ জন, ২০০৪ সালে ৫৫ জন ২০০৫ সালে ৩০ জন , ২০০৬ সালে ১৩ জন ২০০৭ সালে জুন মাস পর্যন্ত ৬ জন ।

## উগ্রপন্থী আক্রমণে নিহত আরক্ষা কর্মী

২০০১ সালে ৩১ জন . ২০০২ সালে ৪২ জন, ২০০৩ সালে ৩৯ জন, ২০০৪ সালে ৪৭ জন, ২০০৫ সালে ১১ জন, ২০০৬ সালে ১৪ জন ২০০৭ সালে জুন মাস পর্যন্ত ৫ জন।

## উগ্রপন্থা আক্রমণে আহত সাধারণ মানুষ

২০০১ সালে ৭২ জন, ২০০২ সালে ৪২ জন , ২০০৩ সালে ১১১ জন ২০০৪ সালে ৭৬ জন ২০০৫ সালে ৪৪ জন ২০০৬ সালে ১২ জন , ২০০৭ সালের জুন মাস পর্য্যন্ত ২ জন ।

## উগ্রপন্থী আক্রমণে আহত আরক্ষা কর্মী ।

২০০১ সালে ৩৪ জন, ২০০২ সালে ২৪ জন , ২০০৩ সালে ৫৩ জন, ২০০৪ সালে ১৫জন , ২০০৫ সালে ৮ জন , ২০০৬ সালে ২৭ জন , ২০০৭ সালের জুন মাস পর্যন্ত - ২জন ।

## এই সময়ে উগ্রপন্থীদের হাতে অপহৃত ।

২০০১ সালে ১২৩ জন, ২০০২ সালে ১৪৫ জন , ২০০৩ সালে , ১৭৩ জন, ২০০৪ সালে ৯২ জন, ২০০৫ সালে ৬২ জন ২০০৬ সালে ৪৩ জন , ২০০৭ সালের জুন মাস পর্যন্ত ৩০ জন ।

### উগ্রপন্থী বিরোধী আরক্ষা বাহিনীর সাফল্য (সরকারী পরিসংখ্যান)

মৃত্যু কখনো কাঙ্খিত নয় ।আরক্ষা বাহিনীর সম্মিলিত অভিযানে ।

২০০১ সালে ২৩৩ জন উগ্রবাদী গ্রেপ্তার হয় ।

২০০২ সালে ৫৭ জন উগ্রবাদী গ্রেপ্তার হয় ।

২০০৩ সালে ১২৮ জন উগ্রবাদী গ্রেপ্তার হয় ।

২০০৪ সালে ১০১ জন উগ্রবাদী গ্রেপ্তার হয় ।

২০০৫ সালে ৬১ জন উগ্রবাদী গ্রেপ্তার হয় ।

২০০৬ সালে ৬১ জন উগ্রবাদী গ্রেপ্তার হন ।

২০০৭ সালের জুনমাস পর্যন্ত ৯ জন উগ্রবাদী গ্রেপ্তার হন ।

২০০১ সালে ৪৪ জন উগ্রবাদী সংঘর্ষে নিহত হয় ।

২০০২ সালে ৩১ জন উগ্রবাদী সংঘর্ষে নিহত হয় ।

২০০৩ সালে ৫০ জন উগ্রবাদী সংঘর্ষে নিহত হন ।

২০০৪ সালে ৫৪ জন উগ্রবাদী সংঘর্ষে নিহত হয় ।

২০০৫ সালে ২৩ জন উগ্রবাদী সংঘর্ষে নিহত হয় ।

২০০৬ সালে ২৭ জন উগ্রবাদী নিহত হয় ।

২০০৭ সালের জুন মাস পর্যন্ত ১০ জন উগ্রবাদী সংঘর্ষে নিহত হয় ।

**এই সময়ে আরক্ষাবাহিনী ও উগ্রবাদীদের সংঘর্ষের তালিকা -**

২০০1 সালে ৪৮ টি সংঘর্ষ

২০০2 সালে ৫০ টি সংঘর্ষ

২০০3 সালে ৮৫ টি সংঘর্ষ

২০০4 সালে ৭৬ টি সংঘর্ষ

২০০5 সালে ৫৩ টি সংঘর্ষ

২০০6 সালে ৫৯ টি সংঘর্ষ

২০০৭ সালের জুন মাস পর্যন্ত - ২৩ টি সংঘর্ষ ঘটে ।

রাজ্যের সাধারণ আইন শৃঙ্খলা ও অনেক উন্নত , অপরাধ নিয়ন্ত্রনের ক্ষেত্রে রাজ্য পুলিশের ভূমিকা যথেষ্ঠ ভাল বলেই তথ্যবিজ্ঞমহল মনে করে নারীদের বিরুদ্ধে অপরাধের নিয়ন্ত্রন ক্ষেত্রে ও আরক্ষা বাহিনী তৎপর ।

## আত্মরক্ষায় খুন করার অধিকার আছে ঃ আদালত

নয়াদিল্লি , ১২ মার্চ , আই এ এন এস ।। নিজের জীবন বাঁচাতে বা আত্মরক্ষার্থে অন্যকে খুন করার অধিকার ও আছে যে কারোর । এই রায় দেশের সর্বোচ্চ আদালতের । তিরিশ বছর আগের খুনের একটি মামলায় দুই অভিযুক্তকে মুক্তি দিয়ে এ মন্তব্য করে সুপ্রীম কোর্ট । বিচারপতি দলবীর সিং ভান্ডারি ও এইচ এস বেদির বেঞ্চ মন্তব্য করে বলেছে আত্মরক্ষার অধিকার আছে সবার । কোন পরিস্থিতিতে অভিযুক্ত আঘাত করেছিল তা খতিয়ে দেখতে হবে । যদি দেখা যায় তিনি বা তারা আঘাত না করলে নিজেদেরই প্রাণ যেতে পারতো , তবে পাল্টা আঘাত করাটা মোটেই অপরাধ গণ্য হবে না । ওই আঘাতে যদি কারোর মৃত্যুও হয় তবুও তা অপরাধ হবে না । ১৯৭৯ সালের ২৭ জানুয়ারী মীরাট শহরে পূর্ব শত্রুতার জেরে খুন হল লাখিরাম নামে এক ব্যক্তি । খুনের দায়ে গজে সিং ও রাজপাল সিংকে গ্রেফতার করে উত্তর প্রদেশ পুলিশ । বিচারে দুজনকেই মুক্তি দেয় নিম্ন আদালত। হাইকোর্টও একই রায় বহাল রাখলে উত্তর প্রদেশ সরকার আপিল করে সুপ্রীম কোর্টে। তদন্তে দেখা যায় , লাখিরাম নামের ওই ব্যক্তি দলবল ও ধারালো অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হামলা চালিয়েছিল গজে সিং ও রাজপাল সিং এর উপর। তখনই নিজেদের লাইসেন্স করা বন্দুক থেকে গুলি চালান অভিযুক্তরা । ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারায় লাখিরাম ।

ত্রিপুরা রাজ্যের পুলিশ জনসাধারনের পক্ষে দাড়াইয়া রাজ্যের সন্ত্রাসবাদ নির্মূলে অঙ্গীকারবদ্ধ

যেমন রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্যাকেজ সামনে রাখিয়া বিপথগামী যুবকদের পরিবারবর্গকে বুঝাইয়া তাদেরকে জীবনের মুল স্রোতে ফিরাইয়া আনার প্রয়াস প্রতিনিয়ত চালাইয়া যাইতেছে এবং তাতে বেশ কিছু ফল পাওয়া গিয়াছে। শুধু তাই নয়, গ্রাম পাহাড়ে, গিরিকন্দরে নানাহ প্রশাসনিক শিবিরের মাধ্যমে সাহয্য সহায়তা করিযা, আলোচনা সভা করিয়া প্রতিনিয়ত চেষ্টা চলিতেছে। রাজ্য উগ্রপন্থা নিমূল করার উদ্দেশ্যে। অগনিত ঘটনা হয়ত ২/১ টা ভুল হতেই পারে কারণ **আমি বিশ্বাস করি** কাজ করলে তাতে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তবু ও বলব মানুষের অধিকার রক্ষা করিয়া এ রাজ্যের আরক্ষা বাহিনীর কাজের ফলে এ রাজ্যের বৃহৎ অংশের যুবক সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ ছাড়িয়া সমাজের মুলস্রোতে ফিরিয়া আসিয়াছে। এমনকি T.N.V এর মুলস্রোতের ফিরিয়া আসা তার নির্দশন বলা যেতে পারে। আমরা বৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশের লোক, যেখানে জনগন কর্তৃক সরকার নির্বাচিত হইয়া কল্যাণ কার্য করেন। জনমতই গনতন্ত্রের ভিত্তি ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় খন্ডে মানবাধিকার সুরক্ষার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে। তা হইল সংবিধানের মৌলিক অধিকার যা "ছ" ভাগে বিভক্ত (১) সাম্যের অধিকার, (২) স্বাধীনতার অধিকার (৩) শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার (৪) ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার (৫) কৃষি, সংস্কৃতি, শিক্ষার অধিকার (৬) সাংবিধানিক প্রতিকার সমুহের অধিকার।

আর্ট ১৪ হইতে ৩২ - সাংবিধানিক প্রতিকার পাওয়ার জন্য যে কোন নাগরিক আবেদন জানাইতে পারে যেমন, হেবিয়াস করপাস, মেনডেমাস, প্রহিবিশন, কু-ও ওয়ারান্টো, সারশিওয়ারি, সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদে বর্ণিত ভারতীয় সংবিধানে ৪৪তম সংশোধনের পর ১৯৭৯ তে জরুরী অবস্থার উপর ও বিধি নিষেধ আরোপ করা হইয়াছে।

ব্যক্তির প্রাণ ও দৈহিক স্বাধীনতার ক্ষেত্রে আদালতে যাইবার অধিকার বলবৎ থাকিবে।

মৌলিক অধিকার সুনিশ্চিত করতে রাষ্ট্র দায়বদ্ধ। রাষ্ট্র সংবিধানের প্রস্তাবনায় (Constitutinal Premble) রাষ্ট্রের কর্মপদ্ধতি নির্দেশমুলক নীতিসমুহ (Divective principles of State policy)) রূপায়িত করিতে সচেষ্ট থাকিবেন।

মানুষের অধিকার লঙ্ঘনের জ্বলন্ত ঘটনা কেবল পুলিশ সন্ত্রাসবাদেই সীমাবদ্ধ নয় তা- ছাড়া ও অজস্র উদাহরণ আছে যেমন (১) শিশু শ্রমিক নিয়োগ, দাস ব্যবসা, নারী নির্যাতন, সম্প্রদায়িক সংঘর্ষ, জাতপাতের হানাহানি, ডাইনী হত্যা ইত্যাদি

সংবিধানের ১২ নং অনুচ্ছেদ বলা হয়েছে ভারত সরকার ও সংসদ - রাজ্য সরকার ও বিধানমন্ডল অশুভ শক্তির মোকাবেলার জন্যই পুলিশ সঠিক ও নির্ভূল আইন প্রয়োগে এবং সঠিক সম্মান প্রদর্শনে মানুষের কাজ করা যেতে পারে।

পুলিশের কাজের ও চারটি দিক আছে যেমন (১) আইনি দিক, (২) প্রশাসনিক দিক (৩)

সামাজিক দিক পরিচালন গত কৌশল ।

আমরা শুনতে পায় পুলিশের বিরুদ্ধে অত্যাচারের অভিযোগ আসে । নারীনির্যাতিন , খুন , অত্যাচার ইত্যাদি হয়ত মুষ্টিমেয় কিছু কর্মীর বিরুদ্ধে তা সত্য হইলে ও অধিকাংশের বিরুদ্ধে অভিযোগ সত্য নহে । তথ্য বিকৃত করিয়া ক্ষতিকারক ও উদ্দেশ্যে প্রনোদিত প্রচারের ফলে অনেক পুলিশ কর্ম্মী বিচারের পূর্বেই অপরাধী হয়ে যান ।

কারণ পরবর্ত্তীতে বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গেছে বেশ কিছু মৃত্যু আত্মহত্যা বা গণপ্রহারে ফলে,কোথা ও বা অতিরিক্ত মাদকশক্তি বা অন্যব্যাধিতে মৃত্যু ঘটিয়াছে ।

কখনো বা সন্ত্রাসবাদীদের থেকে আত্মরক্ষার সময় উভয় পক্ষের ,গোলাগুলিতে মৃত্যু ঘটিয়েছে।

দুভার্গ্যের বিষয় হইল অভিযুক্ত ব্যাক্তির অপরাধ প্রমান হইবার আগেই অভিযুক্ত সাজা পাইবেন কেন ? অভিযুক্ত ব্যাক্তি অপরাধী কি না তা তো প্রমাণ সাপেক্ষ । অভিযুক্ত আর অপরাধী তো এক নহে অভিযুক্ত কোন ভাবেই অপরাধী নহেন শাস্তির বিধান দেবেন আদালত । বিচারের পর আদালত সাজা ঘোষনা করবেন ।

## অধিকার , আরক্ষা ও আইনি সুরক্ষা

**অধিকার সুরক্ষায় ভারতবর্ষের আইনি ব্যবস্থা ঃ-** ভারতবর্ষের মূল আইন অর্থাৎ ভারতীয় সংবিধানেই মানবাধিকার সুরক্ষার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে । ইহা ছাড়াও সংবিধানের মৌলিক নীতির সহিত সঙ্গতি রাখিয়া নানাবিধ সাধারণ আইনের মাধ্যমে মানবাধিকার সুরক্ষা করিবার ব্যবস্থা বিধান দেওয়া হইয়াছে । ভারতবর্ষে মানবাধিকার সুরক্ষায় বিধিত উপরোক্ত আইনি বিধানগুলিকে তিনভাগে ভাগ করা যায় , যথা-

(১) ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় খন্ডে দেওয়া মৌলিক অধিকার সমূহের বিধান ,

২) ভারতীয় সংবিধানে দেওয়া মৌলিক অধিকারসমূহ ভিন্ন অন্যান্য সাংবাধিনিক অধিকারসমূহের বিধান,

৩) সাধারণ আইনি অধিকারসমূহের বিধান ।

**ভারতীয় সংবিধানে দেওয়া মৌলিক অধিকারসমূহ ঃ-**

ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় খন্ডে ভারতের জনগণকে ছয়প্রকারের মৌলিক অধিকার দেওয়া হইয়াছে , যথা -

(i) সাম্যের অধিকার

(ii) স্বাধীনতার অধিকার

(iii) শোষণ হইতে ত্রাণের অধিকার

(iv) ধর্ম স্বাধীনতার অধিকার

(v) কৃষ্টি / সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষার অধিকার

(vi) সাংবিধানিক প্রতিকার সমূহের অধিকার ।

**সাম্যের অধিকার ঃ-** এই বিষয়ে ভারতীয় সংবিধানের ১৪ হইতে ১৮ অনুচ্ছেদে বিধান দেওয়া হইয়াছে যেমন -

(১) ভারতীয় রাষ্ট্র সীমার মধ্যে রাষ্ট্র কোন ব্যক্তিকে আইনের দৃষ্টিতে সমানাধিকার পাইতে এবং আইনের মাধ্যমে সমভাবে সুরক্ষা পাইবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবেন না - (সংবিধানের ১৪ নং অনুচ্ছেদ)

(২) জাতি , ধর্ম , বণ , জন্মস্থান এবং নারীপুরুষ নির্বিশেষে নাগরিক সমান সুযোগ সুবিধা পাইবার অধিকারী থাকিবেন । সর্বসাধারণের জন্য ব্যবহৃত দোকান , হোটেল , রেঁস্তোরা , পুষ্করিণী এবং অন্যান্য প্রমোদস্থলে প্রবেশের ক্ষেত্রে জাতি , ধর্ম , বর্ণ প্রভৃতির জন্য কোন ভেদবিচার করা হইবে না ।

কিন্তু জনস্বার্থে কিছু বাধা নিষেধ আরোপ করা যাইতে পারে , যেমন - সরকার জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য উপরের স্থানগুলিতে ছোঁয়াচে রোগীর প্রবেশ নিষিদ্ধ করিতে পারেন । ইহা ছাড়াও রাষ্ট্র নারী ও শিশুদের উন্নতিকল্পে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারেন । আবার , সামাজিক অথবা শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসর শ্রেণী এবং তপশিলভুক্ত জাতি এবং তপশিলভুক্ত উপজাতিগণের উন্নতিকল্পে বিশেষ ব্যবস্থা অনুমোদন করিতে পারেন - ( সংবিধানের ১৫ নং অনুচ্ছেদ) ।

(৩) সরকারী চাকুরীতে সকলের সমান অধিকার থাকিবে । জাতি , ধর্ম , বর্ণ , নির্বেশেষে নারী পুরুষ সকলেরই যোগ্যতা অনুসারে সরকারি চাকুরীতে নিযুক্ত হইবার অধিকার থাকিবে । কিন্তু রাষ্ট্র অনুন্নত শ্রেণীর জন্য সরকারী চাকুরী দিবার ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন - (সংবিধানের ১৬ নং অনুচ্ছেদ)

(৪) অস্পৃশ্যতা নিষিদ্ধ । অস্পৃশ্য বলিয়া কোন ভারতীয়কে সুযোগসুবিধা হইতে বঞ্চিত করা হইলে কিম্বা অসম্মান করা হইলে তাহা আইনতঃ দন্ডনীয় হইবে - (সংবিধানের ১৭ নং অনুচ্ছেদ )

(৫) উপাধি বিলোপন । কেবলমাত্র সামরিক ও শিক্ষাগত উপাধি ছাড়া রাষ্ট্র কোন ব্যক্তিকে অন্যকোন উপাধি দিবেন না । ভারত সরকার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ভারতরত্ন, পদ্মশ্রী , পদ্মভূষণ ইত্যাদি উপাধি যদিও দিতেছেন কিন্তু সরকারের মতে এইগুলি উপাধি নহে - পুরস্কার বা সম্মান মাত্র - ( সংবিধানের ১৮ নং অনুচ্ছেদ)

স্বাধিনতার অধিকার - এই বিষয়ে ভারতীয় সংবিধানের ১৯ হইতে ২২ নং অনুচ্ছেদে বিধান দেওয়া হইয়াছে , যেমন -

(১) সকল নাগরিকের নিম্নলিখিত অধিকার থাকিবে , যথা-

(i) বাক্‌স্বাধীনতার ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা ,

(ii) শান্তিপূর্ণভাবে এবং নিরস্ত্র হইয়া সমবেত হইবার অধিকার ,

(iii) পরিমেল বা সংঘ গঠন করিবার অধিকার ,

(iv) ভারতীয় অঞ্চলের সর্বত্র স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিবার অধিকার ,

(v) ভারতীয় অঞ্চলের যেকোন ভাগে বসবাস করিবার এবং স্থায়ীভাবে নিবাস করিবার অধিকার

(vi) যেকোন বৃত্তি অবলম্বন করিবার অথবা যেকোন উপজীবিকা , ব্যবসায় বা কারবার চালাইবার অধিকার ।

অবশ্য উপরোক্ত অধিকার প্রয়োগের রাষ্ট্র ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতা , রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্রে সহিত মৈত্রী সম্পর্ক , জনশৃঙ্খলা , সুরুচি বা সুনীতির স্বার্থে, অথবা আদালত অবমাননা, মানহানি বা কোন অপরাধের প্ররোচনা সম্পর্কিত বিষয়ে বিবেচনা করিয়া যুক্তিযুক্ত বাধানিষেধ আরোপ করিতে পারিবে - ( সংবিধানের ১৯ নং অনুচ্ছেদ ) ।

(২) অপরাধে দোষী সাব্যস্ত বিষয়ে সুরক্ষা বিধান নিম্নরূপ ঃ-

(i) যে কার্য করিবার জন্য অপরাধ হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ করা হয় সেই কার্য করিবার সময় বলবৎ থাকা কোন আইনের লঙ্ঘন ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইবেন না, এবং অপরাধ করিবার সময় বলবৎ থাকা আইন অনুযায়ী যে দন্ত দেওয়া যাইত তদপেক্ষা গুরুত্বর দন্ড ঐ ব্যক্তিকে দেওয়া যাইবেনা ।

(ii) কোন ব্যক্তি একই অপরাধের জন্য একাধিকবার অভিযুক্ত ও দন্ডিত হইবেন না ,

(iii) কোন অপরাধে অভিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে তাঁহার নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষী হইতে বাধ্য করা যাইবে না ।

- সংবিধানের ২০ নং অনুচ্ছেদ)

(৩) প্রাণ ও দৈহিক স্বাধীনতার সুরক্ষা - আইন দ্বারা স্থাপিত কার্যপ্রণালী অনুসারে ছাড়া কোন ব্যক্তি তাঁহার প্রাণ বা দৈহিক স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হইবেন না । ( সংবিধানের ২১ নং অনুচ্ছেদ)

(৪) (i) গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এরূপ কোন ব্যক্তিকে তাঁহার গ্রেপ্তারের কারণ যথাসম্ভব শীঘ্র না জানাইয়া হেপাজতে আটক রাখা যাইবে না এবং তাঁহার মনোনীত উকিলের সহিত পরামর্শ করিবার এবং তৎকর্তৃক সমর্থিত হইবার অধিকার হইতেও তাঁহাকে বঞ্চিত করা যাইবে না ।

(ii) গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এবং হেপাজতে আটক রাখা হইয়াছে এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের স্থান হইতে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত পর্যন্ত যাইবার জন্য প্রয়োজনীয় সময় বাদ দিয়া গ্রেপ্তারের সময় হইতে ২৪ ঘন্টা সময়সীমার মধ্যে ঐ ম্যাজিস্ট্রেটের সমক্ষে উপস্থিত করিতে হইবে এবং

ম্যাজিস্ট্রেটের প্রদত্ত আদেশ ছাড়া উক্ত সময়সীমার পর তাঁহাকে হেপাজতে আটক রাখা যাইবে না ।

(iii) বিদেশী শত্রু এবং নিবর্তনমূলক আটক আইনে গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিগণের ক্ষেত্রে উপরোক্ত এবং উপাংশে বলা অধিকার প্রযোজ্য হইবে না । অবশ্য ৪৪ তম সংবিধান সংশোধনীর পর নির্বতনমূলক আটক আইনে গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিগণের উপরোক্ত অধিকারের কঠোরতা অনেকখানি শিথিল হইয়াছে । - (সংবিধানের ২২ নং অনুচ্ছেদ )

**শোষণ হইতে ত্রাণের অধিকার** -এই বিষয়ে ভারতীয় সংবিধানের ২৩ এবং ২৪ নং অনু চ্ছেদ বিধান দেওয়া হইয়াছে , যথা -

(১) মনুষ্য ক্রয়-বিক্রয় ও বেগার খাটান এবং অনুরূপ অন্যকোন প্রকারে বলপূর্বক শ্রম করিইয়া লওয়া নিষিদ্ধ এবং এই বিধানের যেকোন লঙ্ঘন আইন অনুসারে দন্ডনীয় অপরাধ হইবে , কিন্তু এই অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক সার্বজনিক উদ্দেশ্যে বাধ্যতামূলক কর্ম আরোপনে অন্তরায় হইবে না এবং ঐরূপ কর্ম আরোপ করিতে রাষ্ট্র , ধর্ম জাতি , বর্ণ বা শ্রেণীর হেতুতে , অথবা উহাদের যেকোন একটির , কোন বিভেদ করিবেন না - (সংবিধানের ২৩ নং অনুচ্ছেন)

(২) ১৪ বৎসরের কম বয়সের কোন শিশুকে কোন কারখানায় বা খনিতে কর্মে নিযুক্ত করা যাইবে না অথবা অন্যকোন সংকটজনক কর্মে ব্যাপৃত করা যাইবে না - (সংবিধানের ২৪ নং অনুচ্ছেদ)

**ধর্ম স্বাধীনতার অধিকার** - এই বিষয়ে ভারতীয় সংবিধানের ২৫ হইতে ২৮ নং অনুচ্ছেদে বিধানাদি দেওয়া হইয়াছে । এ বিধানাদিতে ভারতের প্রত্যেক নাগরিককে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ ছাড়াই স্বাধীনভাবে তাঁহার নিজ ধর্ম স্বীকার , আচরণ ও প্রচার করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে । ভারতবর্ষের কোন রাষ্ট্রীয় ধর্ম নাই । রাষ্ট্রের চোখে সকল ধর্মই সমান । ধর্মসংক্রান্ত বিবেচনাদি সরকারি সিদ্ধান্তগুলিতে প্রভাব ফেলিতে দেওয়া হয় না । অর্থাৎ ভারতবর্ষ হইল ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ।

**কৃষ্টি সংস্কৃতি এবং শিক্ষা বিষয়ক অধিকার** - এই বিষয়ে ভারতীয় সংবিদানের ২৯ এবং ৩০ নং অনুচ্ছেদে বিধানাদি দেওয়া হইয়াছে ।

(১) ভারতের রাষ্ট্রীয় সীমার মধ্যে বা উহার কোন ভাগে বসবাসকারী নাগরিকগণের কোন বিভাগের নিজস্ব বিশিষ্ট ভাষা , লিপি বা কৃষ্টি সংস্কৃতি থাকিলে , নাগরিকগণের সেই বিভাগের তাহা অক্ষুন্ন রাখিবার অধিকার থাকিবে । কেবল ধর্ম , জাতি , বর্ণ , ভাষঅ বা তাহাদের মধ্যে কোন একটির হেতুতে রাষ্ট্র কর্তৃক পোষিত বা রাষ্ট্রীয় কোষাগার হইতে সাহায্যপ্রাপ্ত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোন নাগরিককে প্রবেশ করিতে দিতে অস্বীকার করা যাইবে না - (সংবিধানের ২৯ নং অনুচ্ছেদ)

(২) সকল সংখ্যালঘুবর্গের , ধর্মভিত্তিকই হউক বা ভাষাভিত্তিকই হউক , তাঁহাদের পছন্দমত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করিবার অধিকার থাকিবে । উক্ত কোন সংখ্যালঘু সম্প্রদায় কর্তৃক স্থাপিত ও পরিচালিত কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অর্জন করিবার জন্য

আইন প্রণয়নকালে রাষ্ট্র ইহা সুনিশ্চিত করিবেন যে , ঐরূপ সম্পত্তি অর্জনের জন্য ঐরূপ আইন দ্বারা স্থিরীকৃত বা তদনুযায়ী নির্ধারিত অর্থ এরূপ হয় যেন উহা উপরোক্ত অধিকার সঙ্কুচিত বা রদ না করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে সাহায্যদানে রাষ্ট্র কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিকূলে এই হেতুতে বিভেদ করিবেন না যে উহা কোন সংখ্যালঘুবর্গের পরিচালনাধীনে আছে , ঐ সংখ্যালঘুবর্গ ধর্মভিত্তিকই হউক বা ভাষাভিত্তিকই হউক - (সংবিধানের ৩০ নং অনুচ্ছেদ)

**সাংবিধানিক প্রতিকারসমূহের অধিকার** - এই বিষয়ে ভারতীয় সংবিধানের ৩২ নং অনুচ্ছেদে বিধান দেওয়া হইয়াছে

ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় খন্ডে যে মৌলিক অধিকারগুলি অর্পণ করা হইয়াছে তাহা লঙ্ঘন করা হইলে তাহা বলবৎ করিবার জন্য অধিকার এই ৩২ নং অনুচ্ছেদে দেওয়া হইয়াছে । অর্পিত মৌলিক অধিকারসমূহ বলবৎ করিবার জন্য যথাযোগ্য কার্যবাহ (Proceedings) দ্বারা সুপ্রীম কোর্টকে প্রচলিত করিবার অধিকার এই অনুচ্ছেদে দেওয়া হইয়াছে । অর্পিত যেকোন মৌলিক অধিকার বলবৎকরণের জন্য নির্দেশ বা আদেশ , অথবা বন্দিপ্রত্যক্ষীকরণ (হেবিয়াস করপাস) , পরমাদেশ (ম্যানডেমাস) , প্রতিষেধ (প্রহিবিশন) , অধিকারপৃচ্ছা (কুও ওয়ারান্টো)ও উৎপ্রেষণ (সারশিওয়ারি) প্রকৃতির আজ্ঞালেখ সমেত আজ্ঞালেখ (Writs) যাহাই যথাযোগ্য হইবে , তাহাই প্রচার করিবার ক্ষমতা সুপ্রীম কোর্টের থাকিবে । সুপ্রীমকোর্টকে অর্পিত উপরোক্ত ক্ষমতাসমূহ ক্ষুন্ন না করিয়া , পার্লামেন্ট আইন দ্বারা অন্য কোন আদালতকে , উহার শাসনাধীন ক্ষেত্রে মধ্যে সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক প্রয়োগযোগ্য উপরোক্ত সকল বা যেকোন ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার অধিকার প্রদান করিতে পারেন । এই প্রসঙ্গে সংবিধানের ২৬৬ নং অনুচ্ছেদও উল্লেখ্য । উক্ত অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোন কোন আজ্ঞালেখ (Writ) প্রচার করিবার জন্য হাইকোর্টকে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে ।

**মৌলিক অধিকারসমূহের প্রকৃতি**

ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয়খন্ড ভারতীয় জনগণকে ব্যক্তিগতভাবে এবং সমষ্টিগতভাবে যে মৌলিক অধিকারসমূহ অর্পন করিয়াছে তাহা জীবনকে অর্থবহ ও গণতন্ত্রকে ফলপ্রসু করিয়া তুলিতে একান্ত প্রয়োজনীয় অধিকারসমূহ । এই অধিকারগুলি এই অর্থে মৌলিক যে রাষ্ট্রের কোন আইনসভা ঐ অধিকারগুলিকে ক্ষুন্ন করিয়া কোন আইন তৈয়ারী করিতে পারেন না । যদি ঐরূপ কোন অধিকার লঙ্ঘিত হয় তবে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি তাহার সেই অধিকার রক্ষা ও বলবৎ করিতে সুপ্রীম বা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হইতে পারিবেন । প্রকৃতপক্ষে সুপ্রীমকোর্ট ঐ সকল অধিকারের রক্ষক ও অভিভাবক । এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে ভারতীয় সংবিধানের প্রদত্ত মৌলিক অধিকারসমূহ অবাধ নহে । ঐ সকল অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে সংবিধানই সমাজের বৃহত্তম স্বার্থে যুক্তিযুক্ত কিছু বাধানিষেধ আরোপ করিয়াছে । ঐ বিধিনিষেধগুলি সমাজের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থেই প্রয়োজনীয় । সমাজের অস্তিত্ব রক্ষা পূর্বশর্ত ।

সমাজ সুশৃঙ্খলভাবে রক্ষিত না হইলে ঐ অধিকারগুলি বলবৎ করিবে কে? সেই কারণেই নাগরিকগণের সমবেত হইবার অধিকারে বিধিনিষেধ আরোপ করিয়া বলা হইয়াছে যে উহা শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্র হইতে হইবে। রাষ্ট্রের নিরাপত্তার সাবার্থে, সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতা, শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার অবস্থায় রাষ্ট্রপতি যেকোন বলবৎ করিবার জন্য সুপ্রীম কোর্ট বা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হইবার এবং ঐ সকল অধিকার বলবৎ করিবার জন্য সুপ্রীম কোর্ট বা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হইবার অধিকারকেও মুলতুবি করিয়া রাখিতে পারেন। কিন্তু ভারতীয় সংবিধানের ৪৪ তম সংশোধনীর পর ২০ শে জুন ১৯৭৯ হইতে জরুরী অবস্থা ঘোষণার উপরে ও নানাবিধ বিধিনিষিধ আরোপ করা হইয়াছে এবং প্রাণ ও দৈহিক স্বাধীনতার অধিকার রক্ষার্থে নাগরিকগণের আদালতে যাইবার অধিকারকে জরুরী অবস্থাকালীন নাকচ করা যাইবে না।

## মৌলিক অধিকারসমূহ কাহাদের অর্পণ করা হইয়াছে ?

কিছু মৌলিক অধিকার কেবলমাত্র ভারতীয় নাগরিকগণকে অর্পণ করা হইয়াছে যথা -

(১) কেবলমাত্র ধর্ম, জাতি, বর্ণ, নারী পুরুষ বা জন্মস্থানের কারণে বৈষ্যমের শিকার হইতে সুরক্ষা পাইবার অধিকার (সংবিধানের ১৫ নং অনুচ্ছেদ)।

(২) সরকারি চাকুরীতে সমান সুযোগ পাইবার অধিকার - (সংবিধানের ১৬ নং অনুচ্ছেদ)

(৩) বাক্‌স্বাধীনতার অধিকার, সমবেত হইবার অধিকার, সঙ্ঘ গঠন করিবার অধিকার, স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিবার অধিকার, বসবাস করিবার অধিকার এবং বৃত্তি অবলম্বন করিবার অধিকার - (সংবিধানের ১৯ নং অনুচ্ছেদ)

(৪) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনে সংখ্যালঘুবর্গের অধিকার - (সংবিধানের ৩০ নং অনুচ্ছেদ)

আবার, কিছু মৌলিক অধিকার ভারতের মাটিতে অবস্থানকারী যেকোন ব্যক্তিকে (তিনি ভারতীয় নাগরিক হউন বা বিদেশী হউন) অর্পন করা হইয়াছে, যথা -

(১) আইনের চোখে সমানাধিকার এবং আইন কর্তৃক সমভাবে রক্ষিত হইবার অধিকার - (সংবিধানের ১৪ নং অনুচ্ছেদ)

(২) অপরাধে দোষীসাব্যস্ত হইবার বিষয়ে সুরক্ষা পাইবার অধিকার - (সংবিধানের ২০ নং অনুচ্ছেদ)

(৩) প্রাণ ও দৈহিক স্বাধীনতার অধিকার - (সংবিধানের ২১ নং অনুচ্ছেদ)

(৪) শোষণ হইতে ত্রাণের অধিকার - (সংবিধানের ২৩ নং অনুচ্ছেদ)

(৫) ধর্ম স্বাধীনতার অধিকার - সংবিধানের ২৫, ২৭ ও ২৮ নং অনুচ্ছেদ

## মৌলিক অধিকারসমূহ কাহার নিকট হইতে প্রাপ্য ?

মৌলিক অধিকারসমূহ রাষ্ট্র সুনিশ্চিত করিতে দায়বদ্ধ । ইহা তথ্য হইতে স্পষ্ট যে ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয়খন্ডে উল্লেখিত প্রায় সকল মৌলিক অধিকারই সুনিশ্চিত করিতে রাষ্ট্রকে উদ্দেশ্যে করিয়া সংবিধানের নির্দেশ দিয়াছে । অপরপক্ষে সংবিধানের ১৫(২), ১৭, ১৮ (২), ২৩ (১) এবং ২৪ অনুচ্ছেদ উল্লেখিত মৌলিক অধিকারসমূহ সুনিশ্চিত করিতে যদিও রাষ্ট্রকে প্রত্যক্ষভাবে উদ্দেশ্য করিয়া সংবিধান নির্দেশ দেয় নাই। তথাপি যেহেতু ঐ অধিকারগুলি সংবিধানের তৃতীয় খন্ডে স্থান পাইবার সেইহেতু তাহা পরোক্ষ রাষ্ট্র এবং ব্যক্তি উভয়কেই উদ্দেশ্য করিয়া বিধিত হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় ।

## ভারতীয় সংবিধানে দেওয়া মৌলিক অধিকারসমূহ ভিন্ন অন্যান্য অধিকারসমূহ ঃ-

এই সকল অন্যান্য সাংবিধানিক অধিকারসমূহ সংবিধানই অনুমোদিত দিয়াছে কিন্তু তাহা সংবিধানের তৃতীয়খন্ডের Part XIII এর বাহিরে দেওয়া হইয়াছে এবং তাহা শুধুমাত্র সাধারণ আইন দ্বারা অনুমোদিত হয় নাই । সেই কারণে এই সকল অধিকারসমূহ মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি না পাইলেও তাহা যেহেতু সংবিধান কর্তৃক অনুমোদিত সেইহেতু এই সকল সাংবিধানিক অধিকারসমূহের গুরুত্বও উল্লেখযোগ্য । নিম্নোক্ত সাংবিধানিক অধিকারসমূহকে মৌলিক সমূহ ভিন্ন অন্যান্য অধিকারসমূহ হিসাবে চিহ্নিত করা যায় , যথা -

(১) আইনের অধিকারবল ছাড়া কোন কর ধার্য বা সংগ্রহ যাইবে না - (সংবিধানের ২৬৫ অনুচ্ছেদ)

(২) আইনের অধিকার বল ছাড়া কোন ব্যক্তিকে তাঁহার সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না - (সংবিধানের ৩০০ এ অনুচ্ছেদ)

(৩) সংবিধানের ১৩ খন্ডের Part XIII অন্যান্য বিধানাদি সাপেক্ষ ব্যবসায় বাণিজ্য ও যোগাযোগের স্বাধীনতার অধিকার - (সংবিধানের ৩০১ অনুচ্ছেদ)

(৪) কেন্দ্র বা কোন রাজ্যের অধীনে অসামরিকপদে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ যে নিয়োগকারী কতৃপক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাহার অধস্তন কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পদচ্যুত বা অপসারিত হইবেন না । উক্তরূপ কোন ব্যক্তিকে তাহার বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ আছে তাহা জানাইয়া এবং সেই সকল অভিযোগ সম্বন্ধে তাঁহার স্বপক্ষে বক্তব্য শুনাইবার যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দিয়া তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান না করিয়া তাহাকে পদচ্যুত বা অপসারিত বা পদাবনমিত করা যাইবে না । অবশ্য এই ক্ষেত্রেও যুক্তিযুক্ত কিছু বাধানিষেধ আরোপ করা আছে - (সংবিধানের ৩১১ (১) ও (২) অনুচ্ছেদ)

৫) ধর্ম , বর্ণ, জাতি , নারী পুরুষের হেতুতে কোন ব্যক্তি নির্বাচক তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইবার

জন্য অপাত্র হইবেন না বা কোন বিশেষ নির্বাচক তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইবার দাবি করিতে পারিবেন না - (সংবিধানের ৩২৫ অনুচ্ছেদ),

৬) লোকসভার এবং রাজ্যসমূহের নির্বাচন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে হইবে - (সংবিধানের ৩২৬ অনুচ্ছেদ)

উপরোক্ত সাংবিধানিক অধিকার সমূহ যাহা যদিও মৌলিক অধিকারের তালিকায় স্থান পায় নাই তথাপি এই অধিকার পর্যাপ্ত পরিমাণে সুরক্ষিত অধিকার কারণ দেশের মূল আইন সংবিধানই এই অধিকার দিয়াছে। এই অধিকার কাড়িয়া লইতে হইলে সংবিধান সংশোধন করিবার প্রয়োজন হইবে যাহা খুব সহজসাধ্য নহে, এই সকল অধিকারের গ্যারান্টি এইখানেই। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে সংবিধান কর্তৃক প্রদত্ত মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হইলে প্রতিকার পাইতে সুপ্রীম কোর্টের দ্বারস্থ হইবার অধিকার সংবিধানের ৩২ নং অনুচ্ছেদ দেওয়া হইয়াছে কিন্তু অন্যান্য সাংবিধানিক অধিকার ( যাহা এই ক্ষেত্রে আলোচিত হইল) লঙ্ঘিত হইলে চাকুরী সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশাসনিক ট্রাইবুনালে দ্বারস্থ হইতে পারা যায় এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সংবিধানে র ২২৬ নং অনুচ্ছেদের আওতায় হাইকোর্টের দ্বারস্থ হওয়া যায়।

**সাধারণ আইনি অধিকারসমূহ**

এই অধিকারসমূহ হইল দেশের সাধারণ আইনে সৃষ্ট অধিকারসমূহ। এই অধিকার সমূহ বেসরকারি ব্যক্তি বা ব্যক্তি প্রতিনিধিগণের নিকট হইতে দাবি করা হয়। সাংবিধানিক অধিকার এবং সাধারণ আইনে সৃষ্ট অধিকারসমূহের মধ্যকার পার্থক্যটি জানিয়া রাখা প্রয়োজন। সাংবিধানিক অধিকার রাষ্ট্রের আইনসভাগুলির ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করিয়াছে, কিন্তু দেশের সাধারণ আইনি অধিকারগুলি রাষ্ট্রের আইনসভার স্ববিবেকের উপর নির্ভরশীল। তথাপি সাধারণ আইনি অধিকারগুলি নাকচ করা পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রের আইনসভাগুলির পক্ষেও খুব সহজসাধ্য নহে, কারণ জনপ্রিয় সরকার সর্বদাই সংবিধানের দর্শনকে, যাহা সংবিধানের প্রস্তাবনায় (Preamble-এ) এবং রাষ্ট্রের কর্মপদ্ধতি নির্দেশমূলক নীতিসমূহে Directive Principles of State policy) ভাষা পাইয়াছে, তাহা রূপায়িত করিতে সচেষ্ট থাকেন - না হইলে জনমত সরকারের বিপক্ষে চলিয়া যায়। সেই কারণে সাধারণ আইনি অধিকার সমূহ হ্রাস না পাইয়া তাহার তালিকা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। এই তথ্যই প্রমাণ করে যে দেশের সাধারণ আইনি অধিকারসমূহ পরোক্ষভাবে গ্যারান্টি প্রদত্ত।

সাধারণ আইনি অধিকার সমূহের তালিকা এই ক্ষুদ্রপরিসরে দেওয়া সম্ভবপর নহে নিম্নে উল্লেখযোগ্য কিছু সাধারণ আইনি অধিকার অর্পণকারী আইনের নাম দেওয়া হইল, যথা -

১)ভারতীয় দন্ড বিধি ( Indian Penal Code)

২) ফৌজদারী কার্যপ্রণালী বিধি ( Criminal Procedure Code )

৩) ভারতীয় সাক্ষ্য আইন (Indian Evidence Act )

৪) নাগরিক অধিকার সুরক্ষা আইন (Civil Right protection Act , 1955)

৫) দাসত্বাবদ্ধ শ্রম পদ্ধতি (বিলাপন) আইন ( Bonded Labour System (Abolition )Act , 1976)

৬) তপসিলভুক্ত জাতি এবং তপসিলভুক্ত উপজাতি (নৃশংসতা নিবারণ ) আইন (S.C.&S.T (Prevention of Atrocities )Act , 1989)

৭) অনৈতিক নির্দ্দাহ্ বৃত্তি নিবারণী আইন ( Prevention of Immoral Traffic Act , 1956)

৮) পণপ্রথা নিবারণী আইন (Dowry Prohibiton Act , 1961)

৯) মহিলাগণের অশোভন প্রদর্শন (নিবারণী ) আইন ( Indecent Representation of women (Prohibition )Act , 1986)

১০) সতীদাহ (প্রতিরোধক) আইন (Commission of Sati (prevention )Act, 1987)

১১) মহিলাগণের জন্য জাতীয় কমিশন আইন ( Nationam Commission for Women Act , 1990)

১২) কিশোর - কিশোরীগণের সম্পর্কিত ন্যায়বিচার আইন (Juvenile justice Act , 1986)

১৩) শিশুশ্রম (নিষেধ ও নিয়ন্ত্রণ) আইন ( Child Labour (Prohibition and regulation Act , 1986)

১৪) মানসিক স্বাস্থ্য আইন (Mental Health Act , 1987 )

১৫) সংখ্যালঘুবর্গের জন্য জাতীয় কমিশন আইন ( National Commission for Minority Act, 1992)

১৬) অনগ্রসর ব্যক্তিবর্গের জন্য জাতীয় কমিশন আইন ( National Commission for Backward classes Act, 1993)

১৭) মানবাধিকার সুরক্ষা আইন ( Protection of Human Right Act , 1993)

## অধিকারের উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলির তালিকা

পূর্ববর্তী দুইটি অধ্যায়ের সারাংশ লইয়া আমরা মানবাধিকারের বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলির তালিকা নিম্নরূপে তৈয়ারী করিতে পারি , যেমন -

**১) সংবিধান কর্তৃক প্রদত্ত মৌলিক অধিকারমসূহ , যথা -**

ক) আইনের চোখে সকলের সমানঅধিকার এবং আইনের মাধ্যমে সকলের সমভাবে সুরক্ষা পাইবার অধিকার ।

খ) জাতি , ধর্ম , বর্ণ , জন্মস্থান , নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে সকলের সুযোগসুবিধা সমানাধিকার, অবশ্য জনস্বার্থে অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য বিশেষ সুরক্ষা ব্যবস্থা হইতে পারে ।

গ) সরকারি চাকুরী পাইতে সকলেরই সমানাধিকার ।

ঘ) অস্পৃশ্য না হইবার অধিকার ।

ঙ) সামরিক ও শিক্ষাগত উপাধি ছাড়া অন্যকোন উপাধি রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত না হইবার অধিকার।

চ) বাক্স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের অধিকার ।

ছ) শান্তিপূর্ণভাবে এবং নিরস্ত্র হইয়া সমবেত হইবার অধিকার ।

জ) পরিমেল বা সঙ্ঘ গঠন করিবার অধিকার ।

ঝ) ভারতীয় অঞ্চলে সর্বত্র স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিবার অধিকার ।

ঞ) ভারতীয় বৃত্তি অবলম্বন করিবার অথবা যেকোন উপজীবিকা , ব্যবসায় কারবার চালাইবার অধিকার।

ট) বলবৎ থাকা আইনের বিধান লঙ্ঘন না করিলে অপরাধে দোষীসাব্যস্ত হইবার অধিকার ।

ঠ) অপরাধ করিবার সময় বলবৎ থাকা আইন অনুযায়ী যে দন্ড প্রাপ্য তাহার অধিক গুরুত্বর দন্ড পাইবার অধিকার ।

ড) একই অপরাধের জন্য একাধিকবার অভিযুক্ত ও দন্ডিত না হইবার অধিকার ।

ঢ) কোন অপরাধে অভিযুক্ত কোন ব্যক্তির তাহার নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষী হইতে বাধ্য না হইবার অধিকার।

ণ) আইনি কার্যপ্রণালী অনুসরণ ছাড়া কোন ব্যক্তি প্রাণে বা দৈহিক স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত না হইবার অধিকার ।

ত) কেহ গ্রেপ্তার হইলে কেন তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইল তাহার কারণ তাহার জানিবার অধিকার।

থ) গ্রেপ্তার হইলে ধৃত ব্যক্তির পছন্দমত আইনজীবীর সহিত পরামর্শ করিবার অধিকার ।

দ) গ্রেপ্তার হইলে ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ছাড়া ২৪ ঘন্টার বেশী ধৃত ব্যক্তির পুলিশ হেপাজতে না থাকিবার অধিকার ।

ধ) মনুষ্য হিসাবে বিক্রয় না হইবার অধিকার , বেগার শ্রম না দিবার অধিকার ।

ন) ১৪ বৎসর কম বয়েসী কোন শিশুর কারখানা বা খনিতে অথবা অন্যকোন সংকটজনক কর্মে নিযুক্ত না হইবার অধিকার ।

প) স্বাধীনভাবে নিজ ধর্ম স্বীকার করিবার , আচরণ করিবার এবং প্রচার করিবার অধিকার ।

ফ) নিজস্ব বিশিষ্ট ভাষা , শিক্ষা বা কৃষ্টি সংস্কৃতি অক্ষুন্ন রাখিবার অধিকার ।

ব) সংখ্যালঘুবর্গের ধর্মভিত্তিকই হউক বা ভাষা ভিত্তিকই হউক , তাঁহাদের পছন্দমত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করিবার অধিকার ।

ভ) উপরোক্ত যে কোন মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করা হইলে সুপ্রীমকোর্ট বা হাইকোর্ট সাংবিধানিক প্রতিকার পাইবার জন্য দ্বারস্থ হইবার অধিকার ।

**২) মৌলিক অধিকার ভিন্ন অন্যান্য সাংবিধানিক অধিকারসমূহ , যথা -**

ক) আইনের অধিকার বল ছাড়া কোন কর ধার্য বা সংগ্রহ না হইতে দেওয়ার অধিকার ।

খ) আইনের অধিকারবল ছাড়া কোন ব্যক্তির তাঁহার সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত না হইবার অধিকার।

গ) ব্যবসায় , বাণিজ্য ও যোগাযোগের স্বাধীনতার অধিকার - অবশ্যই তাহা সংবিদানের ১৩ খন্ডের অন্যান্য বিধানাদি সাপেক্ষ ।

ঘ) নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের অধস্তন কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারি কর্মচারীগণের পদচ্যুত বা অপসারিত না হইবার অধিকার । তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকিলে তাহা জানিবার এবং ঐ অভিযোগের বিপক্ষে তাহাদের বক্তব্যপেশের সুযোগের অধিকার ।

ঙ) ধর্ম, বর্ণ , নারী -পুরুষ নির্বিশেষে সকলের নির্বাচক তালিকায় অন্তভুর্ক্ত হইতে অপাত্র না হইবার অধিকার ।

চ) প্রাপ্তবয়স্ক সকলের লোকসভার এবং রাজ্যসমূহের বিধানসভার নির্বাচনে ভোট দিবার অধিকার ইত্যাদি।

**৩) উল্লেখযোগ্য কিছু সাধারণ আইনি অধিকারসমূহ , যথা -**

ক) নির্মল বাতাস ও পরিবেশ পাইবার অধিকার ।

খ) নাগরিক অধিকার হইতে কাহারও বঞ্চিত না হইবার অধিকার ।

গ) দাসত্বাবদ্ধ শ্রম না দিবার অধিকার ।

ঘ) তপসিলভুক্ত জাতি ও উপজাতিগণের আইনি সুরক্ষা পাইবার অধিকার ।

ঙ) নির্দিষ্ট কিছু কর্মে শিশুগণের নিযুক্ত না হইবার অধিকার , জেলে বা পুলিশ হাজতে আটক না থাকিবার শিশুর অধিকার ।

চ) অবহেলিত বা অপরাধী কিশোর কিশোরীগণের যত্ন , সুরক্ষা , চিকিৎসা বিকাশ এবং পুনর্বাসিন পাইবার অধিকার ।

ছ) মানসিক রোগীগণের আইনানুসারে চিকিৎসা ও যত্ন পাইবার অধিকার এবং চিকিৎসার

সময় দৈহিক বা মানসিকভাবে অমর্যাদা না পাইবার অধিকার ।

জ) নারী মর্যাদা রক্ষাকারী আইনী সুরক্ষা পাইতে নারীগণের অধিকার ,পণের কারণে অত্যাচারিত না হইবার অধিকার, , সতীদাহ প্রতিরোধ করিবার অধিকার , অনৈতিক নিন্দাহ বৃত্তিতে নিযুক্ত না হইবার অধিকার।

ঝ) সংখ্যালঘুবর্গের সাংবিধানিক ও আইনি সুরক্ষা পাইবার অধিকার ইত্যাদি ইত্যাদি ।

## অধিকার লঙ্ঘন এবং জ্বলন্ত কিছু ঘটনা

**অধিকার লঙ্ঘন কিভাবে হয় ?**

মানবাধিকার অজস্রভাবে লঙ্ঘিত হয় । নির্মল পরিবেশ , খাদ্য , বস্ত্র , বাসস্থান , চিকিৎসা , শিক্ষার সুযোগসহ সাধারণমানের জীবনযাত্রা হইতে বঞ্চিত হওয়া এবং মনুষ্যত্বের অমর্যাদা হওয়া , এমনকি মানসিক অত্যাচারও মানবাধিকার লঙ্ঘনের পর্যায়ে পড়ে । কোন লোকসেবকের নিকট প্রথামত সাক্ষাৎ করিতে গেলে তিনি যদি সাক্ষাৎপ্রার্থীকে বসিতে বলার ভদ্রতাটুকুও না দেখান সেখানেও মানবাধিকার লঙ্ঘিত হইয়াছে বলা হইবে । প্রকৃতপক্ষে যেখানে মানবাধিকার লেশমাত্র থাকে সেখানেই মানবাধিকার লঙ্ঘনের পর্যাপ্ত সুযোগ থাকিয়া যায় । প্রসঙ্গত উল্লেখ যোগ্য যে সারা দেশে যে পরিমাণ মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয় তাহার মাত্র ৮/৯ শতাংশ সাধারণের নজরে আসে , বাকি সকল ঘটনা অজান্তেই থাকিয়া যায় ।

**মানবাধিকার লঙ্ঘনের জ্বলন্ত কিছু উদাহরণ**

মানবাধিকার লঙ্ঘনের অজস্র উদাহরণ দেওয়া যায় । কিন্তু এই ক্ষুদ্র পরিসর জ্বলন্ত কয়েকটি ঘটনা লইয়া আলোচনা করা হইল , যথা -

**শিশু শ্রমিক নিয়োগ** - শিশু শ্রমিক আমাদের সমাজে স্বীকৃত একটি জ্বলন্ত সমস্যা জীবিকার তাগিদে এবং ধনবানদের বিত্তবাসনা এই দুইয়ের মণিকাঞ্চনযোগে এই সমস্যা প্রবল হইতে প্রবলতর হইতেছে । বর্তমানে ভারতবর্ষে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা এক কোটি ত্রিশ লক্ষ । পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন পেশায় যথা বিড়ি শিল্পে , কার্পেট শিল্পে , পুস্তক বাঁধাই শিল্পে , আতসবাজির কারখানায় , মোটর মেরামতি গ্যারেজে , বৈদ্যুতিক মিস্ত্রি হিসাবে , ছোটখাট কলকারখানায় , চা বাগান ইত্যাদিতে পাঁচলক্ষ শ্রমিক নিযুক্ত আছে যাহারা স্কুলে যাইবার পরিবর্তে জীবনযুদ্ধে সামিল হইয়াছে । এক তামিলনাড়ুর শিবকাশিতেই দেড়লক্ষ শিশুশ্রমিক আতসবাজি এবং দিয়াশলাই শিল্পে নিযুক্ত আছে । পশ্চিমবঙ্গেও আতসবাজি শিল্পে পনেরো হাজার শিশু শ্রমিক কাজ করিয়া চলিয়াছে । অথচ কারখানা বা খনিতে অথবা অন্যকোন সংকটজনক কর্মে গৃহ নির্মাণ শিল্প , পরিবহন , আতসবাজি এবং কাঁচ শিল্পে শিশু শ্রমিক নিয়োগ সংবিধান এবং সাধারণ আইনে নিষিদ্ধ ঘোষিত হইয়াছে । বিষয়টি বড়ই

স্পর্শকাতর। সেই কারণে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৮৬ সালের শিশুশ্রম (নিষেধ ও নিয়ন্ত্রণ ) আইন পশ্চিবঙ্গ রাজ্যে বলবৎ করিয়া সংকটজনক কর্মে শিশু শ্রমিক নিয়োগ বন্ধ করিতে বিশেষ উদ্যোগি হইয়াছেন এবং অন্যান্যক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রমদপ্তর ঘোষণা করিয়াছেন যে শিশু শ্রমিকদের দিনে ৫ ঘন্টা এবং সপ্তাহে ৩০ ঘন্টার বেশী কোন পরিস্থিতিতেই খাটান চলিবে না ।

**দাস ব্যবসায়** - ভারতবর্ষের বহু রাজ্যের রেগার শ্রম প্রথা চালু আছে । মহাজনের নিকট হইতে ধার লইয়াছেন । সুদ বৃদ্ধি পাইতে থাকায় তাহা আর শোধ করা সম্ভব হইল না। ঋণদাতা বলিলেন পুত্রকে বেগার খাটিতে হইবে । অথচ সর্বপ্রকারের দাস ব্যবসায় সংবিধান ও সাধারণ আইন দ্বারা নিষিদ্ধ ঘোষিত হইয়াছে ।

**নারী নির্যাতন** - আমাদের সমাজের নারীগণের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ ও নির্যাতন নানা দিক দিয়া উৎকটভাবে প্রকট হইতেছে ।অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্ত্রী শিশুদের প্রতি সর্ববিষয়ে অভিভাবকগণের অবহেলা , স্বামীগৃহে বধূদিগের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ কর্মস্থলে নারীগণে প্রতি বিভিন্ন প্রকারের উৎপীড়ন , সমকাজে নারীকর্মীর কম বেতন , ধর্ষণ , পণের জন্য বধূহত্যা ইত্যাদি অহরহ ঘটিয়া চলিয়াছে । ১৯৯২ সালের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে উত্তরপ্রদেশের জরির কাজে নিযুক্ত নারীকর্মীগণ দিয়ে ৫ টাকা মজুরী পাইতেছেন , অপরপক্ষে ঐ একই কাজে পুরুষগণ পঁচিশ টাকা পাইতেছেন । বিহারে নারীকর্মীগণ সূর্যের প্রখর তাপে দগ্ধ হইয়া পাথর ভাঙ্গিয়া দিনে তিন /চার টাকার বেশী মজুরী পান না ।এই বৈষম্য দূর করিতে সরকার সমবেত আইন , নূন্যতম মজুরী আইন করিয়াছেন তথাপি দেশের নানা প্রান্তে আজও বৈষম্য চলিতেছে ।

১৯৯৪ সালে সারাদেশের নানাপ্রান্তে এগারো হাজার ধর্ষনের ঘটনা , বাইশ হাজার নারী উৎপীড়নের ঘটনা নজরে আসিয়াছে । এগারো হাজার ধর্ষণের ভিতর উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ মিলাইয়া পাঁচ হাজার এবং রাজস্থান , মহারাষ্ট্র বিহার এবং অন্ধ্রপ্রদেশ চার হাজার ধর্ষনের ঘটনা নথিবদ্ধ হইয়াছে । এই সংখ্যাতথ্য বিচারকালীন ইহা মনে রাখা প্রয়োজন শেষ সংখ্যাগুরু ক্ষেত্রেই সামাজিক অপবাদ , গুন্ডাদের হুমকি , দারিদ্রের যন্ত্রণার কারণে ধর্ষনের ঘটনা কতৃপক্ষের নজরে আনা হয় না ।আবার ১৯৯৪ সালে দেশের নানা প্রান্তে ৪৮৫০ টি পণঘটিত বধূহত্যা হইয়াছে ।এই ক্ষেত্রেও ২০০ বধূহত্যা হইয়া উত্তরপ্রদেশ তালিকার শীর্ষে আছে । আবার অতি সম্প্রতি সতীদাহের ঘটনাও ঘটিয়াছে । সরকার ভারতীয় দন্ড বিধি , পণপ্রথা নিবারনী আইন , সতীদাহ প্রতিরোধ আইন, অনৈতিক নিন্দার্হ বৃত্তি নিবারনী আইন , মহিলাগণের অশোভন প্রতিমূর্তি প্রদর্শন (নিবারনী) আইন ইত্যাদির মাধ্যমে নারীর অধিকার ও মর্যাদা রক্ষা করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন , তথাপি পরিতা পের ও লজ্জার বিষয় যে নারীর বিরুদ্ধে অপরাধসমূহ ক্রমবর্দ্ধমান ।

**সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ এবং জাতপাতের হানাহানি** - ভারতবর্ষ তাহার অশেষ বৈচিত্র লইয়া ছোটখাট

একটি পৃথিবী। বিশ্বের প্রতিটি ধর্ম এই দেশে উপস্থিত। এত ভাষা আর কোন দেশে নাই, নাই এত সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট। সেই কারণে ভারতবর্ষের প্রত্যেক নাগরিককে জাত, ধর্ম, বর্ণ সম্প্রদায়, জন্মস্থান ইত্যাদি নির্বিশেষে সম অধিকার অর্পণ করিয়া ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের বুনিয়াদ রচনা করিয়া ভারতীয় সংবিধান ভারতবর্ষের অন্তরের ফুল্গু ধারাকে অক্ষুন্ন রাখিতে দায়বদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু স্বার্থন্বেষী দেশী বিদেশী মতলববাজেরা ভারতবর্ষের অন্তঃসলিলা ঐক্যের বুনুন কে ছিড়িয়া দিতে উদ্যত হইয়াছে। সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ সন্ত্রাসবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ, জাতপাতের হানাহানির মধ্যে দিয়া তাহা আত্মপ্রকাশ করিতেছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর নিজেদের মতামত চাপাইয়া দিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছেন। সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় হিন্দুগণ নিজেদের মধ্যে ও ঐক্যবদ্ধ নহে। হিন্দুগণের বহু মন্দিরে আজও হরিজনদের প্রবেশের অধিকার নাই। অনেক পাঠশালায় হরিজন শিশুদের আজও পৃথক করিয়া রাখা পানীয় জলের পাত্র হাতে জল পান করিতে হয়। জাতপাতের এই লড়াই মতলববাজেরা নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করিতে জিয়াইয়া রাখিয়াছে। ইহা অত্যন্ত লজ্জা ও পরিতাপের বিষয়। অথচ দেশের সংবিধান, দেশের সাধারণ আইন সকলের সম অধিকারের কথা স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করিয়াছে। শুচিতা অশুচিতা লইয়া সুক্ষ স্তরভেদ হিন্দুর আচারে বিচারে অভ্যাসে এমনভাবে ঢুকিয়া আছে, আমরা অনেকে তাহাতে এতটাই অভ্যস্ত হইয়া গেছি যে ইহার হীনতা ও অমানবিকতা আমরা লক্ষ্য করিতেই ভুলিয়া গেছি। কিন্তু যাহাদের আমরা ঘৃণা করিয়া দূরে সরাইয়া রাখিয়াছি তাহারাও আজ জাগিতেছেন। মনুষ্যত্বের অপমানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ ক্রমে বাড়িতেছে, আরও বাড়িবে। যাহারা এতদিনের সুবিধাভোগী তাহাদিগকেই আগাইয়া আসিয়া পিছাইয়া পড়া মানুষদের হাত ধরিয়া আগাইয়া লইতে হইবে -ইহাই সময়ের দাবি। এই দাবি অগ্রাহ্য করিলে মানবাধিকার লঙ্ঘন চলিতেই থাকিবে এবং ফল বিষময় হইবে।

**সন্ত্রাস ও বিচ্ছিন্নতাবাদী ক্রিয়াকলাপ** - ভারতবর্ষে অস্থিরতা সৃষ্টি করিতে মতলববাজ বিদেশী গোষ্ঠী এবং বিদেশী মদতপুষ্ট স্বদেশীরা কিছু গোষ্ঠী ভারতবর্ষের মাটিতে সন্ত্রাস ও বিচ্ছন্নতাবাদী ক্রিয়াকলাপ চালাইতেছে। ইহার ফলে শতশত নিরপরাধ ভারতীয় নাগরিক হত্যা হইতেছেন। মানবাধিকার লঙ্ঘনের ইহা এক জ্বলন্ত উদাহরণ। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হইল ঐ সন্ত্রাস ও বিচ্ছিন্নতাবাদী ক্রিয়াকলাপ দমনে সরকারি পদক্ষেপকে বিদেশী স্বার্থন্বেষী গোষ্ঠী মানবতার মুখোশ পড়িয়া মানবাধিকার লঙ্ঘন বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন। প্রকৃতপক্ষে মানবাধিকার বিষয়টিকে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখিতে হইবে যাহাতে ব্যক্তির অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষার সাথে সাথে সামগ্রিক জনগণের স্বার্থও রক্ষিত হয়।

**গণপ্রহার, ডাইনী হত্যা ইত্যাদি** - ডাকাত সন্দেহে পিটাইয়া হত্যা এবং ডাইনী হত্যা এখনকার প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। দেশে আদালত ও পুলিশি ব্যবস্থা থাকিতে ও ক্রুদ্ধ জনতাই বিচারক এবং

দন্ডদাতা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। আইন নিজ হাতে তুলিয়া লইবার এই প্রবণতা সামাজিক অবক্ষয়ের এক চুড়ান্ত নমুনা। ইহা পুলিশের উপর অবিশ্বাসের নমুনা শুধুমাত্র নহে, ইহা গণতান্ত্রিক সমাজের কলঙ্ক লেপনকারী ঘটনা।

কুসংস্কারের পিছনেই থাকে কিছু অসৎ মানুষের স্বার্থবুদ্ধি। এককালে হিন্দুসমাজে যে কারণে সতীদাহের নামে অসহায় নারীদের পুড়াইয়া মারা হইত, এখনও অনেকটাই সেই কারণেই আদিবাসী সমাজের মহিলাদের হত্যা করা হইতেছে। যেসকল মহিলার পুত্রকন্যা কিংম্বা স্বামী নাই, কিন্তু একটি বসতবাড়ী কিম্বা কিছুটা জমি আছে, সেই সকল মহিলাদের সম্পত্তি গ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে একদল লোক উঠিয়া পড়িয়া লাগে। গ্রামে দুই একটি শিশুর মৃত্যু ঘটিলেই তাহা ডাইনীর বিষ নজরের ফল বলিয়া রটাইয়া দেওয়া হয়। যে রমনী একা থাকেন তিনিই ডাইনী। তাহার বিরুদ্ধে লোকজনদের ক্ষ্যাপানো হয় পরিকল্পিতভাবে, তাহারপর একদিন একটি দল জুটাইয়া সেই মহিলাকে আগুনের পুড়াইয়া বা অন্যকোনভাবে, হত্যা করিলে সেই লোকালয় হইতে একটি অশুভ শক্তির বিদায় হইয়া যায়, কাহারও গায়ে দোষ লাগে না। কালক্রমে স্বার্থান্বেষীদের হাতে মৃতার সম্পত্তি চলিয়া যায়।

**পুলিশি অত্যাচার ও বর্বরতার অভিযোগ** - নানা সময়েই পুলিশের বিরুদ্ধে নানাবিধ প্রমাণিত ও অপ্রমাণিত অভিযোগ উঠিতেছে, অভিযোগুলি হইতেছে

(এ) পুলিশ জনসাধারণকে অযথা হয়রানি করে,

(বি) পুলিশ মিথ্যা মামলা সাজায়,

(সি) ঘুষ না দিলে একটি মামলার জামিন পাইয়া গেল হইতে বাহির হওয়ামাত্র পুলিশ আবার তাহাকে একটি মিথ্যা মামলায় জেল গেট হইতেই গ্রেপ্তার করে,

(ডি) পুলিশ থানায় নিষ্ঠুর অমানবিক অত্যাচার করে অর্থাৎ থার্ড ডিগ্রি প্রয়োগ করে,

(ই) পুলিশ হেপাজতে ধৃত ব্যক্তিকে পিটাইয়া মারে,

(এফ্) পুলিশ থানা হাজতে নারীবন্দীদের নির্যাতন করে, ধর্ষণ করে,

(জি) পুলিশ কথায় কথায় নিরীহ মানুষের উপর গুলি ছোঁড়ে,

( এইচ্) ধৃত ব্যক্তি থানা হাজতে অবর্ণনীয় দুর্দশার শিকার হয়, ৫০ বর্গফুট ঘরে ১২-১৩ জনকে ঠাসাঠাসি করিয়া রাখে, মে মাসের গরমেও খাওয়া জল চাহিয়াও পাওয়া যায় না। বাথরুম বলিতে ঐ থানা হাজতের মধ্যে রাখা একটি ড্রামকেই বুঝায় - ইত্যাদি ইত্যাদি।

অধিকাংশ পুলিশ কর্মীর বিরুদ্ধে উক্ত অভিযোগ সত্য নহে, কিন্তু মুষ্টিমেয় কিছু পুলিশ কর্মীর ক্ষেত্রে তাহা সত্য প্রমাণিত হইয়াছে এবং তাহার যথাযথভাবে দন্ডিত হইয়াছেন। সেই কারণেই বিচারপতি কৃষ্ণ আয়ারকে একটি মামলায় মন্তব্য করিতেহইয়াছে যে সরকারি উর্দির আড়ালে পুলিশই হইল এক সংগঠিত গুন্ডাবাহিনী"। উপরোক্ত মন্তব্যটি কিছু পুলিশ কর্মীর কারণে গোটা পুলিশ

বাহিনীকেই শুনিতে হইয়াছে। ইহা অত্যন্ত লজ্জা ও পরিতাপের বিষয়।

এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সাম্প্রতিক রিপোর্ট ভারতবর্ষের নানা প্রান্তে পুলিশি বর্বরতার যে চিত্র ফুটিয়াছে তাহাতে পুলিশ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘনের সহজবোধ্য বেশকিছু ঘটনা উল্লেখিত হইয়াছে। ঐ রিপোর্টে পুলিশি হেপাজতে আটকের ২৪ ঘন্টার মধ্যে ১৫২টি মৃত্যুর ঘটনা সহযোগে অত্যাচারের নমুনা দেওয়া হইয়াছে।

**বিচার বিলম্ব** - হইলে তাহা বিচার না পাইবারই সামিল। পাহাড় প্রমাণ মামলার ভিড়ে বিচার দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইতেছে। ইহাতে পরোক্ষভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হইতেছে। দীনদরিদ্র জনগণ বিচারালয়ের দ্বারস্থ হইবার খরচটুকুও জোগাড় করিতে পারেন না, তাহার উপর বিচারে বিলম্ব হইলে তাহাদের পক্ষে মামলা চালান দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সরকার এই দিকে দৃষ্টি দিয়া বিচার তরান্বিত করিবার উদ্যোগ লইয়াছেন এবং দীনদরিদ্রের জন্য আইনি সাহায্যের ব্যবস্থাও করিতেছেন।

**কারাগারের অবর্ণনীয় দুর্দশা** - কারাগারের অবস্থা অমানবিক। বন্দীদের তথায় অনেকক্ষেত্রেই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ অর্ধভুক্ত হইয়া চিকিৎসা না পাইয়া দিনাতিপাত করিতে হয়। উন্মাদ ও পাগল বন্দীগণের ক্ষেত্রে কারগারগুলি উদাসিনতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কারাগারের পরিবেশ সংশোধনালয়ের পরিবেশ হইবে - ইহাই কাম্য কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কারাগারের পরিবেশ, নির্দয়তা, কলুষ তাহাকে প্রতিশোধপরায়ণ হিংস্র এবং আরও বিপথগামী করিয়া তুলিতে সহায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ। ফলে দন্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি দন্ডভোগ শেষে কারাগার হইতে বাহিরে আসিয়াই নূতন উদ্যমে আবারও অপরাধ সংঘটনে নামিয়া পড়ে। কারণ সে জানে, তাহার সামাজিক পুনর্বাসিন নাই তাহার রুজি রোজগারের পথ বন্ধ, সে রাষ্ট্রের ধিকৃত ও চিহ্নিত নাগরিক। ইহা মানবতাবোধের চরম দৈন্যদশা প্রকট করিতেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সরকার নানাদিক চিন্তা করিয়া বর্তমানে কারা আইন সংশোধনের চেষ্টা করিতেছেন।

## অধিকার এবং পুলিশের কর্তব্যাদি

### অধিকার এবং রাষ্ট্র

মানবাধিকার রক্ষায় রাষ্ট্র দায়বদ্ধ। রাষ্ট্র বলিতে কাহাকে বুঝিব তাহা সংবিধানের তৃতীয় খন্ডে উল্লেখিত মৌলিক অধিকারের বিধানাদির প্রথম অনুচ্ছেদ অর্থাৎ ১২ নং অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে। ঐ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্র বলিতে " ভারত সরকার ও সংসদ এবং রাজ্যসমূহের প্রত্যেকটি সরকার ও বিধানমন্ডল, এবং ভারতের রাষ্ট্রীয় এলাকার অথবা ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রনাধীন সকল স্থানীয় বা অন্য কতৃপক্ষ সকলকে" বুঝায়। উপরোক্ত সংজ্ঞানুযায়ী পুলিশের কার্য রাষ্ট্রের কার্য বলিয়া অভিহিত

হইবে । সেই কারণে পুলিশের কার্যে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হইলে রাষ্ট্র মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ে পড়িয়া যায় ।

**মানবাধিকার রক্ষায় পুলিশের কি করা উচিত ?**

নিজ কার্যের এবং অপরের কার্যের মাধ্যমে কাহারও মানবাধিকার যাহাতে লঙ্ঘিত না হয় তাহার প্রতি সতর্ক দৃস্টি রাখাই পুলিশের অন্যতম কর্তব্য । এই প্রসঙ্গে অবশ্য স্মরণীয় বিষয় হইল যে মানবাধিকারের বিষয়টিকে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখিতে হইবে যাহাতে ব্যক্তির অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষার সাথে সাথে সামগ্রিক জনগণের স্বার্থও রক্ষিত হয় । মনে রাখিতে হইবে যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই মানবাধিকার রক্ষিত হয় । উপরোক্ত বিষয়গুলি যথাযথ সম্পাদনের জন্য পুলিশকে আইন ও আইনি বিধিনিয়ম অনুসারে কার্য করিবার সাথে সাথে যে মূল নীতির উপর আইন প্রতিষ্ঠিত স্ববিবেক প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাহা মানিয়া চলিতে হইবে । এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কিছু বিষয়ে এতদ্‌পশ্চাত পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হইল ।

**পুলিশের নিজ আচরণে যাহাতে মানবাধিকার লঙ্ঘিত না হয় তাহার জন্য উল্লেখযোগ্য কিছু বিষয়াদি**

পুলিশ জনগণের সেবক । পুলিশ বাহিনীর উদ্দেশ্য হইতেছে জনসমাজে অপরাধ নিবারণ , অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা , বিচারার্থে চালান দেওয়া , জনগণের জীবন ও ধনসম্পত্তি রক্ষা করা, আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখা , আপদকালে জনগণকে রক্ষা করা এবং বিবিধ সংবাদ সংগ্রহ করা ইত্যাদি । প্রকৃতপক্ষে রেশনকার্ড হারানো হইতে শুরু করিয়া বাড়িওয়ালা - ভাড়াটে ঝগড়া শাশুড়ি বধূর কাজিয়া ইত্যাদি হাজারো বিষয়ে পুলিশকে ডাইরী লইতে ও হস্তক্ষেপ করিতে হয় । এই সকল কার্যাদি মানবাধিকার লঙ্ঘন না করিয়া উৎকৃষ্টরূপে সম্পন্ন করিতে হইলে পুলিশকে জনগণের সহিত সংযত ভদ্র ব্যবহার করিতে হইবে , কষ্ট সহিষ্ণু হইতে হইবে এবং কর্তব্য কর্মে অটল থাকিয়া নিরপেক্ষ রূপে অগ্রসর হইতে হইবে । পুলিশ বাহীনির সদস্যাগণকে স্মরণে রাখিতে হইবে যে তাহার জনগণের সেবকমাত্র জনগণকে সেবা ও সাহায্য করা এবং তাহাদের অধিকার রক্ষা করাই পুলিশের অন্যতম কর্তব্য । জনগণের সহিত কখনই অমার্জিত রূঢ় , কর্কশ ও অশিষ্ট আচরণ করা যাইবেনা (পি. আর. বি. রুল ৩৩ দ্রষ্টব্য )

**বাদী বা অভিযোগকারীর প্রতি আচরণ** - প্রথমেই মনে রাখা প্রয়োজন যে কেহ কোন বিপদে না পড়িলে পুলিশের নিকট অভিযোগ লইয়া আসে না , সেই কারণে সহানুভূতিপূর্ণ মনোভাব লইয়া তাহার সহিত বাক্যালাপ করিতে হইবে এবং মনোযোগ দিয়া তাহার বক্তব্য শুনিতে হইবে । প্রশ্ন করিয়া তাহার বক্তব্য পরিষ্কার বুঝিয়া লইতে হইবে , কোনরূপ বিরূপ মন্তব্য করা বিধেয় নহে । সত্যমিথ্যা যাহাই হউক উহা তদন্তে প্রকাশ পাইবে , অস্থিরতা প্রকাশ করা পুলিশের কর্তব্য নহে ।

সর্বদা মনে রাখিতে হইবে যে পুলিশের নিকট যখনই কোন ব্যক্তি আসিবেন তাহার আসিবার কারণ জানিয়া তাহার সহিত সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার হইবে , কিন্তু আইনের প্রয়োগ সম্বন্ধে তাহাকে সচেতন ও দৃঢ় হইতে হইবে এবং সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জনের চেষ্টা হইতে নিজেকে দূরে রাখিতে হইবে ।

সম্মান প্রদর্শনে কোন অর্থের প্রয়োজন হয় না , কিন্তু মানুষের অন্তর জয় করা যায় । অশুভ শক্তির মোকাবেলায় জন্যই পুলিশ । জনগণের নিরাপত্তা রক্ষা করা বাহিনীর সদস্যগণের প্রধান কর্তব্য । বিপদগ্রস্থ মানুষ যখনই পুলিশের দরজায় আসিয়া দাঁড়ান ,সদস্যগণকে তাহার বিপদের দিকটাই বেশী করিয়া ভাবিতে হইবে , তাহাকে আস্বস্ত করিয়া বিচলিত না হইবার জন্য অনুরোধ করিয়া বসিতে বলিতে হইবে এবং সহৃদয়তার সহিত স্থিরচিত্তে তিনি যাহা বলিতে চাহেন তাহা শুনিতে হইবে ।অভিযোগের সহিত আইনের সম্বন্ধ কতটুকু তাহা অনুধাবন করিয়া অভিযোগকারীর সহিত কথা বলিতে হইবে ।সাহায্যের সুযোগ থাকিলে তৎক্ষনাৎই তাহাকে সাহায্য দিতে হইবে । অন্যথায় আইনের দিকটা বুঝাইয়া বলিতে হইবে এবং কি প্রকারে তিনি বিপদমুক্ত হইতে পারেন তাহার পথ বাতলাইয়া দিয়া অত্যন্ত আন্তরিকতার সহিত তাহাকে বিদায় জানাইতে হইবে ।

তৎপরতার সহিত অভিযোগের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে । সঠিক অভিযোগ জানিয়া ও লিখিয়া লইবার পর কালবিলম্ব না করিয়া ঘটনাস্থলে ছুটিয়া যাইতে হইবে , এবং উহার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে ।ইহাতে শুধুমাত্র অভিযোগকারীর অধিকার সুনিশ্চিতই হইবেনা , প্রশাসনেরও (অর্থাৎ উৎকৃষ্ট শাসনেরও ) যথেষ্ঠ উন্নতি হইবে ।তৎপরতার সহিত ব্যবস্থা গৃহীত না হইলে ঘটনার বিলুপ্তি বা বিকৃতি হইতে পারে এবং নানা প্রকারের বিভ্রান্তি দানা বাঁধিতে পারে ।অভিযোগ সর্বদাই লিখিয়া রাখিতে হইবে - ইহাতে অভিযোগের হেরফের ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিবেনা এবং অভিযোগকারী তাহার অভিযোগের সত্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হইয়া উহার এক কপি নকলও সঙ্গে রাখিতে পারিবেন।

প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ যখনই নিজের বা অপর কাহারও অভিযোগ লইয়া পুলিশের সম্মুখে উপস্থিত হন তখন তাহাদের সহিতও একই আচরণ করিতে হইবে- মনে রাখিতে হইবে সকল মানুষেরই মর্যাদা সমভাবে রক্ষা করিতে রাষ্ট্রের পক্ষ হইয়া আপনি দায়বদ্ধ ।ধৈর্য সহকারে অভিযোগ শুনিতে হইবে এবং আইনানুসারে সাধ্যমত সকল সাহায্য প্রদান করিতে হইবে ।

বহুক্ষেত্রে অভিযোগের সত্যতা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না , সেই ক্ষেত্রে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে এবং অকপটভাবে , দ্বিধাহীন চিত্তে দৃঢ়তা সহকারে তাহাতে সাহায্য না করিতে পারিবার কারণ বলিয়া দিতে হইবে । বেআইনি কোন আবেদন আদেশ বা নির্দেশকে কখনই আমল দেওয়া যাইবেনা , পরিণামে ঐ সকল ব্যক্তি আপনার বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারেন কিন্তু উহাতে তাহার শেষ রক্ষা হইবেনা কারণ আপনার আইনানুগ কার্য আপনার বিরুদ্ধে আনিত সকল অভিযোগকে খন্ডন করিবে ।

**গ্রেপ্তার সম্পর্কিত আচরণ** - গ্রেপ্তার পুলিশি কার্যের অঙ্গ । কিন্তু অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করিতে গিয়া যাহাতে মানবাধিকার লঙ্ঘিত না হয় তাহা অবশ্যই দেখিতে হইবে । এই প্রসঙ্গে কিছু উল্লেখযোগ্য বিষয়াদি নিম্নে আলোচিত হইল , যথা -

১) অযথা গ্রেপ্তার করা যাইবে না । আইনানুযায়ী গ্রেপ্তার করা প্রয়োজন হইলেই কেবলমাত্র গ্রেপ্তার করিতে হইবে - (সংবিধানের ২১ নং অনুচ্ছেদ এবং পি. আর . বি রুল ৩১৭ দ্রষ্টব্য)।

(২) ওয়ারেন্ট বলে গ্রেপ্তার করা যাইবে আবার বিশেষ কিছু পরিস্থিতিতে বিনা ওয়ারেন্টেও গ্রেপ্তার করা যাইবে - ( ফৌঃ কাঃ প্রঃ বিধির ৪১ ধারা দ্রষ্টব্য)

৩) ওয়ারেন্ট বলে গ্রেপ্তার করিবার সময় ওয়ারেন্ট যাহাকে গ্রেপ্তার করিতে নির্দেশ দেয় সেই ব্যক্তি দাবি করিলে তাহাকে ওয়ারেন্ট দেখাইতে হইবে । ওয়ারেন্ট জামিনযোগ্য হইলে ধৃত ব্যক্তি জামিন পাইতে অধিকারী হইবে অবশ্য যদি ধৃত ব্যক্তি জামিনদার জোগাড় করিয়া দিতে পারেন , না পারিলে তাহার জামিন পাইবার অধিকার থাকিবেনা ।

৪) কথায় বা কার্যে আত্মসমর্পণ করিয়া কয়েদ স্বীকার করিলে কোনরূপ বলপ্রয়োগ করিবার প্রশ্নই আসেনা - (ফৌঃ কাঃ প্রঃ বিধির ৪৬ ধারা দ্রষ্টব্য)

৫) আইনানুগ গ্রেপ্তার বলপ্রয়োগ করিয়া বাধা দিলে অথবা গ্রেপ্তার এড়াইবার চেষ্টা করিলে অভিযুক্তকে হেপাজতে রাখিতে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলপ্রয়োগ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় পন্থা অবলম্বন করা যাইবে । কখনই প্রয়োজনের অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ করা যাইবেনা - (ফৌঃ কাঃ প্রঃ বিধির ৪৬ (২) ধারা দ্রষ্টব্য)

৬) কেবলমাত্র মৃত্যুদন্ড বা যাবজ্জীবন কারাদন্ডযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিতে গিয়া প্রয়োজনে তাহার মৃত্যু পর্যন্ত ঘটান যাইবে । কিন্তু তাই বলিয়া প্রয়োজনের অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ করা যাইবেনা - ( ফৌঃ কাঃ প্রঃ বিধির ৪৬ (৩) ধারা দ্রষ্টব্য)

৭) যাহাকে গ্রেপ্তার করিতে হইবে সেই ব্যক্তি কোন বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছে বা তথায় অবস্থান করিতেছে এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে অর্থাৎ গ্রেপ্তারের জন্য গৃহতল্লাসী করিতে হইলে কৌঃ কাঃ প্রঃ বিধির ৪৭ ধারার পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে । অর্থাৎ সেই বাড়ির মালিক বা দখলকারকে ডাকিয়া দেখা করিতে হইবে এবং তথায় আসিবার উদ্দেশ্যে ও অর্পিত ক্ষমতা জানাইয়া বাড়ীর ভিতর অবাধে প্রবেশ করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অনুসন্ধান করিতে চাহিবেন । এইরূপ দাবি করিবার পরে অবাধে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতে না দেওয়া হইলেই কেবলমাত্র যেকোন উপায়ে অর্থাৎ বাড়ীর দরজা বা জানালা ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করিতে পারিবেন , অন্যথায় নহে । অবশ্য ঐ বাড়ীর প্রকৃতই পর্দানসীন স্ত্রীলোকগণকর্তৃক অধিকৃত হইলে তাহাদিগকে সরিয়া যাইবার জন্য বলিতে হইবে এবং অনুসন্ধানের জন্য বাড়ীতে প্রবেশ করিবার পূর্বে তাহাদিগকে সরিয়া যাইতে সর্বপ্রকার ন্যায্য

সুবিধা দিতে হইবে । অভিযুক্ত স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশে পালাইয়া না যায় সেইদিকেও বিশেষ নজর রাখিতে হইবে ( ফৌঃ কাঃ প্রঃ বিধির ১০০ ধারা দ্রষ্টব্য )

৮) ধৃত ব্যক্তির পলায়ন প্রতিরোধ করিতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ করা যাইবে না (ফৌঃ কা ঃ প্রঃ বিধির ৪৯ ধারা দ্রষ্টব্য )

৯) ধৃত বিনা ওয়ারেন্ট গ্রেপ্তার হইয়া থাকিলে তাহাকে জানাইতে হইবে যে কোন অপরাধের কারণে গ্রেপ্তার হইল । জামিনযোগ্য অপরাধের কারণে বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেপ্তার হইয়া থাকিলে ধৃত জামিন পাইবে বলিয়া জানাইতে হইবে এবং তাহাতে জামিনের ব্যবস্থা করিতে বলিতে হইবে - (সংবিধানের ২২ নং অনুচ্ছেদ এবং ফৌ ঃ কাঃ প্রঃ বিধির ৫০ দারা দ্রষ্টব্য)

১০) ওয়ারেন্ট বলেই হউক অথবা বিনাওয়ারেন্টেই হউক ধৃত গ্রেপ্তার হইয়া জামিন না পাইলে তাহার দেহ তল্লাসী করিয়া পরিধেয় বস্ত্র বাদ দিয়া তাহার অপর সকল দ্রব্যাদি অধিগ্রহন করিতে হইবে এবং অধিগৃহিত উক্ত দ্রব্যাদির মাল তালিকার একটি রসিদ ধৃত ব্যক্তি পাইতে অধিকারী হওয়ায় তাহা তাহাকে দিতে হইবে । ধৃত ব্যক্তি স্ত্রীলোক হইলে শ্লীলতার দিকে বিশেষ নজর রাখিয়া মহিলা পুলিশ বা অপরকোন স্ত্রীলোক দিয়া উক্ত ধৃত স্ত্রীলোকের অঙ্গ তল্লাস করিতে হইবে ) ফৌঃ কাঃ প্রঃ বিধির ৫১ ধারা দ্রষ্টব্য)

১১) বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেপ্তার হওয়া ধৃতের অপরাধটি জামিনযোগ্য হইলে পুলিশ কর্মচারী যথাযথ জামিন লইয়া তাহাতে মুক্তি দিবেন , অন্যাথায় অযথা বিলম্ব না করিয়া ধৃতকে ম্যাজিষ্ট্রেট বা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর নিকট হাজির করিতে হইবে - ( ফৌঃ কাঃ প্রঃ বিধির ৫৬ ধারা দ্রষ্টব্য )

১২) বিনা ওয়ারেন্টে ধৃত ব্যক্তিকে ফৌঃ কাঃ প্রঃ বিধির ১৬৭ ধারায় ম্যাজিষ্ট্রেটের বিশেষ আদেশ ছাড়া কোন অবস্থাতেই গ্রেপ্তারের স্থান হইতে ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালত লইয়া যাওয়ার সময় বাদ দিয়া ২৪ ঘন্টার বেশী পুলিশি হেপাজতে রাখা যাইবেনা ওয়ারেন্ট বলে ধৃত ব্যাক্তিকেও ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে লইয়া যাওয়ার সময় বাদ দিয়া ২৪ ঘন্টার বেশী পুলিশি হেপাজতে রাখা যাইবেনা - (সংবিধানের ২২ নং অনুচ্ছেদ এবং ফৌঃ কাঃ প্রঃ বিধির ৫৭ ও ৭৬ ধারা দ্রষ্টব্য )।

১৩) আইনানুগ হেপাজত হইতে অভিযুক্ত পলাইয়া গেলে বা তাহাকে ছিনাইয়া লইযা গেলে , যাহার জিম্মা হইতে সে পলাইয়াছে বা তাহাতে ছিনাইয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছে সেই ব্যক্তি তাহাতে গ্রেপ্তার করিবার জন্য ভারতবর্ষের যেকোন স্থানে ধাওয়া করিতে পারেন এবং তাহাকে পুনরায় গ্রেপ্তার করিতে গিয়া ফৌঃ কাঃ প্রঃ বিধির ৪৭ দারায় বিধিত পদ্ধতিতে অগ্রসর হইতে পারিবেন ।- (ফৌ ঃ কাঃ বিধির ৬০ ধারা দ্রষ্টব্য) ।

**তল্লাস সম্পর্কিত আচারণ** - অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য , অপহৃত মালামাল ও অপরাধে সংশ্লিষ্ট মালামল উদ্ধারের জন্য পুলিশকে গৃহ তল্লাস করিতে গিয়া যাহাতে মানবাধিকার লঙ্ঘিত না

হয় সেই দিকে দৃষ্টি দিবার প্রয়োজন আছে। সেইকারণে গৃহতল্লাস নিম্নলিখিত বিধানাদি মান্য করিয়া করিতে হইবে , যথা -

১) অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের জন্য বিনাওয়ারেন্টে গৃহ তল্লাসী হইলে ফৌঃ কাঃ বিধির ৪৭ ও ৬০ ধারার বিধান মোতাবেক অগ্রসর হইতে হইবে ।

২) অপহৃত মালামাল , অপরাধে সংশ্লিষ্ট মালামাল ইত্যাদি উদ্ধারের জন্য গৃহতল্লাসী করিতে হইলে - ফৌঃ কাঃ প্রঃ বিধির ৯৯/১০০, ১৬৫ও ১৬৬ ধারা এবং ২৮০ নং পি. আর . বি. রুল মোতাবেক তাহা করিতে হইবে । অর্থাৎ ওয়ারেন্ট বলে উক্ত উদ্দেশ্যে তল্লাসী হইলে ফৌর কাঃ বিধির ৯৯ /১০০ ধারার বিধানাদি বেং ২৮০ নং পি. আর.বি রুলের নিয়মকানুন মান্য করিতে হইবে এবং বিনা তল্লাসী ওয়ারেন্টে উক্ত উদ্দেশ্যে গৃহতল্লাসী করিতে হইলে ফৌঃ কাঃ প্রঃ বিধির ১৬৫ ও ১৬৬ ধারার বিধানাদি এবং ২৮০ নং পি. আর. বি .রুল মান্য করিতে হইবে ।

**পুলিশি হেপাজতে থাকা বন্দীর প্রতি আচারণ** - পুলিশি হেপাজতে স্বীকারোক্তি আদায়ের নামে আসামীকে মারধর করা এবং মারধর করিয়া আসামীর মৃত্যু ঘটান লইয়া সারাদেশে আজ সোরগোল পড়িয়া গিয়াছে । প্রকৃতপক্ষে পুলিশি হেপাজতে মানবধিকার লঙ্ঘনের আনিত অভিযোগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি হইল -

(১) স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য থার্ড ডিগ্রি প্রয়োগ

২) পুলিশি হেপাজতে বন্দীর মৃত্যু

৩) পুলিশি হেপাজতে ধর্ষণ ইত্যাদি

পুলিশি হেপাজতে বন্দীর প্রতি থার্ড ডিগ্রি প্রয়োগ অর্থাৎ নিষ্ঠুর অত্যাচার ও নানাবিধ অপরাধ এবং তাহার পরিণামে অ নেকক্ষেত্রেই বন্দীর মৃত্যুর ঘটনা আজকাল হামেশাই ঘটিয়া চলিয়াছে এবং বেশ কিছু ক্ষেত্রে অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছে , পুলিশি হেপাজতে ধর্ষণের ঘটনাও বিরল নহে । ভারতবর্ষের ন্যায় গণতান্ত্রিক দেশে উপরোক্ত ঘটনা অত্যন্ত লজ্জা ও পরিতাপের বিষয় -- যদিও মুষ্টিমেয় পুলিশকর্মী ইহাতে জড়িত এবং প্রায়শই এই ব্যাপারে তথ্যকে বিকৃত করিয়া ক্ষতিকারক ও উদ্দেশ্য প্রণদিত প্রচার হইয়া থাকে কারণ পুলিশি হেপাজতে ঘটনাগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে বেশ কিছু ক্ষেত্রে মৃত্যু ঘটিয়াছে আত্মহত্যা বাগণপ্রহারের ফলে , আবার মাদকাশক্তি বা অন্যান্য ব্যধিতেও অনেকের মৃত্যু হইয়াছে। যাহাই হউক মুষ্টিমেয় পুলিশকর্মীই উপরোক্ত অপরাধে জড়িত হইলেও অনেক পুলিশ কর্মীই এই মনোভাব পোষণ করেন যে পুলিশতো আর কোন ধর্মীয় মঠ মিশন , মসজিদ , গীর্জার সহিত সেই নিষ্ঠুরতা মাত্রা ছাড়াইয়া গেলেই কেবলমাত্র অপরাধ হইবে । কিন্তু মনোভাব গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও আইনের পরিপন্থি । আসামীর স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য থার্ড ডিগ্রি প্রয়োগ মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন । প্রশ্ন আসে যে অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ প্রমাণ

হইবার আগেই অভিযুক্ত ব্যক্তি সাজা পাইবেন কেন ? অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধী কিনা তাহাতো প্রমাণ সাপেক্ষ - অভিযুক্ত তো সন্দেহভাজন হিসাবে অভিযুক্ত মাত্র অভিযুক্ত ব্যক্তি পুলিশের নিকট অপরাধ কবুল করিলেও পুলিশ তাহাতে সাজা দিতে পারেন না । সেই দায়িত্ব আদালতের - পুলিশের নহে । ভয় দেখাইয়া স্বীকারোক্তি আদায়কে কোন কারণেই সমর্থন করা যায় না , তাহা আইনানুগও নহে । এইভাবে সকল সময় সঠিক স্বীকারোক্তি আদায় করাও যায় না । ইহাতে বিচার ব্যবস্থার ক্ষতি হয় উল্টাপাল্টা তথ্য বাহির হইয়া আসে । ইহা কখনই কাম্য হইতে পারেনা । উদ্দেশ্য যদি সিদ্ধ না হইল তবে সেই পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া লাভ কি? আবার উদ্দেশ্য যদি সিদ্ধ হয় তথাপি কোনমতেই থার্ড ডিগ্রি প্রয়োগকে সমর্থন করা যায় না । দেশ এত আধুনিক হইয়াছে নানা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আবিষ্কার হইয়াছে । স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য এই সকল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বর্তমানে ব্যবহার করা হইতেছে । বিদেশেতো বটেই , আমাদের দেশেও ইদানিং তাহাই করা হইতেছে । এই সকল পদ্ধতি পন্থা প্রয়োগ করিয়া স্বীকারোক্তি আদায় করা যাইতে পারে। আজকাল তো অভিযুক্ত মিথ্যা বলিতেছেন কিনা তাহাও বুঝা যায় । তাহা হইলে অসুবিধাটি কোথায় ? এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় স্মরণে রাখিতে হইবে - অভিযুক্ত আর অপরাধী এক নহে । আমাদের দেশের পুলিশসহ অনেকেই অনেক সময়ে এই দুইটি বিষয় গুলাইয়া ফেলেন । পুলিশ যখন কাহাকেও জেরা করেন তখন তাঁহার মনে রাখা উচিত যে অভিযুক্ত ব্যক্তি কোনভাবেই অপরাধী নহেন । অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধী কিনা তাহা তদন্ত করিয়া দেখিতেই জেরা করা হয় । অভিযুক্ত পুলিশের নিকট অপরাধ কবুল করিলেও কিন্তু পুলিশ সেই অভিযুক্তের শাস্তির বিধান দিতে পারেন না । শাস্তির বিধান দিবেন মহামান্য আদালত । আদালত তাহাতে চূড়ান্ত অপরাধী প্রমাণ করিয়া শাস্তির বিধান দিবেন ।উপরোক্ত আলোচনা হইতে ইহা স্পষ্ট হইল যে পুলিশকে তদনন্তকার্যে দক্ষতা অর্জন করিতে হইবে । তাহা হইলেই ধৃতকে মারধর করিয়া তথ্যাদি সংগ্রহ করিবার বদ অভ্যাসটি লুপ্ত হইবে ।

এই প্রসঙ্গে আইনি বিদানগুলিও স্মরণে রাখিতে হইবে । নিম্নে তাহা আলোচিত হইল ।

১) হেপাজতে রাখিতে হইবে এইরূপ ধৃত ব্যক্তি যখন এইরূপ অসুস্থ থাকেন যে তাহাকে চিকিৎসার কারণে বাহির লইয়া যাওয়াতে জীবনের ঝুঁকি থাকে সেইক্ষেত্রে তৎপরতার সহিত তাহাকে ঐ স্থানে সুচিকিৎসা দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সরকারি ডাক্তার না পাওয়া গেলে বেসরকারী চিকিৎসর ডাকিয়া আনিয়া চিকিৎসক করাইতে হইবে - (পি . আর . বি.রুল ৩২১ দ্রষ্টব্য)।

২) থানা বা ফাড়িঁতে আনিত ধৃত ব্যক্তির নিরাপদ জিম্মার জন্য থানার ভারপ্রপ্ত কর্মচারী দায়ী থাকিবেন - ( পি. আর.বি.রুল ৩২৮ (এ) দ্রষ্টব্য)।

৩) ধৃত ব্যক্তিকে হাজতঘরে রাখিবার পূর্বে ধৃতের দেহ তল্লাস করিয়া দেহে কোন দাগ , জখম আছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া লইতে হইবে , থাকিলে উহা জেনারেল ডাইরীতে লিখিয়া

রাখিয়া হইবে । উপরোক্ত কার্যটি স্থানীয় এলাকার দুইজন নিরপেক্ষ স্বামীর মোকাবিলায় হওয়াই বাঞ্ছনীয় কারণ পুলিশি হেপাজতে অত্যাচার করা হইয়াছে এই অভিযোগ খন্ডন করিতে উপরোক্ত পদ্ধতি বিশেষ ফলপ্রসু হইবে - (পি. আর.বি .রুল ৩২৮ (বি) দ্রষ্টব্য)।

৪) ধৃতের দেহ তল্লাস করিয়া পরিধেয় বস্ত্র বাদ দিয়া অপর সকল দ্রব্যাদি সরাইয়া লইয়া তাহা অধিগ্রহন করিতে হইবে এবং অধিগৃহিত মালামালের তালিকা তৈয়ারী করিয়া ধৃতকে উহার এক কপি নকল সরবরাহ করিতে হইবে । আসামী স্ত্রীলোক হইলে অবশ্যই অপরকোন স্ত্রীলোক দিয়া তাহার অঙ্গ তল্লাস করিতে হইবে - (পি. আর .বি .রুল ৩২৮ (সি) দ্রষ্টব্য। সাম্প্রতিক প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ধৃতকে হাজতে লুঙ্গি গামছা ইত্যাদি ব্যবহার করিতে দেওয়া হইবেনা । আসামীর জন্য হাজত পোষাক হাফ প্যান্ট হইতে চলিয়াছে - কারণ অন্যান্য পোষাক দিয়া গলায় ফাঁসি লাগাইয়া বেশ কিছু আত্মহত্যার ঘটনা ঘটিয়াছে আর দোষ হইতেছে পুলিশের।

৫) ধৃতকে হাজতঘরে রাখিবার পূর্বে হাজতঘরে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া লইতে হইবে যাহাতে তথায় বা নাগালের মধ্যে এমন কোন দ্রব্যাদি যথা - বাঁশ , দড়ি , ইট , পাথর ইত্যাদি না থাকিয়া যায় যাহার সাহায্যে ধৃত আত্মহত্যা বা পলায়ন করিতে পারে - (পি. আর.বি.রুল ৩২৮ (ডি) দ্রষ্টব্য) ।

৬) ধৃতকে থানা হইতে আদালতের লইয়া যাইতে হাতকড়ি ব্যবহার করিলে দেখিয়া লইতে হইবে যে তাহা যেন পি.আর .বি.রুল ৩৩০ মোতাবেক হয় । ধৃত মহিলা হইলে কোনমতেই হাতকড়ি ব্যবহার করা যাইবেনা ।

৭) স্বীকারোক্তী বা সম্পত্তি জোর করিয়া আদায় করিয়া লইবার উদ্দেশ্যে ধৃতকে আঘাত করা যাইবে না । করিলে ভারতীয় দন্ড বিধির ৩৩০ ধারায় দন্ডনীয় অপরাধ হইবে ।

৮) স্বীকারোক্তি বা সম্পত্তি জোর করিয়া আদায় করিয়া লইবার উদ্দেশ্যে ধৃতকে গুরুতর আঘাত করা যাইবে না । করিলে ভারতীয় দন্ড বিধির ৩৩১ ধারার দন্ডনীয় অপরাধ হইবে ।

৯) পুলিশের নিকট দেয়া স্বীকারোক্তি আদালত গাহ্য হয়না - ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের ২৫, ২৬ও ২৭ ধারা দ্রষ্টব্য ) ।

১০) উপরোক্ত কোন কারণে মারধর করিলে বা নানা প্রকারের অত্যাচার করিলে অথবা মারধর করিয়া ধৃতের মৃত্যু ঘটাইলে অবস্থা বিশেষ অপরাধজনক নরহত্যা বা খুনের দায়ে অথবা আত্মহত্যায় প্ররোচনা বা খুন করিবার চেষ্টার দায়ে অথবা অপরাধজনক নরহত্যা করিবার দায়ে ভারতীয় দন্ড বিধির ৩০৪ বা ৩০২ ধারায় অথবা ৩০৬ , ৩০৭ বা ৩০৮ ধারায় দন্ডনীয় অপরাধ হইবে । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে পুলিশি হেপাজতে কাহারো মৃত্যু হইলে ফৌজদারী কার্যপ্রণালী বিধির ১৭৬ ধারা নিকটস্থ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ঐ মৃত্যুর সম্পর্কে সুরতহাল অর্থাৎ মৃত্যুসমীক্ষা করা বাধ্যতামূলক করিয়া দিয়াছে।

(পি. আর.বি. রুল ৩০২ (বি দ্রষ্টব্য) ।

১১) পুলিশি হেপাজতে ধর্ষনের অপরাধ হইয়া থাকিলে দোষী পুলিশ কর্মীর ভাঃ দঃ বিধির ৩৭৬ ধারার (২) উপধারায় দন্ডনীয় অপরাধ হইবে ।

১২) হেপাজতে বন্দীগণের উপর বিবিধ অত্যাচারের বিরুদ্ধে ভারতীয় দন্ড বিধির প্রাসঙ্গিক অন্যান্য ধারাগুলি হইল - ২২৮ এ, ২৯৪ , ৩২৩ , ৩২৪ , ৩২৫ , ৩২৬ , ৩২৭, ৩২৮, ৩২৯, ৩৩০ ৩৩১,৩৪২, ৩৪৩, এবং ৩৪৪ , ৩৫৪ , ৩৭৬, ৫০৯ ধারা । ১৮৬১ সালের পুলিশ আইনের ৯ ধারার বিধানও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এই সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে সম্প্রতি বেশ কিছু প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত লওয়া হইয়াছে যাহা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য , যথা -

(এ) পুলিশি হেপাজতে রাখিবার এবং আদালতে হাজির করিবার বিষয়ে নির্দেশাবলী তৈয়ারী হইয়াছে ,

(বি) মানবাধিকারের বিষয়ে পুলিশকে উদ্বুদ্ধ ও সংবেদনশীল করিয়া তুলিতে প্রশিক্ষনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে ।

(সি) হেপাজতের এলাকা নিয়মিত পরিদর্শনের ব্যবস্থা হইয়াছে ।

(ডি) আটক ব্যক্তিদের শরীর স্বাস্থ্য পরীক্ষার বিষয়ে সুচিন্তিত ব্যবস্থাদি লওয়া হইতেছে ,

(ই) গ্রেপ্তারের খবর এবং আটক রাখিবার স্থান সম্পর্কে গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তির নিকটজনকে জানাইবার ব্যবস্থাদি লওয়া হইতেছে ।

(এফ্) জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী পুলিশি হেপাজতে মৃত্যুর ঘটনা ঘটিলেই খবরটি ২৪ ঘন্টার মধ্যে জাতীয় ও রাজ্য মানবাধিকার কমিশনকে পাঠাইয়া দিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে ।

জি ) - জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পরামর্শমত পুলিশ ও বিচার বিভাগীয় হেপাজতে মৃত্যুর ঘটনার ময়নাতদন্ত ভিডিও ফিল্ড করিয়া রাখিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে ।

মানুষ মানবাধিকার সম্পর্কে যথেষ্ঠ সচেতন । সেই কারণে পুলিশকে এই আইনের পরিধির মধ্যে থাকিয়া মারধর না করিয়া দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে অভিযুক্তের অপরাধের কাহিনী জানিয়া লইবার কৌশল আয়ত্ত করিতে হইবে । অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের পরে তাহাকে মানুষ হিসাবে গণ্য করিতে হইবে । বেদম প্রহার করিয়া শাস্তি দিবার প্রয়োজন নাই । শাস্তি দিবার জন্য আছেন আদালত।

**তদন্তকালীন আচরণ** - ফৌজদারী কার্যপ্রণালী বিধির ১৫৬ ধারা ধর্তব্য মামলা তদন্ত করিতে

থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে ক্ষমতা দিয়াছে । তদন্তকালীন যাহাতে মানবাধিকার লঙ্ঘিত না হয় তাহা সুনিশ্চিত করিতে হইবে এবং উহা সুনিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে পুলিশকে আইনি বিধিবিধানমত তদন্ত পরিচালনা করিতে হইবে । অন্যথায় মানবাধিকার লঙ্ঘনের আশঙ্কা থাকিয়া যাইবে । এই সম্পর্কিত আইনি বিধি বিধানগুলি নিম্নে আলোচিত হইল -

১) থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী যে অপরাধ তদন্ত করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত সেইরূপ কোন অপরাধের সংঘটনের খবর পাইলে বা অন্যকোনভাবে সেইরূপ কোন অপরাধ ঘটিয়াছে বলিয়া সন্দেহ করিলে তিনি পুলিশ রিপোর্টের উপর উক্ত অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট একটি রিপোর্ট পাঠাইয়া দিয়া ঐ মামলা তদন্ত করিতে এবং প্রয়োজনে অভিযুক্তকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া গ্রেপ্তার করিবার উদ্দেশ্যে নিজে ঘটনাস্থলে রওনা হইয়া যাইবেন , অথবা রাজ্য সরকারের অনুমোদিত তাঁহার অধস্তন কোন পুলিশ কর্মচারীকে ঐ তদন্ত করিতে নিযুক্ত করিবেন । প্রকৃতপক্ষে অভিযুক্তের নাম জানাইয়া অভিযোগ করা হইয়া থাকিলে এবং ঘটনাটি মারাত্মক চরিত্রের না হইলে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী নিজে উহা তদন্ত করিবার পরিবর্তে অনুমোদিত তাহার অধস্তন পুলিশ কর্মচারীকে উহা তদন্ত করিতে নিযুক্ত করিতে পারেন । আবার ঐ মামলাটি তদন্ত করিবার যথাযথ কারণ নাই বলিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর মনে হইলে তিনি উহা তদন্ত করিবেন না এবং উহা না কা করিবার কারণ তিনি তাহার রিপোর্টে উল্লেখ করিবেন । এবং রাজ্য সরকারের অনুমোদিত পদ্ধতিতে অভিযোগকারীকে জানইয়া দিবেন যে তিনি ঐ মামলা তদন্ত করিবেন না বা করাইবেন না - (ফৌঃ কাঃ প্রঃ বিধির ১৫৭ ধারা দৃষ্টব্য)।

২) তদন্তকারী যেকোন পুলিশ কর্মচারী , লিখিতভাবে আদেশ দিয়া , তাঁহার থানার বা সংলগ্ন যেকোন থানার চৌহদ্দির মধ্যে থাকা এমন যেকোন ব্যক্তিকে তাঁহার কাছে হাজির হইতে বলিতে পারেন যে ব্যক্তি তদন্তাধীন মামলাটির তথ্য এবং পরিস্থিতির বিষয়ে পরিচিত বলিয়া , প্রদত্ত সবংবাদ হইতে বা অন্যকোনভাবে, প্রতীয়মান হয় , এবং হাজির হইতে বলা উক্ত ব্যক্তি যেরূপে চাওয়া হইবে সেইরূপ হাজির হইবেন ।

শর্ত থাকে যে ১৫ বৎসরের কম বয়স্ক কোন পুরুষ ব্যক্তি অথবা স্ত্রীলোককে যেস্থানে তাহার বসবাস করেন সেই স্থান ছাড়া অন্য কোথাও হাজির হহতে বলা যাইবেনা - (ফৌঃ কাঃ প্র ঃ বিধির ১৬০ ধারা দ্রষ্টব্য)

৩) তদন্তকারী যেকোন পুলিশ কর্মচারী অথবা উক্ত পুলিশ কর্মচারীর ফরমায়েশে কার্যরত রাজ্যসরকারের সাধারণ বা বিশেষ আদেশে নির্দিষ্ট পদমর্যাদার যেকোন পুলিশ কর্মচারী , তদন্তাধীন মামলার তথ্য ও পরিস্থিতির সহিত পরিচিত বলিয়া অনুমতি যেকোন ব্যক্তিকে মৌখিকভাবে জেরা করিতে পারেন এবং যেসকল জেরার উত্তরগুলি ঐ ব্যক্তিকে ফৌজদারী দোষেরোপে বা দন্ডে বা

বাজেয়াপ্তে দায়যোগ্য করিয়া তুলিতে প্রয়াস পাইয়া থাকিতে পারে তাহা বাদ দিয়া ঐ ব্যক্তি তদন্তাধীন মামলা সংক্রান্ত উক্ত পুলিশ কর্মচারীর সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য থাকিবেন - (ফৌ ঃ কাঃ প্রঃ বিধির ১৬১ ধারা দ্রষ্টব্য )।

৪) তদন্তকালীন কেহ তদন্তকারী পুলিশ কর্মচারীর নিকট কোন বক্তব্য রাখিলে তাহা যদি লিখিয়া লওয়া হয় তবে উহাতে স্বাক্ষর করাইয়া রাখিতে হইবে না (এই বিষয়ে তদনন্তকারী পুলিশ কর্মচারী সাক্ষীকে কোনভাবেই চাপ দিবেন না ) কারণ সামান্য কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিয়া সাক্ষ্যে উহা গ্রহণযোগ্য হয় না - (ফৌঃ কাঃ প্রঃ বিধির ১৬২ ধারা দ্রষ্টব্য)।

তদন্তকারী পুলিশ কর্মচারী স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী দিতে কাহাকেও কোন প্রকারে উৎসাহ, প্রলোভন , হুকুমি বা প্রতিশ্রুতি দিবেন না । তবে স্ব-ইচ্ছায় উক্তরূপ জবানবন্দী দিতে কেহ উদ্যত হইলে তাহাকেও বাধা দিবেন না - (ফৌ ঃ কাঃ প্রঃ বিধির ১৬৩ ধারা ।

৬) তদন্তকালীন তদন্তের খাতিরে প্রয়োজনীয় অপরাধে সংশ্লিষ্ট কেনা জিনিস থানা এলাকার কোন বাড়ী বা অন্য কোন স্থানে পাওয়া যাইতে পারে বলিয়া যথাযথ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে তদন্তকারী পুলিশ কর্মচারী , প্রয়োজনীয় গৃহ তল্লাসীর ওয়ারেন্ট বাহির করিয়া প্রথামত উহার তল্লাসে অযথা বিলম্ব হইয়া যাইবে মনে করিলে কারণটি লিখিতভাবে নথিবন্ধ করিয়া , উক্ত বাড়ী বা স্থান উদ্দিষ্ট জিনিসের জন্য তল্লাস করিতে পারিবেন - (ফৌঃ কাঃপ্রঃ বিধির ১৬৫ ধারা দ্রষ্টব্য)

**ঐরূপ তল্লাসী** নিজ থানা এলাকার বাহিরেও করা বা করানো যাইতে পারে অর্থাৎ অন্য থানার চৌহদ্দির মধ্যে যেকোন স্থানে ঐরূপ তল্লাসী করা বা করানো যাইবে এবং তাহা উক্ত অন্য থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে অনুরোধ করিয়া অথবা ফৌঃ কাঃ প্রঃ বিধির ১৬৬ ধারার (৩) উপধারার বিধান মোতাবেক ঐ অন্য থানার চৌহদ্দির মধ্যে যে কোন স্থানে হাজির হইয়া করা যাইতে পারে ।

৭) তদন্তকারী পুলিশ কর্মচারী মামলার পক্ষগণ অর্থাৎ বাদী , বিবাদী সাক্ষী এবং সাধারণভাবে জনগণের যাহাতে অযথা হয়রানি না হয় তাহার প্রতি যত্নবান হইবেন । কেবলমাত্র যেসকল ব্যক্তি তদন্তে বিশেষভাবে সহায়ক হইতে পারেন তাহাদ্দিগকে হাজির হইতে বলিবেন । যেক্ষেত্র সম্ভব হইবে, তদন্তকারী পুলিশ কর্মচারী নিজেই সাক্ষীগণকে জেরা করিতে তাহাদের বাসস্থানে হাজির হইবেন । সমগ্র কার্যটি যতদূর সম্ভব আনুষ্ঠানিক না হওয়াই শ্রেয় । সাক্ষীগণকে এমনভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে হইবে যাহাতে তাহা তাহাদের অরুচিকর না হইয়া ওঠে - (পি.আর.বি.রুল ২৬০ দ্রষ্টব্য)

৮) তদন্ত যেক্ষেত্রে সম্ভব হইবে ধারাবাহিকভাবে চালাইয়া শেষ করিতে হইবে । প্রয়োজনে সার্কেল ইন্সপেক্টরকে জানাইয়া থানা এলাকার বাহিরেও তদন্ত করা যায় । তদন্তে ঢিলেমি সর্বদাই পরিত্যাজ্য । কোন ক্রমেই তদন্তে ১৫ দিনের বেশী সময় লাগা উচিত নহে । যে মামলার তদন্ত

ম্যাজিস্ট্রেট নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে শেষ করিতে আদেশ দেন , উহা উক্ত তারিখের মধ্যেই শেষ করিতে হইবে - (পি. আর .বি. রুল ২৬১ দ্রষ্টব্য।

৯) যখন কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়া হাজির করা হয় তখন তদন্তকারী পুলিশ কর্মচারী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন যে পুলিশি দুর্ব্যবহারের বিষয়ে তাহার কোন অভিযোগ আছে কিনা , সেই বিষয়ে ধৃতের বক্তব্য প্রশ্ন ও উত্তরের আকারে কেস ডাইরীতে লিখিয়া রাখিতে হইবে । ধৃত ব্যক্তি দুর্ব্যবহারের অভিযোগ আনিলে তদন্তকারী পুলিশ কর্মচারী তৎক্ষণাৎ বন্দীর দেহ পরীক্ষা করিয়া (যদি বন্দী তাহাতে সম্মতি দেন) পুলিশি দুর্ব্যবহারের কোন চিহ্নাদি দেহে আছে কিনা তাহা দেখিয়া লইয়া পরীক্ষার ফলাফল নথিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন । তিনি আরও বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে ধৃতের দেহে প্রাপ্ত জখমের চিহ্নাদি পুলিশি দুর্ব্যবহার ছাড়া অন্য কোন কারণে যেমন গ্রেপ্তার প্রতিরোধ করিতে গিয়া প্রাপ্ত চিহ্নাদি ইত্যাদি বলিয়া বিশ্বাস করিবার কারণ আছে কিনা । ধৃত তাহার দেহ পরীক্ষা করিবার জন্য দেখাইতে না দিলে , ঐরূপ অস্বীকার যাওয়া ও তাহার কারণ নথিদ্ধ করিয়া লইতে হইবে । তদন্তকারী পুলিশ কর্মচারী পুলিশি দুর্ব্যবহারের অভিযোগে বিশ্বাস করিবার কারণ পাইলে ধৃত ব্যক্তিকে ঐ অভিযোগ , দৈহিক পরীক্ষার নথি, পাওয়া অন্য কোন সাক্ষ্যসহ এবং যদি সম্ভব হয় ধৃতের অভিযোগে জড়িত পুলিশ কর্মচারীগণকে , ঐ মামলা অনুসন্ধান করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত নিকটবর্তী ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করিবেন - (পি.আর .বি. রুল .২৬২ দ্রষ্টব্য )।

১০) তদন্ত ২৪ ঘন্টার মধ্যে শেষ করা সম্ভব না হইলে অর্থাৎ আরও তদন্ত প্রয়োজন হইলে ধৃত ব্যক্তিকে পুলিশি হেপাজতে রাখিবার জন্য ক্ষমতাপন্ন ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ লইবেন যাহা কোনমতেই ১৫ দিনেই বেশী দেওয়া হয়না । অবশ্য প্রয়োজন হইলে ধৃত ব্যক্তিকে বিচার বিভাগীয় হেপাজতে আরও কিছুদিন রাখিবার অনুমতি মেলে । তদন্তটি মৃত্যুদন্ড যাবজ্জীবন কারাদন্ড বা দশ বৎসরের কম নহে এরূপ কোন কারাদন্ডযোগ্য অপরাধ সম্পর্কিত হইলে সর্বমোট ৯০ দিন এবং তদন্তটি অন্য যেকোন অপরাধ সংশ্লিষ্ট হইলে সর্বমোট ৬০ দিন - (পুলিশি হেপাজতে এবং বিচারবিভাগীয় হেপাজত মিলিয়া ) হইতে পারে।

তদন্ত শেষ হওয়ামাত্র থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী বা তদন্তকারী কর্মচারী চার্জশীট বা ফাইনাল রিপোট দাখিল করিবেন এবং তাহা কোন পরিস্থিতিতেই ৬০ দিন বা ৯০ দিনের বেশী হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে - ( ফৌ ঃ কাঃ বিধির ১৬৭ ও ১৭৩ ধারা এবং পি.আর.বি রুল ২৭২ দ্রষ্টব্য )।

১১) তদন্ত করিয়া পর্যাপ্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ না পাওয়া গেলে অভিযুক্ত ধৃত হইয়া থাকিলে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী প্রয়োজনীয় যথাযথ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হাজিরা দিবার মুচলেকা লইয়া ধৃত ব্যক্তিকে মুক্তি দিয়া দিবেন - (ফৌ ঃ কাঃ প্রঃ বিধির ১৬৯ ধারা দ্রষ্টব্য)।

১২) তদন্ত করিয়া যেক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণ মেলে সেক্ষেত্রে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে

মামলাটি ক্ষমতাপন্ন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট পাঠাইতে হইবে । নালিশকারী এবং যেসকল ব্যক্তিগণ ঐ মামলার তথ্যদি ও পরিস্থিতির সহিত পরিচিত বলিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর মনে হয় তাদের মধ্যে যতজনকে তিনি প্রয়োজন বলিয়া চিন্তা করিতে পারেন তাহাদের অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আরোপ করা দোষার অর্থাৎ চার্জের অভিযোগ চালাইতে বা সাক্ষ্য দিতে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হাজিরা সুনিশ্চিত করিতে মুচলেকা সম্পাদন করাইয়া লইবেন - (ফৌঃ কাঃ বিধির ১৭০ ধারা দ্রষ্টব্য)।

আদালতে যাইবার পথে কোন নালিশকারীকে বা সাক্ষীকে পুলিশ কর্মচারীর সহিত যাইতে ফরমাশ করা যাইবেনা , তাহাকে অযথা বাধা - নিয়ন্ত্রণে রাখা যাইবে না, এমনকি হাজিরার জন্য উক্ত মুচলেকা সম্পাদনকারী ঐ নালিশকারী বা সাক্ষী আদালতে যথাযথভাবে হাজিরা না দিলে বা উক্ত নালিশকারী বা সাক্ষী উপরোক্ত মুচলেকা সম্পাদন করিতে অস্বীকার করিলে তবেই তাহাকে হেপাজতে লইয়া ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করিতে পারিবেন এবং উক্ত মুচলেকা সম্পাদন না করা পর্যন্ত অথবা মামলাটির শুনানী সম্পূর্ণ না হাওয়া পর্যন্ত তাহাকে হেপাজতে আটক করিয়া রাখিতে পারিবনে - (ফৌঃ কাঃ প্রঃ বিধির ১৭১ ধারা দ্রষ্টব্য )।

**বিবাদ মোকাবিলায় আচরণ** - দুই একটি বিষয় বাদ দিয়া পূর্ব হইতে বিবাদ সম্পর্কে আঁচ করিয়া লওয়া হয়না । নানা বিষয়ে বিবাদ দেখা দিতে পারে , যেমন - সীমানা বিরোধ , কলকারখানায় শ্রমিক মালিক বিরোধ , ঘেরাও জমির ধান কাটা লইয়া বিরোধ মিছিল লইয়া বিরোধ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের বিরোধের সম্মুখিন হইতে হয় পুলিশকে যথাসময়ে যথাযথভাবে উহা মোকাবিলা না করিতে পারিলে পুলিশকে চরম ব্যবস্থার আশ্রয় লইতে হইতে পারে , এবং উহাতে মানবাধিকার উঙ্ঘনের অভিযোগ উটিয়া আসিতে পারে । সেইকারণে এই ক্ষেত্রেও পুলিশকে দৃঢ় সঠিক এবং নিরপেক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। কখনও দুই পক্ষকে মীমাংসার দ্বারা বা কখনও আইনের মাধ্যমে বিরোধের নিষ্পত্তি করিতে হইবে । বিরোধের শুরুতেই পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছাইতে পারিলে বিরোধ নিষ্পত্তি করিতে বেশী বেগ পাইতে হইবেনা । অবস্থা ঘোরালো হইলে আইনানুগ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে, এই বিষয়ে ফৌজদারী কার্যপ্রণালী বিধির ১৪৯ হইতে ১৫১ ধারা দ্রষ্টব্য । গোলমালের আশঙ্কার খবর পূর্বে সংগ্রহ ব্যবস্থা করা যাইবে । যেকোন বিরোধের মোকাবিলায় প্রখর বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতার প্রয়োজন হয় বলপ্রয়োগে না করিয়া বিবাদ মীমাংসা করিতে অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা , নিরপেক্ষতা ও সহানুভূতিই হইল প্রধান হাতিয়ার । সতর্কতা হিসাবে ঘটনাস্থলে পুলিশের উপস্থিতি কেন এবং ভবিষ্যতে কি ঘটিতে পারে সেই সম্বন্ধে উভয় পক্ষকে সচেতন করা প্রয়োজন । উহাদের নি জেদের মধ্যে মীমাংসা না হইলে আদালতের মাধ্যমে ফয়সালা করিয়া লইবার জন্য বলিতে হইবে । উহাতে কার্য উদ্ধার না হইলে উভয় পক্ষকে থানায় লইয়া আসিয়া আইনানুগ ব্যবস্থা লইতে হইবে ।

**জনতা নিয়ন্ত্রণে আচরণ** - পুলিশ বিভাগের কর্মীগণকে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ কার্যের সম্মুখিন

হইতে হয় জনতা নিয়ন্ত্রিন উহাদের অন্যতম । সঠিকভাবে জনতা নিয়ন্ত্রণ করিতে না পারিবার কারণে অনেকক্ষেত্রেই পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠিয়াছে যে পুলিশ কথায় কথায় গুলি ছুড়িয়াছেন, যাহা মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগের নামান্তর মাত্র । যদিও পুলিশকে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই নিরুপায় হইয়াই আইনানুগ অন্তিম পন্থা গ্রহণ করিতে হয় তথাপি গণতান্ত্রিক দেশে উক্ত অন্তিম পন্থা অবলম্বন করিবার পরিস্থিতি আসিবার পূর্বেই জনতাকে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি পুলিশকে করায়ত্ত করিতে হইবে । পুলিশের ভূমিকা এইক্ষেত্রে হইবে শৃঙ্খলা রক্ষা ও মানবাধিকার রক্ষার মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করা । কার্যটি জটিল - সন্দেহ নাই । কিন্তু যথাযথ দক্ষতা অর্জনই এইক্ষেত্রে একমাত্র হাতিয়ার । পুলিশ কর্মচারী যখন কোন জনতা বা জনসমাবেশ নিয়ন্ত্রণ করিতে সচেষ্ট হইবেন তখন তাহাকে সর্বদা সজাগ থাকিতে হইবে যেন ঐ জনতা বা জনসমাবেশ উচ্ছৃঙ্খল জনতায় বা দাঙ্গা হাঙ্গামায় পরিণত না হইয়া যায় । সুচিন্তিত পরিকল্পনা ও স্থির সিদ্ধান্ত লইয়া জনতা নিয়ন্ত্রণে অগ্রসর হইলে সফলতা অর্জন করা সম্ভব হইবে ।

জনতা নিয়ন্ত্রণের প্রধান তিনটি দিক হইল -

(i) আইনি দিক

(ii) প্রশাসনিক দিক

(iii) পরিচালন কৌশল

**জনতা নিয়ন্ত্রণের আইনি দিক**

শোভাযাত্রা বা মিছিল , জনসমাবেশ অথবা দাঙ্গা হাঙ্গামা মোকাবিলা করিবার জন্য বিভিন্ন আইনে বিভিন্ন পন্থা , পদ্ধতির নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে , যেমন ভারতীয় দন্ড বিধি , ফৌজদারী কার্যপ্রণালী বিধি , পুলিশ আইন, পুলিশ বিধি বা পি. আর. বি. ইত্যাদি । ঐ সকল আইনের এই সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য বিধানগুলি নিম্নে আলোচিত হইল -

ভারতীয় দন্ড বিধির ১৪১ ধারায় - বেআইনী জনতা বলিতে কাহাকে বুঝায় তাহা বলা হইয়াছে।

ভারতীয় দন্ড বিধির ১৪৩ ধারায় - কেহ বেআইনী জনতার সদস্য হইলে কি দন্ড পাইবে তাহা বলা হইয়াছে ,

ভারতীয় দন্ড বিধির ১৪৬ ধারায় - বেআইনী জনতার সদস্যগণ কখন দাঙ্গা হাঙ্গামা করিবার অপরাধে অপরাধী হইবে তাহা বলা হইয়াছে ,

ভারতীয় দন্ড বিধির ১৪৭ ধারায় - দাঙ্গা হাঙ্গামার জন্য দন্ডের বিধান দেওয়া হইয়াছে ,

ভারতীয় দন্ড বিধির ১৪৮ ধারায় - মারাত্মক অস্ত্রসহযোকে দাঙ্গা হাঙ্গামা করিলে কি দন্ড হইবে তাহার বিধান দেওয়া হইয়াছে ,

ভারতীয় দন্ড বিধির ১৪৯ ধারায় - বলা হইয়াছে যে বেআইনী জনতার কোন সদস্য বেআইনী

জনতার সাধারণ লক্ষ্যে কোন অপরাধ করিলে বেআইনী জনতার অপর সদস্যগণও ঐ অপরাধের জন্য দায়ী হইবে যদিও অপর সদস্যগণের ঐ জনতার যোগদান করা ছাড়া আর কোনকিছুতে অংশগ্রহন নাও থাকে ,

ভারতীয় দন্ড বিধির ১৫১ ধারায় - পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির কোন জনতা ছত্রভঙ্গ হইবার হুকুম পাইবার পরে কেহ যদি তাহা জানিয়াও তাহাতে যোগদান করে বা যোগদান করিয়া চলে তবে কি দন্ড পাইবে তাহার বিধান দেওয়া হইয়াছে ।

ভারতীয় দন্ড বিধির ১৫২ ধারায় - দাঙ্গা হাঙ্গামা দমনকারী লোক সেবকের উপর দাঙ্গাকারীগণ হামলা করিলে বা তাহাকে বাধা দিলে কি দন্ড পাইবে তাহার বিধান দেওয়া হইয়াছে ।

ভারতীয় দন্ড বিধির ১৫৩ ধারায় - দাঙ্গা হাঙ্গামা ঘটাইবার উদ্দেশ্যে খেয়ালীভাবে ইন্ধন যোগাইবার জন্য দন্ডের বিধান দেওয়া হইয়াছে ,

ভারতীয় দন্ড বিধির ১৫৪ ধারায় - বেআইনী জনতা যে স্থানে হয় সেই স্থানের মালিকের কর্তব্য ও কর্তব্যচ্যুতিতে দন্ডের বিধান দেওয়া হইয়াছে ।

ভারতীয় দন্ড বিধির ১৫৫ ধারায় - যে ব্যক্তির সুবিধার জন্য দাঙ্গা হাঙ্গামা হয় সেই ব্যক্তির দায় কি তাহা বলা হইয়াছে,

ভারতীয় দন্ড বিধির ১৫৬ ধারায় - যাহার সুবিধা বা লাভের জন্য দাঙ্গা হাঙ্গামা হয় তাহার প্রতিনিধি বা ম্যানেজারের দায় কি তাহা বলা হইয়াছে ,

ভারতীয় দন্ড বিধির ১৫৭ ধারায় - বেআইনী জনতার জন্য ভাড়া করা ব্যক্তিদের আশ্রয় দিলে কি দন্ড হইবে তাহা বলা হইয়াছে ,

ভারতীয় দন্ড বিধির ১৫৮ ধারায় - কোন বেআইনী জনতায় বা দাঙ্গা হাঙ্গামায় অংশ লইবার জন্য কেহ ভাড়া হইলে কি দন্ড হইবে তাহা বলা হইয়াছে ,

**পুলিশ আইনের-** জেলার পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট অথবা এ্যাসিস্‌টেন্ট সুপারিনটেনডেন্ট , জনসাধারণের চলাচলের স্থানে বা রাস্তায় শোভাযাত্রা বা মিছিল , জনসভা ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণের জন্য লিখিত বা মৌখিক আদেশ জারি করিতে পারেন । যদি একত্রে কোন স্থানে জনসভা বা শোভাযাত্রা হইবার সম্ভাবনা থাকে তবে তিনি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি লইয়া উহার আহ্বায়কগণকে লাইসেন্স লইবার নির্দেশ দিতে পারেন এবং প্রত্যেক আহ্বায়ক উহা লইতে বাধ্য থাকিবেন । উক্ত নির্দেশ বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি ব্যবহারের উপরেও প্রযোজ্য হইতে পারে ,

পুলিশ আইনের - কেহ উক্ত আদেশ বা লাইসেন্সের কোন শর্ত ভঙ্গ করিলে যেকোন ম্যাজিস্ট্রেট অথবা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ঐ শোভাযাত্র বা জনসভা বন্ধ করিয়া দিতে পারেন এবং প্রয়োজন হইলে তাহাদ্গিকে বেআইনী জনতা ঘোষণা করিয়া বলপ্রয়োগ করিয়া ছত্রভঙ্গ করিয়া দিতে পারিবেন,

পুলিশ আইনের - জনসাধারণের ব্যবহৃত রাস্তাঘাট , চলাচলের স্থান অবতরণ ক্ষেত্র অথবা পূজা বা ধর্মীয় সমাবেশের স্থানে প্রত্যেক পুলিশ কর্মচারী শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করিবেন , এবং সেখানে কোন অসুবিধা সৃষ্টি হইলে অপসারণ করিতে সচেষ্ট থাকিবেন ,

**ফৌজদারী কার্যপ্রণালী বিধির ১৪৪ ধারা** - কোন জনসভার বা শোভাযাত্রায় অংশগ্রহনকারীগণের দ্বারা গুরুতর শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা থাকিলে পুলিশ কর্মচারীর উচিত উহা ম্যাজিস্ট্রেটের গোচরে আনিয়া উক্ত ১৪৪ ধারার নিষেধাজ্ঞা জারি করাইয়া উক্ত জনসভা বা শোভাযাত্রা বন্ধ করিবার ব্যবস্থা করা,ফৌজদারী কার্যপ্রণালী বিধির ১২৯ ধারা - কোন উচ্ছৃঙ্খল বা বেআইনী জনতার দ্বারা জনগণের শান্তি বিঘ্নিত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে যেকোন ম্যাজিস্ট্রেট অথবা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী এবং তাহার অনুপস্থিতিতে যেকোন সাব-ইন্সপেক্টর উক্ত জনতাকে ছত্রভঙ্গ হইবার আদেশ দিতে পারিবেন। এই আদেশ অমান্য করিলে উক্ত ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশ অফিসার উপযুক্ত বলপ্রয়োগ করিতে পারিবেন। প্রয়োজনে জনগণের সাহায্য লইবেন এবং বিনা ওয়ারেন্টে যেকোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিতে পারিবেন।

**জনতা নিয়ন্ত্রণের প্রশাসনিক দিক**

প্রশাসনিক ব্যবস্থা বলিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বুঝাইবে-

১) জনতার উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্য সম্বন্ধে পূর্বেই যথাযথ সংবাদ সংগ্রহ করিয়া উপযুক্ত পরিকল্পনা রচনা করা,

২) নিবারণমূলক ব্যবস্থা হিসাব গুন্ডা, বদমাইস বা সমাজ -বিরোধীদের পূর্বাহ্নেই গ্রেপ্তার করা,

৩) উপদ্রুত অঞ্চলে পুলিশ পিকেট এবং পুলিশ প্যাট্রলের (পায়ে হাটিয়া বা গাড়ীতে )সুবন্দোবস্ত করা ,

৪) যোগাযোগের সুব্যবস্থাসহ সুবিধাজনক স্থানে রিজার্ভ পুলিশ মোতায়েন রাখা ,

৫) উপদ্রুত অঞ্চলে কর্তব্যরত পুলিশ কর্মচারীগণের দ্বারা গৃহিত ব্যবস্থা কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করিয়া একটি কেন্দ্রয়ী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা ,

৬) পরিস্থিতির ধারাবাহিক সংবাদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এবং সন্দেহভাজন ব্যক্তিগণের দুরভিসন্ধিমূলক কার্যকলাপের প্রতি নজর রাখিবার জন্য উপদ্রুত অঞ্চল সাদা পোষাকের পুলিশ মোতায়েন করা ।

**জনতা নিয়ন্ত্রণে পরিচালন কৌশলের দিক**

১) জনতা নিয়ন্ত্রণে মনোবিদ্যা- যেকোন প্রকার উত্তেজনা ভীতি বা আতঙ্কের ন্যায় সংক্রামক । যে সকল পুলিশ কর্মচারী উত্তেজিত জনতা নিয়ন্ত্রণে নিযুক্ত থাকিবেন তাহারা ঐ জনতার ন্যায় উত্তেজিত বা উদ্বিগ্ন হইবনে না । দাঙ্গা - হাঙ্গামা দমনকালে পুলিশ বাহিনীর সদস্যগণের ইতস্ততঃ ছুটাছুটি বা হৈ হল্লা অগ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায় পরিস্থিতিকে জটিল ও ভয়াবহ করিয়া তুলিবে । সেইহেতু , তাহাদের

প্রধান কর্তব্য হইবে , জনতার উত্তেজনার কারণগুলি ভালভাবে জানিয়া নিম্নবর্ণিত নির্দেশগুলি যথাযথ পালন করা , যথা -

(এ) নিজের মেজাজ শান্ত রাখিবেন এবং পরবর্তী কর্ম পন্থা সম্বন্ধে এরূপ স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন যাহাতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাহিরে না চলিয়া যায় ,

(বি) জনতার নেতার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হইবে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে তাহার সহায়তা চাহিতে হইবে ,

(সি) যখনই কোন উচ্ছৃঙ্খল জনতা হইতে দাঙ্গা হাঙ্গামা ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে তখন তাহাদের সম্ভাব্য সুবিধাদানের কথা নাটকীয়ভাবে ঘোষণা করা উচিত , যাহাতে উহারা শান্ত হয় ,

(ডি) বহুক্ষেত্রে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে পুলিশ বাহিনী ও উত্তেজিত জনতার মধ্যে কেবলমাত্র ধৈর্যের পরীক্ষাই শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার্থে নিযুক্ত সদস্যগণকে সাফল্য দিয়াছে ,

(ই) সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে বা মতবাদ যতই আপত্তিকর বা অযৌক্তিক হউক না কেন , তাহাদের প্রতি কোন কটুক্তি বা গালিগালাজি করা উচিত নহে,

(এফ) জনতার কথোপকথনের গতি প্রকৃতি অনুধাবন করিয়া কৌশলে তাহাদের বৃহদাংশের আস্থা অর্জন করিতে সচেষ্ট থাকিতে হইবে ।

( ২) পরিকল্পিত উপায়ে জনতা নিয়ন্ত্রণ - বড় বড় উৎসব , জনসভা , ধর্মীয় অনুষ্ঠান কিম্বা বিশিষ্ট ব্যক্তি ও অতিথিবর্গের আগমনকালে , তাহাদের অবতরণ ক্ষেত্রে বা চলাচলের পথে বা জনসভায় পরিকল্পিত উপায়ে জনতা নিয়ন্ত্রণের সুষ্ঠ ব্যবস্থা গ্রহণ করা আধুনিক ভারতের পুলিশ বাহিনীর নৈত্যনৈমিত্তিক ঘটনা । এই সকল ক্ষেত্রে বড় বহু শহরে জনসমাগম বেশী হয় এবং ভীড় নিয়ন্ত্রণের জন্য পুলিশ বাহিনীকে পূর্ব হইতে পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হয় । সুতরাং প্রত্যেক জনাকীর্ণ স্থানে ও রাস্তার সংযোগস্থলে বাঁশ ও কাঠের সাহায্যে ব্যারিকেড তৈয়ারী করিতে হইবে এবং অবতরণ ক্ষেত্রে বা রাস্তার উভয় পার্শ্বে যথেষ্ঠ সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন রাখিয়া শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে হইবে ।

(৩) চাপ সৃষ্টি করিবার রণকৌশল প্রয়োগ করিয়া জনতা নিয়ন্ত্রণ - যে স্থলে জনতা উচ্ছৃঙ্খল বা মারমুখী দাঙ্গায় পরিণত হইয়াছে বা হইবার উপক্রম হইতেছে সেইক্ষেত্রে পুলিশ অফিষার তাহার অধীনস্থ বাহিনীকে জনতার উপর বলপ্রয়োগ করিতে নিযুক্ত করিবার পূর্বে নিম্নলিখিত নিয়ম নীতিগুলি পালন করিবেন , যথা -

(এ) মারমুখী জনতার পার্শ্বদেশ সম্মুখভাব অপেক্ষা দুর্বল , সুতরাং উহাদের ছত্রভঙ্গ করিতে পার্শ্বদেশে আঘাত হানাই সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমানের কাজ । লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে পুলিশ বাহিনী যেন জনতা কর্তৃক ঘেরাও না হইয়া পড়েন ,

(বি) ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, হঠাৎ ও অপ্রত্যাশিত আক্রমণের দ্বারা বহু কঠিন ও দুঃসাধ্য সমাধান সম্ভব, এমনকি সামান্য লাঠি চার্জ করিবার প্রয়োজনও হয়না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কোন কারখানার ম্যানেজার তাহার শ্রমিকদলের দ্বারা ঘেরাও হইয়াছেন। সকালে ঘেরাওয়ে অংশগ্রহনকারী শ্রমিকের উপস্থিতি ছিল এক হাজার, মধ্যাহ্নে উপস্থিতিরি সংখ্যা হইবে পাঁচশত, অপরাহ্নে আটশত, রাত্র এগারোটায় দুইশত এবং রাত্র তিনটায় একশ পঞ্চাশজন, এমতাবস্থায় মাত্র ৫০ জন লইয়া গঠিত পুলিশ বাহিনী রাত্র তিনটার সময় অত্যন্ত ক্লান্ত, নিদ্রালু ও ভীত একশ পঞ্চাশজন শ্রমিকের দখল হইতে ম্যানেজারকে মুক্ত করিতে পারেন।

(সি) কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানে বেআইনী জনতা বা দাঙ্গাকারীগণকে ছত্রভঙ্গ করিয়া কখনই পুলিশ বাহিনী সন্তুষ্ট থাকিবেন না। দাঙ্গাকারীগণের পিছু ধাওয়া করিয়া উহাদের ছত্রভঙ্গ করিতে হইবে এবং সকলপ্রকার প্রচেষ্টা বিফল করিয়া দিতে হইবে যাহাতে তাহারা পুনরায় গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সংঘবদ্ধ হইয়া দাঙ্গা বা কোন হামলা বাধাইতে না পারে,

(ডি) বেআইনী জনতা, দাঙ্গা ইত্যাদি ছত্রভঙ্গ করিবার সময় বা উহাদের পিছু ধাওয়া করিবার সময় পুলিশ কর্মচারী অবশ্যই আত্মসংযম, আত্মবিশ্বাস, সাহসও দৃঢ় সংকল্পের পরিচয় দিবেন। কখনই প্রতিশোধমূলক মনোভাব বা বিদ্বেষভাব মনে পোষণ করিবেন না। নিজেকে সর্বদা সংযত রাখিবেন।

(৪) জনতা নিয়ন্ত্রণে বলপ্রয়োগ বা আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার - ফৌজদারী কার্যপ্রণালী বিধির ১২৯ (১) ধারায় ছত্রভঙ্গের আদেশ দেওয়া সত্ত্বেও বেআইনী জনতা ছত্রভঙ্গ না হইলে পুলিশ ফৌজদারী কার্যপ্রণালী বিধির ১২৯ (২) ধারামতে বলপূর্বক উক্ত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করিতে পারিবেন - (পি.আর.বি.রুল ১৪৩ দ্রষ্টব্য)। গুরুতর দাঙ্গা হাঙ্গামা ও শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা দেখা দিলে এস.পি.সাহেব জেলা শাসকের সহিত পরার্মশ করিয়া উহা নিবারণ করিবার জন্য সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীকে কার্যে লাগাইতে পারেন (পি. আর .বি .রুল ১৪৬ দ্রষ্টব্য)। বেআইনী জনতার উপরে গুলি চালাইবার বিষয়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখযোগ্য, যথা -

(১) জনসমাবেশের উপর গুলি চালোনোর আদেশ কখনই সর্বশেষ উপায় হয় যখন উহা জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার ক্ষেত্রে সত্যকারের প্রয়োজন হইয়া পড়ে, অথবা একজন ম্যাজিস্ট্রেট, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী অথবা তাঁহার উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মচারী যখন অন্যকোন উপায়েই ঐ জনতাকে ছত্রভঙ্গ, করা সম্ভব বলিয়া মনে করেন না।

(২) জনসমাবেশের উপর গুলি চালনার আদেশ দানের পূর্বে যদি ম্যাজিস্ট্রেট তথায় উপস্থিত না থাকেন তবে ঐ সশস্ত্র বাহিনীর কমান্ডিং অফিসার দাঙ্গাকারীগণকে পর্যাপ্তভাবে সতর্কবাণী শুনাই বেন যে তাহারা যদি ছত্রভঙ্গ, না হয় তবে তাহাদের উপর গুলি চালনা করা হইবে,

(৩) দাঙ্গা দমন করিতে নিযুক্ত সকল পদের পুলিশ কর্মচারী গুলি চালনার পূর্বে ম্যাজিস্ট্রেট , থানার বড়বাবু বা উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মচারীর আদেশ পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিবেন - (পি. আর.বি.রুল ১৫৩(সি) দ্রষ্টব্য)।

এই প্রসঙ্গে স্মরণে রাখিতে হইবে যে - (এ) গুলি চালাইবার পূর্বে পুলিশ কর্মচারী দাঙ্গাকারীগণ বারংবার সাবধান করিয়া দিবেন । (বি) গুলি চালনা করিবার পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণাধীন রাখিয়া নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে গুলি চালাইতে হইবে । (সি) বেশী সংখ্যক ব্যক্তি যাহাতে হতাহত না হন সেইদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবে । (ডি) যেইমাত্র গুলি চালাইবার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে তখনই গুলি চালনা বন্ধ করিয়া দিতে হইবে । এই সম্পর্কিত পি.আর.বি.এর অপর বিধানদি যথা রুল নং ১৫১, ১৫২,১৫৩,১৫৪, , ১৫৫ এবং ১৫৬ এবং ১৫৫ এবং ড্রিল ম্যানুয়ালের প্রথম খন্ডের ১০ নং অধ্যায় অনুসরণ করিতে হইবে ।

দাঙ্গাহাঙ্গামা দমনার্থে নিয়োজিত সশ্রস্ত্র পুলিশ বাহিনীর সহিত লাঠি সদস্য , গ্যাস সদস্য সহ নিরস্ত্র সদস্যগণও থাকিবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে গণতান্ত্রিক ধ্যানধারনা ও মানবাধিকারের বিষয়টি খেয়াল রাখিয়া বর্তমানে দাঙ্গা হাঙ্গামা দমনে জল কামান ও রাবার বুলেট ব্যবহার হইতেছে ।

মহিলাগণের প্রতি আচরণ - ইহা বলাই বাহুল্য যে মহিলাগণের সহিত মার্জিত ভদ্র ও রুচিপূর্ণ ব্যবহার করিতে হইবে। নারী অপরাধে অভিযুক্ত হইলেও নারীত্বের সম্মানের সহিত শালীনতা বজায় রাখিয়া তাহার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিতে হইবে । মনে রাখিতে হইবে যে সংবিধান ও সাধারণ আইনসমূহ নারীকে যে বিশেষ মর্যাদা দিয়াছে তাহা ভারতীয় রুচি ও সনাতন ঐতিহ্যের রূপরেখা । কিন্তু বিছিন্নভাবে হইলেও পুলিশি হেপাজতে নারী ধর্ষণের মতন ঘটনা ঘটিয়াছে । ইহা অত্যন্ত পরিতাপের ও লজ্জার বিষয় । নারীর সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার দায়িত্ব যাহাদের উপর অর্পিত তাহাদের কেহ কেহ সরকারি উর্দির অপব্যবহার করিয়া অসহায় নারীর ইজ্জতহানি করিতেছে । লেপন করিতেছে সমগ্র পুলিশ বাহিনীর উপর কলঙ্ক । মানবাধিকারের এই চরম লঙ্ঘনকে নিন্দা করিবার কোন ভাষা নাই ।

ভারতীয় মহিলাগণের ক্ষেত্রে থানা হইল সামাজিক চোখে নিষিদ্ধ স্থান । ইহা হইতে বাধ্য কারণ নিরুপায় পরিস্থিতিতে ছাড়া অর্থাৎ যে ক্ষেত্রে কোন নারী জঘন্য অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া পড়েন সেই ক্ষেত্র ছাড়া সমাজে বসবাসকারী কেহই নারীকে পুলিশি হেপাজতে দেখিতে পছন্দ করেন না , পছন্দ করেন না জঘন্য অপরাধীগণের স্পর্শে তাহাদের রাতভর আটক থাকাকে। ঐরূপ পরিস্থিতিতে কোন নারী অপমানকর পরিস্থিতির শিকার হন সেই দুর্দশা তিনি নিজ সম্মান ও মর্যাদা অটুট রাখিবার স্বার্থে সর্বসাধারণ্যে প্রকাশ করিতে পারেন না । সেই কারণে অত্যন্ত প্রয়োজন না হইলে কোন নারীকেই গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া আসা উচিত নহে । উচিত নহে তাহাতে তদন্ত সম্পর্কিত জিজ্ঞাসাবাদের

অছিলায় থানায় ডাকিয়া আনা । প্রকৃতপক্ষে মহিলাগণের প্রতি পুলিশের আচরণ হইবে এইরূপ যাহাতে সামাজিক ভাবে নারীত্বের মর্যাদা এবং আইনানুগভাবে ব্যক্তি হিসাবে তাহার সুরক্ষিত থাকে।

এই সম্পর্কিত মামলায় ( Ramnath Das vs State of Tripura (1985) I GLRI , Puspalata Choraria vs . State of Assam (1986)IGLR 461) গুয়াহাটি হাইকোর্টের মন্তব্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য -

১) সাধারণভাবে কোন নারীকে গ্রেপ্তার করা উচিত নহে যদিনা তাহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয় অথবা জঘন্য অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া সন্দিগ্ধ হওয়ায় নিরূপায় হইয়া করিতে হয় ,

২) তদন্ত সম্পর্কিত জিজ্ঞাসাবাদ বা অন্যকোন অছিলায় কোন নারীকে থানায় ডাকিয়া আনা উচিত নহে ,

৩) কোন নারীকে বিকালে বা সন্ধ্যায় গ্রেপ্তার করা উচিত নহে , উচিত নহে সারারাত ধরিয়া থানায় আটক রাখা ,

৪) যদি কোন নারীকে সুরক্ষা দিবার প্রয়োজন হয় তবে তাহা তাহাকে পুলিশি হেপাজতে রাখিয়া দেওয়া উচিত নহে, প্রয়োজনে তাহার গৃহে পর্যাপ্ত পুলিশ পিকেটের ব্যবস্থা করা উচিত ,

৫) নারিগণের মোকাবিলায় নারী পুলিশ মোতায়েন করা উচিত ,

৬) কোন মহিলাকে গ্রেপ্তার বা আটক করিলে অবিলম্বে তাহার জামিন মঞ্জুর করা উচিত নয়তো ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট পেশ করা উচিত ।

৭) নারীর মর্যাদাহানিকর সম্ভাব্য সকলপ্রকার পরিস্থিতির বিরুদ্ধে সতর্ক থাকিয়া নারীর মর্যাদা ও অধিকার সুরক্ষিত করিতে হইবে ।

মহিলাগণের সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য প্রাসঙ্গিক কয়েকটি আইনি বিধান নিম্নে আলোচনা করা হইল , যথা -

১) কোন মহিলা আসামীকে গ্রেপ্তার করিবার পর তাহারও দেহ তল্লাস করিয়া লইতে হইবে এবং তাহা অন্যকোন মহিলা পুলিশ দিয়াই কঠোরভাবে শালীনতা বজায় রাখিয়া করাইতে হইবে। (ফৌঃ কাঃ প্রঃ বিধির ৫১(২) ধারা)।

২) যখনই কোন মহিলা আসামীকে গ্রেপ্তার করিবার পর এইরূপপ্রতীয়মান হয় যে তাঁহার দেহ পরীক্ষা করিলে অপরাধ সম্পর্কে সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া যাইবে তখন রেজিস্ট্রীভুক্ত মহিলা ডাক্তার দিয়া বা তাঁহার তত্বাবধানে শালীনতা বজায় রাখিয়া তাঁহার দেহ পরীক্ষা করাইতে হইবে । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে সাব -ইন্সপেক্টরের নিম্নপদস্থ কোন পুলিশ কর্মচারী উপরোক্ত প্রয়োজনে কোন ডাক্তারকে অনুরোধ করিতে পারেন না - (ফৌঃ কাঃ প্রঃ বিধির ৫৩ (২) ধারা দ্রষ্টব্য),

৩) আসামীকে গ্রেপ্তার করিবার প্রয়োজনে গৃহতল্লাস করিতে গিয়া যদি দেখা যায় গৃহটি পর্দানুশীল

কোন মহিলার প্রকৃত দখলে থাকা কোন কক্ষ, তাহা হইলে পুলিশ কর্মচারী ঐ কক্ষে প্রবেশ করিবার পূর্বে মহিলাকে তথা হইতে সরিয়া যাইতে বলিবেন এবং সম্ভাব্য ন্যায্য সুযোগ করিয়া দিবেন, যদিনা যাহাকে গ্রেপ্তার করিতে যাওয়া হইয়াছে সেই ব্যক্তিই ঐ মহিলা হন। উক্তরূপ বলিবার পর মহিলা সরিয়া গেলেই পুলিশ কর্মচারী ফৌজদারী কার্যপ্রণালী বিধির ৪৭, ধারার বিধান মোতাবেক ঐ গৃহে প্রবেশ করিয়া উদ্দিষ্ট তল্লাসীকার্য আরম্ভ করিবেন,

৪) অপরাধ সংক্রান্ত মালামালের তল্লাসে ফৌজদারী কার্যপ্রণালী বিধির ১১০, ১৬৫ বা ১৬৬ ধারা মোতাবেক তল্লাসী করাকালীন যদি দেখা যায় যে তথায় কোন মহিলা কোন জিনিষ তাহার নিজের কাছে লুকাইয়া রাখিতেছেন তাহা হইলে এ মহিলার দেহ তল্লাস করিতে হইবে কিন্তু সেই তল্লাস অপর কোন মহিলা বা মহিলা পুলিশ দিয়া শালীনতা বজায় রাখিয়া করাইতে হইবে - (ফৌঃ কাঃ প্রঃ বিধির ১০০ ধারার (৩) উপধারা দ্রষ্টব্য,

৫) ১৯৫৬ সালের অনৈতিক নিন্দার্হ বৃত্তি নিবারণী আইনে দন্ডনীয় কোন অপরাধ কোন স্থানে বসবাসকারী কোন ব্যক্তি সম্পর্কে করা হইয়াছে বা হইতেছে বলিয়া বিশেষ পুলিশ অফিসার বা অনৈতিক নিন্দার্হ বৃত্তি সংক্রান্ত পুলিশ অফিসারের বিশ্বাস করিবার যুক্তিযুক্ত ভিত্তি থাকিলে এবং এ স্থান তল্লাসী ওয়ারেন্ট বাহির করিয়া লইয়া তল্লাসী করিতে অযথা বিলম্ব হইবে বলিয়া মনে করিলে কারণটি নথিবদ্ধ করিয়া তিনি বিনা ওয়ারেন্টেই উক্ত স্থানে প্রবেশ করিয়া তল্লাসী করিতে পারেন। উক্তরূপ স্থানটি তল্লাসীর পূর্বে বিশেষ পুলিশ অফিসার বা অনৈতিক নিন্দার্হ বৃত্তি সংক্রান্ত পুলিশ অফিসার যেখানে যেমন হইতে পারে, সংশ্লিষ্ট এলাকার দুই বা ততোধিক সম্ভ্রান্ত অধিবাসীকে ( যাহাদের মধ্যে কমপক্ষে একজন মহিলা থাকিবেন)। তল্লাসীর সাক্ষী হইবার জন্য বলিবেন এবং প্রয়োজনে লিখিত আদেশ দিবেন। কিন্তু উপরোক্ত তল্লাসীর সাক্ষীগণের মধ্যে মহিলা সাক্ষীকে ঐ এলাকারই অধিবাসী হইতে হইবে তাহা নহে, অন্য এলাকার হইলেও হইবে। তল্লাসকারী বিশেষ পুলিশ অফিসার অথবা অনৈতিক নিন্দার্হ বৃত্তি সংক্রান্ত পুলিশ অফিসারের সহিত, কমপক্ষে দুইজন মহিলা পুলিশ অফিসার থাকিবেন এবং তথা হইতে সরাইয়া লইয়া যাওয়া কোন মহিলা পুলিশ অফিসার থাকিবেন এবং তথা হইতে সরাইয়া লইয়া যাওয়া কোন মহিলা বা বালিকাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিবার প্রয়োজন হইলে তাহা পুলিশ অফিসারকে দিয়াই করাইতে হইবে এবং যদি কোন মহিলা পুলিশ অফিসার পাওয়া না যায় তবে কোন স্বীকৃত কল্যাণ প্রতিস্ঠান বা সংগঠনের কোন মহিলা সদস্যের উপস্থিতিতে কেবলমাত্র উক্ত জিজ্ঞাসাবাদ করা যাইবে - (১৯৫৬ সালের অনৈতিক নিন্দার্হ বৃত্তি নিবারণী আইনের ১৫ ধারা দ্রষ্টব্য),

৬) তদন্তাধীন মামলার তথ্য এবং পরিস্থিতির বিষয়ে পরিচিত বলিয়া মনে হওয়া কোন মহিলাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিবার জন্য কোন পুলিশ কর্মচারী তাহাকে থানায় হাজির হইতে বলিতে পারেন না -

(ফৌঃ কাঃ প্রঃ বিধির ১৬০ ধারা দ্রষ্টব্য)

৭) মহিলা আসামীকে হাজতঘরে রাখিবার পূর্বে তাহার দেহ তল্লাস অপর কোন মহিলা বা মহিলা পুলিশ দিয়া শালীনতা বজায় রাখিয়া করাইতে হইবে । (পিঃ আর.বি.রুল ৩২৮ দ্রষ্টব্য),

৮) মহিলা আসামীকে হাজতঘরে রাখিবার পূর্বে তাহার দেহ তল্লাস অপর কোন মহিলা বা মহিলা পুলিশ দিয়া শালীনতা বজায় রাখিয়া করাইতে হইবে - (পিঃআর.বি.রুল ৩২৮ দ্রষ্টব্য),

৯) পুলিশ কোর্টে মহিলা আসামীকে উপস্থিত করা হইলে ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমোদিত কোন মহিলাকে দিয়া তাহার দেহ তল্লাস করাইতে হইবে ( পি. আর.বিরুল ৪৮২ দ্রষ্টব্য ),

১০) মহিলা কয়েদিগণকে জেল - প্যারেডে অংশ গ্রহণ করান যাইবেনা , অবশ্য জেল প্যারেড রিপোর্ট তাহাদের নাম উল্লিখিত হইবে - (পি.আর.বি ৫১৫ (ই) দ্রষ্টব্য),

১১) মহিলা কয়েদিকে এসর্কট করিয়া লইয়া যাইবার সময় তাহাদিগকে পুরুষ কয়েদি হইতে পৃথক করিয়া রাখিতে হইবে । দোষীসাব্যস্ত হইয়া থাকুন বা বিচারাধীন থাকুন মহিলা কয়েদিগণকে স্থানান্তর করিবার সময় কারা বিভাগ হইতে দেওয়া মহিলা প্রহরী সঙ্গে থাকিবেন । বর্তমানে মহিলা পুলিশকে নিয়োজিত করা হইতেছে - (পি.আর.বি ৭০১ (পি) এবং তপসিল XXXIX (iv) দ্রষ্টব্য,

১২) আইনানুগ অনুমোদন ছাড়া ধর্ষণ / বলাৎকার ক্ষতিগ্রস্থ মহিলার পরিচয় মুদ্রণ বা সর্বসাধারণ্যে প্রকাশ করা যাইবেনা , করিলে সেই ব্যক্তির ভারতীয় দন্ড বিধির ২২৮ এ ধারায় দন্ডনীয় অপরাধ হইবে । ধর্ষণ / বলাৎকারের অপরাধটি এমনই যে এই অপরাধে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি সামাজিক অপবাদ বহন করিয়া চলেন । এই কারণে ঐ অপরাধে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি বা তাঁহার আত্মীয় স্বজন ঐ অপরাধের মামলায় সাক্ষ্য দিতে হাজির হননা । এই সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে ১৯৮৩ সালের ৪৩ নং সংশোধন আইনের মাধ্যমে ভারতীয় দন্ড বিধিতে ২২৮ এ ধারাটি সংযোজিত হইয়াছে এবং ফৌজদারী কার্যপ্রণালী বিধির ৩২৭ ধারাটিকে সংশোধন করিয়া বলা হইয়াছে যে ধর্ষণ /বলাৎকার অপরাধের অনুসন্ধান ও বিচার প্রকাশ্যে হইবে না অর্থাৎ ( in camera ) হইবে । সেই গোপন বিচারের আইনি কার্যবাহ আদালতের অনুমোদন ছাড়া মুদ্রণ বা সর্বসাধারণ্যে প্রকাশ বেআইনী হইবে,

১৩) কেহ কোন সার্বজনিক স্থানে কোন অশ্লীল কার্য করিয়া , অথবা কোন সার্বজনিক স্থানে কোন অশ্লীল গান , গাঁথা গাহিয়া বা আবৃত্তি করিয়া কিম্বা কোন অশ্লীল শব্দ উচ্চারণ করিয়া কোন মহিলার বিরক্তি উৎপাদন করিলে ভারতীয় দন্ড বিধির ২৯৪ ধারায় দন্ডনীয় অপরাধী হইবে ।

১৪) কোন মহিলার শ্লীলতাহানির করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার প্রতি আক্রমণ করিলে বা তাঁহার প্রতি অপরাধজনক বলপ্রয়োগ করিলে ভারতীয় দন্ড বিধির ৩৫৪ ধারায় দন্ডনীয় অপরাধে অপরাধী হইবে ,

১৫) কোন পুলিশ কর্মচারী তাহার থানা এলাকায় বা কোন থানাবাড়ীর মধ্যে বা তাহার অধস্তন কোন পুলিশ কর্মচারীর হেপাজতে থাকা কোন মহিলাকে ধর্ষন করিলে ভারতীয় দন্ড বিধির ৩৭৬ ধারার (২) উপধারায় দন্ডনীয় অপরাধে অপরাধী হইবে ।

১৬) কোন মহিলার শালীনতা অমর্যাদা করিবার অভিপ্রায়ে কোন শব্দ , অঙ্গভঙ্গী বা কার্য করিলে ভারতীয় দন্ড বিধির ৫০৯ ধারায় দন্ডনীয় অপরাধে অপরাধী হইবে ,

১৭) কোনক্রমেই মহিলা আসামীকে হাতকড়া লাগান যাইবেনা - (পি.আর. বি.রুল ৩৩০ দ্রষ্টব্য)

**যুব সম্প্রদায়ের সহিত আচরণ** - এই সম্প্রদায়ের ভাবাবেগের দ্বারা বেশী পরিচালিত হন , অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোজাসুজি আঙ্গুল তুলিয়া তাহাদের আশু সমাধান পাইতে যাহা ভাল বোঝেন তাহাই উদ্যোগি হন এবং এই সকল করিতে গিয়া আইন নিজ হাতে তুলিয়া লইতেও পিছপা হন না । পরিস্থিতির চাপে , কুসঙ্গে পড়িয়া , তাৎক্ষণিক উত্তেজনায় , বিভ্রমের বশে , বুদ্ধিভ্রংশ হইয়া ইহারা অনেকসময়ই বেআইনী কার্য করিয়া ফেলিতে পারেন । সমাজ ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব হইল , পিতামাতা যেমন দোষী পুত্রকন্যার অপরাধ স্নেহের চোখে দেখিয়া তাহাকে প্রাণপনে সংশোধিত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করেন , ঠিক সেইরকমই । সেই কারণে তাহাদের সহিত পুলিশের আচরণ এইরূপ হইতে হইবে যাহাতে তাহাদের অনুশোচনা বা অনুতাপ জাগ্রত হয় । সেই সঙ্গে যদি সমবেদনা , সহানুভূতি , দরদ এবং সংশোধন যুক্ত হয় তাহা হইলে লহমায় তাহাদের কোমল চিত্তের শুদ্ধি ঘটিবে ইহাতে সন্দেহ নাই। প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সহিত কৌশল অবলম্বন করিয়া যুবসম্প্রদায়ের দাবিদাওয়ার মোকাবিলা করিতে হইবে । পুলিশ যে তাহাদেরই দেশের লোক এবং তাহাদেরই বন্ধু এই বিশ্বাস তাহাদের মনে
জাগ্রত করিতে হইবে । সাময়িকভাবে হইলেও তাহাদের বেআইনি দাবি মানিয়া লইয়া পরিস্থিতি সামাল দিয়া আইনকেই প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে । এই ক্ষেত্রে অবশ্যই সরকারের আদেশ নির্দেশ অনুযায়ী অগ্রসর হইতে হইবে - মনে রাখিতে হইবে অন্যায়ের বিরুদ্ধেই পুলিশের লড়াই , বশ্যতা স্বীকার নহে । যুব সম্পদায়ের সহিত আলোচনা কালে ধৈর্য না হারাইয়া বুদ্ধিমত্তার সহিত দৃঢ় মনোভাব রাখিয়া সংযত ও ভদ্র আচরণ করিলেই কার্যে সফলতা আসিবে ।

**শ্রমিক সম্প্রদায়ের সহিত আচরণ** - বর্তমানকালে চারিদিকে শ্রমিক আন্দোলন , বিভিন্ন দাবিদাওয়া , দাবিদাওয়া পূরণে ব্যর্থ শ্রমিক মালিক বিরোধ । বর্তমান সরকারের সারকুলার অনুযায়ী বিনানুমতিতে কোন শ্রমিক আন্দোলনের পুলিশ হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না । প্রকৃত পক্ষে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার খাতিরেই শ্রমিকগণের সম্মুখে পুলিশ কর্মচারীদের আসিতে হইতেছে । এই ক্ষেত্রে পুলিশের আচরণে মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায় যাহাতে না বর্তায় তাহা দেখিতে হইবে । জিজ্ঞাসাবাদের সময় পুলিশ কর্মী যে শ্রমিকদের শত্রু নহে এই কথা খুব গুরুত্ব দিয়া বুঝাইয়া বলিয়া

আইন মোতাবেক কার্য করিতে হইবে । খুব ভদ্র ও যত্নসহকারে তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিতে হইবে যে তাহাদের যাহাকিছু বক্তব্য তাহা যেন তাহারা যথাস্থানে পেশ করেন এবং দেশের শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখেন । কখনই উগ্র মেজাজে কথা বলা বা অশালীন ব্যবহার করা উচিত নহে । অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সহিত সমস্ত পরিস্থিতি বুঝিয়া সেই মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া কার্য হাসিল করাই পুলিশের কর্তব্য ।

**শিশু ও কিশোরগণের সহিত আচরণ** - সমাজে অবহেলিত শিশু ও কিশোরের অভাব নাই । শুধু আইনের দিক দিয়া নহে , সামাজিক দিক দিয়াও তাহাদের সুরক্ষা ও দেখভাল করিবার নৈতিক দায়িত্ব সকলের পুলিশ কর্মীগণেরও । শিশু ও কিশোরগণ নানা কারণে অপরাধ করিয়া থাকে । তাহাদের প্রতি নির্দয়তা , হিংস্র মনোভাব তাহাদিগকে সাবালক অপরাধী পরিণত করিয়া চিরতরে বিপথগামী করিয়া দিবে । সেই কারণে উহাদের মোকাবিলায় যেমন বেহিসাবী উদারতা দেখান যাইবেনা , অনুরূপেই হৃদয়ের অসাড়তারও স্থান নাই । যেহেতু পুলিশকেই প্রাথমিকভাবে অপরাধী শিশু ও কিশোরদের মোকাবিলা করিতে হয় সেইহেতু পুলিশকে আইনের পরিধির মধ্যে থাকিয়াই তাহাদের সহিত অভিভাবকের ন্যায় আচরণ করিতে হইবে - ইহা বলাই বাহুল্য । ক্রুদ্ধ মনোভাব সর্বক্ষেত্রেই পরিত্যাজ্য । পুলিশকে তাহাদের আপনজন হিসাবেই আত্মপ্রকাশ করিতে হইবে। তাহাদের জিজ্ঞাসাবাদ করিবার প্রয়োজন হইলে তাহা নিম্নলিখিতমত করা উচিত যথা -

১) সহানুভূতিপূর্ণ মনোভাব এবং তাহাদের মঙ্গলের জন্য সর্বদা সচেষ্ঠ থাকিবার দৃষ্টিভঙ্গি, লইয়া অগ্রসর হতে হইবে ,

২) জিজ্ঞাসাবাদ সর্বক্ষেত্রেই গৃহের পরিবেশ হইবে ,

৩) প্রশ্নকর্তা একই সাথে দুইজন হওয়াই শ্রেয় , কিন্তু তাহাদের উভয়েরই একই সময়ে একই পদ্ধতিতে কথা বলা বা নোট লেখা উচিত নহে , উহাতে তাহারা ঘাবড়াইয়া যাইতে পারে । প্রয়োজনে অভিভাবক সম্মুখে থাকিলে ক্ষতি নাই ।

৪) সরাসরি অপরাধের কথা বলা উচিত নহে ,

৫) কোন প্রকার অধৈর্য প্রকাশ করা উচিত নহে ,

৬) উত্তর ঠিকমত পাওয়া না গেলেও ক্রোধ প্রকাশ করা উচিত নহে , উচিত নহে জোর জবরদস্তি করা ,

৭) অপরাধী নারী হইলে এবং অপরাধটি যৌনঘটিত হইলে প্রশ্নকর্তাকে অবশ্যই নারী হইতে হইবে ,

৮) আতঙ্ক বা ভীতিপ্রদ কোন বিবরণ থাকিলে তাহা সতর্কতার সহিত এড়াইয়া যাওয়া উচিত ,

৯) একই বিষয়বস্তু বারংবার জিজ্ঞাসা না করিয়া একবারই জিজ্ঞাসা করা উচিত ,

১০) ভিন্ন ব্যক্তির সম্মুখে জিজ্ঞাসাবাদ না করাই শ্রেয় ,

১১) প্রশ্নকর্তার উপর তাহাদের যাহাতে আস্থা , সম্ভ্রম , বিশ্বাস থাকে সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া প্রশ্ন করা উচিত,

১২) পুলিশি পোষাক না পরিয়াই জিজ্ঞাসাবাদ করা উচিত ।

অবহেলিত ও অপরাধী শিশু ও কিশোরগণের সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য আইনি বিধানগুলি হইল

১) কাহাকেও অবহেলিত শিশু বা কিশোর বলিয়া মনে হইলে যেকোন পুলিশকর্মী তাহাকে জুভেনাইল ওয়েলফেয়ার বোর্ডে পাঠাইয়া দিবার জন্য হেপাজতে লইতে পারেন । থানা এলাকার ভিতর অবহেলিত কোন শিশু বা কিশোরকে দেখিতে পাইয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে সংবাদ দিলে তিনি সংবাদের সারর্মম নির্দিষ্ট রেজিষ্টারে লিখিয়া লইয়া তাহাকে হেপাজতে লইবেন অথবা হেপাজতে না লইলে সংবাদের বিষয়টি জুভেনাইল ওয়েলফেয়ার বোর্ডে জানাইয়া দিবেন । হেপাজতে লইলে তাহাকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে জুভেনাইল ওয়েলফেয়ার বোর্ডে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবেন । তথায় পাঠাইবার পূর্বে তাহাকে , তাহার পিতামাতা বা অভিভাবকের দায়িত্বে না রাখিলে , পর্যবেক্ষণ আবাসে রাখিতে হইবে , কোনক্রমেই থানার হাজতে বা কারাগারে রাখা যাইবেনা - ( ১৯৮৬ সালের কিশোর - কিশোরীদের সম্পর্কে ন্যায়বিচার আইনের ১৩ ধারা দ্রষ্টব্য ), ·

২) কোন শিশু বা কিশোরকে জামিনযোগ্য বা জামিন অযোগ্য অপরাধের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হইলে ফৌজদারী কার্যপ্রণালী বিধি ও অন্যান্য প্রচলিত আইনে যাহাই বিধান থাকুক না কেন , তাহাকে জামিনদারসহ বা বিনা জামিনদারে মুক্তি দিতে হইবে যদিনা তাহাকে জামিন মুক্ত করিলে সে অপরাধীদের খপ্পরে গিয়া পড়িবে বা তাহার নৈতিক চরিত্র কলুষিত হইবে বা ন্যায়বিচার বাধাপ্রাপ্ত হইবে বলিয়া বিশ্বাস করিবার যথাযথ কারণ থাকে। যদি তাহাকে জামিনে মুক্তি না দেওয়া হয় তাহা হইলে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী তাহাকে পর্যবেক্ষন আবাসে বা যথাযথ বিধিত নিরাপদ আশ্রয়ে রাখিবেন , কখনই থানা হাজতে বা কারাগারে রাখা যাইবেনা - (১৯৮৬ সালের কিশোর কিশোরীদের সম্পর্কে ন্যায়বিচার আইনের ১৮ ধারা দ্রষ্টব্য,

৩) কোন শিশু বা কিশোরকে গ্রেপ্তার করিয়া থানায় হাজির করা হইলে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী গ্রেপ্তারের পরে যত শ্রীঘ্র সম্ভব -

(এ) ঐ শিশু বা কিশোরের পিতামাতা বা অভিভাবককে , যদি তাহাদের পাওয়া যায় , গ্রেপ্তার করিবার সংবাদটি দিয়া নির্দিষ্ট জুভেনাইল কোর্টে হাজির হইতে নির্দেশ দিবেন এবং ,

(বি) প্রবেশ নাল অফিসারকে গ্রেপ্তারের সংবাদটি দিবেন যাহাতে তিনি ঐ শিশু বা কিশোরের পূর্ববৃত্তান্ত ও পরিবারের ইতিহাস এবং জুভেনাইল কোর্টের অনুসন্ধানে সহায়ক হইতে পারে এরূপ

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সংবাদাদি সংগ্রহ করিতে পারেন - (১৯৮৬ সালের কিশোর কিশোরীদের সম্পর্কে ন্যায়বিচার আইনরে ১৯ ধারা দ্রষ্টব্য)।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে কিশোর কিশোরী বলিতে বুঝায় এমন কোন বালক যে ১৬ বৎসর বয়স পূর্ণ করে নাই অথবা একজন বালিকা যে ১৮ বৎসর পূর্ণ করে নাই ।

মানসিক প্রতিবন্ধীগণের প্রতি আচরণ - সংবিধান ভারতীয় সকল নাগরিককে সমানাধিকার দিয়াছে । উন্মাদ বলিয়া কোন ব্যক্তি সামাজিক ন্যায়বিচার ও মানবাধিকারের সুরক্ষা হইতে বঞ্চিত হইতে পারেন না । তাহাদের সেই অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার অর্থ সংবিধান লঙ্ঘন শুধুমাত্র নহে, মনুষত্বের চরম অবমাননাও। সেই কারণে সাধারণ আইনেও তাহাদের অধিকার বিশেষভাবে সুরক্ষিতহইয়াছে । মানসিক প্রতিবন্ধীগণ পুলিশসহ সকলের নিকট হইতেই সহৃদয়তা পাইবেন , পাইবেন আন্তরিক শুভবোধ ।

**তপসিলভুক্ত জাতি ও তপসিলভুক্ত উপজাতি সদস্যগণের সহিত আচরণ -**

তপসিলভুক্ত জাতি ও তপসিলভুক্ত উপজাতি সদস্যগণকে রাষ্ট্র যে বিশেষ সুযোগ সুবিধা দিতেছেন তাহার মূল উদ্দেশ্য হইল সমাজের পূর্ণগঠনে সকলকে লইয়া অগ্রসর হওয়া । বিদেশী মদতপুষ্ট কিছু মতলবাজ রাষ্ট্রের এই উদ্যোগকে বানচাল করিতে নানা প্রকার কৌশল অবলম্বণ করিতেছেন , করিতেছেন বিভেদ সৃষ্টি । সেইহেতু রাষ্ট্রের প্রতিনিধি পুলিশকে পরিস্থিতিটি সম্যকরূপে অনুধাবন করিতে হইবে । তপসিলভুক্ত জাতি এবং তপসিলভুক্ত উপজাতি সদস্যগণকে দিতে হইবে যথাযথ সামাজিক মর্যাদা ও আইনি সুরক্ষা । এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে কোন পুলিশ কর্মচারী যিনি তপসিলভুক্ত জাতি বা উপজাতির সদস্য নহেন তিনি যদি ১৯৮৯ সালের তপসিলভুক্ত জাতি ও উপজাতি (নৃশংসতা নিবারণ) আইনের বিধিত কর্তব্যাদি করিতে অবহেলা করেন তবে তিনি ঐ আইনের ৪ ধারায় দন্ডনীয় অপরাধে অপরাধী হইবেন ।

**রুগ্ন , নিঃস্ব , অভাবগ্রস্থ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের প্রতি আচরণ** - এই ক্ষেত্রে একমাত্র সেবার মনোভাবই প্রযোজ্য । অবশ্য সবই আইনমাফিক হইতে হইবে । প্রতিবন্ধী , দুর্বল বা রুগ্ন এবং নিঃস্ব বা অভাবগ্রস্থ যেই হউন না কেন পুলিশকে প্রকৃত মানুষের মতই তাহাদের মর্যাদা রক্ষা করিতে হইবে, দিতে হইবে সাধ্যানুযায়ী সহায়তা ও রাখিতে হইবে মমত্ববোধ । সঙ্গে সঙ্গে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত লইতে হইবে যে ঐরূপ কোন ব্যক্তির কোনপ্রকার মতলব আছে কিনা , কোন দুবৃর্ত্ত তাহাকে চর হিসাবে নিযুক্ত করিয়াছে কিনা । জানিতে হইবে তাহার ঐরূপ দুরাবস্থা কেন হইয়াছে , কেহ উহার জন্য দায়ী কিনা , সংসারে তাহার কে কে আছেন , বর্তমানে থাকেন কোথায় , কাজকর্ম কি করেন ইত্যাদি । এই সকল খবরাখবর নানা কৌশলে জানিয়া লইতে হইবে । তাহার আস্থা অর্জন করিতে পারিলেই সফলতা আসিবে এবং সত্য সত্যই দুঃস্থ মানুষকে ঈশ্বর জ্ঞানে আইনানুসারে সাধ্যমত সহায়তা করিতে হইবে ।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে ইহা স্পষ্ট হইল যে পুলিশকে আইনানুগভাবে ব্যক্তি ও সমষ্টির অধিকার রক্ষা কবিতে হইবে কিন্তু সেই সঙ্গে দেখিতে হইবে যে উহা করিতে গিয়া কোন ব্যক্তির অধিকার যেন বেআইনিভাবে লঙ্ঘিত না হইয়া যায় । ইহা সুনিশ্চিত করিতে হইলে প্রথমেই পুলিশকে জনগণের মন হইতে স্বাধীনতাপূর্ব পুলিশের ভাবমূর্তি বুঝিয়া দিতে হইবে । পরাধীন ভারতবর্ষে বৃটিশ পুলিশ ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যের সেবকমাত্র । তাহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় জনগণের স্বাধীনতা আন্দোলন দমন করা । ইহার ফলস্বরূপ জনগণের নিকট পুলিশের ভাবমূর্তি চিহ্নিত হইয়াছে এক অত্যাচারি নিষ্ঠুর দল হিসাবে । স্বাধীন -ভারতের পুলিশ আজ আর রাজতন্ত্রের সেবক নহে । তাহারা এখন হইয়াছেন জনগণের সেবক । সেইকারণে পুলিশকে তাহার নিজ আচরণের দ্বারা উক্ত ভাবমূর্তি ধুচিয়া দিতে হইবে । মনে রাখিতে হইবে পুলিশ তাহার উপর আরোপিত কার্য সুষ্ঠভাবে সম্পাদন করিতে পারিবেন না যদিনা জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগীতা পান । উক্তরূপ সহযোগিতা পাইতে হইলে জনগণের ন্যায্য অধিকার সুরক্ষিত করিতে হইবে এবং নিজ আচরণ এবং অপরের আচরণ আইনের পরিধির মধ্যে নিয়ন্ত্রিত করিয়াই উহা সম্ভব হইবে । অর্থাৎ জনগণের মানবাধিকার সুরক্ষিত করিতে পারিলেই জনগণের আস্থা পুলিশ পাইবে , এবং উহা পাইলেই পুলিশ তাহার কর্তব্যে সফল হইবে । অর্থাৎ পুলিশ সম্পর্কে আস্থার ভাব আনিতে হইবে এবং অনুকূল মনোভাব গড়িয়া তুলিতে পুলিশকে সঠিক ভূমিকা পালন করিতে হইবে - এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমরা জনগণকে চার ভাগে ভাগ করিতে পারি , যথা -

১) সাধারণ লোক
২) বিক্ষোভ সৃস্টিকারী
৩) অত্যাচারিত বা ক্ষতিগ্রস্থ
৪) অপরাধে অভিযুক্ত (ব্যক্তিবিশেষ বা দল বিশেষ )

**সাধারণ লোক** - সাধারণ লোকজনের সহিত পুলিশের সম্পর্ক খুবই কম । পুলিশ ভাল না খারাপ এই সম্পর্কে তাহাদের মাথাব্যাথা খুব কম । কিন্তু কোন ধর্মীয় বা রাজনৈতিক নেতার কোন বিশেষ এলাকায় বিশেষ সময়ে পরিদর্শনকালে সাধারণ লোকের উপস্থিতিই বেশী থাকে । সেই কারণে ঐ নিদিষ্ট সময়ে বা দিনে পুলিশের ভূমিকা যদি সঠিকরূপে পালিত না হয় , তাহা হইলে একদিনেই পুলিশ সম্পর্কে সাধারণ লোকের মনোভাব বিরূপ হইয়া উঠিবে , যদিও তাহারা সারা বৎসর ধরিয়াই সুনামের সহিত কাজ করিয়াছেন । সেইহেতু কোন রাজনৈতিক বা ধর্মীয় নেতার পরিদর্শকালে , পুলিশ ভাল পোষাকে সুশৃঙ্খলভাবে তাহার কর্তব্য করিবেন । কর্তব্য করিতে গিয়া কোন ক্ষেত্রেই তাহার ক্ষমতার বাড়াবাড়ি করিবেন না । প্রয়োজনের অতিরিক্ত পুলিশি ব্যবস্থা সর্বক্ষেত্রেই বাঞ্ছনীয় । যাতায়াতের সুব্যবস্থায় ট্রাফিক কন্টোল এবং বীট প্যাট্রলের ব্যবস্থা রাখা ইত্যাদি মাধ্যমে সর্বসাধারণের

প্রশংসালাভে পুলিশ সক্ষম হইবেন ।

**বিক্ষোভসৃষ্টিকারী** - বিক্ষোভ সৃষ্টিকারী জনগণের প্রতি পুলিশ দৃঢ় সঠিক এবং নিরপেক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেই জনগণের মনে পুলিশ সম্পর্কে ভাল ধারণা সৃষ্টি হইবে ।

**৩) অত্যাচারিত বা ক্ষতিগ্রস্থ জনগণ** - অত্যাচারিত বা ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের প্রতি পুলিশকে হইতে হইবে সহৃদয় এবং আন্তরিকভাবে সহানুভূতিশীল । তাহাদের প্রতি আচরণে যেন কোন সময়েই সহৃদয় অভ্যর্থনা এবং আন্তরিক সহানুভূতির অভাব প্রকাশিত না হয় । এই দুইয়ের অভাবে ঐ শ্রেণীর জনগণ পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার জন্য জনমতের মাধ্যমে প্রেস বা পত্রিকাওয়ালাদের শরণাপন্ন হইতে পারেন । প্রেস পুলিশের ভাল কাজের জন্য বিভিন্ন সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে পুলিশের প্রতি জনগণের অনুকূল মনোভাব সৃষ্টি করিতে পারেন । আবার খারাপ কাজের জন্য বা পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার জন্য পুলিশের প্রতি জনগণের প্রতিকূল মনোভাবও গড়িয়া তুলিতে পারেন । কিন্তু পরিতাপের বিষয় হইল যে কোন কোন সময়ে প্রেসের ব্যক্তিগত বা রাজনৈতিক স্বার্থে অতিরঞ্জিত সংবাদ পরিবেশিত হইয়া পুলিশ সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হইয়া থাকে । সেইহেতু পুলিশকে তাহার আমলাতান্ত্রিক মনোভাব দূর করিয়া জনগণকে আন্তরিক সহানুভূতিপূর্ণ মনোভাব লইয়া অর্ভ্যথনা করিতে হইবে । এবং তাহাদের প্রতি হইতে হবে সহৃদয় । মনে রাখিতে হইবে বেহিসাবী উদারতারও যেমন স্থান নাই অনুরূপে স্থান নাই হৃদয়ের অসাড়তারও । অপরাধ উদ্‌ঘাটনে ভারতীয় পুলিশ স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের পুলিশের প্রায় সমকক্ষ তথাপি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের পুলিশকে তথাকার জনগণ ভালবাসেন এবং ভারতীয় পুলিশকে ভারতীয় জনগণ ঘৃণার চোখে দেখেন। ইহার জন্য দায়ী হইতেছে ভারতীয় পুলিশের জনগণের প্রতি সহৃদয় অভ্যর্থনা এবং আন্তরিক সহানুভূতির অভাব ।

**৪) অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ** - অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিগণের প্রাপ্য মানবাধিকার রক্ষা করিয়া আইনানুগ দৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধা অর্জন করিতে পারিলে স্বাভাবিকভাবেই আপামর জনসাধারণের মনে পুলিশ সম্পর্কে ভাল ধারণার সৃষ্টি হইবে ।

মোট কথা নিম্নলিখিত পুলিশি আচরণ তাহার উপর অর্পিত কর্তব্য ও দায়দায়িত্বের যথাযথ পালনে ফলপ্রসু পন্থা হিসাবে চিহ্নিত , যথা -

(এ) ক্রোধ প্রকাশ বর্জন করিতে হইবে ,

(বি) যেকোনরূপ শত্রুতা হইতে নিজেকে বিরত করিতে হইবে,

(সি) কোন প্রকার ভয়ে বিচলিত হওয়া যাইবেনা , নিজেকেও অপরের নিকট অশ্রদ্ধা মিশ্রিত ভয়ের কারণ করা যাইবে না,

(ডি) নিজের এবং অপরের অধিকার সম্বন্ধে যথাযথরূপে সর্তক থাকিতে হইবে ,

(ই) জনগণের প্রতি নিজ আচরণে মানবিকতার প্রকাশ থাকিবে , স্মিতমুখে জনসংযোগের

পথকে সুগম করিতে হইবে,

(এফ) বেআইনি উদারতা চলিবেনা , কিন্তু হৃদয়ের অসাড়তাও থাকিবেনা ,

(জি) মূল নীতি হইবে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন ,

(এইচ) জনহিতে নিজেকে নিয়োজিত করিতে হইবে ,

(আই) সদা বিনীত কিন্তু পেশাগত গর্বে থাকিতে হইবে দৃঢ়,

(জে) সুশৃঙ্খল আচরণের মাধ্যমে জনগণে নিকট দৃষ্টান্তস্বরূপ হইতে হইবে ,

(কে) সততা বজায় রাখিয়া চলিতে হইবে ,

(এল) ন্যায় পরায়ণ হইতে হইবে ,

(এম) বিক্ষোভকারীগণের প্রতি দৃঢ় , সঠিক ও নিরপেক্ষ থাকিতে হইবে ,

(এন) নিজ কর্তব্যের সঠিক পালনে রত থাকিতে হইবে ,

(ও) অত্যাচারিত বা ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষের বক্তব্য ধৈর্য্য সহকারে শুনিতে হইবে ,

(পি) ব্যক্তিগত চরিত্র অপরের নিকট দৃষ্টান্তস্বরূপ হইতে হইবে ,

(কিউ) যেকোন অভিযোগে সময়মত সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে ,

(আর) জনসমাজ জনস্বার্থে যাহা চাহেন আইনের পরিধির মধ্যে থাকিয়া তাহা করিতে হইবে ,

(এস্) আত্মসমালোচনা করিতে হইবে ,

(টি) জনগণের প্রভু নহেন , সেবকমাত্র - এই মনোভাব পোষণ করিতে হইবে ।

**অপর কাহারও আচরণে যাহাতে মানবাধিকা লঙ্ঘিত না হয় তাহাও সুনিশ্চিত করা পুলিশের কর্তব্য -**

পুলিশ বাহিনীর উদ্দেশ্য হইল -

১) অপরাধ দমন করা এবং অপরাধীকে খুঁজিয়া বাহির করা ,

২) নাগরিকগণের জীবন , ধনসম্পত্তি ও মানমর্যাদা রক্ষা করা ,

৩) আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা ,

৪) অপরাধীকে গ্রেপ্তার করা এবং বিচারের জন্য আদালতে প্রেরণ করা ,

৫) সংবাদ সংগ্রহ করা এবং উপযুক্ত কতৃপক্ষকে সরবরাহ করা ,

৬) বিপদকালে জনসাধারণকে সাহায্য করা ।

উপরোক্ত উদ্দেশ্যগুলির অন্তর্নিহিত মূল উদ্দেশ্য হইল মানবাধিকার রক্ষা করা । সেইহেতু পুলিশি কর্তব্য সম্পাদন করিতে গিয়া কোন প্রকার আচরণের মাধ্যমে যাহাতে কাহারও মানবাধিকার লঙ্ঘিত না হয় তাহা যেমন সুনিশ্চিত করা পুলিশের কর্তব্য তেমনই অপর কাহারও আচরণে যাহাতে কাহারও মানবাধিকার লঙ্ঘিত না হয় তাহাও সুনিশ্চিত করা পুলিশের কর্তব্য । ইহা সুনিশ্চিত

করিতে পুলিশ কর্মীর হাতিয়ার হইল আইন। আইন যথাযথভাবে প্রয়োগের মাধ্যমেই পুলিশ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মানবাধিকার রক্ষা করিবার পবিত্র কর্তব্য সাফল্যের সহিত সম্পাদন করিতে পারিবেন। মানবাধিকার সমূহের সুরক্ষা সকল আইনের মূল উদ্দেশ্যে হইলেও আলোচ্যক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি আইনি বিধানের উল্লেখ করা হইল, যথা-

**মহিলাগণের অধিকার রক্ষায় বিধিত বিশেষ উল্লেখযোগ্য সাধারণ আইনি বিধানাদি ঃ-**

**(এ) ১৯৬১ সালের পণপ্রথা নিবারণকারী আইন -**

(১) পণ দেওয়া ও লওয়া দন্ডনীয় (৩ ধারা)

২) পণ দিবার বা লইবার জন্য বিজ্ঞাপনের মারফত প্রস্তাব দেওয়া দন্ডনীয় ( ৪ এ ধারা)

৩) পণ দিবার জন্য বা লইবার জন্য চুক্তি সম্পাদিত হইলে সেই চুক্তি আইনগ্রাহ্য হইবেনা ৫ ধারা

৪) আইনানুগভাবে প্রদত্ত পণ স্ত্রী বা তাঁহার উত্তরাধিকারীর উপকারার্থে ব্যায়িত হইবে ( ৬ ধারা)

৫) বিশেষ কিছু উদ্দেশ্যে এই আইনের অপরাধদি ধর্তব্য হইবে, এবং জামিনযোগ্য এবং রফাঅযোগ্য হইবে ৮ ধারা

**(বি) ১৮৬০ সালের ভারতীয় দন্ডবিধি আইন -**

(এ) পণের কারণে বধূহত্যা হইয়াছে বলিয়া কখন ধরা হইবে এবং তাহার দন্ডের বিধান (৩০৪ এ ধারা)

(বি) স্ত্রীলোকের স্বামী বা স্বামীর আত্মীয় সেই স্ত্রীলোকের সহিত নিষ্ঠুর আচার আচরণ করিলে তাহা দন্ডনীয় (৪৯৮ এ ধারা).

সি) আইনানুগ অনুমোদন ছাড়া ধর্ষণ /বলাৎকারে ক্ষতিগ্রস্থ মহিলার পরিচয় মুদ্রণ বা সর্বসাধারণ্যের প্রকাশ দন্ডনীয় (২২৮ এ ধারা)

(ডি) কোন মহিলার বিরক্তি উৎপাদন হয় এমন অশ্লীল কার্য ও গান করা দন্ডনীয় (২৯৪ ধারা)

(ই) স্ত্রীলোকের শ্লীলতাহানি করিবার উদ্দেশ্যে তাহার প্রতি হামলা / আক্রমন করা বা তাহার প্রতি অপরাধজনক বলপ্রয়োগ করা দন্ডনীয় (৩৫৪ ধারা),

(এফ) ধর্ষণ /বলাৎকার দন্ডনীয় (৩৭৬ (২), ৩৭৬ বি, ৩৭৬ সি, ৩৭৬ ডি ধারা ),

জি) স্ত্রীলোকের শালীনতার অমর্যাদা করিবার উদ্দেশ্যে কোন শব্দ অঙ্গভঙ্গী বা কার্য করা দন্ডনীয় (৫০৯ধারা)

**(সি) ১৯৭৩ সালের ফৌজদারী কার্যপ্রণালী বিধি -**

১) ধর্ষণ / বলাৎকারের অপরাধের অনুসন্ধান ও বিচার প্রকাশ্যে হইবেনা, ঐ গোপন বিচারের

কার্যবাহ আদালতের অনুমোদন ছাড়া মুদ্রণ ও সর্বসাধারণ্যে প্রকাশ করা যাইবেনা (৩২৭ ধারা)

**(ডি) ১৮৭২ সালেব ভারতীয় সাক্ষ্য আইন-**

১) বিবাহিত স্ত্রীলোক কর্তৃক আত্মহত্যার প্ররোচনা বিষয়ে অনুমান (১১৩ এ ধারা)

২) পণঘটিত বধূমৃত্যু সম্পর্কে অনুমান (১১৩ বি ধারা)

৩) ধর্ষণ /বলাৎকারের কতিপয় অভিযোজনে সম্মতির অনুপস্থিতির বিষয়ে অনুমান (১১৪ এ ধারা)

(ই) ১৯৫৬ সালের অনৈতিক নিন্দাই বৃত্তি নিবারণী আইন -

১) পতিতালয় চালান বা পতিতালয় হিসাবে কোন স্থান ব্যবহার হইতে দেওয়া দন্ডনীয় (৩ ধারা)

২) পতিতাবৃত্তির উপার্জনের উপর জীবিকা নির্বাহ করা দন্ডনীয় (৪ ধারা)

৩) পতিতাবৃত্তির জন্য ব্যক্তি সংগ্রহ করা , উসকানি দেওয়া বা লইয়া যাওয়া দন্ডনীয় (৫ ধারা)

৪) পতিতালয়ে কাহাকেও আটক করিয়া রাখা দন্ডনীয় (৬ ধারা),

৫) সার্বজনিন স্থানে বা তাহার অনতিদূরে পতিতাবৃত্তি চালান দন্ডনীয় ( ৭ ধারা)

৬) পতিতাবৃত্তির প্রয়োজনের জন্য প্রলুব্ধ করা বা আহ্বান জানান দন্ডনীয় ( ৮ ধারা)

৭) হেপাজতে থাকা কোন ব্যক্তিকে প্রলুব্ধ করান দন্ডনীয় ( ৯ ধারা)

**(এফ্) ১৯৮৭ সালের সতীদাহ (প্রতিরোধক ) আইন -**

ক) সতী সম্পাদন করিবার চেষ্টা দন্ডনীয় ( ৩ ধারা),

খ) সতী হইবার প্ররোচনা দান দন্ডনীয় ( ৪ ধারা),

গ) সতী মহিমান্বিত করা দন্ডনীয় ( ৫ ধারা)

**(জি) ১৯৮৬ সালের মহিলাগণের অশোভন প্রতিমূর্তি প্রদর্শন (নিবারণী) আইন -**

ক) মহিলাগণের অশোভন প্রতিমূর্তি প্রদর্শন করিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া নিষিদ্ধ ও দন্ডনীয় ( ৩ ধারা এবং ৬ ধারা)

খ) মহিলাগণের অশোভন প্রতিমূর্তি প্রদর্শিত থাকা গ্রন্থাদি , পুস্তিকা ইতযাদি সর্বসাধারণ্যের প্রকাশ বা ডাকের মাধমে তাহা প্রেরণ করা নিষিদ্ধ ও দন্ডনীয় ( ৪ ধারা এবং ৬ ধারা)

গ) এই আইনের দন্ডনীয় অপরাধসমূহ জামিনযোগ্য ও ধর্তব্য অপরাধ ( ৮ ধারা),

**শিশুগণের অধিকার রক্ষায় বিধিত বিশেষ উল্লেখযোগ্য সাধারণ আইনি বিধানাদি ঃ-**

**(এ) ১৯৮৬ সালের শিশুশ্রম (নিষেধ ও নিয়ন্ত্রণ) আইন -**

১) বিশেষ কিছু পেশায় এবং বিশেষ কিছু প্রক্রিয়াসমূহ যে কারখানায় হইয়া থাকে তথায় শিশু নিয়োগ নিষিদ্ধ ও দন্ডনীয় ( ৩ধারা ও ১৪ ধারা)

**বিশেষ পেশাগুলি হইল -**

ক) রেলের যাত্রী , মালামাল ও ডাক পরিবহন,

খ) পুড়িয়া গিয়াছে কিন্তু ভস্মীভূত হয় নাই এমন পদার্থ রেলের এলাকায় বোঝাই , ছাইগাদা পরিস্কার করা বা গৃহনিমার্ণ,

গ) রেল ষ্টেশনের ক্যাটারিং প্রতিষ্ঠানে , এক প্ল্যাটফর্ম হইতে অপর প্ল্যাটফর্মে অথবা চলন্ত ট্রেনের ভিতরে বা বাহিরে খাবার ফেরি করিবার কার্য,

ঘ) রেল ষ্টেশনের ক্যাটারিং প্রতিষ্ঠানে , এক প্ল্যাটফর্ম হইতে অপর প্ল্যাটফর্মে অথবা চলন্ত ট্রেনের ভিতরে বা বাহিরে খাবার ফেরি করিবার কার্য ,

ঙ) কোন বন্দর এলাকায় বন্দর কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্ট কোন কার্য ,

ছ) সাময়িক লাইসেন্সপ্রাপ্ত দোকানে পটকা ও আতসবাজি বিক্রয় সংক্রান্ত কার্য,

জ) কসাইখানার কার্যে,

**বিশেষ প্রক্রিয়াসমূহ হইল -**

১) বিড়ি তৈয়ারী

২) কার্পেট বুনন ,

৩) সিমেন্ট উৎপাদন , সিমেন্ট বস্তাজাতকরণ ,

৪) কাপড়ে মুদ্রণ , রঙকরণ এবং বুনন,

৫) দেশলাই , বিস্ফোরক এবং আতসবাজি উৎপাদন ,

৬) অভ্র কাটাই ও ফালিকরণ ,

৭) চাঁচ গালা উৎপাদন ,

৮) সাবান উৎপাদন,

৯) চর্মাদি পাকা করিবার কার্য ,

১০) উল পরিষ্কারকরণ ,

১১) গৃহ ও নিমার্ণ শিল্প,

১২) স্লেট পেনসিল উৎপাদন (প্যাককরণ সহ)

১৩) মূল্যবান মণিরাজি হইতে দ্রব্যাদি উৎপাদন ,

১৪) সিসা , পারদ , ম্যাঙ্গানিজ , ক্রোমিয়াম , ক্যাড্মিয়াম , বেনজিন , পেস্টিসাইড এবং এ্যাসবেসটস্ ইত্যাদি ব্যবহার করিয়া উৎপাদন প্রণালী,

১৫) ১৯৪৮ সালের কারখানা আইনে সংজ্ঞা দিয়া যেরূপ বলা হইয়াছে সেইরূপ ঝুঁকিপূর্ণ প্রণালী এবং বিপজ্জনক ক্রিয়াকলাপ ,

১৬) ১৯৪৮ সালের কারখানা আইনে সংজ্ঞা দিয়া যেরূপ বলা হইয়াছে সেইরূপ মুদ্রণ,

১৭) কাজুবাদাম ছাড়ান ও প্রক্রিয়াকরণ ,

১৮) ইলেকট্রনিক শিল্পে রাং ঝালাই ,

**অন্যান্য ক্ষেত্রে শিশু শ্রমিকের -**

ক) কার্যের সময়সীমার বিধান ( ৭ ধারা),

খ) সাপ্তাহিক ছুটির বিধান ( ৮ ধারা)

গ) স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিধান (১৩ ধারা),

**(বি) ১৯৮৬ সালের কিশোর- কিশোরীদের সম্পর্কে ন্যায়বিচার আইন -**

কোন কিশোর কিশোরীর ভারপ্রাপ্ত বা নিয়ন্ত্রণ প্রাপ্ত কেহ তাহাদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করিলে উপরোক্ত আইনের ৪১ ধারায় দন্ডনীয় হইবেন ,

**ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতপাতের বিভেদহীন রক্ষায় বিধিত বিশেষ উল্লেখযোগ্য সাধারণ আইনি বিধানাদিঃ-**

**(এ) ১৮৬০ সালের ভারতীয় দন্ড বিধি -**

১) কোন ধর্মকে অপমান করিবার উদ্দেশ্যে ধর্মস্থানের ক্ষতি করা বা তাহার পবিত্রতা নষ্ট করা দন্ডনীয় (২৯৫ ধারা)।

২) কোন সম্প্রদায়ের ধর্ম বা ধর্মীয় বিশ্বাসকে অপমান করিয়া ঐ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বোধকে অমর্যাদা করিতে , জ্ঞানসহ বা বিদ্বেষবশতঃ কোন কার্য করা দন্ডনীয় (১৯৫ এ ধারা)

৩) ধর্মীয় সমাবেশে গোলমাল করা দন্ডনীয় ( ২৯৬ ধারা)

৪) কোন ধর্মকে অপমান করিবার উদ্দেশ্যে সমাধিভূমি ইত্যাদিতে অনধিকার প্রবেশ করা দন্ডনীয় (২৯৭ ধারা)

৫) ধর্মীয় বোধকে আঘাত করিবার সুচিন্তিত উদ্দেশ্যে কিছু বলা দন্ডনীয় (২৯৮ ধারা)

**(বি) ১৯৫৫ সালের নাগরিক অধিকার সুরক্ষা আইন ঃ-**

১) ধর্মীয় কারণে কাহাকেও দূরে সরাইয়া রাখা দন্ডনীয় (৩ ধারা)

২) সামাজিক কারণে কাহাকেও দূরে সরাইয়া রাখা অর্থাৎ অস্পৃশ্য করিয়া রাখা দন্ডনীয় ( ৪ধারা),

৩) অস্পৃশ্যতার কারণে হাসপাতাল ইত্যাদিতে ভর্তি লইতে অস্বীকার করা দন্ডনীয় (৫ ধারা),

৪) অস্পৃশ্যতার কারণে কাহাকেও জিনিসপত্র বিক্রয় করিতে বা কোন সেবা সরবরাহ করিতে অস্বীকার করা দন্ডনীয় ( ৬ ধারা)

৫) অস্পৃশ্যতা হইতে উদ্ভুত অন্যান্য অপরাধ দন্ডনীয় ( ৭ ধারা)

৬) এই আইনের কোন অপরাধের প্ররোচনাও দন্ডনীয় (১০ ধারা)

**(সি) ১৯৮৯ সালের তপসিলভুক্ত জাতি ও উপজাতি (নৃশংসতা নিবারণ আইন -**

কেহ তপসিলভুক্ত জাতি বা উপজাতিভুক্ত না হইয়া তপসিলভুক্ত জাতি বা উপজাতিভুক্ত কোন সদস্যের প্রতি কোনরূপ নৃশংস আচরণ করিলে ঐ আইনের ৩ ধারায় দন্ডনীয় অপরাধে অপরাধী হইবে ,

**শোষণ হইতে ত্রাণের অধিকার রক্ষায় বিধিত উল্লেখযোগ্য কিছু সাধারণ আইনি বিধানাদি ঃ-**

**(এ) ১৮৬০ সালের ভারতীয় দন্ড বিধি ঃ-**

১) ক্রীতদাস হিসাবে কোন ব্যক্তিকে ক্রয় বা বিক্রয় দন্ডনীয় (৩৭০ ধারা)

২) ক্রীতদাস লইয়া স্বভাবজাতভাবে ব্যবসায় দন্ডনীয় (৩৭১ ধারা)

৩) পতিতাবৃত্তির জন্য নাবালিকা ক্রয় বিক্রয় দন্ডনীয় (৩৭৩ ও ৩৭২ ধারা)

৪) বেআইনীভাবে শ্রম দিতে বাধ্য করান দন্ডনীয় (৩৭৪ ধারা)

**(বি) ১৯৫৬ সালের অনৈতিক নিন্দার্হ বৃত্তি নিবারণী আইনী ঃ-**

১) পতিতাবৃত্তির উপার্জনের উপর জীবিকা নির্বাহ দন্ডনীয় ( ৪ ধারা)

২) সম্মতি লইয়া বা বিনা সম্মতিতে পতিতাবৃত্তির জন্য ব্যক্তি সংগ্রহ করা দন্ডনীয় ( ৫ধারা)

**(সি) ১৯৮৬ সালের কিশোর কিশোরীদের সম্পর্কে ন্যায়বিচার আইন -**

১) কিশোর কিশোরীকে দিয়া ভিক্ষা করান দন্ডনীয় ( ৪২ ধারা),

২) কিশোর কিশোরী কর্মচারীকে শোষণ দন্ডনীয় (৪৪ ধারা)

**(ডি) ১৯৮৬ শিশু শ্রম (নিষেধ ও নিয়ন্ত্রণ ) আইন -**

১) বিশেষ কিছু পেশায় ও বিশেষ কিছু প্রক্রিয়া সম্পাদনকারী কারখানায় শিশু শ্রমিক নিয়োগ নিষিদ্ধ ও দন্ডনীয় ( ৩ ধারা এবং ১৪ ধারা)

২) অন্যান্য ক্ষেত্রে শিশু শ্রমিকের দৈহিক কার্যের মেয়াদকালের, সাপ্তাহিক আবশ্যিক ছুটির এবং স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিধানদির মান্য করিতে হইবে (৭ , ৮, ও ১৩ ধারা)

**(ই) ১৯৮৯ সালে তপসিল জাতি ও তপসিল উপজাতি (নৃশংসতা নিবারণ ) আইন -**

এই আইনে তপসিলভুক্ত জাতি বা তপসিলভুক্ত উপজাতির সদস্য নহেন এমন ব্যক্তি কর্তৃক তপসিলভুক্ত জাতি বা তপসিলভুক্ত উপজাতি সদস্যকে নানাবিধ উপায়ে শোষণ করিবার অপরাধ বিধিত হইয়াছে এবং উহার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা বিধান দেওয়া হইয়াছে ,

**(এফ্) ১৯৭৬ সালের দাসত্বাবদ্ধ শ্রম পদ্ধতি (বিলোপন )আইন -**

১) দাসত্বাবদ্ধ শ্রম পদ্ধতির বিলোপ ঘটান হইয়াছে ( ৪ ধারা)

২) দাসত্বাবদ্ধ শ্রম আদায় দন্ডনীয় (৯৬ ধারা)

৩) দাসত্বাবদ্ধ দেনায় ফেলিয়া দিবার জন্য অগ্রিম দেওয়া দন্ডনীয় (১৭ ধারা)

৪) দাসত্বাবদ্ধ শ্রম পদ্ধতির আওতায় দাসত্বাবদ্ধ শ্রম জোর করিয়া আদায় দন্ডনীয় ( ১৮ ধারা)

৫) দাসত্বাবদ্ধ শ্রমিককে সম্পত্তি ফিরাইয়া দিতে ত্রুটি বা খেলাপ করা দন্ডনীয় ( ১৯ ধারা)

৬) এই আইনের অপরাধে প্ররোচনা দেওয়া দন্ডনীয় (২০ ধারা)

৭) এই আইনের অপরাধগুলি ধর্তব্য ( ২২ ধারা)

**(জি) ১৯৮৭ সালের মানসিক স্বাস্থ্য আইন -**

এই আইনের অষ্টম অধ্যায়ের মানসিক প্রতিবন্ধি ব্যক্তিগণের মানবাধিকার সুরক্ষায় ব্যবস্থা বিধান দেওয়া হইয়াছে। ঐ অধ্যায়ের ৮১ ধারায় বলা হইয়াছে যে মানসিক প্রতিবন্ধী কোন ব্যক্তি চিকিৎসাকালীন দৈহিক বা মানসিক কোনভাবেই অমর্যাদার শিকার হইবেন না এবং মানসিক প্রতিবন্ধীর চিকিৎসার কারণে তাঁহার মঙ্গলার্থে প্রয়োজন না হইলে , অথবা নিজে কিম্বা তাঁহার অভিভাবক লিখিত অনুমতি না দিলে তাহাকে গবেষণার কার্যে ব্যবহার করা যাইবেনা।

## মানবাধিকার রক্ষায় গঠিত বিভিন্ন সংগঠন

বিশ্বের বর্তমানকালে আন্দোলনগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল মানবাধিকারের আন্দোলন। এই আন্দোলনের ক্রমেই দানা বাঁধিতেছে এবং সরকারি ও বেসরকারি স্তরে বিভিন্ন পর্যায়ে গড়িয়া উঠিতেছে মানবাধিকার সুরক্ষা মঞ্চ। আন্তর্জাতিক ও জাতীয় স্তরে এই সংগঠনগুলি মানবাধিকার রক্ষায় জনমত গঠন করিয়া বিশ্বের দেশগুলিকে তাহাদের পবিত্র কর্তব্য স্মরণ করাইয়া দিতেছেন।

**আর্ন্তজাতিক স্তরের সংগঠনসমূহ -**

আর্ন্তজাতিক স্তরের উল্লেখযোগ্য মানবাধিকার সংগঠনগুলি হইল - রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানবাধিকার কমিশন , এ্যামনেষ্টি ইনটারন্যাশনাল , হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচ্ হিউম্যান রাইটস্ রিসার্চ্ , এশিয়া ওয়াচ ইত্যাদি।

**১) রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানবাধিকার কমিশন** - ইহা সরকারি স্তরের আন্তর্জাতিক মানবাধিকার রক্ষা মঞ্চ। এই সংগঠন বাৎসরিক মিটিং এ মানবাধিকারের নানা বিষয়ে লইয়া বিশদভাবে আলোচনা করিয়া থাকেন এবং রিপোর্ট পেশ করেন।

**২) এ্যামনেষ্টি ইনটারন্যাশনাল** - মানবাধিকার রক্ষায় নিয়োজিত স্বেচ্ছাসেবী এই আর্ন্তজাতিক সংস্থাটি আর্ন্তজাতিক স্থরে সর্ববৃহৎ একটি বেসরকারী মানবাধিকার সংগঠন। ১৯৬১ সালে ব্রিটিশ আইনজীবী পিটার বেনেনসন এই সংস্থাটি প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার সদর দফতর লন্ডনে অবস্থিত। বর্তমানে এই সংস্থার ৭ লক্ষ সদস্য বিশ্বের ১৫০টিরও বেশী দেশে কাজ করিতেছেন। সদর দফতরেই কর্তব্যরত আছেন ২৫০ জনেরও বেশী দক্ষ কর্মী। এই সংগঠন সারা বিশ্বের মানবাধিকারের ঘটনাগুলি লইয়া গবেষণা করেন এবং রিপোর্ট প্রকাশ করেন। এইভাবে এই সংগঠন মানবাধিকার লঙ্ঘনের

বিরুদ্ধে জনমত গঠন করিয়া সংশ্লিষ দেশের উপর চাপ সৃস্টি করেন ।

**৩) হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচ** - আমেরিকার এই বেসরকারি সংগঠনটিও মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করিতে বিশ্বের নানা দেশের মানবাধিকার লঙ্ঘনের আর্ন্তজাতিক স্তরে তুলিয়া ধরেন । বেসরকারি এই মানবাধিকার সংগঠনটি আকারে আয়তনে এ্যামনেষ্টি ইনটারন্যাশনালের তুলনায় ছোট হইলেও মানবাধিকারের প্রহরী হিসাবে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখিতেছেন ।

## জাতীয়স্তরের সংগঠনসমূহ

জাতীয় স্তরের মানবাধিকার সংগঠনগুলি হইল - জাতীয় মানবাধিকার কমিশন , জাতীয় মহিলা কমিশন , জাতীয় সংখ্যালঘুবর্গ কমিশন , জাতীয় তপসিলভুক্ত জাতি ও উপজাতি কমিশন এবং বিভিন্ন বেসরকারি মানবাধিকার সুরক্ষা মঞ্চ।

**১) জাতীয় মানবাধিকার কমিশন** - কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৯৩ সালের মানবাধিকার সুরক্ষা আইন বলবৎ করিয়া " জাতীয় মানবাধিকার কমিশন " গঠন করিয়াছেন । মানবাধিকার রক্ষায় নজরদারী করিতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে পর্যাপ্ত ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে ।এই কমিশন মানবাধিকারের লঙ্ঘন বা তাহার প্ররোচনা দেওয়া সংক্রান্ত অভিযোগ, বা লোকসেবক কর্তৃক ঐরূপ লঙ্ঘনের নিবারণ করা অবহেলা সংক্রান্ত অভিযোগের বিষয়ে নিজ উদ্যোগে অথবা ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ বা ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের হইয়া করা আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে অনুসন্ধান করিতে পারেন এবং অনুসন্ধান করিয়া যাহা যথাযথ মনে করিতে পারেন সেইরূপ পদক্ষেপ লইবার সুপারিশ করিয়া সরকারকে রিপোর্ট দিতে পারেন ।এই কমিশন আদালতে অমীমাংসিত থাকা মানবাধিকার লঙ্ঘনের কোন অভিযোগের মামলায়, আদালতের অনুমোদন লইয়া , হস্তক্ষেপ করিতে পারেন এবং রাজ্য সরকারকে সংবাদ দিয়া , রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন যেকোন জেল বা অন্য যেকোন প্রতিষ্ঠান যেখানে চিকিৎসা , সংশোধন বা নিরাপত্তার কারণে ব্যক্তিদের আটক করিয়া রাখা হয় , তথাকার বাসিন্দগণের জীবনযাত্রার মান পর্যালোচনা করিতে তথায় পরিদর্শন করিতে পারেন এবং যথাযথ পদক্ষেপের সুপারিশ করিতে পারেন ।

**২) জাতীয় মহিলা কমিশন** - কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৯০ সালের মহিলাগণের জন্য জাতীয় কমিশন আইন বলবৎ করিয়া " জাতীয় মহিলা কমিশন " গঠন করিয়াছেন । মহিলাগণের সার্বিক উন্নতি ও অধিকার রক্ষা করিতে জাতীয় মহিলা কমিশনকে নজরদারী পর্যাপ্ত ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে । সংবিধান ও অন্যান্য সাধারণ আইনে মহিলাগণকে যেসকল সুরক্ষা বিধান দেওয়া হইয়াছে তাহা যথাযথভাবে প্রয়োগ হইতেছে কিনা তাহা এই কমিশন তদন্ত করিতে পারেন । নিজ উদ্যোগে বা অভিযোগ পাইয়া এই কমিশন মহিলাগণের অধিকারসমূহের কোন লঙ্ঘন হইয়া থাকিলে তাহা যথাযথ কর্তৃপক্ষের

নজরে আনিয়া ব্যবস্থা গ্রহণ করাইতে পারেন ।

৩) **জাতীয় সংখ্যালঘুবর্গ কমিশন** - কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৯২ সালের সংখ্যালঘুবর্গের জন্য জাতীয় কমিশন আইন বলবৎ করিয়া " জাতীয় সংখ্যালঘুবর্গ কমিশন " গঠন করিয়াছেন । সংখ্যালঘুবর্গ বলিতে মুসলমান , খৃষ্টান , শিখ , বৌদ্ধ ও পারসি সম্প্রদায়ের ব্যক্তিবর্গকে বুঝান হইয়াছে । সংখ্যালঘুবর্গের সার্বিক উন্নতি , সাংবাধানিক ও সাধারণ আইনি অধিকার রক্ষা করিতে জাতীয় সংখ্যালঘুবর্গ কমিশনকে নজরদারীর পর্যাপ্ত ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে ।

৪) **জাতীয় তপসিলভুক্ত জাতি ও উপজাতি কমিশন** - ভারতীয় সংবিধানের ৩৩৮ অনুচ্ছেদের নির্দেশ " জাতীয় তপসিলভুক্ত জাতি ও উপজাতি কমিশন" গঠিত হইয়াছে । তপসিলভুক্ত জাতি ও উপজাতি সদস্যগণ সার্বিক উন্নতি, সাংবিধানিক ও সাধারণ আইনি অধিকার রক্ষা করিতে এই কমিশনকে নজরদারীর পর্যাপ্ত ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে ।

## রাজ্যস্তরের সংগঠনসমূহ

রাজ্যস্তরে মানবাধিকার সংগঠনগুলি হইল - রাজ্য মহিলা কমিশন , রাজ্য ও জেলাস্তরের বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী বিভিন্ন মানবাধিকার সুরক্ষা মঞ্চ ।

## রাজ্য মানবাধিকার কমিশন

কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৯৩ সালের মানবাধিকার সুরক্ষা আইন বলবৎ করিয়া রাজ্যস্তরেও মানবাধিকার কমিশন ও মানবাধিকার আদালত গঠন করিবার বিধান দিয়াছে । রাজ্যস্তরের মানবাধিকার কমিশনের কার্যাবলী জাতীয় মানবাধিকার কমিশনেরই অনুরূপ । প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গই প্রথম রাজ্য যে রাজ্যস্তরেব মানবাধিকার কমিশন ইতিমধ্যেই গঠন করিয়াছেন ত্রিপুরার রাজ্যে ও মানবাধিকার কমিশন গঠিত হয় , এছাড়া ও আছে মহিলা কমিশন , ইত্যাদি ইত্যাদি।

*************************

# পঞ্চম অধ্যায়

## অধিকার - বাস্তুহীন মানুষ , অসমর্থ ,রোগী , শিশু শ্রমিক ইত্যাদি

## অধিকার - বাস্তুহীন মানুষ , অসমর্থ ,রোগী , শিশু শ্রমিক ইত্যাদি

'DISPLACED Person "

In A.I.R 1952 punjle , 229 definition of displace person in Section 3 of the displaced persons (Institution of suits) Act . 1948 ( ACt no 47 of 1948 ) come up for consideration and the question for determination was whether the plaintiff company could be regarded as a " displaced person " under the Act after a detailed discussion of the English as well as the Indian decisions the High count at the conclujion that it is not correct to say that the phrase " displaced persons " refers only to nature persons and not to artificial persons , like a company.

The displaced persons (compensation and Rehabitafion Act - 1954 )

আমাদের দেশের ভেতরে ও নানাহ্ কারণে এ সমস্যার সম্মুখীন যেমন কাশ্মীরের বহুলোক স্থানান্তরিত, আসামে , বড়ো সাওতাল দ্বন্দে ও অনেক লোক স্থানান্তরিত প্রচুর রিয়াং সম্প্রদায়ের লোক মিজোরাম থেকে ত্রিপুরায় আশ্রয় নিয়েছে । ছত্রিশগড়ে ও ভালসংখ্যক লোক স্থান্তান্তর হয়েছে ।

Disabled - অসমর্থ

i) The Person with the disalailihis (Equal opportunities , protection of Rights and full participation )Act- 1995

2) Declaration on the Right of Disaleled Persons - (Proclaimed by central Assembly Resolution - 3447 (XXX) of 9th December -1975.

### প্রতিবন্ধী এবং ভোক্তা বিষয়ক কিছু নিয়মকানুন

**প্রতিবন্ধী কারা ?**

১) অন্ধ বা ক্ষীণ চোখের দৃষ্টি (২) দুর্বল শ্রবণশক্তি (৩) চলাফেরায় অসমর্থ (৪) কুষ্ঠরোগমুক্ত , কিন্তু পঙ্গু (৫) মানসিক অসুস্থ

**সমন্বয় কমিটি** ঃ- প্রতিবন্ধীদের সর্বপ্রকার সহায়তা ও সুযোগ দেয়ার উদ্দেশ্যে একটি কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটি গঠিত হয়েছে ( ৮ ধারা), প্রতি রাজ্যে গঠিত হয়েছে রাজ্য সমন্বয় কমিটি (১৩ ধারা। এই সমন্বয় কমিটিগুলোর কাজ হলো প্রতিবন্ধীদের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতি ও প্রকল্প তৈরী করা, এইসব নীতি ও প্রকল্প রূপায়নে সরকারী ও বেসরকারী সংগঠনগুলোর কাজের সমন্বয় করা। স্কুলে, কলেজে, কর্মস্থানে এবং জনগণের জন্য উন্মুক্ত যে কোন স্থানে প্রতিবন্ধীদের জন্য সব রকমের বাধা দূর করে একটি স্বচ্ছন্দ পরিবেশের সৃষ্টি করা ( ১৮ ধারা)

**প্রতিরোধক ব্যবস্থা, প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা** ঃ- বিকলাঙ্গ হওয়ার কারণগুলোকে প্রাথমিক অবস্থায় অনুসন্ধান করে প্রতিরোধ করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন সরকার। সমস্ত শিশুদের বছরে একবার পরীক্ষা করে দেখতে হবে বিকলাঙ্গ, হওয়ার বিপদ কারো মধ্যে দেখা দিয়েছে কিনা এবং সেক্ষেত্রে প্রতিরোধের ব্যবস্থা করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রগুলোতে নিযুক্ত কর্মীদের প্রশিক্ষণ দিতে হতে হবে এবং জনসাধারণের মধ্যে সুস্থ থাকার জ্য স্বাস্থ্যবিধি পালনের বিষয়ে ব্যাপকভাবে সচেতনতার কর্মসূচী নিতে হবে। (২৫ ধারা)।

**শিক্ষার সুযোগ** ঃ- প্রতিবন্ধী শিশুরা ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত বিনামূল্যে শিক্ষার সুযোগ পাবে। বৃত্তিমূলক শিক্ষার সুযোগ সহ বিশেষ স্কুল স্থাপন করতে হবে তাদের জন্য। যারা পঞ্চম শ্রেণীর পর কোন কারণে আর পড়তে পারেনি তাদের জন্য স্বল্প সময়ের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে। এই শিক্ষার জন্য যে সব বই বা অন্যান্য যন্ত্রপাতি প্রয়োজন হবে সরকার বিনামূল্যে তা বিকলাঙ্গ শিশুদের মধ্যে সরবরাহ করবেন (২৭ধারা) তাছাড়া সরকার রচনা করবেন একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা প্রকল্প। এই প্রকল্পে থাকবে, বিনামূল্যে শিক্ষা, বই খাতা, যন্ত্রপাতি, যাতায়াতের ব্যবস্থা, বৃত্তি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ (৩০ ধারা)। অন্ধ ছাত্রদের কলমচীর ব্যবস্থা করতে হবে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। এরা অন্ধ ছাত্রদের মুখ থেকে শুনে পরীক্ষার খাতায় লেখেন (৩১ ধারা)

**কর্ম সংস্থান ও সংরক্ষণ** ঃ- সরকার প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধীদের চাকুরীর জন্য কিছু পদ চিহ্নিত ও সংরক্ষণ করবেন এবং তা ৩ শতাংশের কম হবে না। অন্ধদের জন্য ১ শতাংশ, বধিরদের জন্য ১ শতাংশ এবং চলাফেরায় বিকলাঙ্গদের জন্য ১ শতাংশ পদ সংরক্ষণ করতে হবে। অবশ্য সরকার যদি মনে করেন কোন দপ্তরে এম) ধরনের কাজ কর্ম হয় না বিকলাঙ্গদের পক্ষে সম্ভব নয় সেই সব দপ্তরকে সংরক্ষনের আওতা থেকে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে মুক্ত রাখতে পারেন (৩৩ ধারা)।

সরকারী এবং স্থানীয় প্রশাসন প্রতিবন্ধীদের কর্ম সংস্থানের জন্য বিশেষ প্রকল্প তৈরী করবেন। এই প্রকল্পের প্রতিবন্ধীদের সার্বিক কল্যাণে জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচী থাকবে, চাকুরীর ক্ষেত্রে উচ্চ বয়সসীমা শিথিল করার ব্যবস্থা থাকবে। কর্মক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীদের কর্মীর শারীরিক অক্ষমতার সংগে সংগতি রেখে উপযুক্ত পরিবেশর ব্যবস্থা করতে হবে ( ৩৮ ধারা)।

**শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষণঃ-** সমস্ত সরকারী এবং সরকারী অনুদানপ্রাপ্ত বেঁসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কম করে ৩ শতাংশ আসন প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে (৩৯ ধারা) । যে সব প্রতিষ্ঠানের কর্মী সংখ্যার অন্তত ৫ শতাংশ প্রতিবন্ধী , সরকার তাদের উৎসাহিত করার জন্য বিশেষ অনুদান দেবেন (৪১ ধারা )।

**স্বাবলম্বন প্রকল্প**

সরকার প্রকল্প তৈরী করবেন পঙ্গুদের সাহায্যকারী যন্ত্রপাতি সরবরাহ্ করার জন্য । এছাড়া বাড়ি , ব্যবসা , কারখানা , স্কুল এসব প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের কাছ থেকে প্রতিবন্ধীরা অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে জায়গা পাবেন (৪৩ ধারা)

**চলাফেরার ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থা ঃ-** ট্রেনে , প্লেনে , বাসে.প্রতিবন্ধীদের ওঠা নামার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা , হুইল চেয়ার ইত্যাদি থাকবে । স্টেশনগুলোতে বিশেষ শৌচালয় থাকবে (৪৪ ধারা। রাস্তা পার হওয়ার সুবিধার্থে অন্ধদের থাকবে সংকেত ধ্বনি , জেব্রাচিহ্নিত অংশের উপুরভাগ খোদাই করা থাকবে (৪৫ ধারা) ।

**বৈষম্যহীন ব্যবস্থাঃ-** কোন সরকারী কর্মচারী যদি দুর্ঘটনা বা অন্য কোন কারণে প্রতিবন্ধী হয়ে পড়েন , শুধু এই কারণে পদোন্নতি বা অন্য কোন বিষয়ে তার প্রতি বৈষম্য করা যাবে না বা তাকে চাকুরীচ্যুত করা যাবে না । অবশ্য যদি তার পদে কাজ চালাতে অসমর্থ হয় তাকে অন্য কোন পদে সরিয়ে দেওয়া যাবে । যদি তার উপযুক্ত কোন পদ না থাকে তবে নতুন সাময়িক পদ তৈরী করে তাকে চাকুরীতে রাখতে হবে যতদিন না তার জন্য উপযুক্ত কোন পদ পাওয়া যায় (৪৭ ধারা)।

প্রতিবন্ধীদের নিয়ে যে সব সংগঠন বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গবেষণা করবে সরকার তাদের আর্থিক অনুদান দেবেন । গবেষণার বিষয়বস্তু হতে পারে পঙ্গুত্ব নিরোধক ব্যবস্থা , পুনর্বাসিন মানসিক ও শারীরিক সহায়ক পদ্ধতির আবিস্কার , কর্ম সংস্থান , বিশেষ শিক্ষা পদ্ধতি এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন (৪৮ ও ৪৯ ধারা)

যে সব প্রতিবন্ধীদের পঙ্গুত্ব ৮০ শতাংশ বা তার বেশী সরকার তাদের জন্য আলাদা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে পারবেন । এ ধরনের বেসরকারী প্রতিষ্ঠান স্থাপনে সরকার অনুমোদন এবং উৎসাহ দেবেন (৫৬ ধারা।

প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ Employment Exchange থাকবে । যাদের নাম এই Exchange দু বছরের বেশী থাকবে তাদের যদি কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা না হয় সরকার তাদের বেকারভাতা দেয়ার জন্য বিশেষ প্রকল্প তৈরী করবেন (৬৮ ধারা) ।

The National Trust for welfare of persons with Autism , Cerebral palsy , Mental Retardation and Multiple Disabilities Act . 1999

এটি একটি কেন্দ্রীয় আইন । এর দ্বারা একটি জাতীয় ন্যাস্ বা ট্রাস্ট গঠন করা হয়েছে । প্রতিবন্ধীদের জন্য কল্যাণমূলক কাজ করবে এই ট্রাস্ট । চার ধরণের প্রতিবন্ধীরা এই ট্রাস্টের আওতায় আসবে ।

এরা হলো-

১) যারা অসমবৃদ্ধির কারণে সামাজিক দায়িত্ব পালনে এবং মত প্রকাশে অক্ষম । এই অক্ষমতা তাদের একই ধরণের আচারগত ব্যবহারে দেখা দেয় ( Autism)

২) গর্ভাবস্থায় বা জন্মের সময় বা শৈশব মস্তিষ্কে আঘাতের কারণে যাদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে এবং এর প্রতিফলন ঘটে তাদের অস্বাভাবিক চলাফেরায় Cerebrl Palsy

৩) অসম্পূর্ণ মানসিক বৃদ্ধির কারণে যাদের বোধশক্তি স্বাভাবিকের চেয়ে কম (Mental Retardation)

৪) একাধিক অক্ষমতায় যারা প্রতিবন্ধী , যেমন - মূক এবং বধির ।

**ভোক্তা কে ?**

২(১) ঘ ধারাঃ ১) যিনি কোন পণ্য বা পরিসেবা দাম দিয়ে কিনেছেন বা গ্রহণ করেছেন ।

২) যিনি অন্যের কেনা পণ্য বা পরিসেবা ক্রেতার অনুমতি নিয়ে ব্যবহার করেছেন । কিন্তু পুনরায় বিক্রি বা অন্য কোন বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে কিনলে সেই ক্রেতাকে ভোক্তা ধরা হবে না ।

৩) যিনি মূল্য দিয়ে কোন পণ্য ভাড়া নিয়েছেন ।

৪) যিনি অন্যের ভাড়া নেয়া পর্য্য তার অনুমতি নিয়ে ব্যবহার করেছেন । কিন্তু যিনি বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ভাড়া নিয়েছেন তাঁকে ভোক্তা বলে গণ্য করা হবে না ।

মনে রাখতে হবে শুধু নিজের জীবন ধারনের জন্য বা স্বেচ্ছা নিয়োগ প্রকল্পে কোন দ্রব্য কিনলে সেই ক্রয়কে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে বলে ধরা হবে না ।

এক অর্থে আমরা সবাই ভোক্তা । আবার ভোক্তাদের মধ্যে কেউ আছেন কোন পণ্যের প্রস্তুতকারক, সরবরাহকারী বা বিক্রেতা বা কোন পরিসেবা কাজে যুক্ত । সবই মূল্যের বিনিময়ে । তাই ডাক্তারবাবুর কাছে রোগী , উকিলবাবুর কাছে মক্কেল , প্রভিডেন্ট ফান্ড কমিশনারের কাছে কর্মচারী , পরিবহণ মালিকের কাছে যাত্রী , বীমা কোম্পানীর কাছে বীমাকারী , বিদ্যুৎ সরবরাহকারীর কাছে গ্রাহক , পৌর সমিতির কাছে এলাকাবাসী এরা সবাই ভোক্তা । আবার যিনি কোন দ্রব্যের বিক্রেতা তিনি অন্য দ্রব্য বা পরিসেবার ক্ষেত্রে ভোক্তা ।

## ভোক্তা সংরক্ষণ আইনের উদ্দেশ্য কি ?

১) জীবন এবং সম্পত্তির হানিকর কোন পণ্য বিক্রির জন্য যাতে বাজারে আসতে না পারে ।

২) পণ্যের গুণ , পরিমাণ , ওজন মূল্য বিশুদ্ধতা, কার্যকারিতা ও মান যেন ক্রেতা জানতে পারেন ।

৩)প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে বিভিন্ন রকমের পণ্য যাচাই করে কেনার সুযোগ যাতে ক্রেতা পেতে পারেন।

৪) **ভোক্তার** অভিযোগে শোনা , প্রতিকারের ব্যবস্থা করা এবং অধিকার সুরক্ষিত করা ।

৫) অসাধু ক্রিয়া কলাপের মাধ্যমে ভোক্তাদের বঞ্চনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া ।

৬) ভোক্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যববস্থা করা ।

## কীভাবে ভোক্তার অধিকার খর্ব হতে পারে এবং বিরোধ দেখা দিতে পারে ঃ-

২ চ ধারা ঃ- ১) ভোক্তা যে পণ্য বা পরিসেবা মূল্য দিয়ে কিনলেন গ্রহণ করলেন বা ভাড়া নিলে তা যদি ত্রুটি পূর্ণ থাকে , বা যদি তার গুণ , পরিমাণ , বিশুদ্ধতা, মান ইত্যাদি আইন বা চুক্তি অনুযায়ী না হয় , বা

২) যদি কোন পণ্য বা পরিসেবা কেনার বা ভাড়া নেয়ার পূর্বশর্ত হিসাবে অন্য কোন পণ্য বা পরিসেবা কেনা বা ভাড়া নিতে ভোক্তাদের বাধ্য করা হয় , বা

৩) কোন পণ্য বা পরিসেবা বিক্রি , ব্যবহার ইত্যাদি বাড়ানোর উদ্দেশ্যে কোন অসাধু পদ্ধতি নেয়া হয় , যেমন -

ক) পণ্যের গুণ , পরিমাণ বা পরিসেবার মান ইত্যাদি সম্পর্কে মিথ্যা বর্ণনা বা ঘোষণা করা , বা

খ) পুরনো ব্যবহৃত জিনিসকে নতুন বলে উপস্থাপন করা , বা

গ) কোন পণ্য বা পরিসেবার যোগ্যতা , কার্যকারিতা , উপযোগিতা বা সুবিধা সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য দেয়া হয় , বা

ঘ) পণ্যের বিক্রেতা বা সরবরাহকারী বিশেষ নামী কোন ব্যক্তি বা সংস্থার অনুমোদন বা প্রতিশ্রুতি আছে বলে দাবি করা যা প্রকৃতপক্ষে তার নাই,

ঙ) দ্রব্য নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নষ্ট হলে সারাই করে দেয়ার বা বদলে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে পালন না করা ,

চ) পণ্যে বাজারমূল্য সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য দিয়ে ক্রেতাদের ঠকানো ।

ছ) অন্যের দ্রব্য বা পরিসেবা সম্পর্কে মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপন দেয়া ।

জ) যদি পণ্যে বা পরিসেবায় ত্রুটি বা ঘাটতি থাকে বা বিপজ্জনক হয় বা প্রচলিত আইন বিরোধ হয় ।

৫) যদি দ্রব্যের নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্য নেয়া হয় ।

**পরিসেবা কাকে বলে ?**

২(৯) ধারা ঃ যে সুযোগ সুবিধা বা সেবা অর্থের বিনিময়ে দেয়া হয়ে থাকে যথা বিদ্যুৎ , জল , বিমা , ব্যাঙ্কিং , হোটেল আমোদ প্রমোদের প্রতিষ্ঠান , তথ্য বা সংবাদ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান । কিন্তু বিনামূল্যে যে ; পরিসেবা পাওয়া যায় , যেমন সরকারী হাসপাতালে বিনামূল্যে চিকিৎসা , এই আইনের আওতায় আসবে না ।

কে নালিশ করতে পারেন ?

১) ভোক্তা নিজে

২) রেজিষ্ট্রিকৃত ভোক্তা সংগঠন

৩) রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সংগঠন

৪) কেই ধরনের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট এক বা একাধিক ভোক্তা ।

## কোথায় নালিশ করবেন ঃ-

**৯ ও ১০ ধারা ঃ-** জেলাস্তরে গঠিত হয়েছে জেলা ভোক্তা আদালত । জেলা জজই এই আদালতের প্রধান বিচারপতি । তাছাড়া আছেন আরও দু'জন সদস্য বিচারপতি । রাজ্য স্তরে গঠিত হয়েছে একটি রাজ্যভোক্তা আদালত বা রাজ্য কমিশন । জাতীয়স্তরে আছে একটি জাতীয় কমিশন ।

ভোক্তা আদালতের এক্তিয়ার -

**১১ ধারা ঃ-** যে পণ্য বা পরিসেবা নিয়ে অভিযোগ বা বিরোধ তার মূল্য যদি ২০ লক্ষ টাকার বেশী না হয় তবে দরখাস্ত করতে হবে জেলা ভোক্তা আদালতে । যে জেলার এলাকার নালিশের কারণ দেখা দিয়েছে বা বিবাদী পক্ষ বাস করেন বা ব্যবসা করেন সেই জেলার ভোক্তা আদালতের নালিশ বা দরখাস্ত করতে হবে । উকিল নিয়োগ না করেও আবেদনকারী নিজেই দরখাস্ত করতে পারেন । এ ধরনের মামলার ব্যয় অতি সামান্যই ।

ভোক্তা আদালত কত দিনের মধ্যে কী ধরনের আদেশ দিতে পারেন ?

**১২ ও ১৪ ধারাঃ-** সাধারণত ঃ দরখাস্ত পাওয়ার ২১ দিনের মধ্যে নালিশের নিষ্পত্তি করতে হয় । দ্রুত ন্যায় বিচারের জন্য এই বিধান । আদালত উভয় পক্ষকে শুনে আদেশ দিতে পারেন পণ্যের বা পরিসেবার ত্রুটি সরিয়ে দিতে বা নুতন ত্রুটিমুক্ত পণ্যের উৎপাদন বন্ধ করতে এবং অসাধু বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপ বন্ধ রাখতে । শাস্তিমূলক ক্ষতিপূরণের আদেশও আদালত দিতে পারেন ।

**আপীলের বিধান -**

**১৫ ধারা ঃ-** জেলা ভোক্তা আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করা যাবে রাজ্য কমিশনের

আদালতে , রায়ের ৩০ দিনের মধ্যে । অবশ্য রাজ্য কমিশন উপযুক্ত কারণের পরিপ্রেক্ষিতে এর পরেও আপীল গ্রহণ করতে পারেন । কিন্তু রায়ে যে অর্থ দিতে বলা হয়েছে তার অর্ধেক বা ২৫ হাজার টাকা, দুটোর মধ্যে যেটি কম , জমা দিতে হবে ।

**রাজ্য কমিশনের এক্তিয়ার-**

**১৭ ধারা -** যে পণ্য বা পরিসেবা নিয়ে নালিশ তার মূল্য যদি ২০ লক্ষ টাকার বেশী হয় কিন্তু ১ কোটি টাকার অধিক না হয় , সে ক্ষেত্রে আবেদনপত্র জমা দিতে হবে রাজ্য কমিশনে । তাছাড়া জেলা ভোক্তা আদালতের যে কোন নথী রাজ্য কমিশন তলব করে কোন আদেশের বা এক্তিয়ারের বৈধতা পরীক্ষা করে দেখে উপযুক্ত আদেশ দিতে পারেন ।

**রাজ্য কমিশনের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল -**

**১৯ ধারা ঃ** রাজ্য কমিশনের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করা যাবে জাতীয় কমিশনে , রায়ের ৩০ দিনের মধ্যে। উপযুক্ত কারণ দেখাতে পারলে পরেও আপীল গ্রহণ করা যাবে ।

জাতীয় কমিশনের এক্তিয়ার -

**২১ ধারা ঃ** জাতীয় কমিশন ১ কোটি টাকার উপর যে কোন আবেদন সরাসরি গ্রহণ করতে পারেন । তাছাড়া রাজ্য কমিশনের নথী তলব করে উপযুক্ত আদেশ দিতে পারেন ।

সর্বোচ্চ আদালতে আপীল -

**২৩ ধারা ঃ-** জাতীয় কমিশনের আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা যাবে সুপ্রীম কোর্টে।

শাস্তি -

**২৭ ধারা ঃ-** ভোক্তা আদালতের নির্দেশ অমান্য করলে তিনবছর পর্যন্ত জেল এবং দু'হাজার টাকা জরিমানা হতে পারে। এই উদ্দেশ্যে ভোক্তা আদালতের থাকবে প্রথম শ্রেণীর বিচার বিভাগীয় ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা ।

## ভারতীয় দন্ডবিধি অনুসারে জনগনের স্বাস্থ্য , নিরাপত্তা , সুবিধা , শিষ্টতা ও সদাচার বিরুদ্ধ ঘটানো অপরাধ বিষয়ক আইন

**১৬৮ ধারা** - সার্বজনিক উপদ্রব (Public nuisance) কোন ব্যক্তি সার্বজনিক উপদ্রব (Public nuisance) করার দোষে দোষী হবে , যদি সেই ব্যক্তি , এমন কোন কাজ করে বা এমন কোন কাজ করতে বেআইনী ত্রুটি (omission) করে যে তা জনসাধারণের বা সাধারণভাবে ঐ এলাকার কাছাকাছি বসবাসকারী বা সম্পত্তি ভোগদখলকারী প্রজাদের ক্ষতি (injury) বিপদ (danger) বা বিরক্তি (annoyance) ঘটায় , যা নাকি এমনই যে তা কোন সার্বজনিক অধিকার (Public right) ভোগকারী ব্যক্তিদের অবশ্যম্ভাবিরূপে (necessarily) ক্ষতি (injury) বাধা (obstruc-

tion) বিপদ (danger) বা বিরক্তি (annoyance) ঘটাবেই ।

সার্বজনিক উপদ্রব কিছু সুযোগ সুবিধা ঘটালেও সার্বজনিক উপদ্রবের দায় থেকে অব্যহতি পাওয়া যায় না ।

**।। আলোচনা ।।**

সার্বজনিক উপদ্রব বা public nuisance হতে গেলে এমন কোন কাজ করে থাকতে হবে বা এমন কোন কোন আইনানুগ কর্তব্য থেকে সরে আসতে হবে যা সাধারণভাবে জনসাধারণের অনিষ্ট , বিপদ , বাধা বা বিরক্তি ঘটাবে এবং এরূপ কাজ বা কাগজে ত্রুটি (omission) করার মাধ্যমে কিছু সুযোগ সুবিধা ঘটলেও Public nuisance এর দায় থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না ।

উদাহরণ দিয়ে বিষয়টিকে যুক্তি বুঝা যাক্ ।

A এর জনবসতি এলাকায় একটি দুগ্ধ ব্যবসায় আরম্ভ এবং এর জন্য বেশ কিছু গরু , মোষ , পালন শুরু করলো । গরু , মোষ পালন করতে গিয়ে এলাকার আবহাওয়া গরু মোষের পরিত্যক্ত বস্তুতে দুষিত হয়ে উঠলো যেটা নাকি সাধারণভাবে ঐ এলাকার জনসাধারণের স্বাস্থের পক্ষে বিপদ ঘটালো ।

এক্ষেত্রে , যদিও ঐ এলাকার জনসাধারণ দুধের যোগান বেশী করে পেতে লাগলো অর্থাৎ ঐ দুগ্ধ ব্যবসায় তাদের কিছু সুবিধা ঘটালো তবুও A সার্বজনিক উপদ্রব বা Public muisance এর দায়ে দায়ী হবে ।

**২৬৯ ধারা** - যে অসর্তক কাজে সম্ভবত ঃ জীবনের পক্ষে বিপজ্জনক রোগ ছড়ায় , তা করলে (Negligent act likey to spread infection of disease dangerous to life ) কেউ ,- কোন কাজ যা জীবনের পক্ষে বিপজ্জনক (dangerous) রোগ সম্ভবতঃ ছড়ায় এবং যে কাজ সে জানে বা যে কাজের সম্বন্ধে তার বিশ্বাস করার মত কারণ থাকে যে তা জীবনের পক্ষে বিপজ্জনক রোগ সম্ভবতঃ ছড়াতে পারে সেই কাজ বেআইনীভাবে বা অসর্তকভাবে (negligently) করলে অনধিক ছ'মাসের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ডে , বা অর্থদন্ডে বা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডিত হবে ।

* (ধর্তব্য ও জামিনযোগ্য অপরাধ)

**২৭০ ধারা** - যে বিদ্বেষপূর্ণ কাজ সম্ভবতঃ জীবনের পক্ষে বিপজ্জনক রোগ ছড়ায় , তা করলে (Malignant act likely to spread infection of disease dangerous to life ) কেউ - কোন কাজ যা জীবনের পক্ষে বিপজ্জনক রোগ সম্ভবত ঃ ছড়ায় এবং যে কাজ সে জানে বা যে কাজের সম্বন্ধে তার বিশ্বাস করার মত কারণ থাকে যে তা জীবনের পক্ষে বিপজ্জনক রোগ সম্ভবতঃ ছড়াতে পারে , সেই কাজ বিদ্বেষপূর্ণভাবে (mailgnantly) করলে , অনধিক দু'বছরের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ডে বা অর্থদন্ডে বা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডিত হবে ।

* (ধর্তব্য ও জামিনযোগ্য অপরাধ)

**২৭১ ধারা** - সংসর্গরোধ বিধি নিয়ম - অমান্য করলে (Disobedience to quarantine rule) কোন জলযানকে vessel- কে সংসর্গরোধ অবস্থায় রাখতে , অথবা

তীর বা অপর জলযানকে সাথে, সংসর্গরোধ অবস্থায় থাকা জলযানাদির যোগাযোগ ( inter-course) নিয়ন্ত্রণ করতে , অথবা যে স্থানে সংক্রমক রোগের ( infectious disease) এর প্রাদুভার্ব দেখা দিয়েছে সেই স্থানের সাথে অপর স্থানের যোগাযোগ করতে সরকার যে বিধি নিয়ম ( rule) তৈরী করে জারি ( promulgate) করেছেন ,

কেউ - সেই বিধি নিয়ম জেনেশুনে (Knowledge) অমান্য করলে , অনধিক ছ মাসের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ডে , বা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডিত হবে ।

* (অধর্তব্য ও জামিনযোগ্য অপরাধ)

**।। আলোচনা ।।**

সংসর্গবোধ (quarantine) বলতে কি বুঝায় তা আমাদের বুঝা দরকার । ' সংসর্গরোধ শব্দের অর্থ হল এমন অবস্থা যা রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য জাহাজ , মানুষ বা প্রাণীকে বাধ্যতামূলকভাবে পৃথক করে রাখে বা আটক করে রাখে।

**২৭২ ধারা** - বিক্রি করা হবে এমন খাদ্য বা পানীয়তে ভেজাল দিলে (adulteration of food drink intended for sale) কেউ, খাদ্য বা পানীয় সামগ্রী খাদ্য বা পানীয় হিসাবে বিক্রি করার উদ্দেশ্যে বা সম্ভবত ঃ খাদ্য বা পানীয় হিসাবে বিক্রি হয়ে যাবে এরূপ জেনে ঐ খাদ্য বা পানীয় সামগ্রীতে ভেজাল দিয়ে তা অস্বাস্থ্যকর (noxious) করে তুললে * অনধিক ছ'মাসের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ডে বা অনধিক এক হাজার টাকা অর্থদন্ডে , বা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডিত হবে ) ।

* (অধর্তব্য ও জামিনযোগ্য অপরাধ)

**পশ্চিমবঙ্গ সংশোধন ঃ**

এই ধারাটি ১৯৭৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ সংশোধন আইনের (১৯৭৩ সালের ৪২ নং আইনে ) সংশোধিয় হয়েছে এবং সেই সংশোধন ২৯ - ৪- ১৯৭৩ থেকে কার্যকর হয়েছে ।

সংশোধনটি অনুসারে - পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এই ধারার অপরাধে দন্ডের বিধানটি নিম্নরূপ হবেঃ

* (অর্থদন্ড সহ বা ছাড়া যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত হবে ঃ শর্ত থাকে যে , আদালত যথেষ্ঠ এবং বিশেষ কারণ রায়ে উল্লেখ করে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে কম কারাদন্ডে দিতে পারেন ।

২৭৩ ধারা - অস্বাস্থ্যকর খাদ্য বা পানীয় বিক্রি করলে (Sale of noxious food or drink ) কেউ , যে খাদ্য বা পানীয় সামগ্রী অস্বাস্থ্যকর করে তোলা হয়েছে বা অস্বাস্থ্যকর হয়ে গেছে, অথবা যে সামগ্রী আর খাদ্য বা পানীয় হিসাবে ব্যবহারের উপযুক্ত নয় , সেই খাদ্য বা পানীয় সামগ্রী

অস্বাস্থ্যকর জেনেও বা তা বিশ্বাস করার কারণ থাকা সত্ত্বেও, তা খাদ্য বা পানীয় হিসাবে বিক্রি করলে বিক্রির করলে বা প্রস্তাব দিলে বা বিক্রির জন্য প্রদর্শন (expose) করলে, * (অনধিক ছ'মাসের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ডে বা অনধিক এক হাজার টাকা অর্থদন্ডে বা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডিত হবে।

* (অধর্তব্য ও জামিনযোগ্য অপরাধ)

**পশ্চিমবঙ্গ সংশোধন ঃ**

এই ধারাটি ১৯৭৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ সংশোধন আইনের (১৯৭৩ সালের ৪২ নং আইনে) সংশোদিত হয়েছে এবং সেই সংশোধন ২৯-৪-১৯৭৩ থেকে কার্যকর হয়েছে।

সংশোধন অনুসারে - পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এই ধারার অপরাধে দন্ডের বিধানটি নিম্নরূপ হবে ঃ

* (অর্থদন্ড সহ বা ছাড়া যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত হবে ঃ শর্ত থাকে যে আদালত যথেষ্ট এবং বিশেষ কারণ রায়ে উল্লেখ করে যাবজ্জীবন কারাদন্ডের কম কারাদন্ডে দিতে পারেন।

**২৭৪ ধারা** - ঔষধে ভেজাল দিলে (Adulteration of drugs) কেউ কোন ঔষধে (drug or medical preparation এ) যদি এরূপভাবে ভেজাল দেয় যাতে ঐ ঔষধের গুণ (efficacy) কমে যায় বা ঔষধের কার্যকারিতা পরিবর্তন হয়ে যায়, অথবা অস্বাস্থ্যকর হয়ে যায়, এবং এর পেছনে তার যদি উদ্দেশ্য থাকে যে ঐ ভেজাল ঔষধ হিসাবেই কোন চিকিৎসার জন্য বিক্রি বা ব্যবহার হবে, অথবা তার যদি জানা থাকে যে ঐ ভেজাল ঔষধ নির্ভেজাল / খাঁটি ঔষধ হিসাবেই কোন চিকিৎসার জন্য সম্ভবতঃ বিক্রি হয়ে যাবে বা ব্যবহার হবে, তরে তার * (অনধিক ছ মাসের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ড, বা অর্থদন্ড, বা উভয়বিধ দন্ড হবে)

* (অধর্তব্য ও জামিনযোগ্য অপরাধ)

**পশ্চিমবঙ্গ সংশোধন ঃ**

এই ধারাটি ১৯৭৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ সংশোধন আইনে (১৯৭৩ সালের ৪২ নং আইনে) সংশোধিত হয়েছে এবং সেই সংশোধন ২৯ - ৪ - ১৯৭৩ থেকে কার্যকর হয়েছে।

সংশোধন অনুসারে - পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এই ধারাটি অপরাধে দন্ডের বিধানটি নিম্নরূপ হবেঃ

* (অর্থদন্ড সহ বা ছাড়া যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত হবে ঃ শর্ত থাকে যে আদালত যথেষ্ঠ এবং বিশেষ কারণ রায়ে উল্লেখ করে যাবজ্জীবন কারাদন্ডের কম কারাদন্ড দিতে পারেন।

**২৭৫ ধারা** - ভেজল ঔষধ বিক্রি করলে (Sale of adulterated drugs) কোন ঔষধে ভেজাল দিয়ে তার গুণ (efficacy) কমানো হয়েছে, অথবা, তার কার্যকারিতা পরিবর্তন করা হয়েছে, অথবা তাকে অস্বাস্থ্যকর (Noxious) করে তোলা হয়েছে এরূপ জেনেও, কেউ - সেই ঔষধ কোন চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করতে নির্ভেজাল / খাঁটি ঔষধ হিসাবে বিক্রি করলে, বা বিক্রির প্রস্তাব দিলে বা প্রদর্শন করলে, অথবা কোন ঔষধালয় (dispensary) থেকে চিকিৎসার

কারণে ব্যবহার করতে দিলে অথবা ঐ ঔষধ ভেজাল বলে যে ব্যক্তি জানে না সেরূপ কোন ব্যক্তিকে চিকিৎসার কারণে তা ব্যবহার করতে দিলে , *(অনধিক ছমাসের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ডে , বা অনধিক এক হাজার টাকা অর্থদন্ডে , বা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডিত হবে )।

* (অধর্তব্য ও জামিনযোগ্য অপরাধ)

**২৭৬ ধারা** - কোন এক প্রকারের ঔষধ অন্য প্রকারের ঔষধ বলে বিক্রি করলে (Sale of drug as a different drug or preparation) কেউ জেনেশুনে কোন এক প্রকারের ঔষধকে (drug a medical preparation কে )অন্য প্রকারের ঔষধ বলে , কোন চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করতে বিক্রি করলে অথবা , বিক্রির প্রস্তাব দিলে বা বিক্রির জন্য প্রদর্শন করলে , অথবা কোন ঔষধালয় (dispensary) থেকে কোন চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করতে দিলে * (অনধিক ছ মাসের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ডে , বা অনধিক এক হাজার টাকা অর্থদন্ডে , বা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডিত হবে।

**পশ্চিমবঙ্গ সংশোধন ঃ**

এই ধারাটি ১৯৭৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ সংশোধন আইনে (১৯৭৩ সালের ৪ ২নং আইনে) সংশোধিত হয়েছে এবং সেই সংশোধন ২৯-৪-১৯৭৩ থেকে কার্যকর হয়েছে ।

সংশোধন অনুসারে - পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এই ধারার অপরাধে দন্ডের বিধানটি নিম্নরূপ হবেঃ

* (অর্থদন্ড সহ বা ছাড়া যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত হবে ঃ শর্ত থাকে যে , আদালত যথেষ্ঠ এবং বিশেষ কারণ রায়ে উল্লেখ করে যাবজ্জীবন কারাদন্ডের কম কারাদন্ড দিতে পারেন )।

**২৭৭ ধারা** - সর্বসাধারণের ঝর্না বা জলাশয় দূষিত করলে (Fouling water of public spring or reservoir) সর্বসাধারণের ঝর্না বা পুকুরের জল (Water of public spring or reservoir) সাধারণতঃ যে উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় , সেই উদ্দেশ্যের পক্ষে অনুপযুক্ত করে তুলতে , কেউ ঐ ঝর্না বা পুকুরের জল স্বেচ্ছাকৃতভাবে / স্বেচ্ছায় (Voluntarily) দূষিত করলে , অনধিক তিন মাসের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ডে , বা অনধিক পাঁচশ টাকা অর্থদন্ডে , বা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডিত হবে ।

* (ধর্তব্য ও জামিনযোগ্য অপরাধ)

**২৭৮ ধারা** - স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারণ আবহাওয়া তৈরী করলে (making atmosphere noxious to helth কেউ, স্বেচ্ছাকৃতভাবে (Voluntarily) কোন স্থানের আবহাওয়া (atmosphere) দূষিত করে সেই স্থানের কাছাকাছি বসবাস করছেন বা ব্যবসায় করছেন এমন ব্যক্তিদের বা সেই স্থানের কাছাকাছি কোন সর্বসাধারণের রাস্তায় (public way তে) চলাকলকারী ব্যক্তিদের পক্ষে ঐ আবহাওয়া (atmosphere) অস্বাস্থ্যকর করে তুললে , অনধিক পাঁচশ টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত হবে ।

* (অধর্তব্য ও জামিনযোগ্য অপরাধ)

**শিশু শ্রমিক ও শিশু সমস্যা - একটি সমীক্ষা ঃ-**

আমাদের দেশে শিশু শ্রমিক অর্থাৎ কম মজুরিতে অধিক খাটুনি ও বেশী মুনাফা লাভ । শিশু শ্রমিক মানে নির্মমতা নিত্য সঙ্গী ও বৈষম্যতো স্বাভাবিক । যদি ও বিশ্বব্যাপী শিশু শ্রমিক পাওয়া যাবে। বেসরকারী প্রতিষ্ঠান , কারখানা , হোটেল , রেস্তোরা এমনকি ঘর গেরস্থলির কাজ ।তারা নায্য মজুরী থেকে বঞ্চিত ।তার উপর আরো একটি বৈষম্য হচ্ছে শিশুকন্যা ।শিশু শ্রমিকের মজুরী যেমন বেশী দিতে হয় না , এমনকি এরা প্রতিবাদ ও করতে পারে না । আইন বুঝে না , জানে না বলে দর কষাকষি ও করতে পারে না । যে কোন ব্যক্তির সহকারী হিসেবে কাজ করে , এবং নামমাত্র মজুরিতে দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করতে অরাজী হয় না । এরা সংঘবদ্ধভাবে আন্দোলন ও করে না ।

১৯৮১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী ২৬৩ মিলিয়ন শিশু যারা ১৪ বছরের নীচে তারাই এ দেশের সমগ্র জনসংখ্যার ৩৯.৫ শতাংশ এবং এদের মধ্যে ১১.২ মিলিয়ন শিশুকে মুল শ্রমিক ও ২.৫ মিলিয়ন শিশুকে প্রান্তিক শ্রমিক হিসাবে গণ্য করা হয় । ১৯৮১ আদমসুমারী অনুযায়ী মুল শ্রমিক শিশুকন্যার হার ৮.৩৫ এবং শিশুপুত্রের হার ৪.১৭ মুল শ্রমিক তারাই যারা পূর্ণ অর্থনৈতিক কাজে যুক্ত আর যারা আংশিক কাজ করে তারা প্রান্তিক শ্রমিক হিসাবে গণ্য হয়েছে । বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে শিশুপুত্রের তুলনায় শিশুকন্যারা শ্রমের ক্ষেত্রে বেশী অংশ গ্রহণ করছে গৃহে বা মায়েদের সাথে যে শ্রম শিশুকন্যারা দেয় তা শ্রম হিসাবে গৃহীত হয় না। ইট ভাটা , নির্মাণ কাজ , পাথর ভাঙ্গা ইত্যাদি কাজে মায়েদের সাথে শিশুকন্যাদের হাতবাড়াতে দেখা যায় ।

সামাজিক দিক থেকে ও দেখা যায় শিশু কন্যা ও পুত্রের মধ্যে বৈষম্যতার দরুন শিশুকন্যা অধিক শ্রম করিয়া ও শিশুপুত্র হইতে কম মজুরী পায় । ১৯৭১ - ৮১ সালের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে শিশুপুত্রের তুলনায় শিশুকন্যা আনুপাতিক ভাবে বেশী শ্রমিক হিসাবে নিয়োজিত হয়েছে । পুত্রসন্তানকে বিদ্যালয়ে পাঠাবার প্রবণতা বাড়ছে গৃহস্থালীর কাজে শিশুকন্যা নিযুক্তির প্রবণতা বেশী এ এক সামাজিক বৈষম্য ও শোষনের উদাহরণ । ছোটবেলা থেকেই মেয়েরা সামাজিক কারণে ঘরে গৃহস্থালীর কাজে পটু হয়ে উঠে তা সত্বে ও শিশুকন্যা সামাজিক বৈষম্যের শিকার হয় ।

সমাজের দুর্বলতম অংশের দরিদ্র পরিবারের শিশুরা বাঁচার তাগিদে ,হোটেল চায়ের দোকান, রেষ্টুরেন্ট , মিষ্টির দোকান , মোটর গ্যারেজ ইত্যাদিতে কাজ নেয় । অনেক ক্ষেত্রেই এই শিশুরা ১০ থেকে ১২ ঘন্টা শ্রমদান করে বিনিময়ে মুজরীবিহীন হয়ত মাথা গোঁজার ঠাই আর দু বেলা খাবার তাদের ভাগ্যে জোটে ।

৮১ সালের আদমসুমারীতে দেখা যায় শিশুদের দিয়ে অনেকস্থানে ১৪-১৫ ঘন্টা কাজ করানো হয় , ফলত শিশু বয়সেই তারা নানা ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে তবুও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের কারণে এদের কাজ করতে হয় ।

শিশু শ্রমিক আইন নিষিদ্ধকরণ / নিয়ন্ত্রণ) ১৯৮৬ অনুযায়ী কিছু কিছু ক্ষেত্রে শিশুদের কাজে নিয়োগে নিষেধজ্ঞা জারি করা হয়েছে এবং অন্যান্য কিছু ক্ষেত্রে তাদের নিয়োগ কিছু নিয়ন্ত্রণ আছে, আইন শুধু স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তাই শুধু নয়, কাজের সময় নির্ধারন, বয়স নির্ধারণ এবং অন্যান্য তথ্য ও রাখার ব্যবস্থা করা হবে।

১৯৪২ এ রাষ্ট্রসংঘ জেনেভাসনদে শিশুদের অধিকার ঘোষণা করেন। এই ঘোষনায় বলা হয় যে শিশুরা যাতে শৈশবে সবচেয়ে সুখী জীবন যাপন করে তা নিশ্চয় করতে হবে, এবং ভবিষ্যৎ জীবনকে সুন্দরতর করার প্রয়োজনে তাকে স্বাভাবিক অধিকার ও স্বাধীনতা দিতে হবে। এই উদ্দেশ্যে দশটি নীতি গৃহীত হয়। শিশুদের শ্রম সংক্রান্ত ৯ নম্বর ঘোষিত নীতি শ্রম সংক্রান্ত ৯ নম্বর ঘোষিত নীতি হল শিশুদের সমস্ত রকম অবহেলা পীড়ন এবং শোষণ থেকে রক্ষা করতে হবে। শিশুদের বিপদগামী করা যাবে না, তার শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয় এমন কোনও কাজে বা জীবিকায় সে যুক্ত হবে না, ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমাদের দেশের মোট জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ অধিকার করে আছে শিশুরা ১৯৮১ সালের লোকগননা অনুসারে দেশের মোট ৬৮.৩ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে ৬ বছরের কম বয়সের শিশুর সংখ্যা ১১.৬ কোটি। গত ১৮ বছরে স্বাভাবিকভাবেই সংখ্যাটি বেড়েছে। জনসংখ্যার অনুপাতে কিন্তু তারপরে ও শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, শ্রম নানান সমস্যায় আমাদের শিশুসমাজ জর্জরিত। ফলস্বরূপ শিশুমৃত্যু, শিশুশ্রমিক, নিরক্ষরতা শিশু অপরাধ অসংখ্য সমস্যা তৈরী হয়েছে। পারিবারিক, সামাজিক জীবন থেকে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যালোচনা করলেই চিত্রখানি পরিষ্কার হয়ে যাবে।

শিশু পরিবারে আনন্দের প্রতীক, কিন্তু শিশু যেন শৈশবের আনন্দ থেকে বঞ্চিত না হয়। রাষ্ট্রীয় জীবনে ও যেন অবহেলিত, নির্যাতিত না হয়, আমাদের দেশে এখনো ২৫ শতাংশ মানুষ দারিদ্রসীমার নীচে বাস করে যে কারণে শিশুদের প্রতি দায়িত্ব ও সঠিক ভাবে পালন করা সম্ভব হয়ে উঠে না পেটের তাগিদে শিশুকে বড়দের সাথে শ্রমে নিযুক্ত হতে হয় ফলে শৈশবেই শিশু পরিণত হয় শিশুশ্রমিকে। কৃষি শিল্পসহ নানাকাজে লক্ষ লক্ষ শিশু নিয়োজিত, দারিদ্রপীড়িত পরিবারের মোট আয়ের ৩০ শতাংশ উপার্জন করছে শিশুরা। আমাদের সংবিধানের ২৪ নং অনুচ্ছেদে স্পষ্ট বলা হয়েছে ১৪ বছরের নীচে কোন শিশুকে কারখানা বা খনির কোন শিশুকে কাজে লাগানো যাবে না। শিশুদের কোন কঠোর পরিশ্রমের কাজে লাগানো যাবে না। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় বালক বালিকা উভয় শিশু শ্রমিক নিঃশব্দে খনিতে, রাসায়নিক কারখানায় কাজ করে চলছে। উদরপূর্তি ও অর্থপ্রাপ্তির আশায়। আর এই হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের ফলে অকালেই ঝড়ে পড়ছে শিশুফুলগুলি। অনেকক্ষেত্রে শিশুকে দাস শ্রমিক হিসাবে ও শ্রমে বাধ্য করা হচ্ছে। ভারতে প্রতি হাজারে ১৯৯ জন শিশু প্রতি

বছর প্রাণহারায় । অথচ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করলে মৃত্যুর সিংহভাগই রোধ করা সম্ভব । চিকিৎসার অভাবে অপুষ্টিজনিত রোগে বিকলাঙ্গ অন্ধশিশুরা পৃথিবীর সৌন্দয্য উপভোগ থেকে বঞ্চিত । পুত্রসন্তানের আকাঙ্খার জন্য কন্যা সন্তানকে বলি চড়ানোর দৃষ্টান্ত ও ভারতে বিরল নয় । অন্ধ কুসংস্কার ভ্রুন হত্যার মাধ্যমে পৃথিবীর আলো দেখা থেকে বঞ্চিত করা , বাল্য বিবাহ , সরকারী নিয়মের তোয়াক্কা না করেই এসব ঘটনা ঘটছে। আমাদের প্রয়োজন সামাজিক সচেতনতার ষ্টেট অব দা ওয়ার্ল্ডস চিলড্রেন -১৯৮৭ শীর্ষক ইউনিসেফ রিপোর্ট। ভারতে শিশুদের স্বাস্থ্য সমীক্ষায় ইউনিসেফের আঞ্চলিক ডাইরেক্টর ডেভিড স্মিথ বলেছেন ভারতের প্রকৃত পক্ষে অজ্ঞানতা রোগের প্রাদুর্ভাব খাদ্যের চাইতে ও মারাত্মক আকার ধারণ করেছে।

একটি শিশুর সার্বিক বিকাশের ক্ষেত্রে শিক্ষার স্থান সব চাইতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য । অথচ ভারতবর্ষের বিরাট অংশের শিশুরা শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত । বিদ্যালয়ের অপ্রতুলতা প্রাণহীন শিক্ষাপদ্ধতি মানবিকতাশূন্য শাসন ও অর্থনৈতিক ক্ষমতাহীন শিশুদের পক্ষে গ্রহনের ক্ষেত্রে অন্তরায় । অথচ স্বাধীন ভারতের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা যারা করিছিলেন তাদের দৃষ্টি তে শিক্ষা ছিল এক শানিত তরবারি যা দরিদ্র , অত্যাচারিত ও পিছিয়ে পড়া মানুষদের অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসবে । কিন্তু বাস্তবের রণভূমিতে দাঁড়িয়ে শিক্ষা শিশুদের কাছে আজও আন্তরিক ভাবে গ্রহনীয় ও কার্যকরী হতে পারে নি । যে সমস্ত শিশু একদা বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হয়ে মাঝপথে স্কুল ছাড়তে বাধ্য হয় সেই সব শিশুদের (শতকরা ৬- ভাগ) কাছ থেকে জানা যায় আর্থিক অনটন , অভাব স্কুল ছাড়ার প্রধান কারণ । যদিও ভারতের সবকটি রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষাকে সরকারী তরফে অবৈতনিক করা হয়েছেতবু ও বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীরা সংখ্যার কম হওয়ার কারণে খুঁজে বের করা শক্ত নয়। শহর এবং গ্রামে যে সব শিশু শ্রমিক তার শ্রমের বদলে প্রয়োজনীয় অর্থ পরিবারকে যোগায় , সেখানে তাকে কাজ থেকে বার করে বা তার জন্য নির্দিষ্ট ঘরের কাজ বন্ধ করে বিদ্যালয়ে পাঠানো গরীব পিতামাতার পক্ষে সম্ভব হয় না । এছাড়াও নিরস পুঁথি সর্বস্ব মাথাভারী শিক্ষাপদ্ধতি বহু শিশুর পড়াশুনার প্রতি অনাগ্রহের অন্যতম কারণ । শিক্ষক ও শিক্ষা বস্তুর ব্যর্থতাই শিশুকে প্ররোচিত করে বিদ্যালয়ে না যেতে । শিক্ষক , পাঠ্য বিষয়বস্তু ও পরিবেশ ছাত্র ছাত্রীদের মনে পঠন পাঠন ভীতি তৈরী করে । শিক্ষক যেখানে শাসকের ভূমিকায় এবং শিশু শিক্ষার্থী যেখানে শোসিত , সেখানে শিক্ষক সম্পর্কে শিশুমনে থাকে ভীতি , থাকে না আন্তরিক ভালবাসার সম্পর্ক । নিস্প্রান বিষয়বস্তু , গতানুগতিক উপস্থাপন। পদ্ধতি শিক্ষকের রক্তচক্ষু চার দেওয়ালে ঘেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিশুদের স্বাভাবিক বিকাশের পক্ষে প্রতিবন্ধক স্বরূপ । ফলে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে শিশুরা বিদ্যালয়কে নিজ গৃহভাবতে পারে না । আবার বহু ক্ষেত্রে অনুন্নত ও দুর্গম অঞ্চলে বিদ্যালয় না থাকায় অথবা বহুদুরে বিদ্যালয় থাকার শতকরা ৩০ ভাগ ভারতীয় শিশুর পক্ষে জীবনে বিদ্যালয় কি বিষয় জানার সুযোগ হয় না ।

উপরিউক্ত প্রধান সমস্যাগুলি ছাড়াও শিশুহত্যা ও নির্যাতন , হারানো শিশু পাচার ও বিক্রি এবং শিশু অপরাধের ঘটনা ক্রমশ বাড়ছে যেগুলি ভারতের শিশু সমস্যার অন্যতম অন্ধকার দিক । সামাজিক বৈষম্য ও কুসংস্কার প্রভৃতি কারণে শিশু বিশেষত শিশু কন্যা হত্যা বা বলি দেওয়ার ঘটনা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশেই ঘটে থাকে শিশু অপরাধীদের উপর অমানবিক নির্যাতন অপহৃত শিশুর শরীরের অংশ কেটে নিয়ে গোপন ব্যবসার ফলাও কারবার সারা পৃথিবী জুড়েই চলছে । বিভিন্ন উদ্দেশ্যে সংগঠিত বা অসংগঠিত ভাবে শিশু চুরি ও পাচার বাড়ছে। শিশুদের প্রতি নির্যাতনের নানান বিকৃত রূপ প্রতিদিন প্রকট আকার ধারন করছে । শিশুরা যেমন জৈবিক লালসার শিকার হচ্ছে তেমনি কন্যা শিশুদের বলপূর্বক পতিতাবৃত্তির কাজেও লাগানো হচ্ছে । শিশু ধর্ষনের মত জগন্য ঘটনা ও সমাজে ক্রমশ বাড়ছে ।

স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে প্রত্যেকটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে নানা ভাবে অর্থনৈতিক সামাজিক উন্নয়নের ভিত্তিতে সাধারন মানুষের সার্বিক উন্নতির চেষ্টা করা হচ্ছে । মা ও শিশুর সার্বিক বিকাশ অন্যান্য গুরুত্বপুর্ণ বিষয়ের সঙ্গে সব সময়ই অল্প বিবেচনা করা হয়েছে । নানা সমীক্ষার মাধ্যমে উপলব্দি করা গেছে যে , মাও শিশুর কল্যানার্থে বিভিন্ন সময়ে অনুসৃত শিক্ষা , স্বাস্থ্য , পুষ্টি প্রকল্প সমূহকে যদি একত্রিক করা যায় এবং শিশুর মৌল প্রয়োজন গুলি যদি শিশুর কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় তবেই ভারতের শিশু সমস্যার সমাধান সম্ভব । বলা বাহুল্য শিশুর সঙ্গে মাকে ও প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসতে হবে কেননা গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়ের সঠিক পরিচর্যার উপর দাঁড়িয়ে থাকবে আগামী দিনের সুস্থ সবল ও পুষ্ঠ শিশু । তাই প্ল্যানিং কমিশন শিশু বিকাশের বিভিন্ন কর্মসূচী গুলির মধ্যে সংহতি স্থাপনের প্রস্তাব রাখেন এবং পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকারের সমাজ কল্যাণ মন্ত্রকের পরিচালনার প্রথম ১৯৭৫ সালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের ৩৩ টি ব্লকে পরীক্ষামূলক ভাবে সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা চালু হয় । যে কটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে এই প্রকল্প রচিত হল তা হল (ক) ৬ বছরের নীচে শিশুর স্বাস্থ্য ও পুষ্টির মান উন্নত করা । (খ) শিশুর শারিরিক , মানসিক ও সামাজিক বিকাশের ভিত্তি স্থাপন । (গ) শিশুমৃত্যু , শিশুরোগের প্রাদুভার্ব , অপুষ্টি এবং বিদ্যালয় পরিত্যাগের হার কমানো (ঘ) শিশু বিকাশের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগ গুলির মধ্যে সংযোগ স্থাপন । (ঙ) স্বাস্থ্য ও পুষ্টি শিক্ষার মাধ্যমে শিশু ও পরিবারের সুস্বাস্থ্য সম্পর্কে মাকে সচেতন করা । অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্রেই হবে এই প্রকল্প রূপায়নের মূল কেন্দ্র বিন্দু ।

শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প ও অন্যান্য পরিকল্পনা সত্ত্বে ও আজও ভারতের শিশু সমস্যার সার্বিক সমাধান সম্ভব হয়নি । আজও ভারতের বহু শিশু গৃহহীন , অভিভাবক হীন অবস্থার অসহায় ভাবে পথে দিন কাটাচ্ছে। মানব সম্পদের এই বিপুল অপচয় দূর করতে আমাদের সকলকে সচেতন হতে হবে ।

শিশুর জীবনে অজস্র অভিশাপ - অশিক্ষা কুশিক্ষা , দুঃখ দৈন্য আর অসহনীয় শ্রমভারের পীড়া। যে বয়সে মায়ের অঞ্চলনিধি হয়ে আদরে সোহাগে বেড়ে ওঠার কথা , সেই বয়সে ওদের কাজে নামতে হয় । বুদ্ধিজীবী উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের প্রকৃতি হল - অপরের শ্রমের বিনিময়ে নিজে সুখে থাকা । পারিশ্রমিকের বিনিময়ে তাই শ্রমজীবী মানুষকে তারা অনেকটা ক্রীতদাসরূপে ব্যবহার করছে । ক্রমে ক্রমে তারা দুঃস্থ অনাথ শিশুদের দিকে দৃস্টি দিল । দরিদ্র পরিবারের এই অজস্র শিশু একমুঠো অন্নের জন্য দুয়ারে দুয়ারে ধরনা দেয় । ভিক্ষাপাত্র হাতে হাটে, মাঠে , বাটে ঘোরে । শিশুদের এই দুর্ভাগ্য কবলিত অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে মালিকমনিব গৃহস্বামীরা স্বল্প বা বিনা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে এদের নিযুক্তি করেন নিজেদের কাজে । শিশুরা অবুঝ অবোধ। প্রতিবাদের ভাষা ওদের অজানা । তাই কায়িক শ্রমের কাজে ওদের নিযুক্ত করলে ইচ্ছামত খাটানো যায় । তা ছাড়া বয়সের বিচারে ওদের পারিশ্রমিকও যৎকিঞ্চিৎই দিতে হয় । এতএব শ্রমের কাজে শিশু শ্রমিক একেবারে সোনায় সোহাগা । উচ্চমধ্যবিত্ত মালিক মনিবের এই মানসিকতাই সুদীর্ঘকাল থেকে সারা বিশ্বে কোটি কোটি শিশু শ্রমিকের জন্ম দিয়েছে ।

আমাদের দেশে শিল্প ব্যবস্থা গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে শিশু শ্রমিক প্রথাও গড়ে উঠেছে । বৃটিশ শাসনকালে গঠিত রয়াল কমিশনের রিপোর্ট জানা গিয়েছিল যে , আমাদের দেশে শিশুদের অভ্র কারখানা , কার্পেট শিল্প, বিড়ি শিল্প ইত্যাদি ক্ষেত্রে যথেচ্ছ নিয়োগ করা হয় । তখন এই কাজে শিশুদের নিয়োগ রোধে আইনও প্রণীত হয়েছিল । কিন্তু প্রথাটি রদ করা যায়নি। অনুসন্ধানে জানা গিয়েছিল যে , কলকারখানায় নিযুক্ত শ্রমিকের শতকরা কুড়ি ভাগ (২০ %) হচ্ছে শিশু , আর তাদের বয়স ১০ থেকে ১৫ বছর । আর্ন্তজাতিক শ্রম সংস্থা (International Labour Organisation) এর হিসাবে জানা গিয়েছিল যে , ১৯৭৫ সালে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ১৫.১ মিলিয়ন । ১৯৮৩ সালে প্ল্যানিং কমিশনের হিসাব মতো শিশু শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ১৭.৩৬ মিলিয়ন । এর মধ্যে শতকরা ৯০ % শিশু শ্রমিক আমদানি হয়েছিল অন্ধ্রপ্রদেশ , মধ্যপ্রদেশ , উত্তরপ্রদেশ , পশ্চিমবঙ্গ , বিহার , ওড়িশা ও তামিলনাড়ু থেকে কার্পেট শিল্পে ২.৭% শ্রমিক হচ্ছে শিশু । এছাড়া চায়ের দোকান, খাবারের দোকান , বাড়িতে যে সব শিশু কাজ করে তার তা সঠিক হিসাব জানা যায় না ।

১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে ভারত সরকার এই মর্মে আইন পাশ করে যে , কারখানা বা অন্যত্র শিশুদের যেমন খুশি কাজে লাগানো যাবে না , কিন্তু তাতেও শিশু শ্রমিক প্রথার বিলুপ্তি ঘটেনি । বিশেষ করে কার্পেট , বিড়ি , সিমেন্ট ও আতসবাজি তৈরীর কারখানায় । যেসব শিল্পে শিশুশ্রমিক নিয়োগ করা হয়ে থাকে , সেখানেও তাদের কাজের সময় বেঁধে দেওয়া হয় । কিন্তু বেশির ভাগ অসংগঠিত ক্ষেত্রে শিশু শ্রমিক নিয়োগ করা হয় । আর সমস্যা সেখানেই । ১৯৮১ সালের জনগণনা রিপোর্ট জানা যায় যে , শতকরা ৮৬ ভাগ শিশু শ্রমিক কৃষিকাজে নিযুক্তি রয়েছে ।

আমাদের দেশে দারিদ্র্যের কারণে শিশুদের কাজে নেমে পড়তে হয় । আমাদের দেশে অধিকাংশ লোকই দরিদ্র । পিতা- মাতার পক্ষে সন্তানের মুখে দু- মুঠো অন্ন তুলে দেওয়া সম্ভব হয় না তাদের সামান্য উপার্জনে । লেখাপড়া শেখানো তো দূর অস্ত । ফলে শিশুসন্তানকেই তারা কাজে লাগিয়ে দেয় । বিশ্ব ব্যাঙ্কের হিসাব জানা যায় যে , বাবা মার আয় বাড়লেই শিশু শ্রমিকেরহার হার কমে যায় । মায়ের রোজগার শতকরা দশ ভাগ বেড়ে গেলে শতকরা নয় থেকে দশভাগ কন্যাশিশু শ্রমিকের হার কমে যায় । উপার্জন বৃদ্ধি পেলেই বাবা - মা শিশু সন্তানকে বিদ্যালয়ে পাঠায় ।

শিশু শ্রমিক বৃদ্ধির আর একটি কারণ শিক্ষার ব্যয় বৃদ্ধি । শিক্ষার ব্যয় যদি বেশি হয় যা বাবা - মার পক্ষে জোগান সম্ভব না হয় , তা হলে শিশুকে স্কুল ছাড়িয়ে বাড়িতে বসিয়ে রাখা হয় না , কাজে পাঠানো হয় । তাই শিশু শ্রমিকের হার কমাতে শিক্ষার খরচ ও কমানো দরকার । কেরলে শিক্ষাখাতে বাজেটের শতকরা ২৫ % ভাগ বরাদ্দ থাকে । সেকানে অন্যান্য রাজ্যের বরাদ্দ মাত্র ১৭ % ভাগ । ফলে কেরল শিশু শ্রমিকের হার অনেক কম । অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় যে , বহু শিশু স্কুলে পড়ার অবকাশেও কাজ করে তবে তা আংশিক সময়ের জন্য । তাই স্কুলে যাওয়ার ফলে শিশুরা নিকৃষ্ট দরনের কার্জ থেকে অব্যাহতি পায় ।

এদেশে নানা কাজে শিশু শ্রমিকরা নিযুক্ত । বয়স্ক শ্রমিকরা যেখানে অবাঞ্ছিত সেখানে শিশু শ্রমিকরা আদৃত । একমাত্র বৃহদায়তন কলকারখানা বাদ দিলে এমন কোনো শ্রমক্ষেত্র নেই , যেখানে শিশু শ্রমিক নেই । চায়ের দোকান থেকে শুরু করে সবরকম ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে শিশু শ্রমিকরাই দোকান কর্মচারী । মালিক মনিবের গালমন্দ , কিল চড় খাপ্পড় নীরবে হজম করে , আর দুফোঁটা অশ্রুপাত করে এই শিশু শ্রমিকরা অবিশ্রান্ত হুকুম তামিল করছে মালিকদের । কখনো কখনো এদের উপর অত্যাচারের মাত্রা অমানুষিক স্তরেও পৌঁছে যায় । ইটভাটা ও ছোটখাটো কলকারখানায় পাথরভাঙা, যানবাহনের সহকারী রাজমিস্ত্রির যোগান , দিনমজুরি , পরিত্যক্ত বস্তুর কুড়ানে ,চর্মকার ,কর্মকার , কৃষিক্ষেত্র কোথায় না দেখা মিলবে শিশু শ্রমিকের অনাহারে , অর্ধাহারে , বস্ত্রহীন জীর্ণদীর্ণ শিশু শুধুই একমুঠো ভাতের জন্য অমানুষিক পরিশ্রম করে চলেছে দিবারাত্রি। শান্তিহীন , ক্লান্তহীন দেহে ।

শিশু দেশের মহৎ সম্পদ । আজকের শিশু ভবিষ্যতের বিজ্ঞানী ,সাহিত্যিক , রাজনীতিক প্রযুক্তিবিদ্ । দেশের ভার একদিন ন্যস্ত হবে আজকের শিশুদের হাতেই । কিন্তু মুকুল যদি অকালেই ঝরে পড়ে , তা হলে ফল ফুলের আশা করা যায় না। শ্রমের কাজে নিযুক্তি হয়ে ,কত কোটি কোটি শিশুর সম্ভাবনা যে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে তার হিসেব কে রাখে । কে জানে আজ যে শিশুটি চায়ের কাপ নিয়ে ছুটোছুটি করছে , যে শিশুটি কাঁধে বিশাল জঞ্জালের বস্তা নিয়ে অতি কষ্টে পথ চলছে , তার মধ্যেই কোনো জওহরলাল , কোনো নেতাজী , কোনো বিবেকানন্দ আত্মগোপন করে

আছে কি না ? মানব সম্পদের এ এক বিপুল অপচয় । অন্য যত বৈষয়িক সম্পদই থাক না কেন , মানব সম্পদই দেশের প্রকৃত সম্পদ । শিশু শ্রমের নামে মানবসম্পদের যে পরিমাণ অপচয় হচ্ছে , তা দেশকে করছে দুর্বল , করছে নিঃস্ব ।

শ্রমের নামে শিশুদের এই শোষণের কবল থেকে মুক্ত করার জন্য সরকারি বেসরকারি স্তরে নানা আইনকানুন চালু হয়েছে । নানা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এই কু - প্রথার অবসান ঘটাতে কাজ করে চলেছেন । দেশ বিদেশের মানব প্রেমী মানুষ এই হতভাগ্য কচি কাঁচাদের মুখে একটু হাসি ফুটিয়ে তুলতে আত্মনিয়োগ করেচেন । কলকাতা মহানগরীর ফুটপাতে শিশু শ্রমিকদের জন্য পাঠশালা চালাচ্ছেন কোনো কোনো দরদী মানুষ । দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ উপলব্ধি করেছেন শিশু শ্রমিকের অন্তরের বেদনা । তাঁরা সোচ্চার হয়ে উঠেছেন এই ঘৃণ্য শ্রমবৃত্তির বিরুদ্ধে । এটা সত্য যে , দেশের লক্ষ কোটি শিশুকে শ্রমের কারাগার থেকে মুক্ত করতে না পারলে , মানবসম্পদের অপচয় রোধ করা যাবে না ।

আমাদের দেশে শিশু শ্রমিক প্রথাকে আইন করে নিষিদ্ধ করা হয়েছে । কিন্তু এই আইনের কার্যকরী প্রয়োগ এখনও সম্ভব হয়নি । সম্ভব হয়নি , কারণ শুধু আইনি নিষেধাজ্ঞা জারি করেই এই পর্বতপ্রমাণ সামাজিক সমস্যার সমাধান একপ্রকার অসম্ভব। আইনের পাশাপাশি চাই , এই অগণিত শিশু শ্রমিকের পুর্নবাসনের সুষ্ঠ ব্যবস্থা । ওদের সুস্থ জীবনে প্রতিষ্ঠার কার্যকরী পরিকল্পনা । কিন্তু এই প্রশ্নেই আমাদের রাষ্ট্র ও সমাজ এখনও অনেক পিছিয়ে । ফলে আইন কার্যকরী হচ্ছে না , আর শিশু শ্রমিক প্রথা চলেছে অব্যাহত গতিতে ।

শিশুদের এই দুঃসহ শ্রমজীবন থেকে মুক্তি দিতে হলে , রাষ্ট্রকে দৃঢ়সংকল্প নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে । বিভিন্ন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে. শিশু শ্রমিকের পুনর্বাসনের জন্য প্রতি বছর বাজেটে এজন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করতে হবে । বড় বড় শহরে প্রয়োজনীয় সংখ্যক আবাসিক শিশু কল্যাণ কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে । ব্যবস্থা করতে হবে এই দুর্ভাগা শিশুদের শিক্ষার , অন্নবস্ত্রের। যদিও বেসরকারি কিছু সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান এই মহান কাজে সেবার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে এসেছেন, কিন্তু তা সমুদ্রে শিশিরবিন্দুরই মতো । তবুও এগুলো উদ্দীপনর সৃষ্টিকারী দৃষ্টান্ত হিসেবে শ্রদ্ধার যোগ্য । শিশু কল্যাণে নিবেদিতপ্রাণ মাদার টেরিজা এদেশে শিশুমুক্তি জন্য অক্লান্ত কাজ করে যাচ্ছেন তা এককথায় বিস্ময়কর । জানা -অজানা এমন আরও অনেক দেশী বিদেশী মহাপ্রাণ শিশু - শ্রমিক কল্যাণে কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন । দেশের চিত্ত ও বিত্তশালী মানুষ যদি এই বিদেশীদের কাজে অনুপ্রাণিত হয়ে , আরও বেশি সংখ্যক শিশুকল্যাণ আবাসিক কেন্দ্র স্থাপন করেন , তবে এই গুরু সমস্যার ভার ধীরে ধীরে লাঘব হবে । সমাজকল্যাণ পর্ষদ , শিশুকল্যাণ পর্ষদ সরকারের সমাজ কল্যাণ বিভাগ ও শ্রমদপ্তর যদি আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে শিশুদের পুনর্বাসনের কাজকে অগ্রাধিকার

দেন তবে অনেক শ্রমিক শিশু জীবনে মুক্তির স্বাদ খুঁজে পাবে । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে শিশু শ্রমিক আইনের প্রয়োগকেও বাস্তবায়িত করতে হবে । অত্যাচারী ও শোষণকারী মালিক মনিবদের বিরুদ্ধে আইনানুগ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ।

কেন্দ্রীয় সরকারের লক্ষ্য ছিল ২০০০ সালের মধ্যে আমাদের দেশ থেকে শিশু শ্রমিক প্রথা নির্মূল করা । একাজে কতটা সফল হওয়া গেছে, তা জানা দরকার । একেবারে নির্মূল না হলেও তার হার যে অনেক কমে গেছে তা বলাই বাহুল্য । সরকারের উদ্দেশ্য , যেসব শিশু বিদ্যালয় যেতে পারে না তাদের হাতে কলমে কাজ শেখানো , বুনিয়াদে যাতে তারা পেশাগত ব্যাপরে দক্ষ হয়ে জীবিকা অর্জনে সক্ষম হয় । আর সেই সঙ্গে প্রথা - বর্হির্ভূত শিক্ষাদানের উপরও জোর দেওয়া হয়েছে । সাক্ষরতা অভিযানে সাফল্য লক্ষ্যে পৌঁছানো দরকার । ফলিত অর্থনীতি গবেষণায় জানা গেছে যে , শিশু শ্রমিকের হার ১৯৯২ সালে ছিল শতকরা ৩.৬১% ভাগ , সেখানে ১৯৯৪ তা কমে দাঁড়ায় শতকরা ২.৭০ ভাগ । শিশু শ্রমিকের হার কমাতে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে কার্পেট শিল্পের প্রতি , যেখানে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা অনেক বেশি । শিক্ষার প্রসার , বৃত্তিমূলক শিক্ষাদান , দারিদ্র্য দূরীকরণ শিশু শ্রমিক সংখ্যা কমতে সাহায্য করবে নিঃসন্দেহে ।

"সংবাদ মাধ্যম"

" সংবাদমাধ্যমে ও সংবাদপত্র সম্পর্কে
সংগৃহীত তথ্য ভিত্তিক প্রবন্ধ "

ভারতীয় প্রেস

# “সংবাদ মাধ্যম”

# “ সংবাদ মাধ্যমে ও সংবাদপত্র সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্য ভিত্তিক প্রবন্ধ ”

# ভারতীয় প্রেস

**ভারতীয় প্রেস ঃ** - ভারতীয় প্রেস , স্বাধীন সংস্থা স্বাধীনতার পর থেকে ভারতীয় সংবিধান বলার অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে ।

১৯৬৩ ইং সাংবিধানিক সংশোধনে বলা হয়েছে দেশের সার্বভৌমত্ব এবং সংহতির কথা সবার মাথায় রাখতে হবে যাতে কোন ভাবেই দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত না হয় ।

ব্রিটিশ পরিচালিত সরকারের আমলে দেশপ্রেমী সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের চেষ্টা হয় । সেই সময়ের ব্রিটিশ সরকার তারপরেও সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করতে পারেনি । যদিও সংবাদ কর্মীরা যথেষ্ট লাঞ্ছিত হয়েছেন , কারাবরণ করেছেন ।

যদি ও আভ্যনন্তরীন জরুরী অবস্থার সময় ১৫ই নভেম্বর ১৯৭৭ ইং তৎকালীন ইউনিয়ন ইনফরমেশন এন্ড ব্রডকাষ্টিং মিনিষ্টার , এল , কে , আদবাণী বলেছিলেন , " White paper on misuse of mass Media during internal emergency ."

## “ ভারতীয় প্রেস আইন ”

১৯৬০ সালের ২৬ জানুয়ারী স্বাধীন সংবিধানে বলার এবং মত প্রকাশের অধিকারকে মৌলিক অধিকার বলা হয় । সকল পেপার প্রাইভেট লিমিটেড বনাম ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়ার রায় প্রদানকালে ভারতের মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট অভিমত ব্যক্ত করেন সমস্ত ব্যক্তির বলার ও মতামত প্রকাশ করার স্বাধীনতা আছে এবং বলার ধারনা প্রকাশ করার অধিকার ও অআছে এবং তাকে প্রচার করা ও যেতে পারে । ১৯৫১ সালের সংশোধনীতে বলা হয়েছে স্বাধীনতা মৌলিক তবে বলার ও মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে কিছু Reasonable Restriction " ও আছে যেমন দেহের ও রাজ্যের নিরাপত্তা , বিদেশী রাজ্যের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক , আইনশৃঙ্খলা সৌন্দর্য্যতা , আদালত অবমাননা ইত্যাদি ( কিছু নিয়ম

অবশ্যই মানতে হয় যা উপরে উল্লেখিত )।

১৯৬৩ ইং তে পুনরায় সংশোধন বলা হয় যাতে দেশের সার্বভৌমত্ব এবং সংহতির উপর কোন প্রভাব না পড়ে । ভারতবর্ষে প্রেস কাউন্সিল বিল তৈরী হয় ১৯৬৫ সালে । একটি কমিশন গঠিত হয়। জুলাই ১৯৬৬ ইং প্রেস কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া গঠিত হয় , উদ্দেশ্য প্রেসের স্বাধীনতা রক্ষা এবং ভারতীয় সংবাদপত্রের উন্নয়ন ঘটানো ।

১৯৭০ সালে কাউন্সিল এ্যাক্ট সংশোধন হয় ।এতে বলা হয় প্রেস কাউন্সিলের স্বাধীন চেয়ারম্যান কমিটি দ্বারা নির্বাচিত হবেনযিনি রাজ্য সভার চেয়ারম্যান , প্রধান বিচারপতি এবং লোকসভার অধ্যক্ষের তাদের মাধ্যমে কাউন্সিলের নির্বাচিত হবেন । কাউন্সিলের মধ্যে ২৬ জন সদস্য থাকবেন এদের মধ্যে, ৬ জন পত্রিকার সম্পাদক , ৭ জন ওয়াকিং জার্নালিষ্ট , ৬ জন নিউজপেপার ম্যানেজম্যান্টের প্রতিনিধি ১ জন নিউজ এজেন্সীর প্রতিনিধি , ৩ জন বিশেষজ্ঞ শিক্ষাবিদ , (বিজ্ঞান , আইন এবং সাহিত্য সংস্কৃতির উপর ) এবং ১জন মনোনীত হবেন ইউনিভার্সিটি , গ্র্যান্ড কমিশন থেকে এছাড়াই ২ জন মনোনীত হবেন বার কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া থেকে , ১ জন সাহিত্য একাডেমী থেকে এবং তিনজন (৩) লোকসভার সদস্য যার থেকে চেয়ারম্যান দ্বারা ১ জন মনোনীত হবেন ।

১৯৬৬ সালে ভারতে প্রেস কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা হয় । প্রথম চেয়্যারম্যান ছিলেন জে, আর , মুদোলেকার উনি ছিলেন সুপ্রীমকোর্টের বিচারপতি । কাউন্সিল প্রেসের স্বাধীনতার প্রতি নজর রাখেন , কাউন্সিলে জ্যার্নালিষ্টদের জন্য " কোড অব কন্ডাক্ট" তৈরী করে যাতে " unbiased " খবর এবং সংবাদ প্রকাশিত হয় । কাউন্সিলকে আইনের বিশেষ ক্ষমতা ও দেওয়া হয় । যা সারাভারত সংবাদপত্র সম্পাদকের সম্মেলনে আলোচিত হয় ।

কাউন্সিলের বিচারের ক্ষমতা আছে তদন্তকে Judicial Proceding" হিসেবে পরিগণিত করা হয় ভারতীয় দন্ডাবিধির ১৯৩ এবং ২২৮ ধারা মোতাবেক । ব্যক্তির উপস্থিতির জন্য কমিশন শমন পাঠাতে পারে। স্বাক্ষীর স্বাক্ষ্য গ্রহণ করিতে পারে শপথের পরে । প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করাইতে পারে ।

১৯৬৬ থেকে ১৯৭৪ পর্যন্ত প্রেস কাউন্সিল অনেক সংবাদপত্রের সমস্যা সমাধান করে এবং সাংবাদিকের জন্য গাইড লাইন তৈরী করে ।

বিখ্যাত সাংবাদিক ডি , আর, মান কর সংবাদপত্রের স্বাধীনতার পক্ষে ছিলেন ।

কমিশনের গাইডলাইন অনুযায়ী প্রেস নিম্নোক্ত বিষয়গুলো পরিহার করবেন । Distortion or exaggeration of facts or incidents in relation to communal matters or giving currency to unverified rumours, Suspicions or inferences , as if they were facts and base their Comments on them ,

Employment of intemperate and unrestrained Language in the pre-

-sentation of news or views even as a piece of liter ary flourish for the purposes of or emphasis,

Encouraging or condoling violence even in the face to provocation as a means of obtaining redress of grievances weather the same be genuine or not , Scurrilous untrue attacks on complained by charges attributing Misconduct to them due to their being Members of a particular community or caste , Falsely giving a communal colour to incidents in which Members of different communities happen to be involved , Emphasizing matters that produce communal hatred or ill - will or fostering feelings or disturbs between communities ,

Publishing alarming news which are in substance untrue or making provocative comments on such news or views which are otherwise calculated to embitter relations between different communities or regional Linguistic Groups , Exaggerating actual happening to achieve sensationalism and publication of news which adversely affects communal harmony with banner lead lines or in distinctive types , and making disrespectful , derogatory or insulting remarks on or reference to the different religions of faith or their founders ,

By way of explanation , the council added to the guidelines that " While it is the legitimate function of the press to draw attention to the genuine and legitimate grievances of any community with a view to having the same redressed by peaceful , legal and legitimate means , it improper and a breach of journalistic ethics to invent grievances or to exaggerate real grievances , as these tend to promote a communal ill - feeling and accentuate the discord .

These guidelines were circulated to over 10000 news paper and periodicals in the country in 1966 .

To help the press , the council published a monograph on subject of parliamentary privileges for the press which was disturbed to members of parliamentary and member of legislative Assemblies as well as to editors and working journalists .

# স্বাধীনতা আন্দোলনে ভারতীয় সংবাদপত্রের অবদান

ভারতীয় সংবাদপত্রের অগ্রগতির শুরু হয় সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তী সময়ে এবং সংবাদপত্রের মাধ্যমে জনমত গঠিত হতে থাকে । ভারতীয়দের পরিচালনায় ইংরেজী ও বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় পত্রিকা প্রকাশিত হইতে থাকে । সংবাদপত্র দেশের লোকের মধ্যে দেশপ্রেম , রাজনৈতিক , আর্থ সামাজিক আলোচনা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়া তার জনপ্রিয়তা বাড়াতে শুরু করে । পাশাপাশি ইংরেজদের দ্বারা পরিচালিত সংবাদপত্রগুলো ভারত বিরোধী হয়ে উঠে । ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষ ইংরেজদের অধীন হওয়ার পর ইংরেজরা নিজেদের প্রভু বলিয়া মনে করিত ।

ভারতীয়দের দ্বারা পরিচালিত " হিন্দু পেট্রিয়ট" জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল । সিপাহী বিদ্রোহের সময় হইতে এই পত্রিকা ব্রিটিশ অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশ করিয়া জনগণের মধ্যে জাতীয় মনোবৃত্তি গঠন করিয়াছিল । ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে হরিশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইলে হিন্দু পেট্রিয়ট এর প্রভাব সাময়িকভাবে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছিল । পরবর্তীতে কৃষ্ণদাস পাল ইহার সম্পাদনা গ্রহণ করিয়া পত্রিকাটির হৃতগৌরব ফিরাইয়া আনেন । ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে " কাউন্সিল অ্যাক্ট" পাশ হইবার ফলে ভারতীয় জনমত ক্রমশ জাগ্রত হইতে থাকে । ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে সরবরাহ 'রয়টার ' এর মাধ্যমে দেশ বিদেশের খবর ভারতে আসিয়া পৌঁছিলে সংবাদপত্র সম্পর্কে ভারতবাসীর উৎসুকগ বৃদ্ধি পায়। ভারতে প্রকাশিত সংবাদ পত্রগুলি তীব্র ভাষায় সরকারী নীতির সমালোচনা করতে শুরু করে। প্রয়োজনীয় খবরাখবর এবং জাতীয় ভাবধারা ও দেশাত্ম বোধ প্রচারের প্রধান বাহক হয়ে উঠেছিল সংবাদপত্র । ইংরেজ সরকার তখন সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রিত করতে দৃঢ় সংকল্প হয় । বিদ্রোহমূলক লেখা বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে ভারতীয় দন্ডবিধিতে নতুন ধারা সন্নিবিষ্ট করে । ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে সরকার একটি ইস্তাহার প্রকাশ করেন যাতে লিখা আছে সরকারের অনুমতি ব্যাতীত কোন সরকারী কর্মচারী সংবাদপত্রের সম্পাদনা করিতে পারিবেন না । ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে লর্ডলিটন দেশীয় ভাষা সংবাদপত্র আইন (Vernacular Press Act ) পাশ করিয়া সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরন করেন । এই আইনের বিরুদ্ধে ভারতবাসী তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছিল । ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড রিপন জনমতের চাপে এই আইন প্রত্যাহার করিয়াছিলেন । ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে সরকার গোপনীয় সরকারী তথ্য আইন ছ Official Secrets Act.) প্রণয়ন করিয়া সংবাদপত্রে গোপন তথ্য বা সংবাদ প্রকাশকে বেআইনী বলিয়া ঘোষণা করে । এতকিছুর করেও সংবাদপত্রের সরকার বিরোধী মনোভাব বিন্দুমাত্র হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই । সেই সময় সংবাদপত্র ইংরেজ অপশাসনের দোষত্রুটি জনসমক্ষে তুলিয়া ধরিয়া দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধভাবে ভারতের উন্নতি সাধনে ব্রতী হইবার আহ্বান জানাইয়াছিল । উহাদের মধ্যে বাংলার অমৃতবাজার পত্রিকা , সঞ্জীবনী , বঙ্গাবাসী , সময় প্রভলতি উল্লেখযোগ্য । ইহা ব্যতীত বোম্বাইয়ের

" রাফু গোফ্‌তার , ইন্দু প্রকাশ . মারাঠী ও কেশরী " , মাদ্রাজের " অন্ধ্র প্রকাশিকা" কেরল পত্রিকা, উত্তরপ্রদেশের " হিন্দুস্তানী " ও আজাদ , পাঞ্জাবের " আকবর ই আম" " কোহিনুর " প্রভৃতি পত্রিকা নির্ভীকভাবে ইংরেজ শাসনের স্বরূপ উদঘাটন করিয়া ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবাদের ভাবনা জাগ্রত করিয়াছিল । এই সকল সংবাদপত্র জাতীয় আন্দোলনে আত্মোৎসর্গ ও আত্মনির্ভরশীলতার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার কাজ চালাইয়া দেশবাসীর মধ্যে ইংরেজ বিরোধী সংগ্রাম মনোভাব জাগাইয়া তুলিতে উদ্যোগী হয় । ইংরেজ সরকার এই সকল সংবাদপত্রের কন্ঠরোধ করিবার উদ্দেশ্যে নানাবিধ পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন ।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে " সংবাদপত্র আইন" এর দ্বারা ইংরেজ সরকার সন্ত্রাসবাদী প্রচারকার্যে লিপ্ত সংবাদপত্রগুলিকে বাতিল করিবার অধিকার লাভ করে । ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে অপর একটি ব্যাপক আইন করিয়া মুদ্রনযন্ত্র এবং সংবাদপত্রের প্রকাশকদের উপর নানাবিধ বিধিনিষেধ আরোপ করা হয় । এই আইনের দ্বারা আপত্তিকর ও রাজদ্রোহ মূলক বিষয়বস্তু প্রকাশিত হইলে পত্রিকাকে বাজেয়াপ্ত করিবার অধিকার লাভ করে ।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বহুলাংশে খর্বিত হইয়াছিল । ১৯১০খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় প্রেস আইন অনুসারে ভারতের বিশিষ্ট সাংবাদিক ও বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদককে রাজদ্রোহমূলক প্রবন্ধ ও সংবাদ পরিবেশনার অপরাধে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল । বাংলার অরবিন্দ ঘোষ ও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় , মাদ্রাজের সুব্রহ্মনীয় শিবে ও চিদম্বরম পিল্লাই, তামিল পত্রিকা ইন্ডিয়ার সম্পাদক শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার প্রভৃতির বিরুদ্ধে সরকার রাজ বিদ্রোহের অভিযোগে আনিয়া আদালতে মামলা করেন । আদালতের রায় অনুসারে প্রত্যেকের উপর জরিমানা ধার্য করা হয় অথবা কারাদন্ডে দন্ডিত করাহয় । ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ডের সময়ে ইংরেজ সরকার যে দমননীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহার হাত হইতে সংবাদপত্রগুলিও রেহাই পায় নাই, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ডের সংবাদ যাহাতে প্রকাশ পাইতে না পারে সেই জন্য সরকার সংবাদপত্রগুলির উপর ভারতীয় নিরাপত্তা আইন ও অন্যান্য দমনমূলক আইন প্রয়োগ করিতে দ্বিধাবো করে নাই । সরকারী বর্বরতার বিভিন্ন সংবাদ প্রকাশ করিয়া " অমৃতবাজার পত্রিকা " , বোম্বাই ক্রনিকল , পাঞ্জাবী , স্বদেশ মিত্রম্ প্রতাপ প্রভলতি পত্রিকার সম্পাদক কারারুদ্ধ বা অর্থদন্ডে দন্ডিত হইয়াছিলেন ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ সরকার প্রেস আইন ও অন্যান্য দমনমূলক আইন প্রত্যাহার করিয়া সংবাদপত্রগুলি স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করিবার অধিকার কতকাংশ ফিরাইয়া দিয়াছিলেন । ১৯৬৪ খ্রীষ্টাবেদ অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠিত হইলে এ সরকার সংবাদপত্রের উপর হইতে দমনমূলক আইন প্রত্যার করিয়ালয় ।

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় সর্বপ্রথম " বেঙ্গল গেজেট" নামে বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রে রামমোহন রায়ের অবদান অনস্বীকার্য । তিনি

প্রথম সংবাদ কৌমুদী নামে হিন্দী এবং পার্শীল ভাষায় তিনটি সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদন করতেন। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর ও কয়েকজন মিলে "বঙ্গদূত" নামে একটি সংবাদপত্র (সাপ্তাহিক) প্রকাশ করে রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায় দেশবাসীর মধ্যে দেশপ্রেম সঞ্চারিত করিবার উদ্দেশ্যে লেখনী ধারণ করিয়া সর্বদা পত্রিকাই প্রকাশ করতেন। তিনি "উৎকল দর্পন' সংবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। সঞ্জীবনী কাগজের সম্পাদক কৃষ্ণ কমুার মিত্র দেশবাসীকে বিদেশী দ্রব্য বর্জন ও স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারে সঙ্কল্প গ্রহনের জন্য আহ্বান জানালে তা সর্বসাধারণের মধ্যে বিপুল সাড়া জাগায়।

## বাংলায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের অবদান

প্রথমে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্র ছিল খুবই কম। তবে ঐ সময়ে কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক হিতবাদী ও সন্ধ্যা পত্রিকার যথেষ্ঠ রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল। কিন্তু সাপ্তাহিক পত্রিকার সংখ্যা ছিল আশ্চর্য রকম বেশী। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা ও বিভিন্ন স্থান থেকে ৫৬টি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হত। তার মধ্যে কলকাতা থেকে ১৮ টি, বর্ধমান বিভাগ থেকে ১৩টি, ঢাকা বিভাগ থেকে ৮টি, প্রেসিডেন্সি বিভাগ থেকে ৭টি, চট্টগ্রাম বিভাগ থেকে ৬টি, রাজশাহী বিভাগ থেকে ৫টি প্রকাশিত হত। কলকাতা থেকে প্রকাশিত পত্রিকা গুলোর মধ্যে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের সম্পাদিত হিতবাদী পত্রিকা, জলধর সেন ও দীনেশ কুমার রায় সম্পাদিত বসুমতী, যোগেন্দ্র চন্দ্র বসু সম্পাদিত বঙ্গবাসী এবং কৃষ্ণকুমার মিত্র সম্পাদিত সঞ্জীবনী পত্রিকা সব চাইতে জনপ্রিয় ছিল। হিতবাদী ও সঞ্জীবনী পত্রিকা পূর্বে সামাজিক প্রশ্নে রক্ষণশীলতার মুখপাত্র রূপে পরিচিত হলেও বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় গৌরবজনক ভূমিকা গ্রহন করে। সঞ্জীবনী পত্রিকাই সর্বপ্রথম বয়কট আন্দোলনের আহ্বান দিলে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন একটি নতুন অধ্যায়ের প্রবেশ করে। সাপ্তাহিক পত্রিকার অধিকাংশই নরমপন্থীদের আন্দোলনের ধারা তীব্র সমালোচনা করে আন্দোলনের গতি পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা শুরু করে। সরকারী নীতিরও তাঁরা সমালোচনা করেন। বিশেষতঃ রুশ জাপান যুদ্ধে জাপান কর্তৃক রাশিয়ার পরাজয় বরনের সংবাদ ভারতীয়দের মনে এক নতুন আশার সঞ্চার করে এবং পত্র পত্রিকায় তার সার্থক প্রতিফলন দেখা দেয়।

চরমপন্থী নেতৃবৃন্দও নিজেদের মতামত প্রকাশের জন্য অতি দ্রুত পত্র -পত্রিকা প্রকাশ করার চেষ্টা শুরু করেন। তাঁদের প্রকাশিত পত্র পত্রিকার বাধা বিঘ্ন পূর্ণ আয়ুস্কাল ভারতের সংবাদপত্রের ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সৃষ্টি করে। প্রাক্তন সাব্- ইনস্পেক্টর জ্যোতিলাল মুখার্জি সম্পাদিত 'প্রতিজ্ঞা' আবেদন - নিবেদনের নীতি পরিবর্তনের দাবি জানায়। তিনি 'ঘুষির আবেদন'

শীর্ষক প্রবন্ধে পুলিশের গুপ্তচরদের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থার সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন । তবে গুরুত্ব ও প্রভাবের দিক থেকে সব চাইতে উল্লেখযোগ্য ছিল সান্ধ্য দৈনিক " সন্ধ্যা" । ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় এই পত্রিকার সম্পাদনা শুরু করেন । ভাষার চাতুর্য , প্রকাশভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য, উগ্রজাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা প্রভৃতির জন্য সন্ধ্যা অনতি বিলম্বে সর্বাধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করে । ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ' স্বরাজ ' নামে একটি সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন । বঙ্কিম চন্দ্র , রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এবং স্বামী বিবেকানন্দের ছবি সহ বহু প্রবন্ধ এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয় । হিন্দুধর্মের প্রতি বিশেষ আকর্ষণের কথা ব্রহ্মবান্ধবের প্রতি রচনায় স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেত । তিনি আত্মরক্ষার জন্য স্বদেশী থানা গঠনের কথাও বলেন । মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার " নব শক্তি" পত্রিকায় চরমপন্থীদের রাজনৈতিক আদর্শের কথা সুন্দরভাবে ব্যাখা করা হত ।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত বিপিন চন্দ্র পালের সাপ্তাহিক পত্রিকা ' নিউ ইন্ডিয়া ' বাংলা চরম পন্থীদের রাজনৈতিক মতবাদ জনপ্রিয় করে তোলার দায়িত্ব গ্রহণ করে । কিছুদিন পরেই বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকা 'বন্দেমাতরম' প্রকাশিত হয় । প্রথমদিকে এই পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব বহন করেন বিপিন চন্দ্র পাল । কিন্তু অরবিন্দ ঘোষ , শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী , হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ প্রমুখ ব্যক্তিগণ এই পত্রিকা পরিচালনা করতে শুরু করেন । সুবোধচন্দ্র মল্লিক এই পত্রিকা প্রকাশনার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন ।এই পত্রিকা সাবলীল ইংরেজী ভাষায় ভারতের জাতীয়তাবাদের নতুন চিন্তাধারা প্রকাশ করতে শুরু করে । হিন্দু ধর্ম ও হিন্দুদের জীবন আদর্শ এই পত্রিকার বিশেষ স্থান পেলেও সন্ধ্যা পত্রিকার মতো উগ্রভাবে তা কখনও প্রকাশিত হয় নি । প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই এই পত্রিকা জনপ্রিয়তার শীর্ষে আরোহণ করার সুযোগ পায় ।

সন্ধ্যা , নবশক্তি , বন্দেমাতরম প্রভৃতি পত্রিকা নিয়মিত বিপ্লবাত্মক আদর্শ প্রচার করত । বিশেষতঃ অরবিন্দ ঘোষের বাংলাদেশের বৈপ্লবিক রাজনৈতিক গোষ্ঠীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল । বি প্লবাত্মক রচনার জন্য সব চাইতে বিখ্যাত ছিল বারীন্দ্র কুমার ঘোষ সম্পাদিত সাপ্তাহিক পত্রিকা ' যুগান্তর'। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে অবিনাশ ভট্টাচার্য , ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ ব্যক্তিদের সহযোগিতায় মাত্র চারশ টাকা মুলধন নিয়ে বারীন্দ্র কুমার ঘোষ যুগান্তর পত্রিকার প্রকাশ শুরু করেন । অরবিন্দ ঘোষ , শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী এবং সখারাম গণেশ দেউস্কর তাঁদের প্রয়োজনীয় পরামর্শদানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন । প্রথম দিকে যুগান্তরের গ্রাহক সংখ্যা খুবই কম ছিল , কিন্তু ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ভূপেন্দ্র নাথ দত্তের কারাদন্ডে হলে জুলাই মাসে বিপ্লবী পত্রিকা প্রকাশনের অপরাধে এই পত্রিকার বিক্রি সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায় । যুগান্তর নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ পদ্ধতির তীব্র সামলোচনা করে এবং প্রকাশ্য বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে । " রক্তপাত ভিন্ন দেবীর পূজা সম্পাদিত হতে পারে না " এই অভিমত যুগান্তর বারবার প্রচার করে । যুগান্তর আরও ঘোষণা করে , দেশের

সাধারণ লোক সাধারণতঃ কখনও এক যোগে বিপ্লবী হয়ে ওঠে না , কতিপয় ব্যক্তির আত্ম উৎসর্গের মাধ্যমে জনসাধারণের মুক্তির পথ প্রশস্ত হয় । সেজন্য যুগান্তর শিক্ষিত ভারতবাসী সকলকে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিতে আহ্বান জানায় ।

কলকাতার বাইরে বিভিন্ন মফঃস্বল শহর থেকেও নানা ধরনের পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে । ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত এবং আইনজীবী বৈকুন্ঠনাথ সোম কর্তৃক সম্পাদিত " চারুমিহির " সাপ্তাহিক পত্রিকা বিভাগে প্রথম থেকেই সরকারী নীতির তীব্র সমালোচনা করেন । এই পত্রিকায় লিয়াকৎ হোসেন রচিত একটি প্রবন্ধের জন্য পুলিশ অফিসে হানা দেয় । অশ্বিনী কুমার দত্তের সহকর্মী এবং স্বদেশ বান্ধব সমিতির সদস্য দূর্গা সেনের পরিচালনায় রবিশাল শহর থেকে বরিশাল হিতৈষী " নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয় । মফঃস্বলে প্রকাশিত পত্রিকার মধ্যে বরিশাল হিতৈষী পত্রিকাই সর্বপ্রথম সরকারী কোপানলে পতিত হয় । সরকার বিরোধী রচনা প্রকাশের জন্য দুর্গামোহন সেনকে এক বছরের সশ্রম কারাদন্ড দেওয়া হয় । জয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত রংপুর থেকে প্রকাশিত রংপুর বার্তাবহ , ঢাকা থেকে প্রকাশিত পূর্ব বাংলা , খুলনা থেকে প্রকাশিত খুলনাবাসী , খুলনার বাগের হাট থেকে প্রকাশিত "পল্লীচিত্র" প্রভৃতি পত্রিকা সরকারের নির্দেশে প্রকাশ বন্ধ রাখতে বাধ্য হয় । নৃপতি কাব্যতীর্থ সম্পাদিত " হাওড়া হিতৈষী " এবং যশোহর থেকে যশোহর পত্রিকা ও চরমপন্থী রাজনীতি প্রচার করতে শুরু করে ।

## সরকারী দমন নীতি

১৯০৫ থেকে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে পর্যন্ত পত্র পত্রিকাগুলো সরকার বিরোধী বহুসংখ্যাক রচনা প্রকাশ করলেও সরকার তাদের বিরুদ্ধে বিশেষ কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করে নি । সম্ভবতঃ সরকারের ধারনা ছিল যে , এই সব রচনা জনসাধারণের মনে কোন গভীর প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না । কিন্তু পাঞ্জাবের রাজনৈতিক ঘটনা সরকারকে সর্তক করে দেয় এবং ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে মে মাসে বাংলাদেশের সরকার সন্ধ্যা , বন্দেমাতরম এবং যুগান্তর পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ করে দিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে । কেন্দ্রীয় সরকার এই সময় প্রাদেশিক সরকারগুলোকে সরকার বিরোধী ও রাষ্ট্রদ্রোহী মতবাদের প্রচারক পত্রিকা সম্পর্কে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দেয় । যুগান্তর , সন্ধ্যা , বন্দেমাতরম এই তিনটি পত্রিকার বিরুদ্ধে সরকার কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করে । ব্রহ্মাবান্ধব উপাধ্যায় গ্রেপ্তার হওয়ার পরেও বিদেশী সরকারের বিচারালয়ের দেশপ্রমিককে শাস্তি দেওয়ার অধিকার আছে কিনা সে সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত একক ভাবে যুগান্তরের সব দায়িত্ব গ্রহণ করে তাঁর সহযোগীদের গ্রেপ্তারের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন । সরকারী আইনের সুবিধা করে

অরবিন্দ ঘোষ গ্রেপ্তারের হাত থেকে অব্যাহতি পেলে অন্যান্য সম্পাদকগণ ও সেই সুযোগ পূর্ণ মাত্রায় গ্রহন করে পত্রিকা প্রকাশনা অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করেন । কিন্তু সরকার আবার নতুন আইন প্রনয়ণ করে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে থেকে মুদ্রন বাজেয়াপ্ত ও পত্রিকা প্রকাশনা স্থগিত রাখার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে শুরু করে । ফলে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে মধ্যে বন্দেমাতরম , সন্ধ্যা , যুগান্তর , নবশক্তি , নিউ ইন্ডিয়া প্রভৃতি পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায় । জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর অরবিন্দ বন্দেমাতরম এর আদর্শে বাংলা ভাষায় ধর্ম ও ইংরেজী ভাষায় কর্মযোগী পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন । কিন্তু কিছু দিনে পরে তিনি ধর্মান্ধ হয়ে পন্ডিচেরী চলে যাওয়ায় উগ্র স্বদেশিকতাবাদী ও বিপ্লবাত্মক পত্র পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায় । এক মাত্র পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত " নায়ক পত্রিকা " তাঁর পূর্বসূরীদের কার্যকলাপের অনুকরণ শুরু করে ।

বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের প্রাক্কালে প্রকাশিত পত্র -পত্রিকা সরকারী নীতির তীব্র সমালোচনা করে জাতীয়তাবাদের মন্ত্রে ভারতবাসীকে উদ্বুদ্ধ করে তোলার চেষ্টা করে । এই সব পত্রিকার রচনায় যুক্তির চেয়ে আবেগ বেশী গুরুত্ব পেলেও জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে সার্থকতা ও সাফল্য প্রমাণ করে । স্বল্পায়ু এই সব পত্রিকার প্রভাবই বাংলাদেশ তথা ভারতের সর্বত্র বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন সমধিক গুরুত্ব লাভ করে এবং নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পাশাপাশি একটি বিপ্লবিক ও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন গড়ে ওঠার ভিত্তি স্থাপিত হয় ।

## ভারতের সংবাদপত্রের ইতিহাস

সংবাদ মাধ্যমের প্রাথমিক ভূমিকা মানবজাতির কাছে তথ্য সরবরাহ করা এবং ঘটনা প্রবাহগুলো তুলে ধরা । সাংবাদিকতার বোধগম্যতা , অনুভব এবং চিন্তা , যার মূল্যায়ণ তথ্যনির্ভর সংবাদ ও পরিবেশনার উপর। বিচক্ষণতার বিশাল ভূমি ,পরিধি জ্ঞান , অভিজ্ঞতা , তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এবং কারণ অনুসন্ধান করিয়া মানুষের , কানে কানে তথ্যনির্ভর ., সত্যানু সন্ধানী সংবাদ তুলে ধরা ।

সাংবাদিকদের পেশাগত দিকে চারপাশের মানুষের মানসিকতা সম্বন্ধে ও ওয়াকিবহল থাকার প্রয়োজন আছে । মানুষের কষ্টের ঘটনা সমূহ পরিষ্কার ভাবে বর্ণনা করা সাংবাদিকতার কাজ । সাংবাদিকতা তার পরিচিত গ্রাম , শহর , রাজ্য ছড়িয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞানের ভিত্তিতে মানুষের সমস্যাগুলি তুলে ধরা ।

সাংবাদিকদের পেশাগত দিকে চারপাশের মানুষের মানসিকতা সম্বন্ধে ও ওয়াকিবহল থাকার প্রয়োজন আছে । মানুষের সমস্যা অনুসন্ধান করা এবং মানুষের কষ্টের ঘটনা সমূহ পরিষ্কার ভাবে বর্ণনা করা সাংবাদিকতার কাজ । সাংবাদিকতা তার পরিচিত গ্রাম , শহর , রাজ্য ছড়িয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞানের ভিত্তিতে মানুষের সমস্যাগুলি তুলে ধরে । অনেক সময় দম বন্ধ করা মানুষের সমস্যা যারা ক্ষতি গ্রস্থ তাদের সমস্যা এবং ক্রোধের কারণগুলি সুনির্দিষ্ট ভাবে উত্থাপন করিয়া তথা সরকারের

গোচরে আনা ও অন্যতম কাজ ।এখানেই সাংবাদিকতার দিন সৃষ্টি এবং ঘটনার কারণ সমূহ নিধারনের ও যাচাই এর একটি পথ ।সাংবাদিক সত্য ঘটনা উৎঘাটনের পরিষ্কার চিন্তা করিবেন তথা পক্ষ্যপাত মূলক হইবেন না । প্রয়োজনে বিনা দ্বিধায় সরকারকে সমর্থন করিবেন যদি সরকারের কোন কাজ সঠিক ভাবে পরিচালিত হয় । তা যে কোন সরকারই হউক না কেন। যদি মানব কল্যানে সুদীর্ঘ পরিকল্পনা হয় তবে ভ্রান্তি দুর করিয়া মানুষের কাছে পৌছে দেওয়া সাংবাদিকদেরই কর্তব্য । এই রকম কাজের মাধ্যমে মহৎ সাংবাদিকরা জনগণকে নতুন ভাবে শিক্ষা দিতে পারেন ।

সাংবাদিকদের ভুললে চলবে না উনাদের তিনটি সংযোগ কারি দায়িত্ব যেমন (১) সংবাদ সংগ্রহ করা ও পরিবেশন করা (২) সংবাদ বুঝাইয়া দেওয়া এবং তার উপর মতামত দেওয়া(৩) সমাজের প্রহরী হিসাবে সমাজকে জাগ্রত করা । সাংবাদিকতার কাজ শুধু সমালোচনা নয় , সঠিক সিদ্ধান্তের উপর মুল্যায়ণ করা মানুষের কানে সঠিক তথ্য পৌছে দেওয়া যাতে পাঠক কুল উপকারিতা পান । অবশ্যই সাংবাদিকতার মূল কাজ যে কোন মূল্যেই সংবাদ সংগ্রহ করা ।ইহা সভাবতই সত্য সরকারি বেসরকারী যে কোন সংস্থা থেকেই সাংবাদিকতার অনেক বেশী খবর রাখেন ।যে কোন ভুল নীতি ও মানুষের সমস্যা সমন্ধে সাংবাদিক সংবাদ পত্রের মাধ্যমে অভিযোগ তৈরী করেন ।যে কোন সরকারের ভুল কাজের সমালোচনা সাংবাদিকরা করেন মানুষের স্বার্থে ।

নিঃসন্দেহে সাংবাদিকরা জনসাধারণ থেকে অনেক সহায়তা লাভ করেন সাংবাদিকরাই প্রথম যে কোন ঐতিহাসিক ঘটনা প্রথম মন্তব্য করে থাকেন ।

সাংবাদিকরা খবর রাখেন , দেখেন , শুনেন জাতীয় এবং আন্তজার্তিক ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ লোকদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক , রাজনৈতিক , অর্থনৈতিক তথা তাদের জন কল্যান মূলক কার্য্য কলাপ । সাংবাদিকরা দুর দৃষ্টি ঘটনার কারন অনুসন্ধান পর্যালোচনা করিয়া নির্ভুল কলমে তা পরিবেশন করেন ।লেখনী কখনোও আবেক বশিভূত হবে না ।কিন্তু তথ্য নির্ভর ঘটনার উপর মতামত প্রদান সাংবাদিকদের কর্তব্য তাদের বহুমুখী , মহান দায়িত্ব, জন সাধারনের প্রতি সাংবাদিকরা ভুললে চলবে না উনারা জন সাধারনের প্রতিনিধি , সামাজিক , রাজনৈতিক , সাংস্কৃতিক এবং নানা বিধ ঘটনার সমূহের সংবাদ প্রেরক । সত্য এবং সঠিক ঘটনা পরিবেশ করা ও সাংবাদিকদের কর্তব্য ।সত্য ও তথ্য নির্ভর ঘটনা শুধু দেশে নয় আন্তর্জাতিক দুনিয়ার সাংবাদিক এবং সংবাদ পত্রের মাধ্যমে জন মুখী হয়ে উঠে ।

১৪৪০ খ্রীষ্টাব্দে চীন প্রথম বিশ্বে সংবাদ পত্রের জন্ম দেয় ।চীনের প্রথম সংবাদ পত্রের নাম " পিকিং গেজেট " সরকারী প্রযোজনায় ।

ইউরোপ প্রথম চীন থেকে সাহায্য গ্রহন করে পুনরায় প্রিন্টিং মিডিয়ার উন্নতি সাধন করে , ভারতবর্ষে ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টান মিশনারী প্রথম প্রেস স্থাপন করে দ্বিতীয় প্রেস স্থাপিত হয় ১৫৭৮

খ্রীষ্টাব্দে তামিলনাড়ুতে এবং তৃতীয় প্রেস স্থাপিত হয় ১৬০২ খ্রীষ্টাব্দে মালাবরে প্রথম অবস্থায় প্রেস, সাহিত্য এবং খ্রীষ্টানদের কাহিনী ছাপতে শুরু করে ধীরে ধীরে ভারতবর্ষে নিজস্ব প্রেস স্থাপন শুরু হয়।

১৬ এর দশকে নিউজিলান্ডে " Newssaithung" নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয় । ১১ মার্চ ১৭০২ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যান্ডে প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় যার নাম ছিল " Daily courant " ফ্রান্সে প্রথম সংবাদপত্র Gazzette ১৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় । ১৬৬৭ খ্রীষ্টাব্দে বেলজিয়াম প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশিত করে "Gazzeteven Gate " নাম দিয়ে জার্মানী Frank Further General , Journal de Genaral সুইজারল্যান্ড Public Occ Urences আমেরিকা, Vaitviya News জাপান , ভারতবর্ষের প্রথম সংবাদপত্র " বেঙ্গল গেজেট " ইহার অপর নাম "Calcutta General" এই পত্রিকার অপর সংস্করন ছিল " HIcky Gazzettee" প্রতিষ্ঠান ছিলেন জেমস্ অগাষ্ট হিকি প্রতিষ্ঠা দিবস ছিল শনিবার , ১৯ শে জানুয়ারী ১৭৮৯ , হিকি কাগজ করেছিলেন বাক্ স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে , এই পত্রিকা সবার মতামতের জন্য উন্মুক্ত ছিল । ইহা মুলত রাজনৈতিক ও ব্যাবসায়িক সম্পর্কিত ছিল । হিকি সাংবাদিকতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন , হিকি এই পত্রিকায় ধনী বনিক ও ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সমালোচনা করেন । তৎকালীন গর্ভনর জেনারেল ওয়ারেণ হেষ্টিংস (ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ) এবং উনার স্ত্রী ও সংবাদপত্রের সমালোচনার মুখে পড়েন উনি জাতির স্বাধীনতার পক্ষে মত প্রকাশ করেন ।

১৯৭৫ এ জানুয়ারী মাসে মাদ্রাজে " মাদ্রাজ গেজেট নামে সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। কিন্তু জুন মাসের ২৯ তারিখ ১৭৯৯ তৎকালীন সরকার এই পত্রিকার উপর সেন্সরশীপ জারী করেন। ১৭ বৎসর এই পত্রিকা বন্ধ ছিল ।

১৯ শে আগষ্ট ১৮১৮ , ওয়ারেণ হেষ্টিংস সংবাদপত্রের উপর এক একপেশে নিয়ম তৈরী করেন । যাতে বলা হয় সংবাদপত্র সরকারের ক্ষতি হয় এমন কিছু লিখতে পারবে না ।

প্রথম হিন্দি সংবাদপত্র " Udant Marant "প্রকাশিত হয় মে , ৩০ - ১৮২৬ কোলকাতা থেকে ইহা সাপ্তাহিক এবং প্রতি সোমবারে প্রকাশিত হত । এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শ্রীমতি যুগল কিশোর মুকুল । এই পত্রিকার স্থায়িত্ব ছিল দেড় বৎসর । এই পত্রিকাটি বন্ধ হয় ১১ ই ডিসেম্বর ১৮২৭ । এই পত্রিকা দেশ বিদেশের সংবাদ বহন করত সাথে সরকারি বিবৃত সমুহ । প্রথম দৈনিক হিন্দী পত্রিকা ছিল " সমাচার সুধাবর্ষণ" , ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের এই পত্রিকায় প্রতিষ্ঠিত এবং সম্পাদক ছিলেন বাবু শ্যাম সুন্দর সেন । ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় হিন্দী প্রত্যাহিক " হিন্দুস্থান " কালা কেঙ্কর থেকে বের হয় , পাবলিসার ছিলেন রাজা রাম পাল সিং সম্পাদক ছিলেন পন্ডিত মদন মোহন মালব্য, কয়েক বৎসরের জন্য । তাছাড়া ও বেশ কিছু ছোট পত্রিকা বের হয়েছিল ।

১৮৭০ সালে রবার্ট নাইট " INDIAN STATESMAN" প্রতিষ্ঠা করেন , বর্তমানে

স্টেটমম্যান নামে জনপ্রিয় পরবর্তীতে বোম্বে টাইমস্ , স্টেনডার্ড ,টেলিগ্রাফ বিখ্যাত টাইমস্ অফ ইন্ডিয়া পত্রিকার সাথে যুক্ত হয় । " The Hindu " পত্রিকার প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৭৪ সালে । ১৮৭২ সালে " Civil and Military Gazzettee " বের হয় লাহোর থেকে এবং ১৮৬৮ সালে এলাহাবাদ থেকে বের হয় " Pioneer" সমাজ সংগঠক কেশবচন্দ্র উনার " Indian Mirror " পত্রিকাটি প্রাত্যাহিক ভাবে বের করতে শুরু করেন । ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের জন্ম হয় এবং অনেক শিক্ষিত যুবক নুতন উদ্দীপনার সাংবাদিকতার পেশা গ্রহণ করেন । দেশে সাংবাদিকতার এবং সংবাদপত্রের উত্তোরত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটানোর জন্য বিখ্যাত তৎকালীন নেতারা যেমন মহাত্মা গান্ধী , মদন মোহন মালব্য , চিত্তরঞ্জন দাশ , ফিরোজ শাহ্ মেহেতা , অ্যানি ব্যাসান্ত ,গোখলে , তিলক , তাদের সময় ও শক্তি প্রয়োগ করেন । ব্রিটিশ শাসকরা অসুন্তুষ্ট হন এবং সেই সময়ে ভারতীয় প্রেস ও দু ভাগে বিভক্ত হয় , একপক্ষ ভারতের স্বাধীনতার জন্য প্রাণপনে কলশুদ্ধে অবর্তীন অন্যদিকে অপর পক্ষ নির্লজ্জভাবে ব্রিটিশের অনুগত হয়ে উঠে । কিন্তু ব্রিটিশরা বুঝতে পারেন সংবাদপত্র মানুষের ভাষাকে আরো তোড়জোর করে তুলেছে ।

স্বাধীনতার লড়াইয়ে সংবাদপত্রের ভূমিকা অপরিসীম । ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে থেকে বের হয় " " Search light " " এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠাছিলেন শচীদানন্দ সিন্হা যিনি পরবর্তীতে বের করেছিলেন " Indian Nation " এবং পরে " Ananda Bazar Patrika"১৯২২ সালে ১৯১৪ সালে , ১৯০৯ সালে মদন মোহন মালব্য এলাবাদ থেকে উনার বিখ্যাত " প্রত্যহ জাতীয়তাবাদী নেতা" নাম দিয়ে সংবাদপত্র বের করেন । এই পত্রিকা আন্তর্জাতিক সুনাম কুড়িয়েছিল । ১৯২০ সালে বারানসী থেকে হিন্দি প্রাত্যাহিক " Aaj" বের হতে শুরু করে । " Hindustan standard" এবং Yugantar"শুরু হয় ১৯৩৭ সালে " National Herald" ১৯৩৭ সালে ।

স্বাধীনতার পরে অনেক পত্রিকা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বের হতে শুরু করে । যদিও স্বাধীনতার পূর্বে ও সংবাদপত্রের ধারা অব্যহত থাকে , সর্বাধিক প্রচারিত সংবাদপত্র ছিল " টাইমস অফ ইন্ডিয়া" যা থেকে ভাষায় সংবাদপত্র , ম্যাগজিন প্রচুর বের হতো । ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস ও বহুল প্রচারিত সংবাদপত্র ছিল ।

সাংবাদিক প্রচেষ্টায় সাংবাপত্রের বিশাল পরিবর্তন লক্ষ করা যায় । বর্তমানে পত্রিকা অনেকবেশী উন্নতি সাধন করিয়াছে।

স্বাধীনোত্তর পূর্ব্বে সংবাদপত্রে রাজনৈতিক গুরুত্ব বেশী ছিল যাতে স্বাধীনতা সংগ্রামে জনগন আকর্ষিত হন এবং পাশাপাশি নানাহ প্রবন্ধের মাধ্যমে বিপ্লবীদের বৈপ্লবিক কাজে উৎসাহ প্রদান করা হতো । কিন্তু বর্তমানে সংবাদ মাধ্যম সংবাদের প্রতিটি ছন্দে প্রসারিত ।

# সাংবাদিকতার কঠিন পথ

সময়ের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা বেঁচে আছি সংবাদ সংগ্রহের কোন নিদিষ্ট পন্থা নেই , কিন্তু সত্যনিষ্ঠ তথ্যভিত্তিক খবরের মাধ্যমেই সংবাদ তৈরী হয় যা পরবর্ত্তীতে পাঠককুলের কাছে পরিবেশিত হয় সংবাদপত্রের মাধ্যমে , বিভিন্ন খবর বিচারের প্রকৃত মানদন্ড বিভিন্ন পাঠকের ব্যক্তিগত অভিরুচি। খবর সংগ্রহের পথ কিন্তু মসৃন নয় , সাংবাদিকরা যারা খবর সংগ্রহ করেন , খবরের সন্ধানে তাদেরকে অনেক চড়াই, উৎরাই অতিক্রম করতে হয় , কখনো ও বা প্রচন্ড ঝুকিনিয়ে । খবরতো শুধু কেবলমাত্র অপরাধ নিয়ে নয় কুসংস্কার , স্বাস্থ্য , কৃষি , শিক্ষা খেলাধূলা অর্থনীতি, বিজ্ঞান , রাজনীতি ,শিল্প, সাহিত্য , আন্তজাতিক ঘটনা সমূহ ইত্যাদি ইত্যাদি । সাংবাদিক ও সংবাদপত্র সমাজ জাগানোর এক বলিষ্ঠ হাতিয়ার। টুকরো , টুকরো সংবাদ পর্যালোচনা ক্রমে বইয়ের পাতায় স্থান নেয় আগামী ইতিহাস রুপে , যা মানুষকে মনে করিয়ে দেয় । ফেলে আসা দিনগুলো , আর আগামীকে পথ দেখায় নতুন সমাজ গড়ার ।

১৯৬৬ সালে সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি জে, আর মুদালেকারের নেতৃত্বে ভারতের প্রেস কাউন্সিল গঠিত হয় । শুরু হয় নতুন করে সুদীর্ঘ পথ চলা , সংবাদপত্রের স্বাধীনতা , প্রেস অ্যাক্ট সাংবাদিকতার নিয়মাবলী ইত্যাদি ইত্যাদি নিয়ে বিশাল অবয়বে প্রেস কাউন্সিল গঠিত হয় ।

যদি ও প্রাক স্বাধীনোত্তর যুগে ও ভারতীয় সাংবাদিক ও সংবাদপত্র বহু তিতিক্ষা , নির্যাতিন সহ্য করিয়া ভারতবাসীকে একত্রিত করিয়া স্বাধীনতার আন্দোলনে ভারতবাসীকে এবং ভারতীয় জনমতকে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে দেশ মাতৃকাকে শৃঙ্খলমুক্ত করতে এক অপরিসীম ভুমিকা গ্রহন করে । বহু সাংবাদিক কারাবরণ করেন " ভার্নিকুলার প্রেস অ্যাক্ট" এর মতো কালো আইনের মাধ্যমে সংবাদপত্রের কন্ঠরোধ করা হয় কিন্তু তবু ও বিদেশী শাসকরা বদ্ধ করতে পারেনি ভারতীয় সংবাদপত্রের দৃঢ়সঙ্কল্প পথ । সঞ্জীবনী কাগজে কৃসনকুমার মিত্র দেশবাসীকে বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জন ও স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারে সংঙ্কল্প গ্রহনের আহ্বান জানালে তা সর্ব সাধারনের মধ্যে বিপুল সাড়া জাগায় । " বঙ্গদর্শন" পত্রিকা ভারতীয়দের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের আহ্বান করে সংবাদপত্রের বলিষ্ঠ ভুমিকার ফলে ছাত্র , যুবক বুদ্ধিজীবি ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে । বিদেশী সরকারের দমন পীড়ন ও বদ্ধ হয়নি , শান্তনা গুহের মতো সাংবাদিক তথা সাহিত্যিক গ্রেপ্তার হন এবং জেলে অত্যাচারে মৃত্যুবরণ করেন । ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে কোলকাতায় সর্বপ্রথম " বেঙ্গল গেজেট" নামে বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকাটি প্রকাশিত , জন্মলগ্নেই প্রতিবাদের ভাষা নিয়ে , শোষনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠে । ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে " সংবাদ কৌমুদী " হয় বাংলা পত্রিকা প্রকাশিত হয় তার পরবর্ত্তীতে রাজা রামমোহন রায় বাংলা হিন্দি পার্শী ভাষায় তিন খানি সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদনা

শুরু করেন ∴ ১৮২২ খ্রীঃ প্রকাশিত হয় বঙ্গদূত নামে অপর পত্রিকা ক্রমে ক্রমে মহারাষ্ট্র , পাঞ্জাব , উত্তর দক্ষিণ ভারত থেকে একে একে পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে এবং পত্রিকাগুলো বিদেশী অপশাসনের বিরুদ্ধে গর্জ্জে উঠে । জাগ্রত জাতিকে জাগাইয়া রাখিতে সংবাদ পত্র বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করে । সেই সময় অমৃতবাজার পত্রিকা , সঞ্জবনী , সন্ধ্যা , নিউ ইন্ডিয়া , ইন্ডিয়ান মিরর , ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়া , স্টেটসম্যান , ইংলিশম্যান , কেশরী , প্রভলতি পত্রিকাগুলো হুমকী , অত্যাচারের পরোয়া না করে দেশবাসীকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করে এবং পরাধীনতার উন্মোচন ঘটাতে জাতিকে প্রতিনিয়ত সাহায্য করে , ভারতীয় সংবাদপত্রের ভুমিকা ছিল অপরিসীম ।

আমাদের রাজ্যে ও সংবাদপত্র এক বিশাল ভুমিকা বহন করে , প্রখ্যাত সাংবাদিক অমিয় কুমার রায়ের নেতৃত্বে ত্রিপুরায় প্রথম প্রেস ক্লাব গঠিত হয় , তারপরবর্ত্তীতে ক্রমে ক্রমে জেলা , সদরগুলোতে ও প্রেসক্লাব গঠিত হয় । প্রেস ক্লাবকে সাংবাদিকদের পীঠস্থান হিসেবে গণ্য করা হয় ।

২০০৮ সালের ১৫ই আগষ্ট গুটি কয়েক সাংবাদিক এই মহান পেশার কাজে মনোনিবেশ তথা কর্মযজ্ঞ বাড়ানোর জন্য সদর উত্তরে " ত্রিপুরা ওয়াকিং জার্নালিষ্ট এসোসিয়েশন " সদর উত্তর সাবডিভিশন কমিটি গঠন করে যা প্রতিষ্ঠা লাভ করে লেফুঙ্গা থানার অন্তর্গত কালীবাজার এলাকায় দৈনিক সংবাদ পত্রিকার সাংবাদিক নীলকণ্ঠ দে সভাপতির পদভার গ্রহণ করেন , এবং দৈনিক আরোহন পত্রিকার সাংবাদিক জীবন সরকার সম্পাদকের পদভার গ্রহণ করে পাশাপাশি মানুষ পত্রিকার সাংবাদিক বাদল চন্দ্র দাস সহ সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন আজকের ফরিয়াদের স্থানীয় সাংবাদিক নিখিল সরকার সংস্থার কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করেন । আজকের ফরিয়াদের অপর সাংবাদিক পীযুস মজুমদার সহ সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন , অপর দুজন সাংবাদিক যথাক্রমে দৈনিক সংবাদের গোপাল চক্রবর্ত্তী এবং " মারুপ" পত্রিকার সাংবাদিক সদাগর সিনহা উভয়ে সদস্য হিসেবে সংস্থার দায়িত্ব গ্রহণ করেন । জন্ম লগ্নেই সংস্থা জনকল্যাণমুখী সংবাদ পরিবেশনাই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে দুযোর্গ , হুমকী উপেক্ষা করে ঘাত প্রতিঘাতকের মধ্যে ও জনস্বার্থে সংবাদ সংগ্রহ করে জনস্বার্থে প্রতিনিয়ত বহুমুখী সংবাদ পরিবেশন করে চলেছে । এ পথের শেষ নেই , যতই দুর্গম হোক না কেন, এই প্রতিজ্ঞা নিয়েই এগিয়ে চলেছে সাংবাদিকরা। তাদের কর্মযজ্ঞের সীমা নেই , নুতন ভাবে ২০০৫ ইং তে পূর্ণঅবয়বে জন্ম নিয়েছে সংস্থার মুখপাত্র " লোহর " যা প্রশংসার দাবী রাখে ।

সাংবাদিকতার জীবন কঠিন , কঠোর ঝুঁকিপূর্ণ , কিন্তু এ তো আত্মপ্রত্যয় ও সমাজ জাগানোর বলিষ্ঠ হাতিয়ার সুতরাং সাংবাদিক চুপ করে বসে থাকতে পারে না । সাংবাদিক ছুটবে সংবাদ সংগ্রহে এ যে চিরন্তন সত্য , এই পবিত্র পেশায় কাজ করতে গিয়ে ভূ - বিশ্বে বহু সাংবাদিক খুন হয়েচেন , অপহৃত হয়েছেন, আহত হয়েছেন , লাঞ্চিত হয়েছেন , সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী ২০০৩ থেকে ২০০৫ ইং পর্যন্ত ইরাকেই খুন হয়েচেন ৬০ জন সাংবাদিক ১৯৯৩ -৯৬ ইং পর্যন্ত ৫৮ জন

সাংবাদিক খুন হয়েছেন আলজেরিয়াতে , ১৯৮৬--২০০৫ ইং পর্যন্ত কলোম্ভিবিয়াতে খুন হয়েছেন ৫২ জন সাংবাদিক , ১৯৯১ - ৯৫ ইং পর্যন্ত বলকানে খুন হয়েছে ৩৬ জন সাংবাদিক , ১৯৮৩ -৮৭ ইং পর্যন্ত ফিলিপিনস্ এ খুন হয়েছেন ৩৬ জন সাংবাদিক , তা ছাড়া ও বহু সাংবাদিক পবিত্র পেশায় থেকে খুন হয়েছেন বিভিন্ন দেশে যেমন থাইল্যান্ড , মেক্সিকো , বেলারুশ , কঙ্গো সোমালিয়া , রাশিয়া, লিবিয়া ,লেবানন , কলোম্ভিয়াতে শুধু তাই নয় আমাদের পাশ্ববর্ত্তী রাষ্ট্র শ্রীল ংক্কাতে ২৯ শে এপ্রিল ২০০৫ এ খুন হন সাংবাদিক ধর্মরত্নম শিবরাম , ২০০৫ এ খুন হয়েছেন পাকিস্তানী সাংবাদিক আল্লা নুর আমীর নোয়ার , নেপালে খুন হয়েছেন ২০০৫ সনের ৪ টা অক্টোবর মহেশ্বর পাহাড়ী তিনি রাষ্ট্রীয় স্বাভিমান কাগজের সাংবাদিক ছিলেন । আমাদের পাশ্ববর্ত্তী রাষ্ট্র বাংলাদেশে " সমাকল " পত্রিকা অফিসেই আততায়ীর হাতে খুন হন সাংবাদিক গৌতম দাস , ১৭ই নভেম্বর ২০০৫ ইং ফরিদপুরে । তা - ছাড়া বাংলা সংবাদপত্র " সংগ্রাম" এর সাংবাদিক শেখ বেলালউদ্দিন আততায়ীর হাতে খুন হন ১১ ই ফেব্রুয়ারী ২০০৫ ইং তে বাংলাদেশের খুলনাতে । শুধু খুনই নয় এ ছাড় ও অপহৃত এবং নিখোঁজ হয়েছেন বহু সাংবাদিক বেলারুশ , কঙ্গোঁ মেক্সিকো , ইরাক , ফিলিপিনস্ থাইল্যান্ড , প্যারাগুয়ে , পাকিস্তান , ইন্দোনেশিয়া , মিশর , ইউক্রেন , রোয়ান্ডা আলজেরিয়া , চেচেনিয়া , লেবানন , রাশিয়াতে সাংবাদিক , খুন ,অপহৃত আহত এ এক সুবিশাল সংখ্যা। আমাদের দেশে ও কাগজে পাওয়া যায় সাংবাদিক নিগ্রহের খবর । এতো সবের মাঝে ও সাংবাদিকতা / সাংবাদিকরা থেমে নেয় এ যেন প্রচন্ড কর্তব্য ও দায়িত্বজ্ঞান । বিভিন্ন দেশে এই পবিত্র ও মহান কর্তব্য দেশে এই পবিত্র ও মহান কর্তব্য পালনের জন্য অনেক সাংবাদিক আজ ইতিহাসের পাতায় তাদের স্বাক্ষর রেখেছেন এবং আগামী তরুন প্রজন্মের সাংবাদিকদের জন্য অনুপ্রেরণা দেখিয়াছেন যেমন বিখ্যাত সাংবাদিক মার্গারেট ফুলার , ইলিজ লভজয় , ম্যাথিউ ব্রেডি, জেকব রিস্ , এইচ এল মেনকেন , ওয়ান্টার উইনচেল ক্যাথারিন গ্রাহাম , বেন ব্রেড-লি ভারতীয় সাংবাদিক খুশবন্ত সিং , যিনি পদ্মবিভুষণ পুরস্কারে ও ভুষিত এ ছাড়া ও আরো অনেক সাংবাদিক কর্মদক্ষতায় আজ সাংবাদিককুলের কাছে আদর্শ ও অনুপ্রেরণা । এ পথ মসৃণ নয় , পর্বত সমান বাধা , তারপরে ও দায়িত্বজ্ঞান নিয়ে জনহিতকর কল্পে সাংবাদিকরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ , প্রতিজ্ঞাবদ্ধ । জাতিকে জাগ্রত করার কর্মে মনে প্রাণে নিয়োজিত । দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন তথ্যভিত্তিক সৃষ্টিশীল সংবাদ সমাজকে এগিয়ে নিতে পারে , হয় মানুষের কাজের সঠিক মূল্যায়ণ সদর উত্তরের ওয়াকিং জানালিষ্ট এসোসিয়েশনের সাথে যুক্ত তরুন সাংবাদিকদের কাছে ও সমাজের প্রত্যাশা অনেক , যদি ও ইত্যবৎসরেই উনারা এগিয়ে যাচ্ছেন সাংবাদিকতার দৃঢ় সংকল্পে , লেখনীর নেই পরাজয় সৃষ্টির ভাষায় লেখনীর জয় । সাংবাদিকতার লেখনীর উপর তাই লেখতে হয় ।

" তুমি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গী বিভৎস ঘটনা , বিচ্ছেদের অশ্রু আশঙ্কার কথা

্বৃত্তরা কত নিষেধ করেছে। তবু আমাদে খবর দেওয়া ছাড়ছো না । তুমি নির্ভীক . তীরের ফলার মতো তোমার কলমের সৃষ্টি । দুবৃত্তের কাছে বারুদ মাখা বন্দুকের হিংসা। তোমার আছে লেখনীর গর্জন , সমাজ জাগানোর পুকার, তোমার আছে কলম যদি দাও বিশদ বর্ণনা সশস্ত্র মানুষ বলে কাগজ পড়া ঠিক নয় কিন্তু তুমি সমাজ জাগানোর এক হাত । যুদ্ধ ক্ষেত্রের মতো বাস্তবের দিকে খুব একা সেখানে তাদের সঙ্গে তোমার কথোপকথন । তারা নিস্তব্দ তোমার প্রতীক্ষায় ।

## সংবাদপত্র একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা

সর্ব প্রথম মুদ্রনযন্ত্রের উদ্ভব হয় চীনদেশে এবং চীন দেশেই প্রথম সংবাদপত্রের প্রচলন হয় । বাংলা সংবাদপত্র প্রথম প্রকাশিত হয় বৃটিশ শাসনকালে । এদেশে প্রথম প্রকাশিত সংবাদপত্র হিকির বেঙ্গল গেজেট ( ১৭৮০ সালে ) গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য সম্পাদিত বেঙ্গল গেজেট , ও শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত মার্শম্যান সম্পাদিত " সমাচার দর্পন" দুটি পত্রিকাই ১৮১৮ খ্রীঃ প্রকাশিত হয় প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র ইশ্বরগুপ্ত সম্পাদিত " সংবাদ প্রভাকর " (১৮৩১ খ্রীঃ) ইউরোপে প্রথম সংবাদপত্রের প্রচলন হয় ইতালীতে । তারপর জার্মানী ও ইংল্যান্ডে । মোগল রাজত্বকালে " আখবার " নামে ভারতবর্ষে হস্তলিখিত সংবাদপত্রের প্রচলন ছিল ।

সংবাদপত্রকে গনতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ বলা হয়ে থাকে । গণতন্ত্রের প্রকৃত বিকাশের স্বার্থেই সংবাদপত্রের স্বাধীন ও পক্ষপাতহীন ভুমিকা একটি অত্যান্ত জরুরি বিষয় । সংবাদপত্র জনমত গঠন করে । গণ আন্দোলনকে পথ দেখায় । রাষ্ট্র পরিচালক ও প্রশাসনের নানা দোষত্রুটির গঠনমুলক সমালোচনা করে , জনজীবনের নানা দুঃখ দুর্দশার কথা তুলে ধরে অবিলম্বে এর প্রতিকার চায় । অভিজ্ঞ মতামতের মধ্যে দিয়ে জনমানসের পরিচয় ফুটে ওঠে ।

যেখানেই মনুষ্যত্বের অবমাননা , অন্যায় , অত্যাচার , শোষণ , সেখানেই সংবাদপত্র বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করে । সংবাদপত্র দেশের রাষ্ট্র কাঠামোকে পরিবর্তিত করে দিতে পারে , স্বৈরাচারী অপশাসনের সমাধিক্ষেত্র রচনা করতে পারে । ব্রিটিশ ভারতে বালগঙ্গাধর তিলকের " কেশরী " মহাত্মা গান্ধির " হরিজন" কলকাতা থেকে প্রকাশিত আনন্দবাজার পত্রিকা , অমৃতবাজার পত্রিকা, স্বদেশী আন্দোলনের বাণী প্রচার করে দেশবাসীর মধ্যে দেশাত্মবোধের উন্মেষ ঘটিয়েছিল । সংবাদপত্রে শুধুমাত্র সংবাদই পরিবেশিত হয় না । বিভিন্ন ধরনের রচনা এতে স্থান লাভ করে । সাহিত্য শিল্পকলা সঙ্গীত , চলচ্চিত্র , খেলাধুলা জ্ঞান বিজ্ঞান বিষয়ে বহু তথ্য সংবাদপত্রে সন্নিবেশিত হয়ে থাকে ।

কোন সময় সংবাদপত্র অবশ্য তার গুরত্বপূর্ণ ভুমিকার কথা বিস্মৃত হয়ে রাজনৈতিক মুখপত্রে

পরিণত হয় । কখনো আবার চাপে নিরপেক্ষ মতামত প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকে ।

সংবাদপত্রের কাছে আমরা নিরপেক্ষ নির্ভীক তথ্যই আশা করি । আধুনিক সভ্যতার বড় অঙ্গ সংবাদপত্র । গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গনতন্ত্র সুরক্ষায় পক্ষপাতহীন নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশন সংবাদপত্রের নিকট একান্ত কাম্য । সংবাদপত্র দেশ ও জাতির জীবনের কাছে দর্পন বিশেষ তেমনি অমোঘ অস্ত্র ও বটে ।

**************

নাগরিক অধিকার , পিছিয়ে পড়া ,

দাসপ্রথা বিলোপন আইন ,

ইত্যাদি সংবিধানগত মানুষের অধিকার ও কর্তব্য

# নাগরিক অধিকার , পিছিয়ে পড়া , দাসপ্রথা বিলোপন আইন , ইত্যাদি সংবিধানগত মানুষের অধিকার , ও কর্তব্য

## নাগরিক অধিকার সুরক্ষা আইন ১৯৫৫

**১ ধারা** - সংক্ষিপ্ত নাম , বিস্তৃতি এবং আরম্ভ [ Short title , extent and commencement ]১৯৫৫ সালের নাগরিক অধিকার সুরক্ষা আইন বলা যেতে পারে । এই আইন সারা ভারতবর্ষে প্রযোজ্য ।

**২ ধারা** - সংজ্ঞা (Definition ]

এ " নাগরিক অধিকার [ Civil Right ] বলতে বুঝায় সেই অধিকার যা ভারতীয় সংবিধানের ১৭ অনুচ্ছেদের দ্বারা অস্পৃশ্যতা দূর হওয়ার ফলে যেকোন ব্যক্তির উপর বর্তিয়েছে ।

**৩ ধারা** - ধর্মীয় কারণে দূরে সরিয়ে রাখার দন্ড [ punishment for enforcing religious disabilities ] যদি কেউ , অস্পৃশ্যতার কারণে কোন ব্যক্তিকে -

(এ) কোন সাধারণ ধর্মস্থানে যেখানে একই ধর্ম সাধনাকারী অপর ব্যক্তিদের বা তাদের কোন অংশের প্রবেশ অধিকার আছে - সেখানে প্রবেশ করতে বাধা দেয় - অথবা ,

(বি) কোন সাধারণ ধর্মস্থানে যেখানে একই ধর্ম সাধনাকারী অপর ব্যক্তিদের বা তাদের কোন অংশের প্রার্থনা করা , ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান করা অথবা কোন পুণ্য জলাশয়ের জল ব্যবহার করার যেরূপ অধিকার আছে সেখানে সেরূপ অধিকার প্রয়োগ করতে বাধা দেয় ,তবে সেই ব্যক্তি এক মাসের কম নয় এবং দুমাসের বেশী নয় এরূপ কারাদন্ডে এবং কেশ টাকার কম নয় এবং পাঁচশ টাকার বেশী নয় এরূপ অর্থদন্ডে দন্ডিত হবে।

**ব্যাখা** [ Explanation ] এই ধারা এবং ৪ ধারার উদ্দেশ্যে বৌদ্ধ , শিখ জৈন এবং বীরাশৈব, আদিবাসী , ব্রাহ্ম , আর্যসমাজ এবং স্বামী নারায়ণ সম্প্রদায়ভুক্ত সমস্ত প্রকার হিন্দুদের " হিন্দু" বলে ধরা হবে ।

**৪ ধারা** - সামাজিক কারণে দুরে সরিয়ে রাখার দন্ড [ Punishment for enforcing

social disabilities ] কেউ অস্পৃশ্যতার কারণে কোন ব্যক্তিকে -

(i) কোন দোকানে, সাধারণের রেস্তোরায় (public restaurant ) এ হোটেলে বা সাধারণের প্রমোদ গৃহে প্রবেশে বাধা দিলে - বা,

(ii) কোন রেস্তোরায় , ধর্মশালায় , হোটেলের বা সরাইখানার সর্বসাধারণের বা তার কোন অংশের ব্যবহার্য বাসনপত্র ব্যবহারে বাধা দিলে - বা ,

(iii) চাকুরী , ব্যবসা - বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বা কোন কাজে নিযুক্তির ক্ষেত্রে বৈষম্য দেখালে - বা ,

(iv) নদী , নালা , খাল পুকুর , স্নানের ঘাট বা অপরাপর জলের স্থান , সমাধিক্ষেত্র বা শ্মশান ঘাট বা কোন শৌচাগার , রাস্তা বা অন্য যে কোন সাধারণের স্থান ব্যবহার করতে দিতে বৈষম্য করলে - বা ,

(v) সম্পূর্ণতঃ বা আংশিকভাবে সরকারি ব্যয়ে পরিচালিত কোন দাতব্য প্রতিষ্ঠানে কিংবা সাধারণের ব্যবহারের জন্য উৎসর্গীকৃত কোন স্থানে প্রবেশ করতে বা তা ব্যবহার করতে বাধা দিলে - বা ,

(vi) কোনক্ষদাতব্য প্রতিষ্ঠানের দ্বারা সাধারণের উপকারের জন্য দেওয়া যেকোন রকম সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করলে - বা,

(vii) সাধাররে ব্যবহার্য কোন যানবাহনে ভ্রমণ করতে বাধা দিলে - বা ,

(viii) যে কোন স্থানে বসতবাটী নিমার্ণ , অধিগ্রহণ বা দখলের ক্ষেত্রে বৈষম্য করলে - বা,

(ix) সাধারণের ব্যবহার্য কোন ধর্মশালা , সরাইখানা কিম্বা মুসাফিরখানা ব্যবহারের ক্ষেত্রে বৈষম্য করলে- বা,

(x) কোন সাংস্কৃতিক বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণে বাধা দিলে বা কোন সাংস্কৃতিক বা ধর্মীয় শোভাযাত্রা বের করতে বাধা দিলে - বা,

( xi) অলংকার ব্যবহারের ক্ষেত্রে বৈষম্য করলে - তার কমপক্ষে একমাস এবং সর্বাধিক ছ, মাসের কারাদন্ড এবং কমপক্ষে একশ টাকা এবং সর্বাধিক পাঁচশ টাকা অর্থদন্ড হবে ।

**৫ ধারা** - হাসপাতাল ইত্যাদিতে ভর্তি নিতে অস্বীকার করলে (Punishment for refusing to admit persons to hospitals , etc ] কেউ অস্পৃশ্যতার কারণে কোন ব্যক্তিকে -

(এ) সাধারণের সুবিধার জন্য প্রতিষ্ঠিত কোন হাসপাতাল , সেবা প্রতিষ্ঠা , শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা ছাত্রাবাসে ভর্তি নিতে অস্বীকার করলে - বা ,

(বি) উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলিতে ভর্তি নেওয়ার করেও বৈষম্য দেখালে - কমপক্ষে এক মাস এবং সর্বাদিক ছয় মাসের কারাদন্ডে এবং কমপক্ষে একশ টাকা এবং সর্বাধিক পাঁচশ টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত হবে ।

**৬ ধারা** - জিনিসপত্র বিক্রি করতে বা কোন সেবা সরবরাহ করতে অস্বীকার করলে [ Punishment for refusing to sell goods or render service ] কেউ অস্পৃশ্যতার কারণে কোন ব্যক্তিকে কোন জিনিসপত্র বিক্রি করতে বা কোন সেবা Service সরবরাহ করতে অস্বীকার করলে অর্থাৎ যেরূপ জিনিস বা সেবা , একই জায়গায় এবং একই সময়ে অন্য সকলে যে শর্ত পাচ্ছেন তা থেকে তাকে বঞ্চিত করলে - তার কমপক্ষে এক মাস এবং সর্বাধিক পাঁচশ টাকা অর্থদন্ড হবে ।

**৭ ধারা** - অস্পৃশ্যতা থেকে উদ্ভূত অন্যান্য অপরাধের দন্ড [ punishment for other offences arising out of untouchability ]

১) কেউ , -

(এ) কোন ব্যক্তিকে সংবিধানের ১৭ অনুচ্ছেদে বলা অস্পৃশ্যতা রহিতজনিত কারণে প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করলে - বা ,

(বি) কোন ব্যক্তিকে তার ঐরূপ প্রাপ্য অধিকার প্রয়োগে উৎপীড়ন করলে , ক্ষতি , বিরক্তি উৎপাদন করলে , বাধা দিলে বা দেওয়ালে , বা বাধা ঘটাবার উদ্যোগ নিলে অথবা এরূপ অধিকার প্রয়োগ করার জন্য ঐ ব্যক্তিকে উৎপীড়ন করলে , ক্ষতি , বিরক্তি উৎপাদন করলে বা বয়কট করলে - বা ,

(সি) লিখিত , মৌখিক বা ইসারায় কেউ কোন ব্যক্তিগোষ্ঠী বা জনসাধারণকে যে কোন প্রকারের 'অস্পৃশ্য' আচরণে উৎসাহিত করলে বা উত্তেজিত করলে - বা

(ডি) কোন তপসিল জাতিভুক্ত ব্যক্তিকে অস্পৃশ্যতা হেতু অপমান করলে বা অপমান করার, চেষ্টা করলে - কমপক্ষে এক মাস এবং অনধিক ছ'মাস কারাদন্ডে এবং কমপক্ষে একশ টাকা এবং অনধিক পাঁচশ টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত হবে ।

(২) কেউ - (i) তার নিজ গোষ্ঠীভুক্ত বা তার কোন শাখাভুক্ত কোন ব্যক্তিকে কোন অধিকার বা সুযোগ যে অধিকার বা সুযোগ উক্ত ব্যক্তি ঐ গোষ্ঠীর বা শাখার সভ্য হিসাবে পাওয়ার যোগ্য- তা থেকে বঞ্চিত করলে - বা,

(ii) ঐরূপ কোন ব্যক্তিকে অস্পৃশ্যতা চালু করতে অস্বীকার করার জন্য বা এই আইনের স্বার্থে কিছু করার জন্য ধর্মসম্প্রদায় থেকে বহিষ্করের উদ্দেশ্যে কিছু করলে - কমপক্ষে এক মাস এবং অনধিক ছ'মাস কারাদন্ডে দন্ডিত হবে এবং কমপক্ষে একশ টাকা এবং অনধিক পাঁচশ টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত হবে ।

**১০ ধারা** - অপরাধের প্ররোচনা - (Abetment of offence ] কেউ , বা আইনের কোন অপরাধের জন্য প্ররোচনা দিলে সেই অপরাধের জন্য নির্দিষ্ট দন্ডে দন্ডিত হবে ।

"৫ ধারা - অপরাধগুলি ধর্তব্য ও সংক্ষেপে বিচারযোগ্য হবে । (Offences to be cognizable and trible summarily ] (১) এই আইনের দন্ডযোগ্য সমস্ত অপরাধ ধর্তব্য অপরাধ হবে এবং তিন মাসের বেশী কারাদন্ডযোগ্য অপরাধ ছাড়া এই ধরনের প্রত্যেক অপরাধ একজন প্রথম শ্রেণীর ন্যায় - ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে অথবা মেট্রপলিটন শহরের ক্ষেত্রে একজন মেট্রপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে ফৌজদারী কার্যপ্রণালী বিধিতে বলা বিধান অনুসারে সংক্ষেপে বিচার হতে পারবে ।

(২) যখন কোন লোকসেবক এই আইনে দন্ডযোগ্য অপরাধের প্ররোচনা দেওয়ার দায়ে অভিযুক্ত হবেন তখন সেই অপরাধ আদালত ধর্তব্য অপরাধ বলে গণ্য করার আগে নিম্নলিখিতের অনুমোদন নিতে হবে -

(এ) কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীর ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের ।

(বি) রাজ্য সরকারি কর্মচারীর ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের ।

## তপশিলভুক্ত জাতি ও তপসিলভুক্ত উপজাতি (নৃশংসতা নিবারণ) আইন , ১৯৮৯

**১ ধারা** - সংক্ষিপ্ত নাম , বিস্তৃতি এবং আরম্ভ [ Short title , exent and commencement ] (১) এই আইনকে ১৯৮৯ সালের তপসিলভুক্ত জাতি ও তপসিলভুক্ত উপজাতি (নৃশংসতা নিবারণ) আইন বলা যেতে পারে ।

(২) জম্মু কাশ্মীর রাজ্য বাদ দিয়ে এই আইন ভারতবর্ষের সর্বত্র প্রযোজ্য ।

**২ ধারা** - সংজ্ঞাসকল ( (১) প্রসঙ্গ থেকে বিরুদ্ধ কিছু বুঝা না গেলে , এই আইনে -

(এ) নৃশংসতা ( Atrocity) বলতে বুঝায় কোন একটি অপরাধ কিছু যা এই আইনের ৩ ধারার ২ নং আইনকে ) বুঝায় ,

(বি) বিধি (Code) বলতে ১৯৭৩ সালের ফৌজদারী কার্যপ্রণালী বিধিকে (১৯৭৪ সালের ২ নং আইনকে) বুঝায়,

(সি) তপসিলভুক্ত জাতি এবং তপসিলভুক্ত উপজাতি [Scheduled Castes and Schdualed Tribes] বলতে ভারতীয় সংবিধানের ৩৬৬ অনুচ্ছেদের যথাক্রমে (২৪) ও (২৫) উপাংশে যাদের বলা হয়েছে তাদেরকে বুঝায় ,

(ডি) বিশেষ আদালত (Special court) বলতে এমন সেশন (দায়রা) আদালতকে বুঝায় যা এই আইনের ১৪ ধারায় বিশেষ আদালত বলে ঘোষণা করা হয়েছে ,

(ই) বিশেষ ফৌজদারী সরকারি উকিল / অভিযোজক (Special public ) বলতে বুঝায় কোন একজন ফৌজদারী সরকারি উকিল (অভিযোজক) যিনি বিশেষ ফৌজদারী সরকারি উকিল (অভিযোজন) হিসাবে ঘোষিত হয়েচেন , অথবা এই আইনের ১৫ ধারায় উল্লেখ করা কোন একজন এ্যাড্‌ভোকেট ,

(এফ্) সে সকল শব্দ ও অভিব্যক্তি এই আইনের ব্যবহৃত হলেও এই আইনে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে , সেই সকল শব্দ ও অভিব্যক্তির অর্থ উক্ত বিধিগুলিতে বলা মোতাবেক হবে ।

(২) যেক্ষেত্রে এমন কোন এলাকা সম্পর্কে এই আইনে কোন আইন বা তার বিধান উল্লেখ করা হয়ে থাকে যে , এলাকায় উক্ত আইন বা আইনের বিধান কার্যকর নয় সেক্ষেত্রে উক্ত এলাকায় কার্যকর উক্ত আইনের অনুরূপ আইনকে বুঝতে হবে ।

## নৃশংসতার অপরাধগুলি

**৩ ধারা** - নৃশংসতার অপরাধগুলির জন্য দন্ডাদি [ punishments for offences of atrocities ] (১) যদি কেউ তপসিলভুক্ত জাতি বা তপসিলভুক্ত উপজাতির সদস্য না হয়ে -

(i) তপসিলভুক্ত জাতি বা তপসিলভুক্ত উপজাতির কোন সদস্যকে কোন অখাদ্য বা অস্বাস্থ্যকর পদার্থ পান করতে বা খেতে জোর করে ,

(ii) তপসিলভুক্ত জাতি বা তপসিলভুক্ত উপজাতির কোন সদস্যের ক্ষতি অপমান বা বিরক্তি ঘটানোর অভিপ্রায়ে তার বাড়ী বা সংলগ্ন এলাকায় মল , বর্জ পদার্থ , পশুপক্ষীর মৃতদেহ , বা অন্য অস্বাস্থ্যকর পদার্থ নিক্ষেপ করে ,

(iii) তপসিলভুক্ত জাতি বা তপসিলভুক্ত উপজাতির কোন সদস্যের দেহ থেকে জোর করে জামাকাপড় খুলে নেয় বা উলঙ্গ করে কিংবা মুখে বা দেহে রঙচঙ তপসিল জাতি ও তপসিল উপজাতি (নৃশংসতা নিবারণ) আইন , ১৯৮৮ , অথবা মানুষের মর্যাদার হানিকর অনুরূপ কোন কাজ করে ,

(iv) তপসিলভুক্ত জাতি বা তপসিলভুক্ত উপজাতির কোন সদস্যের মালিকানাধীন বা তাকে বরাদ্দ করা , বা কোন উপযুক্ত কতৃপক্ষ কর্তৃক তাকে বরাদ্দ করা হবে বলে বিজ্ঞাপিত কোন জমি অন্যায্যভাবে দখল করে বা চাষ করে অথবা তাকে বরাদ্দ করা জমি হস্তান্তর করিয়ে দেয় ,

(v) তপসিলভুক্ত জাতি বা তপসিলভুক্ত উপজাতির কোন সদস্যকে তার জমি বা বাড়ি থেকে অন্যায্যভাবে বেদখল করে বা কোন জমি, বাড়ি বা জলাশয়ের উপরে তার অধিকার ভোগে অন্যায্য ভাবে হস্তক্ষেপ করে ,

(vi) তপসিলভুক্ত জাতি বা তপসিলভুক্ত উপজাতির কোন সদস্যকে , সার্বজনিক উদ্দেশ্যে

সরকার কর্তৃক আরোপ করা বাধ্যতামূলক কোন সেবাদান বাদ দিয়ে, বেগার কিংবা অনুরূপ অপর কোন ধরনের বা দাসত্বের শ্রমদান করতে বাধ্য করে বা চালিত করে,

(vii) তপসিলভুক্ত জাতি বা তপসিলভুক্ত উপজাতির কোন সদস্যকে, কোন বিশেষ নির্বাচনপ্রার্থীকে ভোট না দিতে বা ভোট দিতে বা আইনে যেভাবে বলা হয়েছে সেরূপে ছাড়া অন্য কোন রূপে ভোট দিতে জোর করে বা ভীতিপ্রদর্শন করে,

(viii) তপসিলভুক্ত জাতি বা তপসিলভুক্ত উপজাতির কোন সদস্যর বিরুদ্ধে অসত্য, বিদ্বেষপরায়ণ বা হয়রানকর মামলা কিংবা ফৌজদারী বা অন্য কোন কার্যবাহ রুজু করে,

(ix) কোন লোকসেবককে কোন অসত্য বা চপল সংবাদ দেয় এবং তদ্দ্বারা উক্ত লোকসেবককে তপসিলভুক্ত জাতি বা তপসিলভুক্ত উপজাতির কোন সদস্যের ক্ষতি বা বিরক্তিতে, তাঁর আইনানুগ ক্ষমতা প্রয়োগ করায়,

(x) সর্বসমক্ষে কোন স্থানে তপসিলভুক্ত জাতি বা তপসিলভুক্ত উপজাতির কোন সদস্যকে অবমান humiliate করার অভিপ্রায়ে উদ্দেশ্যকৃতভাবে অপমান বা ভীতিপ্রদর্শন করে,

(xi) তপসিলভুক্ত জাতি বা তপসিলভুক্ত উপজাতির কোন স্ত্রীলোকের অসম্মান বা তাঁর শালীনতা হানি করার অভিপ্রয়ে হামলা / আক্রমণ করে বা বলপ্রয়োগ করে,

(xii) তপসিলভুক্ত জাতি বা তপসিলভুক্ত উপজাতির কোন স্ত্রীলোকের ইচ্ছার উপর প্রভুত্ব করার মত অবস্থায় থেকে, উক্ত স্ত্রীলোককে যৌনভাবে কাজে লাগাতে উক্ত অবস্থার সুযোগ নেয় - যাতে উক্ত স্ত্রীলোক অন্য কোনভাবে রাজী হতেন না,



(xiii) সাধারণভাবে তপসিলভুক্ত উপজাতির সদস্যগণ কর্তৃক ব্যবহৃত কোন ঝর্ণা, জলাশয় বা অন্য কোন জলের উৎস, যে কারণে তা সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয় সেই ব্যবহারের উপযোগিতাকে কম করে তুলতে, উক্ত ঝর্ণা, জলাশয় বা জলের উৎস দূষিত বা নোংরা করে,

(xiv) তপসিলভুক্ত জাতি বা তপসিলভুক্ত উপজাতির কোন সদস্যকে, কোন সার্বজনিক সমাগমের স্থানে প্রবেশের প্রথাগত অধিকার অস্বীকার করে, অথবা যে সার্বজনিক সমাগমের স্থান জনসাধারণের অন্য সদস্যাগণের বা তাদের কোন অংশের ব্যবহার করার অধিকার বা তথায় প্রবেশ করার অধিকার আছে সেই স্থান তপসিলভুক্ত জাতি বা তপসিলভুক্ত উপজাতির কোন সদস্য যাতে ব্যবহার করতে না পারে বা তথায় প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য উক্ত সদস্যকে বাধা দেয়,

(xv) তপসিলভুক্ত জাতি বা তপসিলভুক্ত উপজাতির কোন সদস্যকে তার বাড়ীর গ্রাম বা বসবাস করার অন্য কোন স্থান ত্যাগ করতে জোর করে বা বাধ্য করে,

তবে সে ছয় মাসের কম নয় কিন্তু পাঁচ বছর পর্যন্ত হতে পারে এরূপ কোন একটি মেয়াদের কারাদন্ডে এবং অর্থদন্ডে দন্ডিত হবে ।

(২) যদি কেউ তপসিলভুক্ত জাতি বা তপসিলভুক্ত উপজাতির সদস্য না হয়ে -

(i) তপসিলভুক্ত জাতি বা তপসিলভুক্ত উপজাতির কোন সদস্যকে বর্তমানে চালু কোন আইনের মৃত্যুদন্ডযোগ্য অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করানোর অভিপ্রায়ে বা সম্ভবতঃ সেরূপ হবে এরূপ জেনে, অসত্য সাক্ষ্য দেয় বা সাজায়, তবে সে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে এবং অর্থদন্ডে দন্ডিত হবে, এবং ঐরূপ অসত্য সাক্ষ্য দেওয়া বা সাজানোর ফলে যদি তপসিলভুক্ত জাতি বা তপসিলভুক্ত উপজাতির কোন নির্দোষ সদস্য দোষী সাব্যস্ত হয় এবং আইনবলে তার মৃত্যুদন্ড কার্যকর হয় তবে যে ব্যক্তি ঐরূপ অসত্য সাক্ষ্য দেয় বা সাজায় সেই ব্যক্তি মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত হবে,

(ii) তপসিলভুক্ত জাতি বা তপসিলভুক্ত উপজাতির কোন সদস্যকে মৃত্যুদন্ডযোগ্য নয় কিন্তু সাত বছর বা ততোধিক মেয়াদের কারাদন্ডযোগ্য কোন একটি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করানোর অভিপ্রায়ে বা সম্ভবতঃ সেরূপ হবে এরূপ জেনে, অসত্য সাক্ষ্য দেয় বা সাজায়, তবে সে ছয় মাসের কম নয় কিন্তু সাত বছর বা ততোধিক হতে পারে এরূপ কোন একটি মেয়াদের কারাদডে এবং অর্থদন্ডে দন্ডিত হবে,

(iii) তপসিলভুক্ত জাতি বা তপসিলভুক্ত উপজাতির কোন সদস্যের কোন সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি করানোর অভিপ্রায়ে বা সম্ভবত ঃ সেরূপ হবে এরূপ জেনে তপসিল জাতি ও তপসিল উপজাতি (নৃশংসতা নিবারণ) আইন, ১৯৮৮, ১৮৩ বা কোন বিস্ফোরক পদার্থ দিয়ে অনিষ্ট ঘটায়, তবে সে ছয় মাসের কম নয় কিন্তু সাত বছর পর্যন্ত হতে পারে এরূপ কোন একটি মেয়াদের কারাদন্ডে এবং অর্থদন্ডে দন্ডিত হবে,

(iv ) তপসিলভুক্ত জাতি বা তপসিলভুক্ত উপজাতির কোন সদস্য সাধারণভাবে যে বাড়ী কোন একটি উপাসনাস্থল বা মানুষ বসবাসের স্থান বা সম্পত্তি হেফাজতে রাখার স্থান হিসাবে ব্যবহার করেন সেই বাড়ী ধ্বংস করার অভিপ্রায়ে বা সম্ভবতঃ সেরূপ হবে এরূপ জেনে, আগুন বা কোন বিস্ফোরক পর্দাথি দিয়ে অনিষ্ট ঘটায়, তবে সে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে এবং অর্থদন্ডে দন্ডিত হবে,

(v) কোন ব্যক্তি তপসিলভুক্ত জাতি বা তপসিলভুক্ত উপজাতির সদস্য বলে কিংবা কোন সম্পত্তি উক্ত সদস্যের সম্পত্তি বলে উক্ত ব্যক্তি বা সম্পত্তির বিরুদ্ধে ভারতীয় দন্ড বিধির দশ বা ততোধিক বছরের কারাদন্ডযোগ্য কোন অপরাধ করে তবে সে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে এবং অর্থদন্ডে দন্ডিত হবে,

(vi) এই অধ্যায়ের আওতায় কোন একটি অপরাধ করা হয়েছে এরূপ জেনে বা সেরূপ বিশ্বাস করার কারণ থাকা অবস্থায়, উক্ত অপরাধের অপরাধীকে আইনের দন্ড থেকে আড়াল করার অভিপ্রায়ে,

উক্ত অপরাধের কোন সাক্ষ্য লোপাট করে , অথবা উক্ত অভিপ্রায়ে যদি উক্ত অপরাধ সম্বন্ধে এরূপ সংবাদ দেয় যা সে অসত্য বলে জানে বা বিশ্বাস করে , তবে সে উক্ত অপরাধের জন্য বিধিত দন্ডে দন্ডিত হবে ,

(vii) একজন লোকসেবক হয়ে , এই ধারার কোন অপরাধ করে , তবে সে এক বছরের কম নয় কিন্তু যা উক্ত অপরাধের জন্য বিধিত মেয়াদ পর্যন্ত হতে পারে এরূপ কোন একটি মেয়াদের কারাদন্ডে দন্ডিত হবে ।

## দাসত্ববদ্ধ শ্রম পদ্ধতি (বিলোপন) , আইন , ১৯৭৬

দুর্বলতার শ্রেণীর আর্থিকও দৈহিক শোষণ নিবারণার্থে দাসত্বাবদ্ধ শ্রম পদ্ধতি বিলোপের জন্য একটি আইন

**১ ধারা** - সংক্ষিপ্ত নাম , বিস্তৃতি এবং আরম্ভ [ short title , extent and commencement ] (১) এই আইনকে ১৯৭৫ সালের দাসত্বাবদ্ধ শ্রম পদ্ধতি (বিলোপন) আইন বলা যেতে পারে।

(২) এই আইন ভারতবর্ষের সর্বত্র প্রযোজ্য ।

(৩) এই আইন ১৯৭৫ সালের ২৫ শে অক্টোবর তারিখে বলবৎ হয়েছে বলে মনে করা হবে ।

**২ ধারা** - সংজ্ঞাদি (Definitions ] প্রসঙ্গ থেকে বিরুদ্ধ প্রতীয়মান না হলে, এই আইনে -

(এ) " **অগ্রিম** [ advance] " বলতে কোন ব্যক্তি (এরপর যাকে ঋণদাতা বলা হয়েছে ) টাকায় বা দ্রব্যের , অথবা আংশিক টাকায় এবং আংশিক দ্রব্যে , অন্য ব্যক্তিকে (এরপর যাকে ঋণগ্রহীতা বলা হয়েছে ) যে অগ্রিম দেয় তাকে বুঝায় ,

(বি) " **চুক্তি** [ agreement ] " বলতে ঋণদাতা বা ঋণগ্রহীতার মধ্যে হওয়া চুক্তিকে (তা লিখিত বা মৌখিক , বা আংশিক লিখিত এবং মৌখিক যাই হোক না কেন ) বুঝায় এবং বলপূর্বক শ্রম করিয়ে নেওয়ার জন্য (যার অস্তিত্ব সংশিষ্ট এলাকায় বিরাজমান কোন সামাজিক প্রথায় আছে বলে অনুমিত হয় ) করা চুক্তি ও এর অর্ন্তভুক্ত ,

**ব্যাখা** [ Explanation ] সামাজিক প্রথার আওতায় , নিম্নলিখিত ধরনের বলপূর্বক শ্রম করিয়ে নেওয়র সম্পর্কে , ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতার মধ্যে চুক্তি আছে বলে সাধারণতঃ ধরে নেওয়া হয় , যথা -

আদি আমার , বরামাসি , বেথু , ভাগেলা , চেরুমার , গারুগালু , হালি , হারি , হারওয়াই , হল্যা, জন কামিয়া , কুন্ডিত মুন্ডিত , কুঠিয়া , লাখারি , মুনঝি , মাট , মুনিশ , পদ্ধতি , নিত্য মজুর , পালেরূ, পড়িয়াল , পান্নাওয়াইলাল , সাগরি সানঝি , সানঝাও য়াল , সেবক সেবকিয়া , সেরি ভেট্রি.

**(সি) মাতৃশাসিত সমাজের কোন ব্যক্তির সম্পর্কে " পূর্বপুরুষ "** (ascendant) বা " বংশধর (descendant)" বলতে সেই ব্যক্তিকে বুঝায় যে ব্যক্তি ঐ সমাজের উত্তরাধিকার আইন অনুসারে " পুর্বপুরুষ বা বংশধর" হন ,

**(ডি) " দাসত্বাবদ্ধ-দেনা** ( bonded debt ) " বলতে বুঝায় দাসত্বাবদ্ধ শ্রমিক (bonded labourer) কর্তৃক বা দাসত্বাবদ্ধ শ্রম পদ্ধতি অনুসারে , নেওয়া বা নেওয়া হয়েছে বলে অনুমতি কোন অগ্রিম (advance),

**(ই) " দাসত্বাবদ্ধ শ্রম** (bonded labour) " বলতে দাসত্বাবদ্ধ শ্রম পদ্ধতির আওতায় দেওয়া যেকোন শ্রম বা সেবাকে বুঝায় ।

**(এফ) " দাসত্বাবদ্ধ শ্রমিক** ( bonded labourer ) " বলতে বুঝায় এমন শ্রমিক যিনি দাসত্বাবদ্ধ দেনা' করেছেন বা করেছেন বলে অনুমান করা হয় ,

**(জি) " দাসত্বাবদ্ধ শ্রম পদ্ধতি** (bonded labour system)" বলতে সেই বলপূর্বক বা আংশিক বলপূর্বক শ্রম করিয়ে নেওয়ার পদ্ধতি বুঝায় যার আওতায় ঋণগ্রহীতা এই মর্মে ঋণদাতার চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে বা হয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে যে - (i) তার বা তার যেকোন বংশানুক্রমিক পূর্বপুরুষ বা বংশধরের নেওয়া অগ্রিমের কারণে (সেই অগ্রিম দলিল আকারে থাকুক বা না থাকুক ) এবং সেই অগ্রিমের উপরে যদি কোন সুদ দেওয়া হয় তবে সেই সুদের কারণে , বা

(ii) কোন প্রথাগত বা সামাজিক দায়বদ্ধতা অনুসারে , বা

(iii) উত্তরাধিকার হিসাবে তার উপরে বর্তানো কোন দায়বদ্ধতা অনুসারে ,

(iv) তার বা তার বংশানুক্রমিক পূর্বপুরুষদের বা বংশদরের নেওয়া কোন আর্থিক সুবিধার কারণে , বা

(v কোন বিশেষ জাতি বা সম্প্রদায়ে তার জন্মের কারণে,

তিনি , - (১) নিজে বা তার পরিবারের কোন সদস্য , বা তার উপর নির্ভরশীল কোন ব্যক্তির মাধ্যমে, ঋণদাতাকে ,বা ঋণদাতার সুবিধার্থে , বিনা মজুরীতে বা নামমাত্র মজুরীতে , নিদিষ্ট বা অনির্দিষ্ট সময়কালের জন্য , শ্রম বা সেবা দেবেন , বা

(২) কোন নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট সময়কালের জন্য কর্মে নিযুক্ত হওয়ার বা অন্য কোন জীবিকার উপায় গ্রহনের স্বাধীনতা হারাবেন , বা

(৩) ভারতের রাজ্যক্ষেত্রের সর্বত্র স্বাধীনভাবে চলাফেরা করবার অধিকার হারাবেন , বা

(৪) তার যেকোন সম্পত্তি অথবা তার বা তার পরিবারের কোন সদস্য কিম্বা তার উপর নির্ভরশীল কোন ব্যক্তির শ্রমের ফসল নিজের ভোগে লাগানোর বা বাজারদরে বিক্রি করবার অধিকার হারাবেন ।

এবং এর মধ্যে সেই বলপূর্বক বা আংশিক বলপূর্বক শ্রম করিয়ে নেওয়ার পদ্ধতিও অন্তর্ভুক্ত যার আওতায় ঋণগ্রহীতার কোন জামিনদার এই মর্মে ঋণদাতার সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হন বা হয়েছেন বলে মনে হয় সে ঋণগ্রহীতা দেনা শোধ করতে ব্যর্থ হলে তিনি (জমিনদার) ঋণগ্রহীতার হয়ে দাসত্ববদ্ধ শ্রম দেবেন ।

**(এইচ) কোন ব্যক্তির সম্পর্কে , " পরিবার (family) "** বলতে তার পূর্বপুরুষ ও বংশধরও ' পরিবারের ' অন্তর্ভুক্ত হয়,

**(আই) " নামমাত্র মজুরী (nominal wages) "** বলতে কোন , শ্রমের সম্পর্কেসেই মজুরীকে বুঝায় যা -

(এ) ঐ শ্রম বা অনুরূপ শ্রমের সম্পর্কে , প্রচলিত কোন আইনের আওতায় সরকারের নির্দিষ্ট করে দেওয়া নুন্যতম মজুরী থেকে কম , এবং

(বি) যেক্ষেত্রে কোন ধরনের শ্রমের সম্পর্কে ঐরূপ ন্যুনতম মজুরী নির্দিষ্ট করা নেই , সেক্ষেত্রে ঐ ধরনের বা অনুরূপ ধরনের শ্রমের জন্য একই এলাকায় কর্মরত শ্রমিকদের যে মজুরী সাধারণতঃ দেওয়া হয় সেই মজুরী থেকে কম,

**(জে) " ঘোষিত (prescribed )"** বলতে এই আইনের আওতায় রচিত নিয়মাবলীতে ঘোষিত' কে বুঝায় ।

**৪ ধারা** - দাসত্ববদ্ধ শ্রম পদ্ধতির বিলোপন [ Abolition of bonded labour system]

(১) এই আইন আরম্ভের দিনে , দাসত্বাবদ্ধ শ্রম পদ্ধতি বিলোপ হল এবং দাসত্বাবদ্ধ প্রত্যেক শ্রমিক যেকোন দাসত্বাবদ্ধ শ্রম দেওয়ার দায়বদ্ধতা থেকে বন্ধনহীন ও ভারমুক্ত হলেন ।

(২) এই আইন আরম্ভের পর, কোন ব্যক্তি -

(এ) দাসত্বাবদ্ধ শ্রম পদ্ধতি অনুসারে , বা বলপূর্বক শ্রম করিয়ে নেওয়ার আওতায় কোন অগ্রিম দেবেন না , বা

(বি) কোন দাসত্বাবদ্ধ শ্রম দেওয়ার জন্য বা কোন ধরনের বলপূর্বক শ্রম করিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে কাউকে বাধ্য করবেন না ।

**১৬ ধারা** - দাসত্বাবদ্ধ শ্রমের আদায়করণের জন্য দন্ড [ punishment for enforcement of bonded labour ] যদি কেউ , এই আইন চালু হওয়ার পর , কোন দাসত্বাবদ্ধ শ্রম দেওয়ার জন্য কোন ব্যক্তিকে বাধ্য করে তবে সে তিন বছরে পর্যন্ত হতে পারে এরূপ কোন একটি মেয়াদের কারাদন্ডে এবং দুই হাজার টাকা পর্যন্ত হতে পারে এরূপ কোন একটি অঙ্কের অর্থদন্ডেও দন্ডিত হবে ।

**১৭ ধারা** - দাসত্বাবদ্ধ দেনার অগ্রিম দেওয়ার জন্য দন্ড [ punishment for advance-

ment of bonded debt ] যদি , কেউ এই আইন চালু হওয়ার পর ,কোন দাসত্বাবদ্ধ দেনার অগ্রিম দেয় তবে সে তিন বছর পর্যন্ত হতে পারে এরূপ কোন একটি মেয়াদের কারাদন্ডে এবং দুই হাজার টাকা পর্যন্ত হতে পারে এরূপ কোন একটি অঙ্কের অর্থদন্ডের দন্ডিত হবে ।

**১৮ ধারা** - দাসত্বাবদ্ধ শ্রম পদ্ধতির আওতায় দাসত্বাবদ্ধ শ্রম জোর করে আদায় করার জন্য দন্ড ( Punishment for extraction bonded labour under the bonded labour system ] যদি কেউ , এই আইন চালু হওয়ার পর , এমন কোন প্রথা , ঐতিহ্য , চুক্তি বা কোন দলিল বলবৎ করে যার ফলে কোন ব্যক্তিকে বা ঐ ব্যক্তির পরিবারের কোন সদস্যকে বা ঐ ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল কোন ব্যক্তিকে দাসত্বাবদ্ধ শ্রম পদ্ধতির আওতায় কোন সেবা (service) দিতে হয় তবে সে তিন বছর পর্যন্ত হতে পারে এমন কোন একটি মেয়াদের কারাদন্ডে এবং দুই হাজার টাকা পর্যন্ত হতে পারে এরূপ কোন অঙ্কের অর্থদন্ডেও দন্ডিত হবে , এবং অর্থদন্ড আদায় হলে তা থেকে দাসত্বাবদ্ধ শ্রমিককে (bonded labour ) প্রত্যেক দিন পাঁচ টাকা হিসাবে সেই দিনগুলির জন্য টাকা দেওয়া হবে যতদিন ধরে তার কাছ থেকে দাসত্বাবদ্ধ শ্রম আদায় করা হয়েছিল ।

**১৯ ধারা** - দাসত্বাবদ্ধ শ্রমিককে সম্পত্তি ফিরিয়ে দিতে ত্রুটি বা খেলাপ করলে [ punishment for omission or failure to restore of property to bonded labourers ] যদি কেউ , এই আইন মোতাবেক কোন দাসত্বাবদ্ধ শ্রমিকের হেফাজতে কোন সম্পত্তি ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়েও এই আইন চালু হওয়া থেকে ৩০ দিনের মধ্যে তা করতে ত্রুটি বা খেলাপ করে , তবে সে এক বছর পর্যন্ত হতে পারে এরূপ কোন একটি মেয়াদের কারাদন্ডে বা এক হাজার টাকা পর্যন্ত হতে পারে এরূপ কোন একটি অঙ্কের অর্থদন্ডে , বা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডিত হবে , এবং অর্থদন্ড আদায় হলে, তা থেকে , প্রত্যেকদিন পাঁচ টাকা হিসাবে সেই দিনগুলির জন্য তাকে টাকা দেওয়া হবে যতদিন ধরে তার হেফাজতে সম্পত্তিটি ফিরেয়ে না দেওয়া হয়েছে ।

**২০ ধারা** - প্ররোচনা দেওয়া অপরাধ হবে [Abetment to be an offence ] যদি কেউ, এই আইনের দন্ডনীয় কোন অপরাধের প্ররোচনা দেয় তাতে প্ররোচিত অপরাধটি ঘটে থাকুক বা না থাকুক , তবে সে প্ররোচিত অপরাধটির জন্য বিধিত দন্ডের একই দন্ডে দন্ডিত হবে ।

**ব্যাখা** [ Explanation ] ভারতীয় দন্ড বিধিতে " প্ররোচনার " যে অর্থ এই আইনের উদ্দেশেও " প্ররোচনা " সেই একই অর্থ হবে ।

**২১ ধারা** - প্রশাসনিক ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক অপরাধদির বিচার [ Offences to be tried .Executive Magistrates ] (১) এই আইনের অপরাধগুলির বিচারের জন্য রাজ্য সরকার প্রশাসনিক ম্যঅজিস্ট্রেটকে ১ ম শ্রেণীর বা দ্বিতীয় শ্রেণীর ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেটের [ Judicial Magistrate ] এর ক্ষমতাদি অর্পন করতে পারেন , এবং এইরূপ ক্ষমতা অর্পণের পরিপ্রেক্ষিতে যাঁকে

ঐরূপ ক্ষমতা অর্পণ করা হয় সেই প্রশাসনিক ম্যাজিস্ট্রেটকে , ১৯৭৩ সালের ফৌজদারী কার্যপ্রণালী বিধির (১৯৭৪ সালের ২ নং আইনের ) উদ্দেশ্যে ১ম শ্রেণীর বা দ্বিতীয় শ্রেণীর , যেখানে যেমন হতে পারে , ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেট [ Judicial Magistrate ] বলে মনে করা হবে ।

(২) এই আইনের অপরাধ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক সংক্ষিপ্ত প্রক্রিয়ায় বিচার হতে পারে ।

২২ ধারা - অপরাধগুলির ধর্তব্যতা [ Cognizance of offences ] এই আইনের প্রত্যেক অপরাধ এবং জামিনযোগ্য হবে ।

## ভারতীয় সংবিধান ঃ- প্রথম খন্ড

১৯৪৬ সালের ২৬ শে নভেম্বর সংবিধান পরিষদে ভারতীয় সংবিধান গ্রহণ করা হয় ।

ভারতীয় সংবিধানে একটি প্রস্তাবনা (Preamble) আছে । এই প্রস্তাবনায় সংবিধানের মূল নীতি এবং আদর্শ লিপিবদ্ধ করা আছে। মূল সংবিধানের ' প্রস্তাবনায় ' ভারতবর্ষকে একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র " বলে ঘোষণা করা হয়েছিল।

কিন্তু ৪২ তম সংবিধান সংশোধনের পর প্রস্তাবনায় ভারতবর্ষকে একটি সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র বলে ঘোষণা করা হয়েছে ।

### প্রস্তাবনাটি নিম্নরূপ

" আমরা ভারতবর্ষের গনগণ ভারতবর্ষকে একটি সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্ররূপে গড়ে তুলতে এবং এর সকল নাগরিক যাতে -

সামাজিক , অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ন্যায়বিচার , অভিব্যক্তির , বিশ্বাসের , ধর্মের ও উপাসনার স্বাধীনতা , প্রতিষ্ঠা ও সুযোগের সমতা নিশ্চিতভাবে লাভ করেন , এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তি মর্যাদা , জাতীয় ঐক্য ও সংহতির আশ্বাসক ভ্রাতৃভাব বর্দ্ধিত হয় ,

সেজন্য সত্যনিষ্ঠার সাথে সংকল্প করে আমাদের সংবিধান অদ্য ২৬ শে নভেম্বর ১৯৪৯ তারিখে এতদ্বারা গ্রহণ করছি , আমাদেরকে অর্পণ করছি "

প্রস্তাবনা সংবিধানের কার্যকরী অংশ নয় তবুও এর গুরুত্ব এই , যে যদি সংবিধানে কোন বিষয়ে অস্পষ্টতা থাকে, তবে প্রস্তাবনা অনুযায়ী তা ব্যাখা করা যায় ।

### দ্বিতীয় খন্ড — নাগরিকত্ব

**৫ নং অনুচ্ছেদ ঃ** সংবিধান কার্যকরী হওয়ার সময়ে - সংবিধান কার্যকরী হওয়ার সময়ে প্রত্যেক

ব্যক্তি যাদের ভারতবর্ষে বাস ছিল এবং ভারতবর্ষে জন্ম হয়েছিল , অথবা যাদের পিতা কিম্বা মাতার ভারতবর্ষে জন্ম হয়েছিল , অথবা সংবিধান কার্যকরী হওয়ার ঠিক পূর্বে যে সব ব্যক্তি পাঁচ বৎসর ধরে ভারতবর্ষে বসবাস করছিলেন তারা ভারতবর্ষের নাগরিক বলে বিবেচিত হবেন ।

**৬ নং অনুচ্ছেদ ঃ** যে সকল ব্যক্তি পাকিস্তান থেকে ভারতবর্ষে এসেছেন তাদের নাগরিকত্ব - উপরোক্ত ৫ নং অনুচ্ছেদ ছাড়া যে ব্যক্তি পাকিস্তান থেকে ভারতবর্ষে এসেছেন তিনি ভারতবর্ষে নাগরিক বলে বিবেচিত হবেন যদি -

(এ) ১৯৩৫ সালের Govt . of Indian Act আইনানুসারে শাসিত ভারতীয় এলাকায় তাদের বা তাদের পিতামাতার অথবা পিতামহ বা পিতামহীর জন্ম হয়ে থাকে , অথবা

(বি) (১) ১৯৪৮ সালের ১৯ শে জুলাইয়ের আগে যারা ভারতবর্ষে এসেছেন এবং সেই সময় থেকে বসবাস করছেন , অথবা

(২) ১৯৪৮ সালের ১৯ শে জুলাইয়ের আগে বা পরে ভারতবর্ষে এসে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করে ভারতবর্ষের নাগরিক হিসাবে পঞ্জিভুক্ত হয়েছেন । কিন্তু ঐ আবেদন মঞ্জুর হতে হলে তাকে কমপক্ষে ৬ মাস ভারতবর্ষে বসবাস করে থাকতে হবে ।

## তৃতীয় খন্ড — মৌলিক অধিকার

ভারতীয় সংবিধানের এই তৃতীয় খন্ডে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলি লিপিবদ্ধ আছে । এই অধিকারগুলিকে সাত ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে , যথা-

১) সাম্যের অধিকার , (২) স্বাধীনতার অধিকার , (৩) শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার , (৪) ধর্মের অধিকার , (৫) সংস্কৃতি ও শিক্ষা বিষয়ক অধিকার (৬) সম্পত্তির অধিকার , (৭) শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার ।

* কিন্তু ১৯৮৭ সালের ৪৪ তম সংবিধান সংশোধনের দ্বারা সম্পত্তির অধিকারকে মৌলিক অধিকারের অধ্যায় থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে ।

### সাম্যের অধিকার ঃ- ( ১৪ থেকে ১৮ নং অনুচ্ছেদ )

**১৪ নং অনুচ্ছেদ ঃ-** ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সীমার ভিতরে রাষ্ট্র কোন ব্যক্তিকে আইনের দৃষ্টিতে সমানাধিকার এবং আইনের মাধ্যমে সমভাবে রক্ষা পাওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত করবেন না ।

**১৫ নং অনুচ্ছেদ ঃ-** জাতি , দর্ম বর্ণ জন্মস্থান ও স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সকল নাগরিক সমান সুযোগ সুবিধার অধিকারী । সর্বসাধারণের জন্য ব্যবহৃত দোকান , হোটেল , রেস্তোরা , স্নানাগার , পুষ্করিণী এবং অন্যান্য প্রমোদের স্থানে প্রবেশের ক্ষেত্রে জাতি , ধর্ম বর্ণ প্রভৃতির জন্য কোন ভেদবিচার করা হবে না । কিন্তু জনস্বার্থে কিছু বাধানিষেধ আরোপ করা যেতে পারে , যেমন - সরকার জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য উপরে বলা স্থানগুলিতে ছোঁয়াচে রোগীর প্রবেশ নিষিদ্ধ করতে পারেন ।

এছাড়া রাষ্ট্র স্ত্রীলোক ও শিশুদের উন্নতির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন । আবার সামাজিক অথবা শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসর শ্রেণী এবং তপসিল জাতি ও উপজাতিদের উন্নতির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অনুমোদন করতে পারেন ।

**১৬ নং অনুচ্ছেদ ঃ-** সরকারি চাকুরীতে সকলের সমান অধিকার থাকবে । জাতি , ধর্ম , বর্ণ , স্ত্রী পুরুষ সকলেই যোগ্যতা অনুসারে সরকারি চাকুরীতে নিযুক্ত হতে পারবেন । কিন্তু রাষ্ট্র অনুন্নত শ্রেণীর জন্য সরকারি চাকুরি দেওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন ।

**১৭ নং অনুচ্ছেদ -** অস্পৃশ্যতা আচরণ নিষিদ্ধ । অস্পৃশ্য বলে কোন ভারতীয়কে সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হলে কিম্বা অসম্মান করা হলে আইনতঃ দন্ড হবে ।

**১৮ নং অনুচ্ছেদ ঃ-** উপাধি ব্যবহার নিষিদ্ধ । কেবলমাত্র সামরিক ও শিক্ষাগত উপাধি ছাড়া রাষ্ট্র কোন ব্যক্তিকে অন্য কোন উপাধি দেবেন না । ভারত সরকার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ভারতরত্ন , পদ্মশ্রী , পদ্মভূষণ ইত্যাদি উপাধি অবশ্য দেন । কিন্তু সরকারের মতে এইগুলি উপাধি নয় - পুরস্কার বা সম্মান মাত্র ।

**স্বাধীনতার অধিকার ( Right to freedom)**

**১৯ নং অনুচ্ছেদ ঃ-** এই অনুচ্ছেদ নাগরিকদের সাত প্রকার অধিকার দেওয়া হয়েছে , যথা ,-

(এ) বাক্‌স্বাধীনতার ও মতামত প্রকাশের অধিকার ,

(বি) শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্রভাবে সমবেত হওয়ার অধিকার,

(সি) ভারতের সর্বত্র স্বাধীনভাবে চলাচল করার অধিকার ,

(ডি) ভারতের যেকোন অঞ্চলে স্বাধীনভাবে বসবাস করার অধিকার ,

(ই) সম্পত্তি দখল , অর্জন ও হস্তান্তর করার অধিকার ,

(এফ্) যেকোন বৃত্তি , পেশা বা ব্যবসায় বাণিজ্য করার অধিকার ।

* কিন্তু ৪৪ তম সংবিধান সংশোধনের পর সম্পত্তির অধিকার আর মৌলিক অধিকার না থাকায় ভারতীয় নাগরিকগণ ছয় প্রকার স্বাধীনতার অধিকার বর্তমানে ভোগ করে থাকেন ।

**২০ নং অনুচ্ছেদ ঃ-** (১) আইন ভঙ্গের অপরাধে কোন ব্যক্তিকে কেবলমাত্র প্রচলিত আইন অনুসারে দন্ড দেওয়া হবে।

(২) একই অপরাধের জন্য একাধিকবার কোন ব্যক্তিকে দন্ড দেওয়া যাবে না ।

(৩)অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিজের বিরুদ্ধে আদালতে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা যাবে না ।

**২১ নং অনুচ্ছেদ ঃ-** আইন নির্দিষ্ট পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোন উপায়ে কোন ব্যক্তিকে তার জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না ।

**২২ নং অনুচ্ছেদ ঃ-** (১) যুক্তিসঙ্গত কারণ না দেখিয়ে কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা যাবে না ।

আটক ব্যক্তিকে উকিলের মাধ্যমে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

(২) গ্রেপ্তার করার ২৪ ঘন্টার মধ্যে আটক ব্যক্তিকে নিকটস্থ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে উপস্থিত করতে হবে এবং তাঁর আদেশ ছাড়া তাকে কোন মতেই অতিরিক্ত সময় আটক করা যাবে না।

(৩) " শত্রুভাবাপন্ন বিদেশী " এবং নিবর্তনমূলক আটক আইনে গ্রেপ্তার করা ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে উল্লিখিত নিয়মগুলি প্রয়োগ হবে না।

**শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার - ( Right against exploitation)**

**২৩ ও ২৪ নং অনুচ্ছেদ :-** ২৩ ও ২৪ অনুচ্ছেদ ' শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার ' স্বীকৃত হয়েছে। দাসপ্রথা , বেগার খাটানো , শিশুকর্মী নিয়োগ আইনের দৃষ্টিতে অপরাধ বলা হয়েছে।

**ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার :- Right to religion**

**২৫ থেকে ২৮ নং অনুচ্ছেদ :-** ভারতীয় সংবিধানের ২৫ থেকে ২৮ নং অনুচ্ছেদে জনগণের ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার স্বীকৃতি লাভ করেছে। বিভিন্ন উপায়ে সংবিধান ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ সংরক্ষিত হয়েছে।

**সংস্কৃতি ও শিক্ষা বিষয়ক অধিকার :- Cultural and educational rights**

**২৯ ও ৩০ নং অনুচ্ছেদ :-** ভারতীয় সংবিধান ২৯ ও ৩০ অনুচ্ছেদে সংস্কৃতি ও শিক্ষা বিষয়ক অধিকার ঘোষিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে সকল শ্রেণীর নাগরিক নিজ নিজ ভাষা , লিপি ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ করার অধিকার ।

**সম্পত্তির অধিকার :- Right to property**

**৩১ নং অনুচ্ছেদ :-** ৪৪ তম সংবিধান সংশোধনের ফলে সম্পত্তির অধিকারটি মৌলিক অধিকার থেকে বাদ হয়ে গেছে। এটি বর্তমানে একটি আইনগত অধিকার ।

**শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার :- Right to constitutional remedy**

**৩২ নং অনুচ্ছেদ :-** ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলি রক্ষার জন্য শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার সংবিধানের ৩২ ও ২২৬ অনুচ্ছেদ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সুপ্রীম কোর্ট বা হাইকোর্ট আদেশ বা নির্দেশ জারি করে অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন ।

## চতুর্থ খন্ড

### রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতি

### Directive principles of State policy

ভারতীয় সংবিধানের এই অধ্যায়ে কয়েকটি আর্থিক , সামাজিক ও রাজনৈতিক আদর্শের নীতি

সন্নিবেশিত হয়েছে। এগুলিকে রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতি (Directive principles of state policy) বলা হয়, জাতীয় জীবনের সকল স্তরে সামাজিক অর্থনৈতিক ন্যায়ের ভিত্তিতে সমাজকে গড়ে তুলে রাষ্ট্র জনকল্যাণে সচেষ্ট থাকবে - এটাই হল এই নীতিগুলির মূল উদ্দেশ্য।

রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিগুলি নিম্নে বর্ণনা করা হল ঃ-

(i) রাষ্ট্র এমনভাবে কাজ করবে এবং এমন সমাজ ব্যবস্থা সৃষ্টি করবে যাতে জনগণ সামাজিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার ভোগ করেন।

(ii) নরনারী নির্বিশেষে যেন প্রত্যেকে জীবীকা অর্জনের সুবিধা পায়, উপযুক্ত বেতন পায় ও স্বচ্ছন্দে জীবনযাপন করতে পারেন।

(iii) ধন বন্টনে যেন সাম্য বজায় থাকে, উৎপাদনের উপকরণ ও ধন সম্পদ যেন মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে কেন্দ্রীভূত না হয়।

(iv) গ্রামাঞ্চলে কুটির শিল্প ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, অনুন্নত শ্রেণীর বৈষয়িক ও শিক্ষাগত উন্নতি বিধান করা সরকারের কাজ বলে গণ্য হবে।

(v) সার্বজনিক অবৈতনিক ও আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা সরকারের অন্যতম কর্তব্য বলে গণ্য হবে।

(vi) শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথক করতে হবে।

(vii) আর্ন্তজাতিক শান্তি ও সৌহার্দ স্থাপন, পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিবাদের মীমাংসা ইত্যাদি সরকারের লক্ষ্য হবে।

(viii) প্রত্যেকের কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করা, বেকার ভাতা, বার্ধক্য ভাতা, অসুস্থতা বা দৈব দুর্ঘটনায় সাহায্য দান সরকারের কর্তব্য হবে।

(ix) নারী ও পুরুষের মধ্যে সমান কাজের জন্য সমান বেতনের অধিকার, শোষিত না হওয়ার এবং শিক্ষা পাওয়ার অধিকার প্রভৃতি আদর্শগুলি সামনে রেখে রাষ্ট্রীয় কার্যাবলী পরিচালিত হবে।

উপরোক্ত নির্দেশমূলক নীতিগুলির বাস্তব রূপায়ণে সরকার বাধ্য নন এবং এগুলি পালিত না হলে আদালতে প্রতিকার প্রার্থনা করা যায় না - তবে আইন প্রণয়নের সময় রাষ্ট্র এই নীতিগুলি অনুসরণ করবেন কারণ এইগুলি শাসন পরিচালনার মৌলিক নীতি এবং কল্যাণকামী রাষ্ট্রের অনুসরণীয়।

উপরোক্ত নির্দেশমূলক নীতিগুলির বাস্তব রূপায়ণে সরকার বাধ্য নন এবং এগুলি পালিত না হলে আদালতে প্রতিকার প্রার্থনা করা যায় না - তবে আইন প্রণয়নের সময় রাষ্ট্র এই নীতিগুলি অনুসরণ করবেন কারণ এইগুলি শাসন পরিচালনার মৌলিক নীতি এবং কল্যাণকামী রাষ্ট্রের অনুসরণীয়

## চতুর্থ (এ) খন্ড

## মৌলিক কর্তব্যাদি ঃ-

## Fundamental Duties

### (৫১ -এ অনুচ্ছেদ )

নাগরিকদের শুধুমাত্র রাষ্ট্রপ্রদত্ত অধিকার ভোগ করলেই চলবে না , রাষ্ট্রের প্রতি তাদের ও কর্তব্য আছে। প্রকৃতপক্ষে কর্তব্য ও অধিকার একে অপরের পরিপূরক । মূল ভারতীয় সংবিধানে মৌলিক অধিকারের উল্লেখ থাকলেও মৌলিক কর্তব্য সম্বন্ধে কোন উল্লেখ ছিল না । ২৪ তম সংশোধনের দ্বারা নাগরিকদের মৌলিক কর্তব্যগুলি সংযোজিত হয়েছে এবং সংবিধানের এই অধ্যায়ে তা অর্ন্তভুক্ত ।

ভারতের প্রত্যেক নাগরিকদের কর্তব্য হবে -

(i) সংবিধান মেনে চলা এবং সংবিধানের সকল আদর্শ ও জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীতকে শ্রদ্ধা করা ,

(ii) যে মহান আদর্শ আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামকে উদ্বুদ্ধ করেছিল তা পোষণ ও অনুসরণ করা ,

(iii) ভারতের সার্বভৌমত্ব, ঐক্য ও অখন্ডতা সমুন্নত রাখা ও রক্ষা করা ,

(iv) আহ্বান জানানো হলে দেশের প্রতিরক্ষা ও জাতীয় সেবামূলক কাজে আত্মনিয়োগ করা ,

(v) ধর্মীয় , ভাষাগত ও আঞ্চলিক বা শ্রেণীগত পার্থক্য অতিক্রম করে ভারতের জনগণের মধ্যে সমন্বয় ও ভ্রাতৃত্ববোধ বৃদ্ধি করা এবং নারীজাতির মর্যাদা হানিকর আচরণ পরিত্যাগ করা ,

(vi) আমাদের মিশ্র সংস্কৃতির গৌরবময় ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং তা রক্ষণাবেক্ষন করা ,

(vii) বন, হ্রদ , নদী , ও বন্য প্রাণী সমেতে প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষা করা এবং তার উন্নতিসাধন করা এবং সমস্ত রকম জীব জন্তুর প্রতি সদয় হওয়া ,

( viii) বৈজ্ঞানিক মানসিকতা , মানবিকতা , অনুসন্ধিৎসা , সংস্কারের স্পৃহা বিকশিত করা ,

(ix) জাতীয় সম্পত্তি রক্ষা করা এবং শপথপূর্বক হিংসার পথ পরিহার করা,

(x) জাতি যাতে উদ্যাম ও সাফল্যের উচ্চতর স্তরে সতত উন্নতি লাভ করে সেজন্য ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সর্বপ্রকার প্রচেষ্টার দ্বারা সকল ক্ষেত্রে উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা করা ।

## দ্বাদশ খন্ড

## Part - XII

**৩০০ -এ অনুচ্ছেদ ঃ-** আইনের কর্তৃত্বে ছাড়া কোন ব্যক্তিকে তাঁর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা

যাবে না :

## জাতীয় সম্মানের প্রতি অমর্যাদা নিবারণ আইন , ১৯৭১

(১৯৭১ সালের ৬৯ নং আইন )

জাতীয় সম্মানের প্রতি অমর্যাদা নিবারণ করতে একটি আইন

**১ধারা** - সংক্ষিপ্ত নাম এবং বিস্তৃতি [ Short title and extent ] (১) এই আইনকে ১৯৭১ সালের জাতীয় সম্মানের প্রতি অমর্যাদা নিবারণ আইন বলা যেতে পারে ।

(২) এই আইন ভারতবর্ষের সর্বত্র প্রযোজ্য ।

**২ ধারা** - ভারতীয় জাতীয় পতাকা এবং ভারতবর্ষের সংবিধানের প্রতি অমর্যাদা [ Insult to Indian National Flag and Constitution of India ] কেউ কোন সর্বসাধারণের স্থানে বা সর্বসাধারণের দৃষ্টিগোচরযোগ্য অন্য কোন স্থানে পুড়িয়ে , অঙ্গচ্ছেদ করে , সৌন্দর্যহানি করে , নোংরা করে চেহারা বিকৃত করে ধ্বংস করে , অবজ্ঞাভরে পদদলিত করে বা অন্য কোনভাবে (মৌখিক বা লিখিত শব্দেই হোক বা কাজের মাধ্যমে হোক ) ভারতীয় জাতীয় পতাকা অথবা ভারতের সংবিধান বা তার কোন অংশের অমর্যাদা (insult ) করলে তিন বছর কারাদন্ড পর্যন্ত হতে পারে এরূপ কোন একটি মেয়াদের কারাদন্ডে , বা অর্থদন্ডে, বা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডিত হবে ।

**১ নং ব্যাখা** ( Explanation -1 ) ভারতের সংবিধান বা ভারতীয় জাতীয় পতাকার অথবা আইনানুগভাবে ভারতের কোন একটি সংশোধন করানোর উদ্দেশ্যে কিম্বা ভারতীয় পতাকার কোন একটি পরিবর্তন করানোর উদ্দেশ্যে সরকারের পদক্ষেপের বিষয়ে অনুমোদন বা সমালোচনামূলক মন্তব্য এই ধারার আওতায় অপরাধ নয়।

**২ নং ব্যাখা** (Explanation -2 ) ভারতীয় জাতীয় পতাকা বলতে ভারতীয় জাতীয় পতাকার যে কোন ছবি , রঙিন চিত্রাঙ্কন বা আলোকচিত্র বা অপরাপর দৃশ্যমান নিবেদন , অথবা কোন পদার্থ দিয়ে তৈরী বা কোন পদার্থের উপর নিবেদিত ভারতীয় জাতীয় পতাকার কোন অংশ বা অংশাদিকে বুঝাবে ।

**৩ নং ব্যাখা** (Explanation -3 ] সর্বসাধারণের স্থান (Public place) বলতে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য , অথবা জনসাধারণের প্রবেশাধিকারযোগ্য প্রবর্তিত যেকোন স্থানকে বুঝায় এবং সর্বসাধারণের যেকোন গাড়িকেও বুঝায় ।

**৩ ধারা** - ভারতীয় জাতীয় সঙ্গীত ইত্যাদি গাওয়াকে প্রতিরোধ করলে (Prevention of singing of Indian National Anthem ] কেউ উদ্দেশ্যকৃত ভাবে ভারতীয় জাতীয় সঙ্গীতের

গাওয়া প্রতিরোধ কর'লে বা উক্ত সঙ্গীত গাইতে থাকা কোন সমাবেশ বিঘ্ন সৃষ্টি করলে তিন বছর পর্যন্ত কারাদন্ড হতে পারে এরূপ কোন একটি মেয়াদের কারাদন্ডে, বা অর্থদন্ডে, বা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডিত হবে ।

## Position of Minorities in India

Among the great population of one hundred crores , eight percent more than are Hindus and The remaining 20 percent are minorities . The Constitution of India gives more than sufficient right and protection to the minority classes.

ARTICLE 14 grants to every person equality before law , that the state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws with in the territories of India. The supreme Report of-1945 in corporating the proposals of supra committee while laying emphasis on minorities enunciated the fundamental rights, described as the fundamental rights of the proposed new constitution as a standing warning to all "that what the constitution demands and expects is perfect equality between one section of the communities and another in the matter of political and civil right , equalits of liberty and Security in the enjoyment of fredom of religion worship and pursuit of the ordinary application of life .

ARTICLE 15 prohibits discrimination on grounds of religion race , caste , sex or place of birth . The general mandates of Articles 14 and 15 completely projects the right of the minorities. ARTICLE 25 provides freedom of science and free profession practice and propagation of religious to all including the minorities This is an absolute right granted to all person's to Whatever community , Majority orminority . They might be or may belong to , except a few restrictions providing for social welfare and reform .

ARTICLE 26 provides for freedom to manage religious affairs to all majority as well well as minority communities and their member's but subject to public order morality . And health (a) to establish and maintain institution's for religious and charitable purpose to manage their own

affairs in matters of religion to own and enquire movable and immovable property and to administer such property in accordance with law .

ARTICLE 27 provides special protection to minorities relating in freedom as to payment for taxes for promotion of any particular religion that no person shall be compelled to pay any taxes the proceeds of which are specifically appropriated in payment for expenses in the promotion or main tenance of any particular religion or religious domination.

ARTICLE 28 provides freedom as to attendance at religious institution shall be provided from any educational institution , wholly mantained outer State funds . Subject to the exception that (2) an educational institution Which is administered by the state but has been established under any endow ment or trust,which requires that religions instruction shall be impaired insuch institution .It has been further provided in this Article.(3) that noperson attending any educational institution recognized by the state or receiving aid out of state founds shall be required to false part in any religious instruction that may be imparted in such institution or in any premises attached there to unless . It person or if such person is a minor his guardian has given his consent there to .

ARTICLE 29 particularly denotes the interests of minorities . It provides for the protection of interests on minorities . That (1) any section of the citizens residing in the territory of India or any part there of having a distinct language, Script or culture of its own shall have the right to conserve lie same and that (2) no citizen shall be denied admission into any educational institution mantained by the state funds on grounds only of religion , race, Caste . Languge or any of them .

National Commission for Scheduled Castes and Scheduated Tribes.

(1) There shall be a Commission for the the Scheduled Castes and Schedule Tribes to be Known as the National Commission for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

(2) Subject to the Provisions of any law made in this behalf by parliament , the commission Shall consist of a Chairperson , Vice -Chairperson and five other Members and the conditions of service and tenure of office of the Chairperson, Vice - Chairperson and other Members so appointed shall be such as the president may be rule determine.

(3) The Chairperson , Vice - Chairperson and other Members of the Commission shall be appointed by the president by warrant under his hand seal.

4) The Commission shall have the power to regulate its own procedure.

5) It shall be the duty of the Constitution :-

a) to investigate and monitor all matters relating to the safeguards provided for the Scheduled Castes and Tribes under this Commission or under any other law for the time being in force or under any order of the Government and to evaluate the working of such safeguards.

b) to inquire into specific complaints with respect to the deprivation of rights and safeguards of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

c) to participate and advise on the planning process of socio economic development of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and to evaluate the progress of their development under the union and the State .

d) to present to the president , annually and at such other items as the times as the Commission maydeem fit , reports upon the working of those safeguards.

e) to make in such reports recommendations as to measures that should be taken by the union or any State for the effective implementation of those safeguards and other measures for the protection , welfare and socio -economic development of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and

f) to discharge such other functions in relation to the protection , welfare and development and advancement of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes as the president may , subject to the provision of any law made by parliament ,by rule specify .

6) The president shall cause all such reports to be laid before each House of parliament along with a memorandum explaining the action taken or proposed to be taken on the recommendations relating to the union and the reasons for the non - acceptance , if any , of any of such recommendations.

7) Where any such report , or any part thereof , relates to any matter

with which any State Governments Concerned , a copy of such report shall be forwarded to the Governor of the State who shall cause it to be laid before the Legislature of the State along with a memorandum explaining the action taken or proposed to be taken on the recommendations relating to the State and the reasons for the non - acceptance , if any , of any of such recommendations .

8) The commission shall , while investigating any matter referred to in sub - clause (a) or inquiring into any complaint referred to in sub - class (b) of cause (5) have all the powers of a civil Court trying a suit and in particular in respect of the following matters namely :-

a) Summoning and enforcing the attendance of any person from any part of India and examining him on oath .

b) requiring the discovery and production ofany documents,

c) receiving evidence on affidavits,

d) requisitioning any public record or copy there of from any court or office,

e) issuing commissions for the examination of witnesses and documents,

f) any other matter which the president may by rule , determine .

9) The union and every State Government shall consult the commission on all major police matters affecting Scheduled Castes and Scheduled Tribes .

10) In this Article , references to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes shall be constituted as including reference to such other backward classes as the president may , on receipt of the report of a Commission appointed under clause (1) of Article 340 of the Constitution by order specify and also to the Anglo - Indian community

**Prohibition of discrimination on grounds of religion , race , caste , sex or place of birth.**

1) The state shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion race , caste sex , place of birth or any of them

2) No citizen shall , on grounds only of religion , race casts sex ,place of birth or any of them , be subject to any disability , liability , restriction or condition with regard to -]

a) access to shops public restaurants , hotels , and places of public entertainment , or

b) The use of wells , tanks , bathing ghats , road and places of public resort maintained wholly or partly out of state funds or dedicated to the use of the general public.

3) Nothings in this Article shall prevent the State from making any special provision for women and children .

4) Nothing in this Article or in clause (2) of Artical 29 shall prevent the State from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.

**SCHEDULED CASTES AND RESERVATION**

**protection of backward classes from social injustice.**

The senior advocate put forth an argument that the enabling power conferred under Article 16(4) is intended for the benefit of the ' backward classes of citizens" Who in the opinion of the State are not adequately represented in the services under the state and that the power in one coupled with a duty and , therefore , has to be exercised by the state for the benefit of those for whom it is intended reference was made to H.W.R . wade Administrative Law, Halsbury's Laws of England , He add that the duty caused on the State is to be exercised in keeping with the directive principles laid under Article 46 to promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people and , in particular , of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and to protect them from social injustice and all other forms of exploitation .

## সামাজিক , দেশীয় ,আন্তর্জাতিক
## ও
## জাতীয় প্রেক্ষাপটে আলোচনা।

## সামাজিক , দেশীয় ,আন্তজার্তিক ও জাতীয় প্রেক্ষাপটে আলোচনা।

*(ধারাবাহিক কিছু ঘটনা তথ্যভিত্তিক ভাবে লেখক প্রবন্ধকারে লিখেছেন , যা অধিকার সম্বলিত এবং রাজ্যের বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ও ম্যাগাজিনে প্রকাশিত ও হয়েছে ।)*

**আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ** ঃ- ১১ই সেপ্টেম্বর ২০০১ ইং আমেরিকার ওয়াশিংটন ও নিউইর্য়ক এ ঘটেযাওয়া ঘটনা ( যে সন্ত্রাসবাদী আক্রমন ) কখনো কোন সভ্যদেশে সভ্যমানুষের কাছে প্রশংসীয় হতে পারে না ? তাই বলে প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধের আগুনে নিরীহ্ জনগণের উপর আক্রমন ও প্রশংসার দাবী রাখতে পারে না । এক শক্তির কাছে পদানত হয়ে লেজুর বৃত্তি করার দিন ফুরিয়ে গেছে। ধর্ম নিরপেক্ষ ও সহিষ্ণু ভারতবাসী দীর্ঘদিন ধরে লক্ষ্য করে আসছে , যদিও সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে বিশাল ভারত ভূমিকে দ্বিখন্ডিত করে ভারত ও পাকিস্তান দুই রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান ভারতের সহিত অ - মিত্র সুলভ আচরন করে চলছে দ্র। ভারত বির্দ্বেষটা মনে হয় পাকিস্তানের জাতীয় নীতি । যখনই পাকিস্তানে কোন আভ্যন্তরীন অসন্তোষ দেখা দেয় তখনই পাকিস্তানের শাসককূল অসন্তোষ দমনের উদ্দেশ্যে জনসাধারনের দৃষ্টি ভারতের শত্রুতার দুহাই দিয়ে বিভ্রান্ত করার নীতি অনুসরন করে । তা যেন সদাসর্বদা ভারতে বিরুদ্ধে সামরিক প্রস্তুতি একটু মনযোগ সহকারে লক্ষ্য করলে দেখা যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে প্রায়শই অস্ত্র শস্ত্র দিয়ে সাহায্য অব্যাহত রাখে । ফলশ্রুতিতে পাকিস্তান রনমধে মত্ত হইয়া পরপর পাঁচবার ভারত আক্রমন করে । প্রথমবার কাশ্মীর আক্রমন (১৯৪৭ ) হতে শুরু করে কচ্ছের রান আক্রমন (১৯৬৫) , এ বছরই কাশ্মীরে মুজাহিদ বাহিনী প্রেরন করে , সীমানা লঙ্ঘন এবং কারগিল অভিযান । আভ্যন্তরীন দুর্বলতা ও ভারতের বিরুদ্ধে বিদ্দের্ষপূর্ণ মনোভাব গ্রহনের ফলে পাকিস্তানের বৈদেশিক নীতি পশ্চিমী শক্তিগোষ্ঠীর অনুগামী হতে শুরু করে । পশ্চিমী শক্তিগোষ্ঠী ও পাকিস্তানের আভ্যন্তরীন দুর্বলতা ও ভারত বির্দ্বেষের সুযোগ গ্রহন করে পাকিস্তানের প্রতি সহানুভুতিশীল হয় । বিশেষ করে কাশ্মীর সীমানা নিয়ে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষ শুরু হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট ব্রিটেন পাকিস্তানের পক্ষ অবলম্ভন করে , কারন স্বরুপ বলা যেতে পারে ভারতের জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি পশ্চিমী শক্তিগোষ্ঠীর

সাম্যবাদের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ বাঁধাদানের পথে অন্তরায় হয়ে উঠার ফ'ল পাকিস্তানের সমর্থন করে তারা নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখার জন্য উৎসাহিত হয় এবং পাকিস্তানকে শক্তিশালী করে তুলতে বদ্ধপরিকর হয় । বিশেষত কাশ্মীরের সমস্যার সময়ে পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে সামরিক দক্ষতার পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয়ে আধুনিক সামরিক সাজ সরঞ্জামে সৈন্য বাহিনীকে সুসিজ্জিত করে তুলার জন্য পশ্চিমী শক্তিগোষ্ঠীর সাহায্য প্রার্থী হয় কারন ভারতের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান প্রেরন করা ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে পাকিস্তান দক্ষিন - পূর্ব এশিয়ার মুক্তিসংস্থায় (SEATO) যোগ দেয় । উদ্দেশ্য সাম্যবাদী আন্দোলনকে দমন করা এবং নেটুর সাহায্য লাভ করা , যার ফলশ্রুতিতে পাকিস্তান উত্তর আটলান্টিক মুক্তি সংস্থার মাধ্যমে প্রচুর অস্ত্র শস্ত্র লাভ করে এবং পাকিস্তান তার পূবাংশে ঝিকর গাছা সামরিক বিমান বন্দরকে উন্নত করে এবং পশ্চিমাংসের সারগদা বিমান বন্দরকে আধুনিক সমর উপকরণে সুসজ্জিত করে যদিও ভারত তাহার প্রতিবাদ জানায় , কিন্তু আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ভারতের প্রতিবাদে প্রতি কোন কর্ণপাত করে নি বরঞ্চ মার্কিন যুক্তরাষ্ঠ প্রেরিত সাজোয়া বিমান বাহিনী ট্রেংক ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে সামরিক শক্তি প্রয়োগ শক্তি বাড়ার জন্য পাকিস্তানকে সাহায্য করে যার ফলে পাকিস্তান ও ভারতের সম্পর্কের দ্রুত অবনতি হয় । ১৯৫৪ সালে পাকিস্তান পাশ্চত্য সামরিক জোটে যোগদান করলে ইঙ্গ মার্কিন শক্তির পাকিস্তান প্রীতি বৃদ্ধি পায় । রাষ্ট্রসংঘ সোভিয়েত প্রতিনিধি জ্যাকব মালিক পাশ্চত্য শক্তিবর্গ কাশ্মীরকে কুক্ষিগত করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত বলে অভিযোগ উত্থাপন করেন । এই অভিযোগ যে ভিত্তিহীন নয় তার প্রমাণ ১৯৫৭ সালের ইঙ্গ মার্কিন প্রস্তাব । প্রকৃত পক্ষে কাশ্মীর যে সকল কমিশন ও মধ্যস্থ হয় তাদের পশ্চাদপটে দেখা যায় ইঙ্গ মার্কিন শক্তি ও পাকিস্তানের গণভোটের দাবী । কিন্তু পাকিস্তান যে বেআইনী ভাবে কাশ্মীরের একাংশ অধিকার করে রেখেছে সে সম্পর্কে ইষ্ট মার্কিন শক্তি নীরবতা অবলম্বন করে । অধিকন্তু সামরিক সাহায্য দিয়ে পাকিস্তানকে শক্তিশালী করে তোলার দিকেই তাদের সব সময়ে সর্তক দৃষ্টি । সুতরাং ভারত সব সময়ই ইঙ্গ মার্কিন ও পাকিস্তানের সামরিক জোট সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে এবং এই সন্দেহ কোন অংশেই ভিত্তিহীন নয় । ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের পাক ভারত যুদ্ধে ও ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের বাংলাদেশের সমস্যাকে কেন্দ্র করে পাক ভারত যুদ্ধের সময় এই সন্দেহের যথাযথ প্রমাণিত হয় । ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের পাক ভারত যুদ্ধের সময় পাকিস্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃক প্রদত্ত অস্ত্রশস্ত্র যথেচ্ছ ভাবে ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে । এমন কি ভারত এই সম্পর্কে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নিকট অভিযোগ করা সত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতির কোন পরিবর্তন ঘটে নি । ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের পাক ভারত যুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার বিখ্যাত সপ্তম নৌবহর ভারত মহাসাগরে প্রেরণ করে পাকিস্তানের স্বার্থরক্ষার জন্য ব্যস্ততা প্রকাশ করে । বিশ্ব জনমতের বিরোধিতায় , বিশেষত ঃ সোভিয়েত রাশিয়ার হুমকিতে বাধ্য হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার পরিকল্পনা পরিবর্তন করতে বাধ্য হয় । তথাপি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট ব্রিটেন এই যুদ্ধের সময় শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের সর্বাঙ্গীন ভাবে সহায়তা করতে চেষ্টা করে । শুধু তাই নয় ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে পাক ভারত যুদ্ধে গণতন্ত্রের শত্রু পাকিস্তানের শাসকদের বাংলাদেশের জন সাধারণের উপর নির্মম অত্যাচার সমালোচনা করতে ও তারা বিস্মৃত হয় এবং পশ্চিমী শক্তি জোট পাকিস্তানকে সাহায্য করতেও কোন আপত্তি ছিল না । ইতিহাস স্বাক্ষ্য দেয় স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্ব থেকেই ভারতের নেতৃবর্গ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি বজায় রাখার নীতিতে বিশ্বাসী , স্বাধীনতা লাভের পরও ভারত তার পূর্ব অনুসৃত নীতি পরিত্যাগ করে নি এবং জোট নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করে উভয় সামরিক জোটের প্রভাব মুক্ত থেকে নিজের স্বাতন্ত্র রক্ষা করার জন্য আন্তরিক ভাবে চেষ্টা করে । প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব পূর্ণ সর্ম্পক গড়ে তোলা ভারতের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য । কিন্তু প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তানের ভারত বিদ্বেষী নীতি ভারতকে যুদ্ধে ব্যাপৃত করে তুলতে বাধ্য করে । ইঙ্গ মার্কিন শক্ত জোটের বিভেদমূলক নীতি ভারতকে যুদ্ধে ব্যাবহৃত করে তুলতে বাধ্য করে ।ইঙ্গ মার্কিন শক্তি জোটের বিভেদ মূলক নীতি এ জন্য অনেকাংশে দায়ী । ভারত উপমহাদেশের দুটি রাষ্টর ভারত ও পাকিস্তানের দ্বন্দ্বকে কখনও তারা নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করার প্রচেষ্টা করে নি । নিজেদের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যেই তারা পাকিস্তানের ব্যবহার করে এই মহাদেহের রাজনৈতিক অশান্তি ও বিনা কারণে রক্ত পাতের পথ সুগম করে তোলার চেষ্টা করে । কমন ওয়েলেথের প্রধান হিসাবেও ইংলন্ড ভারত ও পাকিস্তান সম্পর্কে নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করতে সমর্থন হয় । পর সাহায্যেলোলুপ পাকিস্তান আভ্যন্তরীণ সমস্যা থেকে দেশবাসীর দৃষ্টি অন্যদিকে নিবর্দ্ধ করার উদ্দেশ্যে এবং পরসাহায্যে সমৃদ্ধ ও নুতন সাহায্য লাভের সম্ভাবনায় পাকিস্তান আগ্রহী হয়ে উঠে । প্রকৃত পক্ষে এটাই মনে হয় বিদেশী সাহায্য লাভের কোন সম্ভাবনা না থাকলে পাকিস্তান কখনই ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে প্রস্তুত হতো কিনা সন্দেহ । বিদেশী সাহায্যই পাকিস্তানকে এই বিষয়ে আকৃষ্ট করে তোলে । কিন্তু এবারকার ঘটনা প্রবাহ মনে হয় একটু অন্য ধরনের ১১ ই সেপ্টেম্বর ২০০১ ইং আমেরিকার ওয়াশিংটন ও নিউইয়র্ক এ বিমান হামলার পরিপ্রেক্ষিতে যে যুদ্ধ শুরু হয়েছে তাকে বিশ্বশক্তিমান দুভাই আমেরিকা ও ইংল্যান্ড সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বলে ঘোষণা দিয়েছে পাশাপাশি এটাও ঘোষিত হয় যে এ যুদ্ধ সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে , ইসলামের বিরুদ্ধে নয় । অর্থ শক্তি দু দিকই আছে আমেরিকার পাশাপাশি আছে বহু অনুগত সাথী তবু ও রাজী নন নিজের অর্থ শক্তি ভান্ডারের খরচ করতে । একটু চিন্তা করলেই মনে ভেসে আসে এর আগেও তো আমেরিকা উগ্রপন্থা দমনের নামে অনেক মুসলিম দেশ আক্রমন করেছে । যেমন ইরাক , লিবিয়া কিন্তু তখনতো আর একথা বলতে হয়নি যে যুদ্ধ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে , ইসলামের বিরুদ্ধে নয় , তবে আজ কেন হঠাৎ করে এই উক্তি। আর মুশকিলে পড়েছেন পাকিস্তানের স্বঘোষিত প্রেসিডেন্ট জেনারেল পারভেজ মুশারফ সাহেব যিনিই সর্ব প্রথম তালিবানদের স্বীকৃতি দিলেন , প্রশিক্ষন দিয়েছিলেন , পরম মিত্র ছিলেন

আজ তিনি আমেরিকাকে স্থল , জল আকাশ , সবই দিতে সাধ্য হচ্ছেন পাশাপাশি ঘরে বাইরে নানাহ সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। সবটা মিলেই যেন মনে প্রশ্ন আসে তাহলে " ওসামা " কি উপলক্ষ্য কারণ কে এই ওসামা বিন লাদেন কোথায় পেল সে এত অস্ত্র সম্ভার । সত্য কখনো গোপন থাকে না বলে প্রবাদ আছে । আফগান – রাশিয়া যুদ্ধে এই লাদেনের কি ভূমিকা ছিল , কে তাকে কাজে লাগিয়েছিল, মাঝে মাঝে পত্রিকায় দেখা যায় বুশ সাহেবরাই নাকি মানুষপুত্র লাদেনকে শিশু থেকে দৈত্য বানিয়েছেন। তাই সমস্ত ব্যাপারটা যেন ধোঁয়াশার " দাদা বলে কথা" দাদার বিরুদ্ধে কথা বললে মুশকিল হবে। তবে তা কতদিন ? নিজের ঘরে আগুন লাগলে তবেই বোঝা যায় পরের ঘরের আগুন লাগার ভয়াবহতা । যা হয়ত আজ উনাদের বোধগম্য হয়েছে যদিও বিলম্বে । এটা বিশ্বাস করা যেতে পারে যেভাবে জাত , পাত , ধর্ম নিয়ে যুদ্ধের রূপ নিচ্ছে তা খুবই ভয়ঙ্কর কারণ ও যুদ্ধ কখনো যোদ্ধার জয় বিজয়ের প্রশ্ন আসে না আসে শুধু সভ্যতা , ধ্বংসের কালো ছাপ। কারণ সন্ত্রাসবাদ সে যাই হোক , যাই হোক তা কখনো বিশ্বের কোন জাতি গোষ্ঠীর কল্যাণে আসতে পারে না ।

## " অধিকার ও ভারতবাসী "

ভারতবর্ষ দৃঢ় সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ভারতবাসী স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ যার প্রমাণ ১১ ই মে ১৯৯৮ ইং রাজস্থানের পোখরানে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের সফল পরমানু বোমা পরিক্ষা । ভারতবাসী আরও একবার বুঝিয়ে দিল এ দেশের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা রক্ষার দায়িত্ব নিজেদেরই যার ফলেই বিশ্বের অশুভ শক্তিগুলো উঠছে কেঁপে এবং চির সত্যের ভারত ভূমির টুটি চেপে ধরতে চায় । ওদের উদ্দেশ্যে ভারতবাসী জানতে চায় ওদের ভূমিকম্পের আগেই ভারতবাসী নিদ্রা বিহীন সদা জ্যাগ্রত। যদিও ইতিহাস নীরব সাক্ষ্য বহন করে যারা আজ ভারতের পরমাণু বোমা পরীক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে হুংকার দিচ্ছে । ওদেরই অশুভ শক্তি ১৯৪৫ সালে হিরোসিমা নাগাসাকিতে নরমেদ যজ্ঞ করেছিল । ওদের মুখে সাধুবাদ শোভা পায় না । ওদের হুমকির মূল উদ্দেশ্য ওদের মনের বাসনা ওরা পরাক্রান্ত হয়ে আমাদের দাস বানিয়ে রাখা যদিও ভারতবাসী দুশো বছরের পরাধীনতার গ্লানি ভুলতে পারে নি। ওদের উচ্ছিষ্ট হাড়ে কুকুরের মতো বেঁচে থাকার মানসিকতা ভারতবাসীর নেই । ভারতবাসী বশ্যতাকে অস্বীকার করে প্রয়োজনে তাহা রক্তের বিনিময়ে , পরাধীনতার শেকলের দাগ ভারতাবাসী কখনো মেনে নেয় না ভারত মাতা ঘরে ঘরে বীর বীরঙ্গনার জন্ম দেয় , যারা সর্বদা জাগ্রত , মাতার সম্মান রক্ষায় ঝটিকা শত্রুর আক্রমনে মৃত্যুর যে কোন পরোয়ানা উপেক্ষা করে সহস্রাধিক প্রাণ অস্ত্রহাতে দেশ রক্ষার নির্মিত্ত তৈরী হয়ে আছে । অন্ধকার হিমগিরি থেকে নিষ্ঠুর অরণ্য পর্যন্ত কঠিন ইস্পাত হয়ে ভারতীয় বীরেরা শপথ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এ জীবন মাতৃভূমি রক্ষার জন্য যত বড় তুফানই আসুক না কেন , অশুভ শক্তির হুমকী তাদের হিংস্র চোখে কিন্তু ওদের জেনে রাখা উচিত ভারতবাসী বসে আছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ চোখে । ভারতবাসী বশ্যতা স্বীকার করতে জানে না , সে যত

বড়ই শক্তিধর হোক না কেন , ভারতবর্ষের অগ্রগতি রুখবার সাধ্য ওদের নেই । এদেশের লোক কারো চোখের রাঙানির ধার ধারে না । এ দেশে জন্ম নেয় ঘরে ঘরে প্রহরী । ভারতবাসী ১৯৪৭ সালে গোলামির দলিল ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে । ভারতভূমি আবারো প্রমাণ করে দিলো একক দাদার দাদাগিরী সবাই বরদাস্ত করলেও স্বাধীনচেতা ভারতবাসী তা বরদাস্ত করে না । ভারতবর্ষ এর আগে ও ভারতীয় দৃঢ়তা সম্পর্কে রাষ্ট্র সংঘকে অবগত করে দিয়েছিলো । চাপ সত্ত্বেও সিটি বিটিতে ভারত সাক্ষর প্রদান করে নি অর্থাৎ কোন চাপের কাছে ভারত মাথা নত করে নি । দাদাদের উদ্দেশ্যে ছিল পারমানবিক জীবাণু ইত্যাদি মারাত্মক অস্ত্রে শক্তিশালী হয়ে অন্যকে পদানত করে রাখা । কিন্তু ভারতবর্ষ কোন চাপের কাছে মাথা নত না করে ১১মে প্রমাণ করে দিলে পরমাণু শক্তি ভারতের ও আছে অর্থাৎ ভারত দাদাদের হাতে নির্ভর খাদ্য যোগায় না নিত্য খাদ্য যোগানের ক্ষমতা নিজেদেরই আছে । ফলশ্রুতিতে দাদাদের রক্ত চক্ষু চরক গাছ , যা স্বাভাবিক, তবে তাদের ভাল ভাবেই জেনে রাখা উচিত রক্ত চক্ষু তাদের জমিতেই নিস্ফল আস্ফালন এছাড়া আর কিছুই নয় । ভারতবাসী নিজের মাকে কারো রক্ত চক্ষুর ভয়ে বন্ধক রাখতে জানে না । প্রয়োজনে রক্ত ঝড়াতে ও পিছপা হয় না । রক্ত চক্ষুর আস্ফালন আতঙ্কেরই প্রতিছবি । ভারতীয়রা অযথা কাউকে নাজেহাল করে না । আর যে কোন আক্রমনের প্রত্যুত্তর দেয় দেশ ও দেশবাসীর স্বার্থে । ভারতবাসী হিংসায় বিশ্বাসী না তবে তাই বলে বহিরাগত শত্রুর আক্রমণ মুখ বুঝে সহ্য করবে তা কি কখনো হতে পারে । বিশ্বের বৃহ্য শক্তি বলে যারা নিজেদের দাবী করে তারা যদি অস্ত্র প্রতিযোগীতা বন্ধ করে হিংসার পথ পরিহার করে শান্তির পথে বিশ্বাসী হয় তবে ভারতবর্ষ সর্বদাই শান্তি সম্প্রীতির বার্তা বহক । যা পূর্বে ও ভারত জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে অবগত করেছিল । কিন্তু তাই বলে এক তরফা শান্তি আলোচনা চলতে পারে না যেমনটা এক তরফা দাদাগিরি ও বরদাস্ত করা যায় না । ১৯৭১ সালে ও ভারত , পাক ভারত যুদ্ধে যথেষ্ঠ সহনশীলতার পরিচয় দেখায় ৯০ হাজার এর ও বেশী পাক সৈন্যকে ভারত স্বসম্মানে পাকিস্তানে প্রেরণ করে । ভারতীয়রা পরম শত্রুকেও সম্মান দেখাতে জানে । উপনিবেসিক ব্রিটিশ সম্রাজ্যবাদীরা অনেক ঘৃণ্য চক্রান্ত করে ভারত ভূমিকে খন্ডিত করে বিচ্ছেদ ও বিদ্বেষের বাতাবরণ সৃষ্টি করে কিন্তু তবুও সাফল্য পায়নি অবশেষে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারত উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে যদিও ভারতবাসীকে যথেষ্ঠ বলিদান ও ক্ষতি স্বীকার করে নিতে হয়। শুধু তাই নয় ইংরেজশক্তি ভারতবর্ষ ত্যাগ করে চলে যাওয়ার পরও ইউরোপিয়ান শক্তি পর্তুগাল ফরাসীরা ভারতের অনেক ভূমিতে শোষণের মাধ্যমে তাদের অবৈধ কর্তৃত্ব বজায় রাখেন যেমন গোয়া , দমন দিও , পন্ডিচেরী , চন্দননগর ইত্যাদি স্থানে । কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারতবর্ষ সহনশীলতার পরিচয় দেখিয়েছে । যা ভারতের পঞ্চশীল ও সহবস্থান ভারতের জোট নিরপেক্ষ নীতির । মূল আদর্শ যদিও ভারত উপমহাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েই পাকিস্তান ও বাংলাদেশ দুটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে।

১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে চীন ভারতের দন্ধের সময় পাকিস্তান চীনের পক্ষ সমর্থন করে পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তোলে । শান্তি পূর্ণ বৈঠকের মাধ্যমে ভারত প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তানের সহিত সকল দন্ধের অবসান করার চেষ্টা করলেও পাকিস্তানের এক গুয়েমির জন্যই ভারতের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় এমন কি পাকিস্তানের সরকার ইঙ্গমার্কিন মিত্রদের সাহায্যে নিয়েও ভারতের বিরোধিতা করতে ত্রুটি করেনি । যদিও ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ১০ ই জানুয়ারী রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী কোসিগ্রিনের চেষ্টায় উভয় দেশের মধ্যে তাসখন্দ চুক্তির মাধ্যমে শান্তি স্থাপিত হলেও এই চুক্তির শর্ত কার্য্যকরী করার ব্যাপারে পাকিস্তান বিন্দুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করে নি। ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে ৩ রা ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যাকে কেন্দ্র করে পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন কিন্তু পূর্ব ও পশ্চিমে উভয় রণাঙ্গনেই পাকিস্তান পরাজিত হলে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্ম । ইতিহাস এক নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করে যদিও যুদ্ধের পূর্বে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের জনগণকে রক্ষা করার জন্য পৃথিবীর সর্বত্র আবেদন জানান , কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এক অদ্ভুত মনোভাব গ্রহণ করে ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে সাহায্যের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত সপ্তম পৌবহর ভারত মহাসাগরে পাঠাতে প্রস্তুত হয় । ভারতের প্রতি বিদ্বেষের জন্য চীন ও পাকিকস্তানের পক্ষ অবলম্বন করে । সেই সময়ে ও এক মাত্র রাশিয়া ভারতের বন্ধু হিসাবে উপনীত হয় । সম্প্রতিক কালে ও পাকিস্তানের পক্ষ থেকে বিদেশী অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ ভারত পাক সম্পর্ক অবনতির কারণ । ১৯৭২ সালের সিমলা বৈঠক ও ভারত পাক সম্পর্কের উন্নতি ঘটাতে পারে নি । ভারত চীন সীমান্তেরা সীমা রেখা ম্যাক মোহন লাইনের অস্পষ্টতার সুযোগ গ্রহণ করে ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের চীন ভারতের লাদাক এলাকার মোট ১২০০০ মাইল দখল করলে উভয় দেশের সম্পর্কের অবনতি ঘটাতে শুরু করে যদিও শান্তি প্রিয় ভারত পঞ্চশীল আদর্শে যুগ্ম স্বাক্ষরকারী মিত্র দেশ চীনের কাছ থেকে এরূপ ব্যবহার প্রত্যাশ করে নি । যা হোক সীমান্ত বিরোধ মীমাংসার জন্য যখন ভারত ও চীনের মধ্যে পত্রলাপ চলতে থাকে সেই সময় ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দের ২০ শে অক্টোবর ভারতের উত্তর সীমান্তে নেফা অঞ্চল এবং লাদাকে চীন সুপরিকল্পিত সামরিক আক্রমণ চালায় যেহেতু ভারতীয় সৈন্য বাহিনী প্রস্তুত ছিল না ফলে চীন ভারতের উত্তর সীমান্তের এক বিরাট অঞ্চল অধিকার করে ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের ২২ শে নভেম্বর চীনা সৈন্য বাহিনী ভারতের সীমান্তে আক্রমন বন্ধ করে নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী "Actual line of control" " রূপে ঘোষণা করে ভারতের বিরাট অংশ নিজেদের কর্তৃত্বে নিয়ে যায় তার পরে ও ভারত শান্তি নীতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে কলম্বো প্রস্তাব গ্রহণ করে কিন্তু চীন এই প্রস্তাব বর্জন করে । উপরন্তু ভারতের শত্রুতা সাধনে পাকিস্তানের সাথে মিত্রতা চুক্তি স্বাক্ষর করে চীন কাশ্মীরের পাক অধিকৃত অঞ্চলের কতকাংশ নিজের অধিকার করিয়ে নিতে সমর্থ হয় । এমন কি ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে চীন পাকিস্থান যুগ্ম ভাবে ভারত আক্রমণ করার জন্য গোপনে এক অপবিত্র চুক্তিতে আবদ্ধ হয় ।

১৯৬৫ ও ১৯৭১ ভারত পাক যুদ্ধের সময় ও চীন ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে সাহায্য করতে কার্পণ্য করে নি T - 59 ট্যাঙ্ক ও মিগ ১৯ বিশাল বহর পাকিস্তানে প্রেরিত চীনা অস্ত্রশস্ত্রের অর্ন্তভুক্ত যদিও১৯৭১ এর ১৬ই ডিসেম্বর মাত্র চৌদ্দ দিনের যুদ্ধের রণাঙ্গণে পাক শক্তি বিধবস্ত হয়ে পড়ে নব্বুই হাজার সৈন্য সহ অধিনায়ক জোরেস নিয়াজী ঢাকার রেস কোর্স এ আত্ম সমর্পন করতে বাধ্য হন । এরূপ বিশাল সৈন্যের আত্ম সমর্পন ইতিহাসে খুবই বিরল । ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ১ লা জুলাই মাসে, ওয়াশিংটন ও লন্ডনে আনবিক অস্ত্র প্রসার নিরোধ চুক্তি স্বাক্ষর শুরু হয় । ১২৪ সদস্যের মধ্যে ৬০ জন এই চুক্তি গৃহীত হওয়ার পর স্বাক্ষর শুরু করে যে সকল রাষ্ট্র এই চুক্তিতে ভোট দানে বিরত ছিল ভারত তাদের অন্যতম । যার ফলশ্রুতিতে তদানীন্তন মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব ডীন রাস্ক যে সকল রাষ্ট্র এই চুক্তি গ্রহণ করতে অসম্মত তাদের সাহায্যে বন্ধ করার হুমকী দেয় । সুতরাং আমেরিকার এই দাদাগিরী নতুন কিছু নয় । ভারত শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য আনবিক শক্তি প্রয়োগের পক্ষপাত ১৯৭৮ খ্রীঃ ভারত প্রথম আনবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে প্রমাণ করে বৃহৎ শক্তি গুলোর মতো ভারত ও আনবিক শক্তির অধিকারী হতে সক্ষম । সুতরাং কেন আনবিক শক্তি সম্প্রসারণ নিরোধ চুক্তিতে স্বাক্ষর করে ভারত তার অধিকার খর্ব করতে সম্মত নয় বা কোন যুক্তি সঙ্গত কারণ খুঁজে পায় নি বলেই ভারত এই রুপ চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে আপত্তি করে । সুতরাং আনবিক অস্ত্র উৎপাদন আইনের দিক থেকে অবৈধ হতে পারে না । আনবিক শক্তি ভারতের অর্থনীতিকে জোরদার করবে। এই শক্তির সাহায্যে ভারত কৃষি ও শিল্পে অনেক এগিয়ে যেতে পারবে এবং অর্থনীতিতে নতুন প্রাণ সঞ্চারিত হবে । তাছাড়া পরমাণু শক্তিধর হলেই তা প্রয়োগ করতে হবে এ রকম কোন কথা নেই । ভারত নিজের আত্মরক্ষা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য আনবিক অস্ত্র রাখলেও তা কখনই সর্ব প্রথম প্রয়োগ করবে না তবে অন্য রাষ্ট্র প্রথমে ঐ অস্ত্র ব্যবহার করলে নিশ্চয় তখন ভেবে দেখা যাবে । তবে যাই হোক না কেন ভআরতের বৈদেশিক নীতিতে সর্ব্বদা শান্তিপূর্ণ সহবস্থান ও যুদ্ধ বিরোধী নীতি স্থায়ী আসন লাভ করেছে । তাই বলে ভারতবাসী কারো হুমকীর কাছে কখনো বশ্যতা স্বীকার করতে জানে না । স্বাধীনচেতা ভারতবাসী নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষায় প্রতিশ্রুতি বদ্ধ ।

## সন্ত্রাসবাদ ও আমরা

'সন্ত্রাসবাদ ' যার অপর নাম আতঙ্কবাদ , রাজ্যে ও রাষ্ট্রের কাছে এক বিভীষিকাময় ব্যাধি । সন্ত্রাসবাদ এক বৃহৎ সমস্যা। তৃতীয় বিশ্বে উন্নত দেশগুলি ও সন্ত্রাসবাদ থেকে মুক্তি নয় । এশীয় দেশগুলি তথা ইসলামী রাষ্ট্র গুলিতে সন্ত্রাসবাদ এতই মাথা চারা দিয়ে উঠেছে যে রাষ্ট্র প্রধানদের শিরপীডার কারণ হয়ে উঠেছে বিশেষতঃ তাদের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে গেরিলা লড়াইকে ইতিহাস

ও যুদ্ধেরই অন্যতম পদ্ধতি হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। যেমনটা আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাস বলে -

রায় কাচাগ রায় কসম গেরিলা যুদ্ধের পথ অবলম্বন করে হোসেন শার মত দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ যোদ্ধাকে হার মানিয়েছিল ছত্রপতি শিবাজী ও গেরিলা পদ্ধতি অনুসরণ করে অতর্কিতে শত্রু পক্ষের উপর আক্রমণ করে শত্রুদের ব্যাতিব্যস্ত রাখতেন। ভিয়েত নামের মত ক্ষুদ্র দেশ ও গেরিলা পদ্ধতিতে আমেরিকার মত বৃহৎ শক্তির সাথে বিশ বছর যুদ্ধ চালিয়েছিল । কিন্তু তাই বলে গেরিলা যুদ্ধ , সন্ত্রাসবাদ এক কথা নয় বা সন্ত্রাসবাদকে বিপ্লব বলেও আখ্যা দেওয়া যায় না । যেহেতু সন্ত্রাসবাদ ও বিপ্লবের আদর্শ ও উদ্দেশ্য এক নয় । বিপ্লব সাধারণ শাসনযন্ত্র বা শাসকের বিরুদ্ধে দীর্ঘ পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ । বিপ্লবের পেছনে বৃহৎ সংখ্যক জনগণের সমর্থন থাকে এবং বিপ্লব সাধারণত দেশের অভ্যন্তরে দেশের জনগণ দ্বারাই সংগঠিত হয়ে থাকে । সেখান বাহিরে থেকে কোন আক্রমন আসে না । বা দেশের সার্বভোমত্বের বিনষ্ট করে না । সন্ত্রাসবাদ কোন দেশের সংগঠিত বিদ্রোহ নয় বা গণ সমর্থনেরও ততবেশী পরোয়া করে না । সন্ত্রাসবাদ মানেই বিছিন্নতাবাদী শক্তি যাদের আক্রমনে নিরীহ জনসাধারণই বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয় । সন্ত্রাস মানেই দেশের ভেতরে আতঙ্কের সৃষ্টি করা । সন্ত্রাসবাদের নগ্নরুপ লক্ষ্য করলে দেখা যায় এদের বর্বর হিংসাত্মক থাবা থেকে সাধারণ মানুষ , মহিলা এবং শিশুরাও রক্ষা পায় না । সরকারী কর্মচারী এমন কি বিদেশী পর্যটকরাও এদের হাত থেকে রেহাই পায় না । শারীরিক, মানবিক , সামাজিক যন্ত্রণা , অপরহণ , গৃহদাহ বিস্ফোরণ ঘটিয়ে প্রাণ নাশ , সম্পত্তি নাশ করে ভীতির রাজত্ব কায়েম করে নিজেদের প্রচার যন্ত্রকে ব্যবহার করে । সন্ত্রাসবাদ নিজের গোষ্ঠীর প্রচার বাড়ায় বিছিন্নতাবাদীদের কাজের ভঙ্গিমা সর্বত্রই প্রায় একই দরনের যাত্রীবাহি গাড়ী , জনবহুল বাজার নির্বিবাদে হত্যা , অগ্নি সংযোগের মাধ্যমে নিজেদের গোষ্ঠীর প্রচার করে শাসন ব্যবস্থা ও সমাজ ব্যবস্থায় উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে । সন্ত্রাসবাদীরা তাদের পরিকল্পনা মাফিক তাদের হিংসাত্মক কার্যকলাপ করে । শান্তি বিঘ্নিত করার নিমিত্ত তারা মর্জি মাফিক চোরা গোপ্তা হিংসাত্মক কার্যকলাপ অব্যাহত রাখে । সন্ত্রাস ক্ষোভ ও আক্রোশের চিহ্ন । সন্ত্রাসবাদীরা দেশের জন্য বিপ্লবীদের মত প্রাণ উৎসর্গ করে না , সন্ত্রাসবাদ , এমনই এক মরণ কারখানা কোন যুবক এইপথে গেলে সেখান থেকে ব্যাক্তি প্রচেষ্টায় মুক্তি পথ খুঁজে বের করা প্রচন্ড কষ্ট সাধ্য । সন্ত্রাসবাদীদের একের সাথে অপর সংগঠনের সে সর্ম্পক থাকে তা অস্বীকার করা যাবে না । পার্শ্ববর্তী কোন রাষ্ট্র থেকে যদি অন্যরাষ্ট্রে সন্ত্রাসবাদীদের সাহায্যে ও উৎসাহ দেওয়া হয় তা অবাঞ্চনীয় যদি ও পাকিস্তান বরাবরই ভারত ভূমিতে প্রতক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে সন্ত্রাসবাদকে পশ্রয় দিয়ে যাচ্ছে এটা নিশ্চয় মিথ্যা নয় । একক প্রচেষ্টার মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করা অত্যন্ত দুরুহ ব্যাপার । সন্ত্রাসবাদ এক অপযুদ্ধ কৌশল। মধ্য প্রাচ্যেও সন্ত্রাসবাদ আজ চরম আকার নিয়েছে । প্যালেস্তান , ইসরাইল বা

পশ্চিম এশিয়া বা ইসলামি দুনিয়া ও সমস্যার আজ সর্বত্র মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করেছে । কাশ্মীর সমস্যা আজ ভারত ভূমিতে ক্ষয়রোগের ন্যায় উপলব্দি হচ্ছে । কাশ্মীর সমস্যা অর্ধশতক ধরে শুধু রক্তক্ষরণ ঘটিয়ে চলেছে । কাশ্মীরের সন্ত্রাসবাদী কার্য্যকলাপের পেছনে পাকিস্তানের মদতের কথা অনস্বীকার্য । যার প্রমাণ ' কারগিল যুদ্ধ ' আরও জলন্ত প্রমাণ ইন্ডিয়া এয়ার বাস ছিনতাই কান্দাহারে অবতরণ তিন জঙ্গীর মুক্তি তথা ৩১ শে ডিসেম্বর নাটকের অবসান পাশাপাশি রুপেন কাটিয়ারের মৃত্যু । যদিও তালিবানরা ও সন্দেহের উর্দ্ধে নয় । পাকিস্তানি মদতে কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদীরা গোলাবারুদের সংস্কৃতি স্থান বানানোর প্রতিনিয়ত চেষ্টায় আছে ফলাফল শুধুই রক্ত স্নান । এটা ও পাশাপাশি সত্য যে কাশ্মীরে যে সকল সন্ত্রাসবাদী সংগঠন আছে সবটুকুই পাকিস্তানী নয় দেশ অভ্যন্তরে ও আতঙ্কবাদীর জন্ম হয়েছে । সন্ত্রাসবাদ এত জঘন্য যে এরা ধর্মস্থানের মত গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর স্থানকেও আশ্রয় স্থান হিসেবে ব্যবহৃত করে । ধর্মের জীগির তুলে ধর্মীয় ভাবাবেগকে কাজে লাগিয়েও সন্ত্রাসবাদীর নরমেধ যজ্ঞ করতে চায় । যার প্রমাণ ১৯৮৪সালে পাঞ্জাবের স্বর্ণ মন্দিরে ' ব্লুষ্টার অপারেশন ১৯৯৩ সালে প্রথমবার সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা হজরতবাল মস্‌জিদ দখলকরার প্রচেষ্টা । ১৯৯৫ সালে চেরার-ই শরিফ দখল । যাই হোক ধর্মের মত গুরুত্বপূর্ণ স্থানকে আঘাত করে সন্ত্রাসবাদীরা সাধারণ মানুষকে উত্তেজিত করে বিছিন্নতাবাদী মনোভাবকে চাঙ্গা করতে চেষ্টা করে । যেমনটা পাঞ্জাবে স্বর্ণ মন্দির ব্লুষ্টার অপারের্শনের পর শিখ জনগণ এমন কি শিখ রেজিমেন্টের মধ্যেও অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল । ধর্মীয় ভাবাবেগ ধর্মপ্রাণ মানুষের মনে জিগীর সৃষ্টি করে বল প্রয়োগ বা সামরিক অভিযান দিয়েই শুধু সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করা যায় না। শুভবুদ্ধী সম্পন্ন মানুষের ও আত্মনিয়োগ একান্ত আবশ্যক যাতে আলোচনার পথ তৈরী হয় । আমাদের উত্তর পূর্বাঞ্চাল ও ক্রমশ আশান্ত থেকে অশান্ত রূপ নিচ্ছে সন্ত্রাসবাদীদের বারংবার সহিংস ওবর্বরোচিত আক্রমনে । সন্ত্রাসবাদের জন্ম কেন ? তার কারণ ও অনুসন্ধান করা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি । আমাদের উত্তর পূর্বাঞ্চালে জীবিকা ও কর্মক্ষেত্র ততটা প্রসারিত হয় নি । হতাশা থাকতেই পারে তাই বলে বিচ্ছিন্নতাবাদ বা সন্ত্রাসবাদ সমাধানের শেষ কথা কখনো বলে না। সন্ত্রাসবাদ ভারতের বাইরে থেকে বাহাবা পাচ্ছে যার ফলে অত্যাধুনিক অস্ত্র ও বিস্ফোরণ আজ সন্ত্রাসবাদীদের হাতে যার ফলে নিরাপত্তা বাহিনী থেকে সাধারন জনসাধারন ক্রমশ শুধু এদের আক্রমনের শিকার হচ্ছে । বিদেশী শিবিরগুলি থেকে টেনিং নিয়ে প্রতি নিয়ত গোপনে দেশের ভিতর নাশকতার কাজ করে যাচ্ছে । সন্ত্রাসবাদীদের নাশকতামূলক কাজ করে যাচ্ছে সন্ত্রাসবাদীরা আমাদের ছোটরাজ্য ত্রিপুরাতে অপহরন, গৃহদাহ, খুন, জখম নরমেধ যজ্ঞ সংগঠিত করেছে । সন্ত্রাসবাদীদের জখন্য কার্যকলাপ এক অবিশ্বাসের বাতাবরণ সৃষ্টি করছে । সন্ত্রাসবাদীদের দেশ ও মানুষের প্রতি কোন দায়বদ্ধতা নেই । সভ্যতার কোন মূল্য নেই এরা মানবতার পরম শত্রু , সুতরাং সন্ত্রাসবাদ রুখতে নতুন করে পুনরায় ভাবতে হবে এবং নিতে হবে নানাহ উদ্যোগ ও তৈরী

করতে হবে কর্মসূচী , সন্ত্রাসবাদ এক ভায়াবহ সন্ত্রাসের সৃষ্টি করছে যা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই । যদিও সন্ত্রাসবাদীদের মনে রাখা উচিৎ সন্ত্রাসের মাধ্যমে আতংকের সৃষ্টি করা সম্ভব তাই বলে সামাজিক পটভূমি পরিবর্তন করা সম্ভব নয় । সন্ত্রাসবাদীরা গনতান্ত্রিক শান্তিপ্রিয় আন্দোলনে বিশ্বাসী নয় যার দরুন কিছু ব্যর্থ যুবক বিপথগামী হয়ে সন্ত্রাসবাদে আকৃষ্ট হচ্ছে । যদিও মনে হয় সন্ত্রাসবাদের মধ্যে জন্ম হচ্ছে হতাশা , ক্ষোভ ও আক্রোশ যা আগামী দিনের ঝড়ো হাওয়া । সন্ত্রাসবাদের উন্মক্ত আগুনের সামনে যুক্তিকতার কোন স্থান নেই । মানবতার সমস্ত মূল্যই যখন ভুলণ্ঠিত তখন সহিংস সন্ত্রাসবাদীদের কাছে নিরীহ রক্তের স্বাদ হোলি খেলার মতই সুখকর । সন্ত্রাসবাদ শুধুই আতংকই নয় আগামী প্রজন্মের নিকট নিছক সর্বনাশের ইঙ্গিত । সুতরাং সন্ত্রাসবাদ শু সন্ত্রাসবাদীদের কাছে বাহাবা পেলে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন নাগরিকদের কাছে ধংসের পূর্বাভাষ বলেই বিবেচিত । সন্ত্রাসবাদের সমস্যায় ত্রিপুরাবাসী জর্জরিত সুতরাং আর কালক্ষেপ নয় সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার পাশাপাশি আলোচনা ও বোঝাপড়ার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা আবশ্যক । আগামী প্রজন্ম শুধু প্রতীক্ষায় ।

## " ছাত্রসমাজ দায়িত্ব ও কর্তব্য "

স্বাভাবিক কারণেই ছাত্র বলতে আমরা বুঝি , কম বয়সী তরুন , অভিজ্ঞতা যাই হোক না কেন প্রচন্ড মানবিক শক্তি, সঠিক ,ভুল , ভাল ,মন্দ তত বিচার বিবেচনা করার ফুরসৎ নেই , বাঁধ ভাঙ্গাঁ জলস্রোতের মত এগিয়ে যায় , পিছে পিরে তাকানোর সময়টা কোথায় ? বাধা পেলে ঢেউ এর রূপ নেয় - কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয় কারনটা এ যে দুর্বার বয়স তবুও তাদেরকেই ভরসা করতে হবে আগামী ভবিষ্যৎ ওদের অপেক্ষাই ঠাঁই দাঁড়িয়ে আছে। ওরা নরম মাটি যেভাবে তৈরী করা হবে সেভাবে গঠিত হবে। আর এই ছাত্র সমাজের ভেতরই লুকিয়ে আছে আমাদের উজ্বল সমাজ ও উন্নত দেশের বীজ ।

সুতরাং এই বীজ সুষ্ঠ ও সুন্দরভাবে রোপন করতে হবে । তবেই আমাদের দেশ ও সমাজ ভাল ফল আশা করতে পারে। পাশাপাশি ভুল সিদ্ধান্ত সমাজ ও দেশের প্রতি ভয়ঙ্কর স্বরূপ হতে পারে । ছাত্র মন যাতে সমাজ ও দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন না হয় এ গুরুদায়িত্বটুকু ও নিতে হবে । আমাদের অতীত এক জ্বলন্ত ইতিহাস আমাদের অতীত দেখিয়েছে ছাত্রদের মুল্যবোধ , আদর্শ , সততা , দায়িত্ববোধ , যদিও সামাজিক অস্থিরতা হতাশা ইত্যাদি কারনে সামাজিক চেতনা আঘাতপ্রাপ্ত হচ্ছে ফলে অগনতান্ত্রিক ,সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলো সমাজ জীবনে ঢুকবার সুযোগ খুঁজছে । সঠিক চিন্তা থেকে বের হয়ে আসা সঠিক পথ , সঠিক মূল্যবোধ যা ছাত্রসমাজকে সাহায্য করে আগামী সমাজ গড়তে , ছাত্র শুধু লেখাপড়া করবে তা নয় , লেখাপড়ার পাশাপাশি ক্রীড়াঙ্গন যেমন প্রয়োজন তেমনি আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কৃতি ও সামাজিক মুল্যবোধ , শিক্ষার মানে হওয়া উচিত দেশের ও

সমাজের উন্নতি ও অগ্রগতি । ছাত্রসমাজ সঠিক শিক্ষা , সামাজিক অবক্ষয় , দুনীতি , সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছন্নতার বুকে কুঠারাঘাত করতে পারে ।ইতিহাস বলে - দেশ , জাতি , সমাজ গঠনের ছাত্রসমাজ সর্ব্বদাই অগ্রনী ভূমিকা নিয়ে থাকে । সামাজিক বা দেশের সমস্যার প্রতি আজকাল ছাত্রদের সর্বদা সজাগ থাকতে হয় । সাম্প্রদায়িকতা , জাতিভেদ , শোষণ , বঞ্চনা ,কুসংস্কার , দারিদ্রতা , নিরক্ষরতা ইত্যাদি স্পর্শকাতর বিষয়গুলি আজকের ছাত্রসমাজকে ভাবতে হয় । দেশ ও জাতি গঠনে এবং নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আজকের ছাত্রসমাজই আগামী দিনের দেশ পরিচালক , দক্ষ শাসক , দক্ষ প্রশাসক , হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবে দেশের বৃহত্তর স্বার্থে আমরা এখনোও কুসংস্কারের শিকার , সাম্প্রদায়িকতার রোষানল এখনো এ দেশের মাটি থেকে লুপ্ত হয় নি , বিচ্ছন্নতাবাদ , উগ্রপন্থা , যদিও অর্থনৈতিক বঞ্চনা যে এর জন্য অনেকাংশেদায়ী তা আমরা অস্বীকার করতে পারি না পাশাপাশি নিরক্ষরতা ও আমাদেরকে অন্ধবিশ্বাসের দিকে অনেক সময়ই ঠেলে দিচ্ছে । তাই এ সকল অভিশাপের নিরসন কল্পে ছাত্র সমাজকেই অগ্রনী ভূমিকা নিতে হবে নিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য । উপযুক্ত শিক্ষা সমাজকে সচেতন করে তোলে সুতরাং অমবস্যার জমকালো আধাঁর থেকে সমাজকে আলোর পথে ছাত্র সমাজই নিয়ে যেতে পারে । " আমাদের অধিকার নিশ্চয় আছে কিন্তু পাশাপাশি কর্তব্যটুকু ভুলে গেলে সবটুকুই যে শেষ হয়ে যায় " তখনই সামাজিক কাঠামো আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে ।

শিক্ষা , বিজ্ঞান , স্বাস্থ্য , কুসংস্কারের থেকে মুক্তি এসব গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো ছাত্রসমাজকেই করতে হবে। সুতরাং আমাদের ছাত্র সমাজের সামনে অসংখ্য গুরুদায়িত্ব , অপসংস্কৃতি ও নেশার বাতাস আমাদের যুবসমাজের ভীত কাপিয়ে তুলেছে সুতরাং এই সকল নোংরামি বন্ধে ছাত্রসমাজই জোরদার প্রচার চালাতে পারে , জীবন ও ভবিষ্যতকে রক্ষা করতে পারে । আগামী দিনগুলো যদি ও কঠোর তবু ও ছাত্রসমাজ প্রস্তুত কঠিন সংগ্রামে পা বাড়াতে দেশ ও সমাজের স্বার্থে , আমাদের স্বাধীনোত্তর ইতিহাস আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় এদেশের ছাত্রসমাজ কত মজবুত কঠোর থেকে কঠোরতর পরিস্থিতির মোকাবেলায় লৌহ দৃঢ় ভূমিকা নিয়েছিল , মাতৃভুমি রক্ষার নিমিত্তে, ছাত্রসমাজই পারে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্তি দিয়ে জাতিকে সুন্দর ও সুসংহত জাতীয় সংহতির পথ দেখাতে । যদি ও ছাত্রদের মুল কর্তব্য লেখাপড়া তবু ও জীবনের অস্তিত্ব রক্ষার্থে ও ভবিস্যত দেশ ও সমাজ গড়ার জন্য আত্মনিয়োগ করতেই হয় নহেতু ভবিষ্যত যে অন্ধকার । আজকের ছাত্র আগামী দিনের দেশের সর্বাধিক মুল্যবান সম্পদ । সুস্থ সংস্কৃতি ও শিক্ষা প্রসারের মত মূল্যবান কাজগুলো ছাত্রদের ভেতর থেকেই প্রস্ফুটিত হয় । আর সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কে গেলে সর্বাগ্রেই বলতে হয় এ দেশকে দুর্বল করার জন্য সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসকরাই এ দেশের মাটিতে সামপ্রদায়িকতার বীজ রোপন করেছিল যার ফলশ্রুতি আজও আমরা সাম্প্রদায়িকতার মত জঘন্য ঘটনা গুলোকে নির্মূল করতে পারিনি । সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মানুষকে হিংস্র পশু থেকেও নীচে নামিয়ে দেয় , সুতরাং আমাদের

দেশের ইতিহাস পড়তে হবে । যদি অতীতকে জানতে হয় এবং ভবিস্যত এর রূপরেখা তৈরী করতে হয় । আমাদের দেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উপর প্রতিষ্ঠিত সুতরাং যে কোন মূল্যে সম্প্রীতি আমাদের বজায় রাখতে হবে ঐক্যবদ্ধ ভারতভূমিকে রক্ষার স্বার্থে আর উগ্রপন্থা সম্বন্ধে বলতে গেলে বুঝি জনসমর্থনহীন কেবল আগ্নেয়াস্ত্রের আস্ফালন প্রাণ কেড়ে নিতে পারে কিন্তু তা কখনো ও সাফল্য আনতে পারে না , ভীতির পরিবেশ বজায় রাখতে সক্ষম হয় কিছু সময়ের জন্য কিন্তু সংঘবদ্ধ আন্দোলন ও সচেতন সমাজ আজ নয় কাল ওদের আস্ফালন উৎখাত করে দেবে হয়ত আরো কিছু রক্ত ঝড়বে আরো কিছু সময় লাগবে , তবে ওরা সফল হবে না , হতে ও পারে না , সুতরাং নির্দ্বিধায় বলতে পারি দেশের ও সমাজের সার্বিক পরিবর্তনের জন্য আমাদের ছাত্রসমাজ তৈরী , সে পথ যতই কঠিন কঠোর হোক না কেন ।

## " ভারতের প্রতি পাকিস্থানের আজন্ম বৈরীতা "

ইতিহাসো পাতায় জ্বলন্ত সাক্ষ্য বহন করে – ভারতভূমির পেট থেকে জন্মগ্রহন করার পূর্ব থেকেই শুরু হয় ভারত । পাকিস্তানের বিদ্বেষ , বলা বাহুল্য কতিপয় নেতা ও ঐতিহাসিক কারনেই স্বতন্ত্র পাকিস্তানের জন্ম । পাশাপাশি উচ্চাকাঙ্খা সম্পন্ন কতিপয় নেতার অদম্য উচ্চাকঙ্খা ভারত পাকিস্তান উভয় দেশের মধ্যে চিরশত্রুতার জন্ম দেয় । ইতিহাসের দিকে নজর রেখে আলোচনা করলেই দেখা যায় পাকিস্তান গঠনের চিন্তাধারা স্রষ্টারুপে স্যার মহম্মদ ইকবালের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়। তবে পাশাপাশি ইহাও সত্য যে স্যার মহম্মদ ইকবাল কখনই সার্বভৌম , স্বতন্ত্র , স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের কথা বলেননি ।

Mr. Coupland এর মতানুযায়ী মোহম্মদ ইকবাল ভারতে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের পক্ষপাতি ছিলেন এবং এই কেন্দ্রিয় সরকার শুধুমাত্র তার অন্তভুক্ত মন্ডলী রাষ্ট্রগুলোর দ্বারা স্বেচ্চায় প্রদত্ত ক্ষমতা ভোগ করার অধিকার লাভ করবে । তাছাড়া পাকিস্তান প্রস্তাবের প্রথম উদ্যেক্তা স্যার মোহম্মদ ইকবাল হলে ও তিনি , বিশ্বাস করতেন যে পাকিস্তানের সৃষ্টি ব্রিটিশ সরকার হিন্দু সম্প্রদায় ও ক্রমশঃ মুসলমান ধর্মাবিলম্বীদের পক্ষে ও ক্ষতিকারক হবে । একসময় স্যার মহম্মদ ইকবাল Mr. Edward Thompson কে বলেছিলেন ব্রিটিশ সরকারের পাকিস্তান পরিকল্পনা হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের জন্য ক্ষতিকারক হবে , মোহম্মদ ইকবালের আদর্শে অনুপ্রানিত কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠনরত কিছু ছাত্র , রহমৎ আলী নামে জনৈক ছাত্রনেতাকে তাদের নেতৃত্বে প্রদান করেন । ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে রহমৎ আলী ভারতীয় মুসলীমদের একটি স্বতন্ত্র জাতি রূপে বর্ণণা করেন এবং পাঞ্জাব , কাশ্মীর , সিন্ধু , বালুচিস্তান , এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ নিয়ে পাকিস্তান গঠনের সম্ভাবনার কথা প্রকাশ করেন । শুধু - ই নয় রহমৎ আলী হায়দরাবাদে ও পাকীস্তান এবং বাংলাদেশ

ও আসাম নিয়ে বঙ্গ - ই ইসলাম নামে আরও দুটি মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের আদর্শের কথা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করেন , কিন্তু তার এই চিন্তাধারা মুসসিল জনসাধারনের ও তাদের নেতৃবর্গের উপর কোন প্রকার প্রভাব বিস্তার করতে ব্যর্থ হয় । ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে স্যার জাফরুল্লাখান রহমৎ আলীর এই পরিকল্পনাকে অদ্ভুত ও অবাস্তব বলে বর্ণনা করেন । ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মুসলীম লীগও এই পরিকল্পনার প্রতি সমর্থন জানায়নি । ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে মোহম্মদ আলী জিন্নাহ্ সর্বপ্রথম ভারত বিভাগের দাবী পেশ করেন ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তিনি হিন্দু ও মুসলমানকে দুটি স্বতন্ত্র জাতি রূপে বর্ণনা করেন । ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে মুসলীম লীগের লাহোর অধিবেশনকে সভাপতির ভাষনে তিনি বলেন মুসলিমগন একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নয় । তারা একটি স্বতন্ত্র জাতি । তিনি আরও বলেন এই উপমহাদেশে শান্তি ও সমৃদ্ধি স্থাপনে আগ্রহী হলে ভারতের প্রধান প্রধান জাতিগুলোকে স্বতন্ত্র জাতীয় রাষ্ট্র স্থাপনের জন্য ব্রিটিশ সরকারের উচিত ভারতকে বিভাগ করা এই ভাষনেই তিনি আর ও বলেন যে হিন্দু ও মুসলমান সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দুটি জাতি । সুতরাং তাদের নিয়ে একটি অখন্ড জাতি বা জাতীয় রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব নয় । প্রকৃতপক্ষে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ শে মার্চ মুসলীম লীগের লাহোর অধিবেশন পাকিস্তান গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয় । ঐ প্রস্তাবে মোটামুটি ভাবে বলা হয় যে , যে সকল পরস্পর সংলগ্ন অঞ্চলে মুসলমানগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ সেই সকল অঞ্চলগুলো নিয়ে একটি স্বতন্র রাষ্ট্র গঠন করা উচিত এবং এই রাষ্ট্রে নাম হবে পাকিস্তান । ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে রাজনৈতিক ভাগ্য পরিবর্তন দেখা দেয় সাথে মোহম্মদ আলী জিন্নাহ্র উচ্চাকাঙ্খার আশাও । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহন করার প্রসঙ্গে জাতীয় কংগ্রেসের সহিত ব্রিটিশ সরকারের মতবিরোধ দেখা দিলে বিভিন্ন প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার সদস্যগন পদত্যাগ করেন । এই সময় মোহম্মদ আলী জিন্নাহ্ ঘোষনা করেন যে কংগ্রেসী মন্ত্রিদের পদত্যাগের দিনটি প্রতিবছর মুসলিমদের " পরিত্রান দিবস" রূপে পালন করা অবশ্য কর্তব্য । ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে ক্রিপসের প্রস্তাবে বলা হয় যে ইচ্ছা করলে ভারতের যে কেন অংশ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তভুর্ক্ত না হয়েও নিজের স্বাতন্ত্র বজায় রাখতে পারে।

ব্রিটিশ সরকারের এই প্রস্তাব মুসলীম লীগের পাকিস্তান দাবিকে প্রত্যক্ষভাবে জোরদার করে তুলে । যদিও মুসলীম লীগ ও জাতীয় কংগ্রেস ক্রিপসের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে । কিন্তু ক্রিপসের প্রস্তাব মুসলীম লীগের নেতৃবর্গের মধ্যে নতুন আশার সঞ্চার করে । ক্রিপস মিশনের ব্যর্থতার অন্যতম প্রত্যক্ষ ফল জাতীয় কংগ্রেসের পরিচালিত ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ভারত ছাড়ো আন্দোলন । এই আন্দোলনের সময় ব্রিটিশ সরকারও মুসলীম লীগের মধ্যে সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠে এবং মিষ্টার জিন্নাহ্ ভারত ছাড়ো আন্দোলনকে জাতীয় কংগ্রেসের আন্দোলন বলে আখ্যা দেন । তিনি ঘোষনা করেন যে , এটা শুধুমাত্র ব্রিটিশদের ভারত থেকে বিতাড়িত নয় , মুসলীমদের উপর চীবদিনের জন্য কর্তৃত্ব করার এই আন্দোলন শুরু করা হয় । সুতরাং মুসলীম সম্প্রদায়কে এই আন্দোলনে

অংশগ্রহন করার জন্য নিষেধ করা হয় এবং ব্রিটিশ সরকারকে ভারত পরিত্যাগ করে যাওয়ার পূর্বেই ভারত বিভক্তিকরনের জন্য অনুরোধ জানায় । চক্রবর্ত্তী রাজা গোপালচারী হিন্দু - মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপনের জন্য একটি নতুন প্রস্তাব পেশ করেন এবং এই প্রস্তাব মুসলীম লীগের অধিকাংশ দাবীই স্বীকৃত হয় কিন্তু মিষ্টার জিন্নাহ্ এই প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন । লর্ড ওয়াভেলের ও মিমাংসার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় । ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত গনপরিষদের নির্বাচনে মুসলিম সংরক্ষিত ৭৮ টি আসনের মধ্যে ৭৩ টি আসন লাভ করে । ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ জুলাই তারিখে মুসলীম লীগের নেতৃবৃন্দ ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব প্রত্যাখান করে এবং তাদের বাঞ্ছিত পাকিস্তান স্বীকৃত না হলে তারা প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ারও ভীতি প্রদর্শন করে , ১৬ই আগষ্ট কলকাতায় মুসলমানগন অতর্কিতে হিন্দুদের আক্রমন করে ব্যাপক দাঙ্গা - হাঙ্গামা শুরু করে । কয়েক সপ্তাহ পরে নোয়াখালি ও ত্রিপুরার মুলসমান রা নিরপরাধ হিন্দুদের ব্যাপকভাবে হত্যা করে । তখন বিহার , উত্তর প্রদেশ এবং বোম্বাইতে হিন্দুরাও ক্ষিপ্ত হয়ে মুসলমান হত্যায় প্রবৃত্ত হয় ।

ইতিমধ্যে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ২ রা সেপ্টেম্বর জাতীয় কংগ্রেস পন্ডিত জওহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে অন্তবর্তী সরকার গঠন করে । মুসলীম লীগ প্রথমে এই সরকারে যোগ দিতে অস্বীকার করে কিন্তু কিছুকাল পরে সরকারের সহযোগিতার পরিবর্তে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার উপায় হিসেবে অন্তবর্তী সরকারে যোগদান করে । কিন্তু মুসলীম লীগ নেহেরুর নেতৃত্বে ও যৌথ দ্বায়িত্ব অস্বীকার করে , উভয় দলের মধ্যে মতনৈক্য শুরু হয় । এই সম্পর্কে লন্ডনে ব্রিটিশ সরকারের আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এবং তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার মুসলীম লীগের ব্যাখ্যাই সমর্থন করে । মুসলীম লীগ স্বতন্ত্র গনপরিষদ চাই যেখানে মুসলমানগন সংখ্যাধিক্য আছে যা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে পাকিস্তান রাষ্ট্রের পরিকল্পনা করে । এই সকল পরিস্থিতি ও পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে ব্রিটিশ সরকার ভারত স্বাধীনতা আইন রচনা করে । ১৯৪৭ সালের ৪ ঠা জুলাই এই বিল পার্লামেন্টে উত্থাপিত হয় এবং ১৮ ই জুলাই পার্লামেন্টে তা অনুমোদিত হয়ে রাজস্বাক্ষর লাভ করে আইনে পরিণত হয় । এই আইনে বলা হয় যে , ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ ই আগষ্ট থেকে ভারতবর্ষে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের সৃষ্টি হবে। বহু দিন দরেই কতিপয় মুসলীম নেতার উচ্চাকাঙ্খা ধীরে ধীরে মুসলীম সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্যের মনোভাব গড়ে উঠা ভারতবিভাগ ও পাকিস্তানের সৃষ্টিই তার শেষ পরিণতি , ওয়াহাবী আন্দোলন থেকেই প্রথম জাতীয় ঐক্যে আঘাত শুরু হয় । আলীগড় আন্দোলন দ্বিজাতিতত্বের মতবাদ শক্তি সঞ্চয় করে । মুসলীম লীগ গঠন এই মতবাদকে আরো শক্তিশালী করে তুলে । এছাড়া শাসকদের অনুসৃত । বিভেদমুলক নীতি হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে পার্থক্য ও বিদ্বেষের জন্ম দেয় । তৎকালীন ব্রিটিশ শাসকের দ্বারা সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা পক্ষপাতিত্বের প্রদর্শন ইত্যাদি । কতিপয় নেতার রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা । ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ

করাও আর একটি ভুল সিদ্ধান্ত । বিশ্বযুদ্ধের সুযোগ নিয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষী মিষ্টার জিন্নাহ্ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বিস্তারের সুযোগ লাভ করেন । পাকিস্তানের দাবী উত্থাপনের জন্য ও তিনি এই সময় বিশেষ সুযোগ লাভ করেন । ফলে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ আরো বৃদ্ধি পায় । সাম্প্রদায়িকতা দাঙ্গা হাঙ্গামা ও বিদ্বেষের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্যই বাংলাদেশ ও পাঞ্জাবের হিন্দুগন ও দেশ বিভাগের পক্ষপাতি হয়ে উঠে ,এছাড়া ও ওয়ার্ধা শিক্ষা পরিকল্পনা ও বিদ্যামন্দির পরিকল্পনা ও মুসলীম সম্প্রদায়ের মনে বিরক্তির সৃষ্টি করে এই সব পরিকল্পনাকে তারা তাদের ধর্মনীতি বিরোধ রুপে বিবেচনা করতে শুরু করে এবং মনে করে যে কংগ্রেসী শাসনে তাদের ধর্ম সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হবে । গোঁড়া মতাবলম্বী অনেক মুসলমানেরই ধারণা হয় যে পাকিস্তান সৃষ্টির মাধ্যমেই তারা সমগ্র মুসলীম জগতের সহিত ঐক্য স্থাপন করার সুযোগ লাভ করবে । পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের পরাধীন মুসলীমদের স্বাধীনতা লাভের আন্দোলনের পীঠস্থানরূপে পাকিস্তানকে পরিণত করার স্বপ্নও তারা দেখতে শুরু করে । তবে ইহাও সত্য যে মুসলীমসেদর প্রতি উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মনোভাব মুসলীম সম্প্রদায়ের মনে প্রচন্ড বিক্ষোভের সৃষ্টি হয় । গোঁড়া হিন্দুগন মুসলমানদের অস্পৃশ্য জাতিরূপেই বিবেচনা করত। যার কারনে মুসলমানদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয় যে হিন্দুগন তাদের হীনজাতি বলে গণ্য করে । অপরদিকে মুসলমানগন নিজেদের হিন্দুদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠজাতিরুপে মনে করত । ফলে একে অপরের মনোভাব সহ্য করত না । ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ভি, ডি সাভারকার হিন্দু রাষ্ট্রের আদর্শ ঘোষনা করেন এবং হিন্দুদের ভারতের রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার করার জন্য অনুরোধ করেন । শুধু তাই নয় সাভারকার হিন্দু ও মুসলমানগনকে দুটি স্বতন্ত্র জাতি রুপেও বর্ণনা করেন। ফলে মুসলীম লীগ অত্যন্ত স্বতন্ত্র হয়ে উঠে এবং পাকিস্তানের দাবী যত শীঘ্র সম্ভব আদায় করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠে। পাশাপাশি চোকাস্লোভাকিয়ার সুদেতেন আন্দোলন ও ভারতের মুসলীমদের স্বতন্ত্র্য রাষ্ট্র গঠন করতে প্রভাবিত করে , সুযোগ বুঝে ব্রিটিশ সরকার ও উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্ব থেকেই সাম্প্রদায়িক মনোভাব নিয়ে মুসলমানদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন শুরু করে এবং সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা করে । ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ক্রিপসের পরোক্ষভাবে প্রস্তাব ও পাকিস্তানের দাবিকেই স্বীকার করে । প্রকৃতপক্ষে ক্রিপসের প্রস্তাব ভারতের জাতীয় ঐক্যের মূলে কুঠারাঘাত করে এবং দিনে দিনে হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায়ের সম্পর্ক তিক্ত থেকে আরো তিক্ত করে তুলে । প্রতিভাবান ও উচ্চাকাঙ্খী মোহম্মদ আলী জিন্নাহ্ ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের বড়দিনের দিন করাচি শহরে জন্ম গ্রহন করেন এবং মাত্র ১৬ বছর বয়সে লন্ডনে ব্যারিষ্টারী পড়তে যান এবং সেখানে দাদাভাই নওরোজীর সংস্পর্শে আসেন । ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নওরোজীর একান্ত নিযুক্ত হন । ঐ সময় থেকে গান্ধী যুগের সূচনা পর্যন্ত তিনি ছিলেন কংগ্রেসের অন্যতম নেতা । যদিও তখন তিনি হিন্দু মুসলিম ঐক্যের খুব প্রয়াস করেন কিন্তু গান্ধীজির অহসযোগ আন্দোলন তিনি মেনে নেননি বরঞ্চ গান্ধীনীতির প্রকাশ্য সমালোচনা করেন । কিছুদিন পরে জাতীয়

কংগ্রেসের সাথে মতবিরোধিতার কারণে তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করেন ও উচ্চকাঙ্খার নেশা উনাকে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির দিকে আকৃষ্ট শুরু করেন । ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে লন্ডনে অনুষ্ঠিত গোলটেবিল বৈঠকে জিন্নাহ্ যোগদান করে কিন্তু রাজনৈতিকভাবে মর্মাহত হয়ে দেশে ফিরে আসেন এবং প্রাচীনপন্থী মুসলীম নেতৃবর্গের সাথে মতবিরোধ দেখা দিলে রাজনীতি ত্যাগ করে লন্ডনে প্রিভি কাউন্সিলে আইন ব্যববসায় যোগ দেন । কিন্তু কিছুকাল পরে মুসলীম সম্প্রদায়ের নেতৃত্বে বিরাট শূন্যতা দেখা দেয় । যেহেতু ফলজ -ই হোসেন , আজমল খান , মোহম্মদ সাফী , ডক্টর আনসার , মোহম্মদ আলী মৃত্যমুখে পতিত হন । মৌলানা আবুল কালাম , আসক আলী জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দেন , ফলে তরুন মুসলীম নেতৃবর্গের পক্ষ থেকে মোহম্মদ আলী জিন্নাহ্ কে নেতৃত্বে গ্রহনের জন্য অনুরোধ করা হয় এবং নবাবজাদা লিয়াকৎ আলী খানের আমন্ত্রণে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পুনরায় ভারতে ফিরে আসেন এবং লন্ডনে থাকাকালেই তিনি মুসলীম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং ইতিহাস বলে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ তার মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনিই মুসলীম লীগের অবিসংবাদিত নেতা ছিলেন ।- ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় এই সুযোগে জিন্নাহ্ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বৃদ্ধি করার চেষ্টা করেন পাশাপাশি ব্রিটিশ সরকার জিন্নাহ্ র প্রচেষ্টায় ইন্ধন যোগায় । ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের লাহোর অনুষ্ঠিত মুসলীম লীগের অধিবেশনে মোহম্মদ আলী জিন্নাহ্ প্রকাশ্যে পাকিস্তান গঠনের প্রস্তাব পেশ করেন । ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ শে মার্চ মুসলীম লীগ সর্বসম্মতিক্রমে পাকিস্তান গঠনের প্রস্তাব গ্রহন করে । পাকিস্তান দাবি ই মোহম্মদ আলী জিন্নাহ্র রাজনৈতিক জীবনে বিরাট পরিবর্তন আনায়ন করে শুধু তাই নয় তিনি ভারতের রাজনৈতিক জীবনেও অন্যতম প্রধান ভাগ্য নিয়ন্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার সুযোগ পান । ব্রিটিশ সরকারও উনার উপর গুরুত্ব আরোপ করতে শুরু করে । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সাধারণ নির্বাচনে শ্রমিক দল নির্বাচিত হয় মন্ত্রিসভা গঠন করে এবং তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট এ্যাটলি অবিলম্বে ভারতকে স্বাধীনতা প্রাদন করার প্রতিশ্রুতি দেন এবং একটি ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবেই পাকিস্তান গঠনের দাবী সরকারের পক্ষে থেকে স্বীকৃতি লাভ করে এবং ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩ রা জুন একটি সরকারী ঘোষনা প্রচার হয় এ ঘোষনায় ভারত দ্বি - খন্ডিত হয়ে ভারত ও পাকিস্তান দুটি রাষ্ট্র গঠন করা হয় । মোহম্মদ আলী জিন্নাহ্র দীর্ঘদিনের আশা বৃহত্তর পাকিস্তান গঠনের স্বপ্নসম্পূর্ণ বাস্তবে পরিণত না হলেও পাকিস্তানের উপর সর্বসময় আধিপত্য বিস্তার করার সুযোগ মোহম্মদ আলী জিন্নাহ্ লাভ করেন । তারপর থেকেই ভারতের সাথে পাকিস্তানের অমিত্র সুলভ আচরণ শুরু হয় এবং তা যেন পাকিস্তানের জাতীয় নীতি হিসেবে গৃহীত ।

পরবর্তী সময়ে ইয়াহিয়া খানের আমলে ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের ৩ রা ডিসেম্বর ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে লিপ্ত হয় । এছাড়া ও ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে সেপ্টে ম্বর মাসে ও পাকিস্তান কাশ্মীর ইস্যু নিয়ে ভারতের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়।

সুতরাং কাশ্মীরের প্রশ্ন তুলে পাকিস্তানের জনমতকে উত্তেজিত করা পাকিস্তানের একটি পুরানো কৌশল , যেমনটা পুনরায় হয়েছিল ১৯৯৯ এর কাশ্মীরে কারগিল অভিযান । এই ভাবে ১৯৪৭ এ কাশ্মীর অভিযান , ১৯৬৫ কচ্ছের রান আক্রমন ,১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে ভারত আক্রমন এবং ১৯৯৯ এর কারগিল অভিযান কোন ক্ষেত্রেই পাকিস্তান ফলপ্রসূ হতে পারেনি বরং পরাজয়ের গ্লানি বহন করে নিয়েছে । তবুও পাকিস্তানী শাসকদের উচ্চাকাঙ্খার অবদমন নেই । সন্ত্রাসবাদীদের ভারত ভূখন্ডে প্রেরণ করা ও নতুন কিছু নয় বহু পূর্ব থেকেই তাদের এই পুরানো অভযাস ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে পাকিস্তান ভারতভূখন্ডে ১২০০ সশস্ত্র মুজাহিদিন প্রেরন করেছিল তাদের কিছু ভারতীয় সেনাদের হাতে মারা গেছে ও কিছু গ্রেপ্তার হয়েছে । তাই দেখে মনে হয় এ যেন পাকিস্তান শাসককুলের বরাবরের উচ্চকাঙ্খা ও আগ্রসন ও ভারতকে অবদমনের ব্যর্থ প্রচেষ্টা । মুখে এক কথা কাজে অন্য রকম যা আজো শেষ হয়নি । নওয়াজ শরিপের পতন ঘটিয়ে সামরিক প্রসাশক জেনারেল পারভেজ মুশারফের আমলেও তার পরিবর্তন ঘটেনি যেমনটা অন্যদেশের ভুমিতে চোরের মত ঢুকে সন্ত্রাস করাকে ও উনি স্বাধীনতা যুদ্ধ বলেন । তাহলে সন্ত্রাসটা কি ? শুধু তাই নয় উনার আমলেই উনার দেশে উনার মদতপুষ্ট সন্ত্রাসদের প্রত্যক্ষ মদতে কান্দাহার থেকে ভারতীয় বিমান ছিনতাই , জম্মু কাশ্মীর বিধানসভায় হামলা শেষ অব্দি ১৩ ই ডিসেম্বর ২০০১ ইং ভারতীয় গনতন্ত্র ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক পার্লামেন্ট ভবন আক্রমন , তারপরও কি কোন সভ্য দেশের মানুষ এ জঘন্যতম আক্রমনকে সমর্থন করতে পারে ? পাকিস্তানেরই শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষেরই একটি অংশ এই জঘন্যতম ঘটনাকে মেনে নিতে পারেনি । সুতরাং এ বিদ্বেষ আর নতুন কিছু ঘটনা নয় । পাকিস্তান শাসককুলের একটি অংশ নিজেদের গদী ও উচ্চাকাঙ্খাককে টিকিয়ে রাখতেও দেশের জনগনের দৃষ্টিকে ঘুরিয়ে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধিই করতে সচেষ্ট যা কলংকিত ও বিকৃত ইতিহাস সৃষ্টির প্রয়াস মাত্র ।৬ / ১১ মুম্বাইয়ের ঘটনা ও তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ ।

## " লড়াইটা কাদের বিরুদ্ধে"

উন্নত সমাজ ব্যবস্থায় কি সমাজের অবক্ষয় ঘটে ? এ প্রশ্ন আমার আপনার সবারই আধুনিকতার পর্যায়ক্রমে উপরে উঠে যখন আমরা শিক্ষায় দীক্ষায় কারিগরি , চিকিৎসা প্রভৃতি দিকে উন্নয়নশীল দেশগুলোর সাথে নিজেদের তুলনা করতে যাচ্ছি তখনই পাশাপাশি দেখতে পাচ্ছি হঠাৎ করে ধর্মঘট, অবরোধ বন্ধ যা তৎক্ষণাৎ জন জীবনকে স্তব্দ করে দেয় কিন্তু যদি প্রশ্ন উঠে এই বনধ , ধর্মঘট এর ফলে কত ক্ষতি হলো , কার হলো কেন হলো বা লাভই কতটুকু হল আর যদি লাভই হলো , তবে কার হলে , তখনই প্রশ্ন জাগে লড়াইটা কিসের কিভাবে কখনও কাদের বিরুদ্ধে বাস্তব অভিজ্ঞতা মনে করিয়ে দেয় আসলে অসুবিধাটা ........ নয় । অসুবিধাটা নিতান্তই সাধারণ মানুষের যাদের পুজিই হলো '' দীন ভিক্ষা তনুরক্ষা '' যারা অসহায় , মনে লড়াইটাই শুধু তাদের বিরুদ্ধেই ।

আধুনিকতার চরম শিখরে যখন আমরা উঠতে যাচ্ছি , পাশাপাশি আমাদেরই একদল অত্যাধুনিকতার নামে জীবন সংহারক পথ দেখিয়ে দিচ্ছে । যেমন আমাদেরই কিছু কিছু অভিভাবককে দেখা যায় ছেলেমেয়েরা যখন যৌবন তাড়িত বয়সের গন্ডিকে , তখন তাদের নিয়ে ঘরে বসে অত্যাধুনিক হিন্দী ইংরেজী আরও কত কি লাল নীল ছবি একসাথে উপভোগ করেন । আরও কত কিছু তা কী অভিভাবকদের শোভা দেয় । তাহলে লড়াইটা হবে কখনও কাদের বিরুদ্ধে ।

এই তো দেখুন উত্তর - পূর্বাঞ্চলে সন্ত্রাসবাদীরা সন্ত্রাসকে নিত্যসঙ্গী করে রেখেছে কিন্তু হয়ত এসব উগ্র সংগঠন বা সন্ত্রাসবাদীরা নিজেরাও জানে না কি তাদের অভীষ্ট লক্ষ । তাহলে নির্দ্ধিধায় যদি তাদেরকে নরঘাদক ও কু চক্রী দল বলা হয় তবে কী ভুল হবে ? যারা প্রতিনিয়ন এত প্রাণ কেড়ে নিচ্ছে হাজার সদবা আজ বিধবা , হাজার সন্তান আজ পিতৃহারা , মাতৃহারা , স্বজনহারা অগনিত , রিক্ত হস্ত , যেখানে মৃত্যুর আর্তনাদ থেমে গেছে । শ্মশান ভূমিতেও উত্তেজনা নেই যেন নিয়মের বাধা শবের মিছিল , যদি কোন কলবর হয় তা হল ধ্বংসের উন্মুক্ততা ।

যদি এই হত্যাকারীদের কাছে প্রশ্ন করি তোদের এ লড়াইটা কিসের, কাদের বিরুদ্ধে তখন আর সঠিক উত্তর আসে না। তবে এটা তো সত্য তাদের ইতিহাসটা হবে বর্বরতার ও দুষ্কর্মের ইতিহাস । আমার মনে হয় উত্তর পূর্ববাঞ্চলে একটা অমানবিক অঘোষিত যুদ্ধ রোগের ন্যায় ছড়িয়ে পড়ছে আর আমরা জড় পদার্থের মতো নির্বাক দৃষ্টিতে চেয়ে আছি। মুখে আমরা চুরান্ত সাম্যবাদী কিন্তু বাস্তবটা সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণ বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় দায়িয়ে জাত পাতের বিভেদ , নীচু জাতের বিভেদ ধর্মান্ধতা , তবে এগুলো কার স্বার্থে কেন বা এটা কিসের লড়াই?

১৯৪৭ যর পূর্বে লড়াইটা ছিল বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে শৃঙ্খল বদ্ধ জননীর মুক্তির লড়াই অমানবিক শোষক ও পরাধীনতার বিরুদ্ধে লড়াই , অগনিত রক্ত ঝরেছে হাজার হাজার শহীদের রক্তের বিনিময়ে আজ স্বাধীন ধ্বজ উড়ছে নিশ্চয়ই স্বাধীনতার যুদ্ধে যারা বলিদান দিয়েছেন বা শত্রুর অত্যাচারের কবল থেকে রক্ষা পেতে আত্মঘাতী হয়েছেন বা নয়ত নির্মম জেল যন্ত্রণা ভোগ করেছেন তারা নিশ্চয়ই এ বিভাজন চাননি । আজকের এ লড়াই তো আর স্বাধীনতার লড়াই নয় তবে লড়াইটা কিসের ও কেন । আমাদের এ সমাজে আমরা যাদের বুদ্ধিজীবি শিক্ষিত বলে জানি তাদেরই বা ভূমিকা কি ? জানতে ইচ্ছে হয় , এ দেশ তো আর দুষ্টচক্রের তল্পিবাহকের জন্য নয় নিশ্চয় শুনেছি আগেরকার সময়ে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে সাধারণ মানুষ জানতো না কেই বা প্রধানমন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রী মানে কী ? বা উনার কাজ কি ? বা এ সব জানার জন্য তাদের কোন স্পৃহা ও চিল না । কিন্তু এ দেশ তো আজ আর এ রকম নয় অনেক পরিবর্তন হয়েছে । তাহলে ভাতৃঘাতী সংঘর্ষ কেন ? যেমনটা দেখুন আমাদের ঐতিহ্যশালী ক্ষুদ্র রাজ্য ত্রিপুরা যা ছিল জাতি উপজাতি সহ সর্বস্তরের মানুষের মিলনসেতু । যেখানে মানবতার মুল্যই ছিল অগ্রগন্য যা পুরানো ইতিহাসের পাতা স্বাক্ষ্য

বহন করে । কিন্তু আজ দৈনন্দিন খবরের কাগজ হাতে নিলেই দেখা যায় শান্ত ভূমি পোড়া আগুন , বারুদ ও ভেজা রক্তের গন্ধে লাল হয়ে আছে । কিন্তু কেন ? সংঘর্ষে সংঘর্ষ বাড়ে , উত্তেজনা বাড়ে , সংহতি নষ্ট হয় , জীবন পিছু ধাবিত হয় , তাহলে সংঘর্ষ কেন ও কাদের বিরুদ্ধে ? কে শুনবে শ্মশান ভূমির বুক চাপা কান্না যা গুমড়ে গুমড়ে আগামী প্রজন্মকে অভিশাপের দিকে ঠেলে দিচ্ছে , কে দেবে আগামী প্রজন্মের অভিশাপ থেকে মুক্তি । প্রশ্ন করলে প্রশ্নটা থেকে যাবে । আমার বিশ্বাস মানুষই মানুষের মুক্তির পথ । মানুষই সমস্যার সমাধান সূত্র ।

## "ওদের প্রতি ঘৃনা"

উগ্র পৈচাশিক সাম্রাজ্যবাদী বিভ্রান্তি ছড়ানো উগ্রবাদীদের উদ্দেশ্য । এ দেশের রাজ্যর মানুষের ঘৃণা তিতীক্ষা সীমাহীন বেড়েছে তাই বলি মায়েদের মনে আনন্দ তখনই আসবে যখন নিপীড়িত উৎপীড়িতের কান্না আকাশে বাতাসে ছড়াবে না , রক্ত আর বারুদের তাজা গন্ধ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে আর পাশাপাশি নরঘাত্কদের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র যখন আর যুদ্ধ ক্ষোভ তৈরী করতে পারবে না ।

এ দেশে আমাদের অগ্রগতি ওমান রক্ষার দায়িত্ব ও আমাদের । এ শতাব্দীর বিদায়ের ঘন্টা ক্রমেই বেজে উঠেছে । নতুন শতাব্দী নতুন প্রজন্মকে সামনে রেখে এগিয়ে আসছে । শতাব্দীর যাওয়া আসা মানুষের বোঝাপড়ার অতুলনীয় সময় রেখে এগিয়ে আসছে । শতাব্দীর যাওয়া আসা মানুষের বোঝাপড়ার অতুলনীয় সময় যখন মানুষের পরিচয়টাই হয় মানুষের কাজের মাধ্যমে যা বাস্তব সমাজ জীবনেই স্বীকৃতি মেলে । এটা অস্বীকার করার উপায় নেই সাম্রাজ্যবাদী ক্ষমতালিপ্সা উগ্রবাদীদের সন্ত্রাস অপহরনের কারণে মানুষের জীবন জীবিকা বিপর্যস্ত । সাধারণ মানুষ থেকে , শিক্ষক , চিকিৎসক, সরকারী , কর্মচারী সবাই এস্ত উন্নয়নে প্রচন্ড বাধা সমাজকে পিছু ঠেলে দিচ্ছে । সংকট সর্বত্র বিরাজমান যখনই সাধারণ মানুষ নিত্য টানাপোড়েন কাটিয়ে মাথা তুলে দাড়াতে চাইছে নতুন প্রজন্মের প্রতি আশার দ্বীপ জ্বালিয়ে তখনই সাম্রাজ্যবাদী বিভ্রান্ত শক্তি অগ্রগতি রোধ করে রুখে দাড়াচ্ছে - এ কোন অসভ্যতা । এ কথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে যখন সমাজে মানুষ মানসিক শ্রমে , শারীরিক শ্রমে উপার্জন করে এই উপার্জিত অর্থকে জীবনের কবচ ভেবে এগিয়ে যাচ্ছে তখনই বিভ্রান্ত বর্বরদের হাতে হয়ত অর্থ লুঠ নহেতু প্রাননাশ । মনে হয় যেন নিজের জীবন ভূমিতেই নিজের জীবননাশ - বিভ্রান্তকামীরা নিজেরাই নিজেদের হারিয়ে ফেলেছে তা স্পষ্ট , সুদুর ভয়ঙ্কর সিদ্ধান্ত মরীচিকার পেছনে হন্যে হয়ে ছুটে বেড়ানো ছাড়া আর কিছু নয় । উগ্রদের উদ্ভট চিন্তাধারায় কখনো অদ্ভুত ইতিহাস তৈরী হতে পারে না এরা হয়ত বা জানে না এ ভারতভূমির কোটি কোটি সন্তান তা কখনো বরদাস্ত করবে না । যদি বরদাস্তই করতে তবে এ ভারতবর্ষ বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দ্বারা টুকরো টুকরো হয়ে যেত । এরা সাময়িক সংকট তৈরী করতে পারবে তবুও মানে এ নয় এ দেশের মানুষ

ওদের কাছে পরাধীনতার শৃঙ্খল পুনরায় পড়বে । সাম্রাজ্যবাদী বিভ্রান্তিকারীদের উদ্দেশ্যে পুনরায় বলছি এ দেশের মানুষ সুপার পাওয়ারের বিরুদ্ধে ও নিরস্ত্রহাতে , সংগ্রাম চালিয়েছিল জয়ও হয়েছিল। সুতরাং এ রাজ্যকে টুকরো করার অভিপ্রায় ওদের স্বপ্ন এবং তা স্বপ্নই থেকে যাবে । আমরা সবাই জানি জাতীয়তাবোধ এক প্রবল ও প্রচন্ড শক্তি । যার ভাবাবেগ অনুপ্রানিত হয়ে এ দেশের মানুষ পরাক্রমশালী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রাম করেছে । ১৯৪৭ সালের পূর্বে ছিল বিদেশী শত্রু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম , বর্তমান বর্তমানে এ সংগ্রাম হচ্ছে স্বদেশের ভেতরে গজিয়া উঠা সাম্রাজ্যেবাদী বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম । যা বিছিন্নতাবাদীদের বিরুদ্ধে আমাদের ভূখন্ডকে ঐক্যবদ্ধ ও সঙ্ঘবদ্ধ করার সংগ্রাম সমগ্র উত্তর পূর্ব ভারত আজ অশান্ত এবং বিচ্ছিন্নতাবাদও জাতি বিদ্বেষ আজ এক চরম আকার নিয়েছে । সুতরাং ভারতভুমিকে ঐক্যবদ্ধ রাখার জন্য সরকার ও জনগনের সম্মিলিত প্রয়াসই হবে কার্যকরী পদক্ষেপ আর তা না হলে বিচ্ছন্নতাবাদ ও জাতিবিদ্বেষ প্রবল রূপ নিতে পারে সাম্রাজ্যবাদীদের সহযোগীতায় এ রাজ্যেও বিচ্ছিন্নতাবাদীরা মাথা চাড়া দিয়ে ক্রমশ উঠে দাড়িয়েছে যা এ রাজ্যের সামনে ও ভয়ংঙ্কর বিপদ । তবে আমরা ভবিষৎহীন নয় । যদি ও ক্ষয়ের ক্ষতচিত্র দেখা যাচ্ছে তবে সবকিছু ধংস প্রাপ্ত হয়নি । একদিন আসবেই মানুষই প্রতিরোধ করবে মানুষের এই নিষ্ঠুর মৃত্যু পরোয়ানা । এটাই আবার প্রমান হবে মানুষই মানুষের কাছে সবচেয়ে দামী । হিংসা , পরন্তু যার মূল্যহীন যারা পরিবর্তনে বিশ্বাসী তারা কখনো এই বিচ্ছিন্নতাবাদকে প্রশ্রয় দিতে পারে না বা তারা কখনো উদাসীন বসে ও থাকতে পারে না । সুতরাং নৈতিকতা , সামাজিক চেতনা যার দ্বারা মানুষ নিয়ন্ত্রিত হয় যা কখনো ও চাপিয়েও দেওয়া যায় না । কারণ এ সমাজই সামাজিক নৈতিকতার শোষধনাগার যা এ সমাজের প্রয়োজনেই গড়ে উঠে । ইতিহাস প্রমান করে যুগের যবনিকাতে সমাজের চেহারা পাল্টায় যা মানব সভ্যতার অগ্রগতির সাধন করে ।

সুতরাং ক্ষয় হয়ত হচ্ছে কিন্তু তাই বলে ধ্বংস হয়নি । নিস্পেষিত নীপিড়িত মানুষের প্রতিবাদ যত প্রবল হয় । বিচ্ছিন্নতাবাদীদের পাজর তত দুর্বল হয় । তখনই ভাববে ওদের চক্রান্তের ঘর তৈরী হবে সামাজিক দায়িত্বজ্ঞান । যদি ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তি পরিচালিত বিচ্ছিন্নতাবাদীরা নৈতিকার টুটি চেপে ধরে রাখতে চায় । এর জন্যই প্রয়োজন এদের কুচক্রান্তকে ধুলিসাৎ করে দেওয়া । পরিবর্তিত সমাজ ব্যবস্থায় ওরা যতই স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করুক না কেন , এ সমাজই এদের দেবে যোগ্য উত্তর সমাজেই কংস জন্মেছিল , নীপিড়ন , উৎপীড়ন চালিয়েছিল , পাশাপাশি এ সমাজেই কংসের ধ্বংস ও হয়েছিল । সময়ের করাঘাত বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সাম্রাজ্য স্বপ্ন ভেঙ্গে যাবে ওদের দলপতি ও ওদের ছেড়ে পালাবে । নির্যাতিত জনগন প্রতিরোধ গড়ার জন্য অস্থির হয়ে আসছে । ওদের নির্মম অত্যাচারের সময় ক্রমেই ফুরিয়ে যাবে । ধ্বংস ও রক্তের দাগ এ মাটিতে লেগে

আছে। ঘৃনা চর্তুদিকে ধুমায়িত হচ্ছে সহস্ত্রাধিক মানুষ প্রতিবাদের ভাষায় ঘৃনা ও ধিক্কার জানাচ্ছে সময় দ্রুত ঘনিয়ে আসছে প্রান্তে প্রান্তে মানুষ নিজেরাই নিজেদের দায়িত্ব নেবে । মুখের গ্রাস , জীবনের ক্ষতি আর মানতে পারছে না । সুতরাং বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রতিরোধের, গতি ক্রমেই ধাবমান । বিচ্ছিন্নতাবাদীদের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র অত্যাচার - এর বিরুদ্ধে আর দীর্ঘ নিঃশেষিত মানুষ আর বসে থাকবে না । প্রতিবাদ এগিয়ে আসছে যার অগ্রগতি রোখা দায় । তাদের অস্ত্রে হয়ত আরো রক্ত ছড়বে তবুও ভবিষ্যতের প্রতীক্ষায় । লুঠেরোদের অত্যাচার , গৃহহীনার আর্তনাদ , পুত্রহীন মা, স্বামীহীনা স্ত্রীর আর্তনাদ আকাশ বাতাস ভারী হয়ে আসছে । এ সমাজ তোদের ক্ষমা করবে কি ? স্বজন হারানোর যন্ত্রণা যে কি নির্মম তা কি তোদের হাড়ে লাগে । তারা বর্বর মনুষত্বহীন কাপুরুষ শ্মশান ভূমি ও কবরের মাটিও তোদের ক্ষমা করবে না । রক্তের উন্মাদনা একদিন তাদেরকে নিজের দহনেই জ্বালিয়ে রাখ করে দেবে শুধু সময়ের প্রতীক্ষায়।

## অধিকার ও বাঙালীজাতি

বাঙালীরা অভিমানী , ভাবপ্রবন তবে নিঃসন্দেহে প্রতিবাদ হয়ত বা পৃথিবীর আর কোন ও জাতিসত্বার মতো নয় । মনে হয় বাঙালীদের সংস্কৃতি চালচলন সবকিছু যেন একটু আলাদা । যদি ও এই বিষয়ে অনেক আলোচনা , পর্যালোচনা হয়েছে গবেষনা হয়েছে তাই ঐতিহাসিক ঘটনা ও ইতিহাসের তথ্য ঘেঁটে দেখা দরকার সত্যিই কি বাঙালীরা প্রতিবাদী , বাঙা লিদের আত্মপ্রকাশ বন্ধ ,পতন - অভ্যুদয় , কর্ম , চিন্তা , অজস্র আন্দোলন সংঘাত যে পথ কখনো ও মসৃন ছিল না । ইতিহাস তার যুগ যুগান্তরের স্বাক্ষী । প্রথম সামাজিক বিপ্লব সম্ভবত শুরু হয় *শ্রী চৈতন্য ও নিত্যানন্দ যখন* দলিত জনসাধারণের বিদ্রোহকে সামাজিক বিপ্লবে রূপ দিয়েছিলেন তারপর শুরু করা যাক শিক্ষার উৎকৃস্ট সেই রামকৃষ্ণ মিশন দিয়ে । উনবিংশ শতাব্দীতে প্রাচ্য ও পাশ্চত্য ভাবধারার সমন্বয়ের মাধ্যমে যে ধর্মীয় ও সমাজ সংস্কার আন্দোলন শুরু হয় রামকৃষ্ণ মিশন তাতে এক অগ্রনী ভূমিকা পালন করেছিল । " রামকৃষ্ণ মিশন " রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নামানুসারেই হয়েছিল । পরম পুরুষ দক্ষিনেশ্বরের কালীবাড়ির একজন পূজারী ছিলেন মাত্র । শিক্ষা বলতে প্রচলিত অর্থে যা বুঝায় তা কিন্তু উনার ছিল না , তবু ও তিনি ছিলেন মহাজ্ঞানী পুরুষ । তিনি বলতেন যে , সকল ধর্মে কেই ঈশ্বরের কথা বলা হয়েছে । হিন্দু , মুসলমান , বৌদ্ধ খ্রীষ্টান , সকল ধর্মের লক্ষ্য একেই । ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে কোলকাতার বাগবাজার অঞ্চলে " রামকৃষ্ণ মিশন" এর সূত্রপাত হয় । যদি ও পরে তা বেলুড়ে স্থানান্তরিত হয় । নরেন্দ্রনাথ দত্ত সন্ন্যাস জীবনে যিনি " স্বামী বিবেকানন্দ " নামে পরিচিতি তিনিই ছিলেন রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের একজন প্রধান শিষ্য । বিবেকানন্দ গতানুগতিকতার বিরোধী হলে ও ভারতের শ্বাশত আত্মাকে অস্বীকার করেন নাই । নিষ্ঠা ও সংস্কৃতির সাহায্য নবীন

জীবন গড়িয়া তোলাই ছিল তার উদ্দেশ্য । তিনি বুঝতে পেরেছিলেন আমাদের দাড়াতে হইবে শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে । সেই শক্তি হলো দৈহিক , মানষিক ও আধ্যাত্মিক যা পরবর্ত্তী কালে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের শ্রীমতি অ্যানি বেশান্ত ও অকপটে স্বীকার করে গেছেন তারপরে আমরা আসি রাজা রামমোহন রায় সম্পর্কে , রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর , রাজা রামমোহন রায় সম্পর্কে বলেছিলেন বহুযুগব্যাপী অন্ধতার দিনে দেশ যখন নিশ্চল তাকেই পবিত্রতা বলে স্থির করে নিস্তব্দ ছিল এমন সময়েই রামমোহনের অর্বিভাব । অশিক্ষা , অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার গ্রস্ত সমাজ ব্যবস্থাকে যখন আমরা নির্ব্বিবাদে মানিয়া লইয়াছিলাম তখন অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থা থেকে মুক্তির নির্মল বাতাস সঞ্চারিত করিয়াছিলেন রামমোহন ভারতের সর্বপ্রথম আধুনিক মানুষ যিনি শত শত বৎসরের বিকৃত সমাজ ব্যবস্থা ও সংকীর্নতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান এবং আমাদের নূতন দিগন্তের সূচনা করেন । কুসংস্কার ও জাতিভেদ রোধে তিনিই যুক্তিনির্ভর বিজ্ঞানশ্রিত আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজনের কথা তুলে ধরেন । ইহা অনস্বীকার্য যে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার সংস্পর্শে আসিয়াই আমাদের জড়তা মুক্তি ঘটিয়াছিল । শুধু তাই নয় জাতিভেদ প্রথা দূরীকরণ এবং বিদেশীরা কিভাবে আমাদের সম্পদ ও কৃষকদের শোষন করিতেছে তা প্রথম রামমোহনের রচনায় বিস্তারিত ভাবে প্রকাশিত হয় । ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে রাজা রামমোহন রায় বাংলা সাহিত্যে গুরুগম্ভীর বিষয় আলোচনা করিয়া বাংলা ভাষার মর্যাদাকে যথেষ্ঠ পরিমাণে বলবৃদ্ধি করিয়াছিলেন । ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের রচিত " বেতাল পঞ্চবিংশতি " বাংলা গদ্যের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী বলা চলে । উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলার আর্বির্ভূর্ত যে সকল সাহিত্যিক বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধশালী করিয়া তুলিয়াছিলেন তাঁদের মধ্যে টেকচাঁদ ঠাকুর ওরফে প্যারিচাঁদ মিত্র , কালীপ্রসন্ন সিংহ , অক্ষয় কুমার দত্ত প্রমুখের নাম্ উল্লেখযোগ্য । বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন বাংলার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস রচয়িতা । বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্ত্তী কালে তারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় , রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ ঔপন্যাসিক বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতি ঘটিয়েছিলেন । কাব্য রচনার ক্ষেত্রে যারা বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধশালী করেছিলেন তাদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত , মাইকেল মধূসূসন দত্ত , রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায় , নবীন চন্দ্র সেন প্রমুখ উল্লেখযোগ্য । বাংলা প্রথম উল্লেখযোগ্য নাট্যকার ছিলেন রামনারায়ণ তর্করত্ন , তাছাড়া বাস্তব ঘটনা অবলম্বনে দীনবন্ধু মিত্রের রচিত " নীলদর্পন " নাট্য সাহিত্যে অমূল্য সম্পদ বলিয়া আজো বিবেচিত হইয়া থাকে । শুধু তাই নয় দেশীয় ভাষার মধ্যে বাংলায় প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় । ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় সর্বপ্রথম " বেঙ্গল গেজেট " নামে বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় । দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রে রামমোহন রায়ের অবদান অনস্বীকার্য । তিনি প্রথম " সম্মান কৌমুদী " নামে একটি বাংলা পত্রিকার সম্পাদনা করেন । ১৮২১ খ্রীঃ এবং প্রবন্ধ আকারে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে পত্রিকায় লিখে সমলোচনা ও প্রতিবাদ করতে শুরু করেন । ইহা ছাড়াও রামমোহন ইংরেজী , হিন্দী এবং পার্শী ভাষায় তিনখানি সাপ্তাহিক

পত্রিকার সম্পাদনা করিতেন । ১৮২২ খ্রীঃ রামমোহন রায় দ্বারকানাথ ঠাকুর ও কয়েকজন মিলে " বঙ্গদুত " নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন । সংবাদ পত্রের উত্তরোত্তর বৃদ্ধিতে " জান্ডাস" উক্তি করেছিলেন - "লাইসেন্স" বিহীন সংবাদ পত্র গুলি যদি যথেচ্ছভাবে প্রচার করিতে দেওয়া হয় তা হইলে ইংরেজ সরকারের ভিত্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে " রামমোহন রায় , হিন্দু কলেজ বা ইয়ং বেঙ্গলের নেতৃত্বে আন্দোলন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে গঠিত কোন সভা সমিতি মাধ্যমে শুরু হয় নাই , বাঙালী রাজনৈতিক আন্দোলনকারিগন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে স্থায়ী সভা- সমিতির গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন , ১৮৩৭ খ্রীঃ দ্বারকানাথ ঠাকুর , কালীনাথ রায় প্রমূখ ব্যক্তিত্ব " বঙ্গভাষা প্রকাশিত সভা" নামে একটি সমিতি গঠন করেন । ইহাই বাংলা তথা সমগ্র ভারতের প্রথম রাজনৈতিক সংঘ হিসাবে বিবেচিত হইয়া থাকে।

১৮৪৩ খ্রীঃ ভারত হিতৈষী টমসন সাহেব দ্বারকানাথ ঠাকুরের অনুরোধে কলিকাতায় আসেন। তাহার সহযোগিতায় কতিপয় বাঙালী চিন্তাশীল ব্যক্তি ইংরেজ শাসনের দোষ ত্রুটির প্রতিকার এবং ভারতীয়দের অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য " বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডয়া সোসাইটি " প্রতিষ্ঠা করেন ।এই সমিতি ভারতবাসীর সমস্যা সম্পর্কে ইংলন্ডে ব্যাপক প্রচার শুরু করেছিল । ১৮৭৬ খ্রীঃ সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তির উৎসাহে কোলকাতায় " ভারত সভা " নামে একটি শক্তিশালী সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । যার উদ্দেশ্য ছিল দেশে শক্তিশালী জনমত গঠন করা , ভারতে বিভিন্ন জাতি ও ধর্ম্মের মানুষকে একেই রাজনৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করা , হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রীভাব বৃদ্ধি করা এবং এই আন্দোলনে সমস্ত জনসাধারনকে সামিল করা । ১৮৪৭ খ্রীঃ প্যারীচরণ সরকার , কালীকৃষ্ণ মিত্র প্রমুখ সভ্রান্ত ব্যক্তির উদ্যোগে কলিকাতার সন্নিকটে বারাসতেই প্রথম প্রকাশ্য বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় । ১৮৭৩ খ্রীঃ ব্রিটিশ অধিকৃত ভারতে বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১৬৪০ , বালকদের জন্য প্রাথমিক স্কুল ,সংখ্যা ১৬,৪৭৩ টি পাশ্চাত্যে শিক্ষা ও সংস্কৃত বাঙালী মনকেই প্রথম আলোড়িত করিয়াছিল । পাশ্চত্য শিক্ষা - দীক্ষা , সংস্কৃতি ও ভাবাদর্শের সংঘাত বাঙালীর মনে যে নবজাগরণের সূচনা হয় তাহা সমসাময়িক সমাজ ধর্ম ও রাজনৈতিক বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল । রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালীর জীবনে চৈতন্যের বিস্ফোরন ঘটিয়াছিল তাহা তদানীন্তন সাহিত্যে প্রতিফলিন হইয়াছিল । ইংরেজ শাসনের প্রতি আস্তা হারাইয়া সমাজ নেতা , দেশ নেতা , কবি , সাহিত্যিক নাট্যকার সকলেই একযোগে শেতাঙ্গদের বর্বরতার বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইয়াছিল । বঙ্কিমচন্দ্র , রঙ্গলাল, তারক নাথ , নবীন কুমার, অক্ষয়কুমার কামিনী রায়, দীনবন্ধু মিত্র প্রমুখের দেশ বাৎসল্য ও বিদেশী অপশাসনের বিরুদ্ধে তাহাদের প্রতিবাদ , সর্বত্র এক নতুন স্পন্দনের সৃষ্টি করিয়াছিল ।

বঙ্গ ভাষায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচনাতেই সর্বপ্রথম স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি প্রগাঢ় মমত্ব বোধের

পরিচয় পাওয়া যায় ।পরাধীন ভারতের দুদশায় কবি র্মমাহত হইয়া ছিলেন । ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাহার স্বদেশ ভাবনা মূলক কবি । তার মাধ্যমে দেশবাসীর অন্তরে পরাধীনতার বেদনা ও স্বাধীনতার মর্ম বাণী জাগাইয়া তুলিয়াছিল । এবং ভারত সন্তানদিগকে স্বদেশের সেবায় আত্ম নিয়োগ করিবার আহ্বান জানাইয়া ছিলেন । অল্প কথায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত গভীর দেশাত্মবোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া এবং দেশও জাতির উন্নত কামনা করিয়াই তাহার লেখনী পরিচালনা করিয়াছিল । ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের পরবর্তী কালে যে সকল কবি ও সাহিত্যিক তাহাদের রচনার মাধ্যমে দেশবাসীর অন্তরে স্বাদেশিকতা ও দেশ বাৎসল্য জাগাইবা তুলিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় , দীনবন্ধু মিত্র, রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়, মনমোহন বসু প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । বঙ্কিম চন্দ্রের মনে দেশপ্রেমের বীজ উপ্ত হইয়াছিল ঈশ্বর গুপ্তের দেশ প্রেমমুলক রচনা হইতে বঙ্কিম প্রতিভার প্রধান উৎস ছিল দেশাত্ম বোধী স্বাধীনতা , অপহরণ কারী ইংরেজদের নিকট হইতে মাতৃভূমিতে স্বাধীন করিতে হইলে বিরুপ অনুশীলনে প্রয়োজন । বঙ্কিমচন্দ্র তাহাই " আনন্দ মঠ" উপন্যাসে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন । বিখ্যাত " বন্দেমাতরম " সঙ্গীত এই উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত । ভরতবাসীর অন্তরে দেশ মাতৃকার মাতৃমুক্তিটি সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে " আনন্দ মঠে" দেশদ্ধার ব্রতী 'সন্তান' ভবানন্দের মুখে উচ্চারিত হইয়াছিল । আমরা অন্য মা মানি না - জননী জন্ম ভূমিশ্চ স্বর্গদপি গরীয়সী। আমরা বলি , জন্ম ভূমিই জননী । আনন্দমঠ উপন্যাসে রচনায় বঙ্কিম চন্দ্র কতখানি স্বদেশপ্রীতির্ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন উহা তাহার একটি মন্তব্য হইতে বুঝিতে পারা যায় । কবি হেমচন্দ্রের উদ্দেশ্যে লিখিত এক পত্রে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়া ছিলেন যদি সাহিত্যের দ্বারা এদেশের মঙ্গল সাধন করা যায় না মনে করিতাম , তাহা হইলে আমি আনন্দমঠ লিখিতাম না । আমার বিশ্বাস , আমার আনন্দমঠে দেশের একদিন উপকার হইবে । বঙ্কিমচন্দ্রের এই ভবিষ্যবানী মিথ্যা হয় নাই আনন্দমঠ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মধ্যে বিপুল অ নুপ্রেরণা জাগাইয়া ছিল ।আনন্দমঠ ব্যতীত " দেবী চৌধুরানী " সীতারাম প্রভৃতি গ্রন্থে ও বঙ্কিমচন্দ্রের দেশ ভক্তির আদর্শ । প্রতিফলিত হইয়াছিল ।

পরাধীনতার জ্বালা অনুভব করিয়া রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায় দেশবাসীর মধ্যে দেশপ্রেম সঞ্চারিত করিবার উদ্দেশ্যেই লেখনী ধারন করিয়াছিলেন সমসাময়িক বাংলায় এমন কোনো পাঠক ছিলেন না যিনি তাহার কবিতার দ্বারা অনুপ্রাণিত হন নাই । ঐতিহাসিক আখযান তাহার রচিত চারটি কাব্য পদ্মিনী উপাখ্যান , কর্মদেবী , সুরসুন্দর এবং কাঞ্চিকাবেরী স্বদেশনুরাগ ও জাতীয়তাবাদী আদেশ পরিপূর্ণ । রঙ্গলালের দেশাত্ম বোধ সম্পর্কিত একটি গান গ্লাসিক পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে । " স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় , কে বাঁচিতে চায় ? " তাছাড়া তিনি "উৎকল দর্পন " সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা করেন ।

পরাধীনতা তথা দাসত্বের বিরুদ্ধে মাইকেল মধুসুদন দত্ত যে বিদ্রোহের মনোভাব পোষন করিতেন

তাহাই " মেঘনাধ বধ" কাব্যের রচনায় চরিত্রে প্রতিফলিত হইয়াছিল । মেঘনদাধবধ কাব্যে চরিত্রে প্রতিফলিত ইহয়াছিল । মেঘনাবধবধ কাব্যের রাবন ও মেঘনাধ ছিল যথাক্রমে শক্তি ও নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধের প্রতীক । রাবনের মুখে দেশের প্রতি আত্মত্যাগের যে আদর্শ বর্ণিত হইয়াছে তাহা পরাধীন ভারতবাসীর দীক্ষামন্ত্র ছিল । জন্মভূমি রক্ষা যে ডরে মরিতে , ভীরু সে মূঢ় শতধিকভাবে ........... ।" অল্প বয়স হইতেই হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় পরাধীনতার জ্বালা মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছিলেন। পরিনত বয়সে তিনি স্বদেশ প্রীতিমুলক কবিতা রচনার মাধ্যমে দেশবাসীকে জাতীয়তাবোধে উদবুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন । হেমচন্দ্রের " ভারত সঙ্গীত " ও ' ভারত বিলাপ ' কবিতাদ্বয় এবং " বীরবাহু কাব্যে" দেশ প্রেমের উচ্ছাস পূর্ণ উত্তেজনার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় । " ইলবার্ট বিল" উপলক্ষে আন্দোলনের সময়ে তাহার রচিত রঙ্গ কবিতা ।

" নেভার নেভার" খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল ।

সাহিত্য সাধনার দ্বারা যে সকল কবি সাহিত্যিক দেশবাসীর মনে স্বদেশ প্রেমের উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে নবীন চন্দ্র সেন বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছেন । সর্বপ্রকার অন্যায় অবিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা এবং এই অত্যাচার হইতে দেশবাসীকে মুক্ত করাই ছিল নবীন চন্দ্রের সাহিত্য সাধনার একমাত্র উদ্দেশ্য । পরাধীনতার জ্বালায় জর্জরিত , ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ভারতকে ঐক্যের মহাবন্ধনে বাধিবার আশায় তিনি তাহার " কুরুক্ষেত্র " মহাকাব্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতিত " পলাশীর যুদ্ধ" রঙ্গমতী প্রভলতি জাতীয়তা মূলক কাব্য ছিল নবীন চন্দ্রের অনবদ্য সৃষ্টি।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে অপর দুইজন ব্যক্তি যাহার স্বদেশ প্রীতিমূলক রচনার মাধ্যমে প্রাতঃস্মরনীয় হইয়া আছেন তাহাদের নাম রমেশচন্দ্র দত্ত ও ঈশান চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় । বঙ্কিমচন্দ্রের অনুপ্রেরনায় রমেশ চন্দ্র দত্ত " রাজপুত জীবন প্রভাত " ও রাজপুত জীবন সন্ধ্যা " নামক যে দুইটি স্বদেশ প্রীতি মূলক ঐতিহাসিক উপন্যাস বাংলা , সাহিত্যে উপহার দিয়াছেন তাহা নিঃসন্দেহে বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ । উপরিউক্ত দুইটি উপন্যাসের প্রথমটি একটি নিদ্রিত জাতিকে জাগ্রত করিবার এবং দ্বিতীয়টি জাগ্রত জাতিকে জাগাইয়া রাখবার গানে মুখর । কবি হেমচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঈশান চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও অগ্রজের ন্যায় জাতিবৈরী জনিত স্বদেশ প্রেমে উদবুদ্ধ হইয়া " কি লিখিব আজ , স্বভাবে কি অর্থ নাই " প্রভৃতি স্বদেশ প্রীতিমূলক কবিতা রচনা করিয়াছিলেন । মধুসুধনের পরবর্তী কালে নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের নাম উল্লেখযোগ্য । " নীলদর্পন " নাটকে দিনবন্ধুর নাট্য প্রতিভার স্ফুরন না ঘটিলেও ইহাতে উৎপীড়িত অসহায় এক শ্রেণীর বাঙালীর প্রতি যে মর্মবেদনা ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা এই নাটকটিকে অমরত্ব দান করিয়াছে । তাছাড়া বাংলাদেশে ইংরেজ চরিত্রের প্রতি সর্বপ্রথম সর্বদলীয় ঘৃনা সঞ্চারিত হইয়াছিল এই নাটকাভিনয় । স্বাদেশিক গন আন্দোলনের ভিত্তি ভুমি ও ছিল এই নাটক । উনিশ

শতকের শেষভাগে দীনবন্ধু মিত্র ব্যতীত অপর যে সকল ব্যক্তি নাট্যকার হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে জ্যোতিন্দ্র নাথ ঠাকুর , গিরিশচন্দ্র ঘোষ , রাজকৃষ্ণ রায় , অমৃত লাল বসু , ক্ষীরোদ প্রসাদ , বিদ্যা বিনোদ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য । " চৈত্র " বা হিন্দুমেলার অধিবেশনে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত " গাও ভারতের জয় " - যে জাতীয় সঙ্গীতটি গাওয়া হইত ভারতে রাষ্ট্রীয় মুক্তির ইতিহাসে তাহার স্থান সুনির্দিষ্ট । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ১৮৬৭ সালে হিন্দুমেলার সূচনা হয়। হিন্দুমেলার উদ্যোক্তাদের মধ্যে গনেন্দ্র নাথ ঠাকুর , নবগোপাল মিত্র , সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রভৃতির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য । বাংলার কবি সাহিত্যিক ও নাট্যকার গন ভারত মাতার অশ্রুজল নিবারনে দেশবাসীকে যখন আহ্বান জানাইতে ছিলেন সেই সময়ে জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হয় (১৮৮৫ খ্রীঃ ) কংগ্রেসের কর্মকর্তাগন কবি সাহিত্যকদের তেমন ধার না ধারিলেও তাহারা কংগ্রেসকে সহানুভূতির দৃষ্টিতেই দেখিতেন । সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর যে জাতীয় মিলন সঙ্গীতের সূচনা করিয়াছিলেন পরবর্তী কালে উহার প্রসার ঘটিয়াছিল । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বাদেশিকতার আবহাওয়াতেই বর্ধিত হইয়াছিলেন । হিন্দু মেলা অনুষ্ঠানে বালক রবীন্দ্রনাথ একটি জোরালো স্বদেশী কবিতা পাঠ করিয়াছিলেন । পরবর্তী কালে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনের সহিত রবীন্দ্রনাথের মনের মিল ঘটিয়াছিল , কারণ উহার মাধ্যমে তিনি সমগ্র জাতির উত্থানের ইঙ্গিত পাইয়াছিলেন । ১৯০৪ সালে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক প্রদত্ত " স্বদেশী সমাজ " বক্তৃতা সমসায়িক সমাজ ও রাজনৈতিক মহলে বিশেষ চাঞ্চল্য ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করিয়াছিল ।

স্বদেশ আন্দোলনের যুগে বঙ্গ সাহিত্য যে স্বাদেশিকতার বন্যা লক্ষ্য করা যায় , তা অতুলনীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ , রজনী কান্ত সেন , কালী প্রসন্ন ,অতুল প্রসাদ সেন, সত্যেন্দ্র নাথ দত্ত প্রমুখের আবেগময়ী গান ও কবিতা ব্যতীত এমন সাহিত্যিক বোধ হয় খুব কমই ছিলেন যাহারা দেশ ও স্বজাতির জন্য অন্তত দুই ছত্র লিখেন নাই । স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে রবীন্দ্রনাথ বিরচিত " আমার সোনার বাংলা " আজি বাংলা দেশের হৃদয় হতে কখন আপনি সঙ্গীত সমুহ বাংলার আপামর মানুষের মনে উন্মাদনার সৃষ্টি করিত ।

স্বদেশী আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের অবদান নানা দিক দিয়া অসামান্য । সভা সমিতিতে বক্তৃতা , সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ , কবিতা ,গল্প প্রভৃতির মাধ্যমে তিনি যে উদ্দীপনার সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহা আমাদের জাতীয় জীবনে চিরস্মরনীয় হইয়া থাকিবে । তাহার ছাপ স্বদেশী যুগে তাহার রচিত দেশপ্রেম মুলক সঙ্গীত তাহার গভীর দেশ প্রেম এবং জাতীয় আন্দোলনে আত্মোৎসর্গেরই অভিব্যক্তি। সেই সময়ে বাংলা দেশের সর্বত্র জনসভা হাটে মাঠে , ঘাটে রবীন্দ্রনাথের ঐ সকল সংগীত গাওয়া হইত । ইংরেজ সরকারে নৃশংস অত্যাচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে ও রবীন্দ্রনাথের লেখনী মুখরিত ছিল। জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকান্ডের বিরুদ্ধে রবীন্দ্র নাথই সর্বপ্রথম প্রতিবাদ

জানাইয়াছিলেন । বড় লাটের নিকট লিখিত এক পত্রে তিনি জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ড ও পাঞ্জাবে সামরিক আইন জারির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং সরকার কতৃক প্রদত্ত " স্যার" উপাধি ত্যাগ করেন । এই পত্রে কবির লেখনী হইতে যে তেজোময়ী প্রতিবাদ নিঃসৃত হইয়াছিল, তাহার তুলনা নাই ।

রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী যুগে অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বঞ্চিতের মর্মবেদনা এবং নারী হৃদয়ের জটিল সমস্যার আলেখ্য রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন । তাহার রচিত ' পথের দাবীতে ' বিদেশী অপশাসনের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ উ খিত হইয়াছিল তাহা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মধ্যে প্রচন্ড উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করিয়াছিল । ইংরেজ সরকার রাজদ্রোহমুলক প্রচারের অজুহাতে তাহাকে নিষিদ্ধ গ্রন্থ বলিয়া ঘোষনা করিয়াছিল।

কলিকাতার জোরাসাকোর ঠাকুর বাড়ী দ্বারকানাথের প্রপৌত্র অবনীন্দ্র নাথের শিল্পাদর্শ যে ভারতীয় শিল্পে নবজাগরনের সৃষ্টি করিয়াছিল একথা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন ।

হ্যাভেলের সহযোগিতায় অবনীন্দ্রনাথ ভারতীয় প্রাচীন শিল্প সম্পর্কে জ্ঞান ার্জন করিয়াছিলেন। হ্যাভেল অবনীন্দ্র নাথের শিল্প প্রতিভা উপলব্দি করিয়া তাহাকে কলিকাতা আর্ট স্কুলের সহকারী অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করেন । ইতিপূর্বে আর কোনো ভারতীয়ই এইপদ লাভ করে নাই । অবনীন্দ্রনাথের শিল্পবৈশিষ্ট হইল , ভারতীয় প্রাচীন শিল্পসত্তার যুগোপযোগী প্রকাশ । অবনীন্দ্র ঠাকুর শিল্পে যে যুগান্তর সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহা - নন্দলাল বসু , অসিতকুমার হালদার , যমিনী রায় মহীশূরের ভেঙ্কটাপ্পা প্রমুখের শিল্প সৃষ্টির দ্বারা পুষ্টি লাভ করিয়াছিল এবং অবনীন্দ্রনাথের শিল্প পদ্ধতি এক ন তুন শিল্প শৈলীতে উন্নীত হইয়াছিল ।

নন্দনাল বসু ছিলেন অবনীন্দ্র নাথের প্রধান শিল্প শিষ্য । কলিকাতা আর্ট স্কুলের ছাত্র হিসাবে নন্দলাল অবনীন্দ্র নাথের ঘনিষ্ট সান্নিধ্যে আসিয়া ছিলেন । ছাত্রাবস্থায় তিনি " বসুমতী " ছবি আকিয়া প্রাচ্য কলা মন্ডলীর নিকট হইতে পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন । নন্দলালের অস্কিত অসংখ্যা স্কেচ ও চিত্র পাটগুলি এক অনবদ্য শিল্পসৃষ্টি । প্রকরন পদ্ধতি ও রূপ রসের দিক দিয়া নন্দলাল শিল্প সৃষ্টি অভিনবত্বে অবনীন্দ্র নাথ অপেক্ষা কোনো অংশ কম ছিল না । এই প্রসঙ্গে কানাই সামন্তের মন্তব্যটি উল্লেখ করা যাইতে পারে ঃ অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল পরস্পরের পরিপূরক । অতিশয় সংক্ষেপে বলা যায় , পাশ্চত্য চিত্ররীতির প্রতিষ্ঠাভূমি হইতে প্রাচ্যরূপ কলার সন্ধানে যাত্রা করেন অবনীন্দ্র নাথ নন্দলাল যাত্রা করেন ভারতীয় ধ্রুবচিত্র রীতি তথা মুতিকথার সহজ অবিস্কারের ক্ষেত্রে হইতে ।

নন্দলাল ব্যতীত অবনীন্দ্র নাথের অন্যান্য যে সকল শিষ্য বাংলায় নব যুগকে সমৃদ্ধশালী করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ কর , সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত শৈলেন্দ্র নাথ দে , মুকুল দে প্রমুখ উল্লেখযোগ্য । সুরেন্দ্রনাথ কর , ওয়াল পেইন্টিং এবং মিনিচেয়ার ছবির জন্য খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

অবনীন্দ্র নাথের জ্যেষ্ঠভ্রাতা গনেন্দ্র ঠাকুর ।(১৮৬৭ -১৯৩৮ খ্রীঃ )ছিলেন উপরি উক্ত শিল্পী অপেক্ষা ভিন্ন প্রকৃতির । তিনি ছিলেন বাস্তববাদী শিল্পী । সমসাময়িক রাজনীতি , সমাজ ও অর্থনীতির উপর তাহার অঙ্কিত ব্যাঙ্গচিত্র গুলি জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল ।

ইংরেজ শাসনাধীন ভারতবাসীর দুদর্শা ও হতাশা যখন তাহাদিগকে পাশ্চত্য সভ্যতার প্রতি বিরুপ করিয়া তুলিয়াছে সেই সময়ে স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ মনীষীর "নব হিন্দু বাদ " এর প্রচার দেশবাসীকে ভারতের সনাতন ধর্ম ও প্রাচীন সভ্যতার প্রতি আগ্রহশীল করিয়া তুলিয়াছিল । বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ই সর্ব প্রথম যুক্তির আলোকে প্রাচীন হিন্দু ধর্মের কলুষতা দূরকরিয়া উহাকে স্বমহিমায় পুন ঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে সচেষ্ঠ হইয়া ছিলেন । বঙ্কিমচন্দ্রের " বন্দে মাতরম " সঙ্গীতে হিন্দুদের আরাধ্যা দেবী দুর্গার সহিত দেশ মাতৃকাকে এক করিয়ে দেখিবার ফলে দেশবাসীকে দেশাত্মবোধ বহুল পরিমানে বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্তী কালে ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণদেব ও তাহার প্রধান শিষ্য স্বামী বিকানন্দের ধর্ম সাধনা ধর্ম ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত ভারতবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করিতে যে রূপ সাহায্য করিয়াছিল অপর কোনো ধমান্দোলনই তাহা করিতে পারে নাই । শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ভগবানকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিয়া প্রচলিত হিন্দুধর্মের প্রতি দেশবাসী , বিশেষত ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যাক্তিদের বিশ্বাস ও নিষ্ঠা ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন ।

হিন্দু ধর্মের পুনরুজ্জীবনের অন্যতম পুরোহিত ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ । হিন্দু ধর্মের মুল সত্য ব্যাখা করিয়া তিনি উহাকে বিশ্বের দরবারে স্বমহিমায় পূনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । তাহার ধর্ম সাধনার উদ্দেশ্য ছিল স্বদেশ গৌরববোধ হিন্দু সম্প্রদায়ের পুনরুত্থান এবং ভারতের প্রাচীন আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ সাধন । বিবেকানন্দ কেবল অতীত ভারতের গৌরবোজ্জ্বল যুগেরই প্রচারক ছিলেন না তিনি ছিলেন হিন্দু ভারতের জাগরনের ও অগ্রদূত তিনি দেশবাসীতে দুঃখ ও দারিদ্র হইতে মুক্ত করিয়া শিক্ষাদীক্ষা শক্তি সাহসে এক বলিষ্ঠ জাতিতে পরিনত করিতে চাহিয়াছিলেন । বিবেকানন্দের তেজোদীপ্ত বানী ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লবীদের অন্তরে গভীর প্রেরনার সঞ্চার করিয়াছিল । তাহাদের এক হাতে থাকত গীতা , অন্য হাতে তরবারি এবং অন্তরে থাকিত বিবেকানন্দের আদর্শ ।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যয় , স্বামী বিবেকানন্দ , দয়ানন্দ সরস্বতী প্রমুখ মনিষীর আদর্শ ও বানী উগ্র ভাবধারা বিকাশের আদর্শ গত ভিত্তি রচনা করিয়াছিল । স্বাধীনতা অপহরণ কারী বিদেশী শাসকদের অত্যাচারে হইতে ভারতমুক্ত করিতে হইলে যে শক্তি ও আত্মত্যাগের প্রয়োজন একথা বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম প্রচার করিয়া ছিলেন । বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মের মূল সত্য প্রকাশ করিয়া সমগ্র ভারতের ঐক্যসাধন ও মুক্তির পথ প্রদর্শন করিয়া ছিলেন । এক কথায় মনীষিগন ভারত বাসীকে কাপুরুষতা ও ভীরুতা পরিত্যাগ করিয়া শক্তি সাধনার দ্বারা স্বাধীনতার অর্জন করিবার যে আহ্বান জানাইয়াছিলেন

তাহা দেশবাসীর মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও সংগ্রামী প্রেরনা জাগাইয়া তুলিয়াছিল । ভারতবাসী উপলব্ধি করিয়া ছিল যে একমাত্র তাহাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষ বর্ত্তমান অপেক্ষা উন্নতর অবস্থার উপনীত হইতে পারে । ভারতের সন্ত্রাসবাদীগন দেশ ও বিদেশ উভয় স্থান হইতেই সন্ত্রাসবাদী কার্য্যকলাপের প্রের না লাভ করিয়াছিলেন।

বাংলার বঙ্কিমচন্দ্র চট্রোপাধ্যায় , স্বামী বিবেকানন্দ , অরবিন্দ ঘোষ , মহারাষ্ট্রে বাল গঙ্গাঁধর তিলক , পাঞ্জাবের লালা লাজপৎ রায় , মাদ্রাজের চিদম্বরম পিল্লাই প্রমুখের দেশাত্মবোধ ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ ভারতের যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে বিপ্লবিক প্রেরনা সঞ্চার করিয়া ছিল । ইহা ব্যতীত ফরাসী বিপ্লব , আমেরিকার স্বাধীনতার সংগ্রাম , জাপানীদের দেশ হিঁতৈষনা ও রাশিয়ার জারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে নিহিলস্টদের গুপ্তহত্যার কাহিনী প্রভৃতির ইতিহাস পাঠ ভারতীয় বিপ্লবীদের মধ্যে বৈপ্লবিক চেতনা জাগরনে বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল ।

বাংলাদেশে প্রথমে বৈপ্লবিক উদ্দেশ্যে গুপ্ত সমিতি গঠনের কৃতিত্ব প্রথম নাথ মিত্র মহাশয়ের। তিনি ১৯০২ খ্রীঃ কলিকাতায় " অনুশীলন সমিতি " নামে একটি বিপ্লবী সংগঠন সম্পর্কে শিক্ষা দান করা হইত । ইহার উদ্দেশ্য ছিল এমন একদল তরুন সৈনিকের সৃষ্টি করা যাহারা দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকিবে ।

বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করিয়া দেশব্যাপী আন্দোলন শুরু হইলে বাংলার বিপ্লবীরা ও অধিকতর সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন । সেই সময়ে " অনুশীলন সমিতি " ব্যতীত আরও অনেক গুপ্ত সমিতি বাংলার বিভিন্ন স্থানে গড়িয়া উঠিয়াছিল । এই সকল সমিতির মধ্যে ময়মন সিংহের " সাধনা সমিতি " ঢাকার " অনুশীলন সমিতি " ফরিদপুরের " ব্রতী সমিতি " প্রভৃতি উল্লেখ যোগ্য । ইহা ভিন্ন সেই সময়ে বারীন ঘোষের নেতৃত্বে " যুগান্তর " নামে অপর একটি বিপ্লবী দলও গড়িয়া উঠিয়াছিল । " অনুশীলন সমিতি "র প্রমথ নাথ মিত্রের সহিত মত পার্থক্যের ফলেই এই নতুন গোষ্ঠীর সৃষ্টি হইয়াছিল । ইতিমধ্যে অরবিন্দ ঘোষ চাকুরীতে ইস্তফা দিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসেন । তিনি ছিলেন যুগান্তর দলের মন্ত্রনা গুরু এবং তাহার ভ্রাতা বারন ঘোষ চিলেন ঐ দলের সর্বাধিনায়ক ।

১৯০৭ খ্রীঃ ' যুগান্তর' দলের সদস্যগণ কলিকাতার মানিকতলা অঞ্চলে মুরারি পুকুরের বাগান বাড়ীতে একটি গুপ্ত বিপ্লবী কেন্দ্র গড়িয়া তোলেন এবং তাহারাই ইংরেজদের বিরুদ্ধে নানা প্রকার হিংসাত্মক কার্য কলাপে লিপ্ত হন । যুগান্তর দলের নেতৃত্বে কলিকাতা আদালতের বিচারপতি কিংসফোর্ড হত্যার ষড়যন্ত্র সমসাময়িক ভারতে একটি বিশেষ উল্লেখযেগ্য ঘটনা । কিংসফোর্ড ছিলেন একজন কুখ্যাত বিচারপতি । তিনি বিচারের নাম বিপ্লবীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার চালাইতেন। এই অত্যাচারী বিচার পতিকে হত্যার উদ্দেশ্যে যুগান্তর দল ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী - বাংলার দুই নির্ভীক সন্তানকে নিযুক্ত করিয়াছিল । কিন্তু বি প্লবীরা ভুলবশত কিংস্ফোর্ডের পরিবর্তে দুইজন

ইংরেজ মহিলাকে বোম্বার আঘাতে হত্যা করিয়া বসেন। পুলিশের নিকট ধরা পরিবার পুর্বেই প্রফুল্ল চাকি আত্মহত্যা করেন এবং ক্ষুদিরামকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে । আদালতের বিচারে ক্ষুদিরামের ফাঁসির হুকুম হয় ।

কিংসফোর্ডের হত্যা সম্পর্কে অনুসন্ধান চালাইতে গিয়া ইংরেজ সরকার মুরারি পুকুর বাগান বাড়ির গুপ্তসমিতির সন্ধান পায় ।এই সুত্রে যুগান্তর দলের বহু বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করা হয় ।তাহাদের বিরুদ্ধে ইংরেজ সরকার আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলা , শুরু করেন । মামলার বিচারে বারিন ঘোষ , উল্লাস কর দত্ত প্রভৃতিকে দীপান্তরে প্রেরণ করা হয় এবং অন্যান্য কয়েকজনকে প্রাণদন্ডে দন্ডিত করা হয় ।

কিংসফোর্ড হত্যার ষড়যন্ত্র বাংলার বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্ব পূর্ণ এই হত্যাকান্ডকে কেন্দ্র করিয়া ইংরেজ সরকার বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে যে মামলা রুজু করিয়াছিলেন তাহাই " আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলা " নামে খ্যাত । ইহা ছিল বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে প্রথম ষড়যন্ত্র মামলা । দ্বিতীয়, ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকির দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জনের দৃষ্টান্ত বাংলার যুবকদের হিংসাত্মক কার্যকলাপে উৎসাহিত করিয়া ছিল ।এই ঘটনার অব্যহিত পরে বাংলার সর্বত্র বিপ্লবীদের গুপ্তহত্যা এবং রাজনৈতিক লুন্ঠন শাসক গোষ্ঠীকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল ।এই হত্যাকান্ডের সমর্থনে বাংলার বাহিরে বহু বিপ্লবী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতে থাকে ।মহারাষ্ট্রের তিলক এই রূপ একটি প্রবন্ধে বাংলার বিপ্লবীকে সমর্থন জানাইলে তাহাকে কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয় ।তৃতীয়ত ঃ- হত্যাকান্ডের স্বল্প কালের মধ্যেই ইংরেজ সরকার বহু সংখ্যক সমিতি ও সংগঠনকে বে আইনী বলিয়া ঘোষনা করে । ইহার ফলস্বরূপ প্রধান সমিতির অন্তরালে যে গুপ্ত কর্মপন্থা চলিত তাহা বন্ধ হইয়া যায় । তখন বিপ্লবীরা লোক চক্ষুর অন্তরালে আত্মগোপন করেন ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিব্রত ইংরেজদের উপর চরম আঘাত হানিবার উদ্দেশ্যে ভারতের যে বিপ্লব প্রচেষ্টা শুরুহইয়াছিল যতীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় ও রাসবিহারী বসু ছিলেন উহার প্রাণস্বরূপ ।আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলার পরবর্তী কালে যতীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় ওরফে বাঘাযতীন এর নেতৃত্বে বাংলার বিভিন্ন স্থানে বৈপ্লবিক কার্য্য কলাপ চলিতে থাকে । যতীন্দ্রনাথ বিদেশ হইতে অস্ত্র শস্ত্র আমদানি করিয়া ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন । তিনি এম .এন . রায় (মানবেন্দ্র নাথ রায় )কে ইংরেজদের প্রধান শত্রু জার্মানদের সহিত যোগাযোগের জন্য বাটাভিয়ার প্রেরন করিয়াছিলেন । ১৯১৫ খ্রীঃ জামার্নী হইতে জাহাজ বোঝায় অস্ত্র শস্ত্র বালেশ্বরে আসিয়া পৌছিতেছি এই সংবাদ পাইয়া যতীন্দ্রনাথ কয়েক জন বৈপ্লবী সহ বালেশ্বরে উপস্হি হন । এই খবর ইংরেজ পুলিশ পূর্বহেই জানতে পারিয়া বহু সিপাহী লইয়া বিপ্লবীদের পশ্চাদ্ধারন করে । বুড়ীবলাম নদীর তীরে ইংরেজ সিপাহীর সহিত বিপ্লবীদের প্রচন্ড লড়াই হয় । শেষ পর্যন্ত এই লড়াইয়ে বিপ্লবী চিত্ত

প্রিয় রায় চৌধুরী মারা যান যতীন্দ্রনাথ সহ অন্যরা ধরা পড়ে । এইভাবে বৈদেশিক সাহায্য বাংলার বিপ্লবীদের প্রথম বিপ্লব প্রয়াস বিফলতার পর্যবসিত হইয়া ছিল ।

১৯১৫ খ্রীঃ " ভারত রক্ষা " আইনের দ্বারা শত শত যুবককে গ্রেপ্তার করা হইলে সাময়িকভাবে বাংলার বিপ্লব আন্দোলনে ভাটা পড়িয়াছিল ।

যতীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলায় যখন বিপ্লবী কার্যকলাপ চলিতেছিল সেই সময়ে উত্তর ভারতে রাস বিহারী বসু ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে একটি সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আয়োজন করেন। তাহার অক্লান্ত পরিশ্রমে লাহোর প্রভৃতি স্থানে বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি গড়িয়া উঠিয়াছিল । ১৯১২ খ্রীঃ দিল্লীতে বড়লাট হার্ডিঞ্জ কে হত্যার পরিকল্পনা রাসবিহারী বসুর অন্যতম উল্লেখ যোগ্য বিপ্লব প্রচেষ্ঠা।

দুই বৎসর পরে তিনি সমগ্র উত্তর ভারত ব্যাপী ইংরেজদের বিরুদ্ধে এক সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আয়োজন করিয়া ছিলেন। এই আয়োজনের মুল কেন্দ্র ছিল পাঞ্জাব । বিভিন্ন অঞ্চলের গুপ্ত সমিতির সহিত আলাপ আলোচনা করিয়া তিনি ১৯১৫ খ্রীঃ ২১ ফ্রেঃ অভ্যুত্থানের দিন ধার্য করিয়াছিলেন । কিন্তু ইংরেজ সরকারের নিকট এই সংবাদ পূর্বেই ফাঁস হইয়া গেলে বিপ্লবী অভ্যুত্থানের আয়োজন ব্যর্থ হইয়াছিল । উত্তর ভারতের সর্বত্র পুলিশী তৎপরতার ফলে সেই সময়ে অনেকে বিপ্লবী ধরা পড়িয়া ছিলেন এবং রাসবিহারী বসুকে এক নম্বর আসামী বলিয়া ঘোষনা করা হইয়াছিল । রাসবিহারী বসু সেই সময়ে " পি ঠাকুর " ছদ্মনামে জাপানে চলিয়া যান । বাংলায় যতীন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও উত্তর ভারতে রাস বিহারী বসুর বিপ্লব প্রচেষ্টা বিফলতায় পর্যবসিত হইলে ভারত সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের প্রথম পযার্য়ের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছিল ।

ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে সন্ত্রাসবাদীদের ভূমিকা যেমন ছিল উজ্জ্বল তেমনি প্রেরনার উদ্দীপক। মৃত্যু ভয়কে জয় করিয়া এবং আত্ম বিসর্জনের শপথ গ্রহন করিয়া তাহারা যেভাবে দুঃসাহসিক কাজে ঝাঁপাইয়া পরিয়াছিলেন তাহাতে বিদেশী শাসকবর্গ আতঙ্কিত হইয়াছিল । তাহারা বুঝিয়াছিল যে ভারতে তাহাদের শাসনের মেয়াদ ফুরাইয়া আসিয়াছে। তথাপি ইহা অনস্বীকার্য যে কঠোর আত্মত্যাগ সত্বেও সন্ত্রাসবাদীদের সাফল্য ছিল খুবই সীমিত ।

ইহার প্রধান কারন ছিল এই যে , সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও নেতৃত্বের অভাবে সন্ত্রাসবাদীগন ভারতীয় জন সাধারনের হৃদয়ে তেমন উৎসাহের সঞ্চার করিতে পারেন নাই । গুপ্ত সমিতি গুলিতে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের অধিপত্য ছিল কৃষক বা শ্রমিক শ্রেণীকে এই সংগ্রামের অংশীদার করা সম্ভবপর হয় নাই । তাহা দ্বারা সুসংবদ্ধ লক্ষ্যের অভাবে রাশিয়ার নিহিলিষ্ট এবং আয়ার ল্যান্ডের সন্ত্রাসবাদীদের ন্যায় ভারতীয় বিপ্লবীদের কার্যকলাপ ও কতিপয় অত্যাচারী সরকারী কর্মচারী হত্যা এবং সশস্ত্র বিপ্লবের পরিকল্পনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল ।

বঙ্গ বিভাগের পরিকল্পনা কার্জনের নীতির দ্বারা সৃষ্টি হয়নি। ইংরেজ আমলে প্রধান তিনটি রাজনীতিক বিভাগ ছিল - এরা হল বঙ্গ প্রেসিডেন্সী, বম্বে প্রেসিডেন্সী ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী শাসকদের কাছে বঙ্গ প্রেসিডেন্সী বহু দিন ধরেই দুরূহ সমস্যা উপস্থিত করেছিলেন। প্রদেশের আয়তন ও জনসংখ্যার পরিমান সুষ্ঠ শাসন ব্যবস্থার পরিপন্থী ছিল। এই বিভাজনের পদ্ধতি কার্যত আরম্ভ হয়েছিল ১৮৭৪ সালে, যখন আসামকে বিভক্ত করে চীফ কমিশনারের কর্তৃত্বাধীন করা হয়। এতে অবশ্য সমস্যা মেটেনি। ১৮৯৬ সালে ঢাকা ও ময়মনসিংহ জিলা এবং চট্টগ্রাম বিভাগকে আসামের সঙ্গে, যুক্ত করার পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল। কিন্তু এটা ব্যয় বহুল হওয়ার দরুন পরিত্যক্ত হয়েছিল। শুধু এর পরিনাম স্বরূপ লুসাই পার্বত্য অঞ্চল আসামে যুক্ত হয়েছিল। ১৯০১ সালের আদম সুমারীতে যখন দেখা গেল বাংলার জনসংখ্যা ৭ কোটি ৮০ লক্ষ তখন আর একটি পরিকল্পনার উদয় হয়েছিল উড়িষ্যাকে মধ্যপ্রদেশের সঙ্গে একত্রিত করা।

এই অবস্থায় কার্জনের মাথায় এক চিন্তার উদয় হল যে, " বাংলাদেশ " একজনের পক্ষে নিঃসন্দেহে অতি বিশাল উপরন্তু কার্জনের মনে হয়েছিল - বাংলা, আসাম এবং মধ্যপ্রদেশের চতুঃসীমা - সেকেলে, অযৌক্তিক ও অদক্ষতার জন্মদাতা।

স্যার এন্ড্রোফ্রেজার কর্তৃক একটি পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল যেটা ১৯০৩ সালের ডিসেম্বরে সর্ব সাধারনের কাছে বিদিত করা হয়েছিল। চট্টগ্রাম বিভাগ, পার্বত্য ত্রিপুরা, ঢাকা জিলা, ময়মনসিংহ জিলা আসামের ভিতর যাবে। আর ছোটনাগপুর যাবে মধ্যপ্রদেশ। এর পরিবর্তে বাংলা মধ্যপ্রদেশ থেকে পাবে, সম্বলপুর আর মাদ্রাজ থেকে পাবে গঞ্জাম। এই পরিকল্পনার পক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তি গুলি দেখানো হয়েছিল।

১) বাংলার অধিকতর নিজস্ব শাসনের ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল। পুর্নগঠনের পরে বাংলার লোক সংখ্যা ৭ কোটি ৮০ লক্ষ থেকে কমে ৬ কোটি ৭ লক্ষ দাঁড়াত।

২) বাংলার পূবাঞ্চলের জেলাগুলির কলকাতার কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত হত।

৩) পূবাঞ্চলের জেলাগুলির মুসলমান অধিক সুখ সুবিধা পেত।

৪) আসামের চা বাইরে আসার পথ পেত।

৫) সমস্ত উড়িষ্যা ভাষীরা একটি শাসন ব্যবস্থার অধীন হত।

শেষ পর্যন্ত কার্জনের দ্বারা যে পরিকল্পনা অবলুণ্ঠিত হয়েছিল তাতে ছিল পূর্ববঙ্গ থেকে ১৫ টি জিলা নিয়ে আসামের সঙ্গে যুক্ত করে পূর্ববঙ্গ ও আসাম নামে নতুন প্রদেশ তৈরী করা। এবং রাজধানী ছিল ঢাকা। এর জন সংখ্যা ছিল ৩ কোটি ১ লক্ষ তাতে মুসলমানদেরই প্রাধান্য।

এই শাসনব্যবস্থার সংক্রান্ত যুক্তিগুলির পশ্চাতে এক ক্ষতি সাধক রাজনৈতিক মতলব ছিল যা প্রতিফলিত হয়েছিল লর্ড কার্জনের " স্বদেশ " কর্তৃপক্ষের সাথে পত্র আদান প্রদানের মধ্যে।

" ঐক্যবদ্ধ বাংলা একটি শক্তি " - এটি তার দ্বারাই লিখিত হয়েছিল এবং দেশভঙ্গের মধ্যে দিয়ে সেই শক্তিকে খর্ব করাই ছিল তার উদ্দেশ্য। তার মতলব ছিল ব্রিটিশ শাসনের একটি শক্তিশালী প্রতিপক্ষ দলকে টুকরো টুকরো করে ভেঙ্গে দুর্বল করে দেওয়া। বাঙালীরা নিজেদের একটি জাতি বলে ভেবে নিয়েছিল, এই ধরনের চিন্তা ছিল ব্রিটিশ শাসনের সুপ্রতিষ্ঠার পক্ষে বিপদজনক সুতরাং এই চিন্তাকে ধ্বংস করাই ছিল কার্জনের লক্ষ্য। কংগ্রেস রাজনীতির কেন্দ্র স্থল ছিল কলকাতা, এই শহরটি প্রাধান্য ও বৈশিষ্ঠ হরন ছিল লক্ষ।

অবশ্য লর্ড কার্জনের গোপন মতলবগুলি সে সময়ে সাধারন লোকে কিছুই জানত না। শুধু এটা বুঝতে পেরেছিল যে বাঙালীর সংহতি ভেঙ্গে দেওয়াটাই কার্জনের আসল অভিপ্রায়। এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে জনসাধারণের কাছ থেকে প্রবল প্রতিবাদ এসেছিল। এমনকি সেক্রেটারি অফ স্টেটের দ্বারাও একথা স্বীকৃত হয়েছিল যে, একটি সমশ্রেণী ভুক্ত সম্প্রদায়কে খন্ডখন্ড করে দিলে তাদের প্রতিবাদ করাটাই স্বাভাবিক। সমালোচকদের বক্তব্য ছিল মাত্র এক কোটি দশ লক্ষ লোককে সরিয়ে নিলে শাসন ব্যবস্থার চাপ মুলতঃ হালকা হবে না। উপরন্তু, ব্যয় বৃদ্ধি পাবে এবং সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধি পাবে। এই পরিকল্পনার পিছনে যে সাম্প্রদায়িক মতলব ছিল এটা স্পিয়ারের দ্বারাও স্বীকৃত হয়েছে। স্পিয়ারের বক্তব্য ছিল - " হিন্দু অধ্যুষিত পশ্চিমাঞ্চল, মুসলিম অধ্যুসিত পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে সুন্দর ভারসাম্য ছিল, অধ্যুষিত পশ্চিমাঞ্চল, মুসলিম অধ্যুষিত পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে সুন্দর ভারসাম্য ছিল, উভয় সম্প্রদায়ের বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনগুলি পৃথক পৃথক ভাবে বিবেচনা করা যেত।"

এই সাম্প্রদায়িকতার কীর্তিই কার্জনকে শক্তি জুগিয়ে ছিল ১৯০৪ সালে তার পূর্ববঙ্গ পরিদর্শন কালে। কার্জনের পরিকল্পনা একটি রাজনৈতিক রূপ গ্রহণ করেছিল। একটি মুসলিম প্রদেশ গঠনই ছিল তার উদ্দেশ্য যা হিন্দু মুসলিম ঐক্যের প্রণানাশক হবে। ১৯০৬ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে নবাব আতিকুল্লা খাঁ তার বক্তৃতার এই সংবাদটিকে দৃঢ়তার সঙ্গে সত্য বলে ঘোষনা করেন।

পূর্ববঙ্গের মুসলমানেরা সকলেই এই পরিকল্পনার অংশীদার ছিলেন না। আব্দুল রসুল ও লিয়াকৎ হোসেন - বদরুদ্দিন তায়েবজি ও শিবলী নোমানির মহান ভাবধারাকে ধরে রেখেছিল। কিন্তু ঢাকার নবাব সালিম উল্লা খাঁ কার্জনের কাছ থেকে এক লক্ষ পাউন্ড ধার পাওয়ার প্রতিশ্রুতি পেয়ে চক্রান্তের কাজে অংশ নিতে রাজী হয়েছিল। স্যার হেনরী কটনের ভাষায় বলতে গেলে, " লর্ড কার্জনের নীতির সার বস্তু ছিল বর্ধিষ্ণু শক্তিগুলিকে দুর্বল করে দেওয়া আর দেশপ্রেমের চেতনা থেকে উদ্ভুত রাজনৈতিক মনোভাবকে ধ্বংস করে দেওয়া। স্পিয়ারের ভাষায় ন্যায় সঙ্গত প্রতিবাদ সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জির পরিচালনায় জনগণের মধ্যে প্রবল বিক্ষোভের রূপ নিয়ে ছিল।

একজন বিচক্ষন শাসকের কর্তব্য এই ধরনের বিক্ষোভকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা কিন্তু জনগণের এই বিরোধীতা, কার্জনকে করে তুলল আরও অদম্য। এই বিক্ষোভ কার্জনের কাছে

স্বাথপর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যমূলক এই আখ্যা পেল , আর বলা হল এটা বাগাম্বর ও অলঙ্কারপুর্ব বক্তৃতা ছাড়া আর কিছুই নয় ।

উকিল সভার Bar বিরোধীতা কার্জনের কাছে মনে হল ঢাকায় হাইকোর্ট গঠনের ফলে কলিকাতার হাইকোট উকিল সভার কায়েমী স্বার্থের যে ক্ষতি হবে তার ভয়ে । কিন্তু যদি তাই হবে , তা হলে পূর্ববঙ্গের খ্যাত নামা উকিলেরা এই পরিকল্পনার বিরোধিতা করতেন না । এদের মধ্যে ছিলেন ঢাকার আনন্দ চন্দ্র রায় , শিলচরের কামিনী কুমার চন্দ্র ও রবিশালের দীনবন্ধু সেন ।

এর পরে আসে ভারতীয় সংবাদ পত্রগুলির কথা । সংবাদ পত্রগুলি যে বিরোধীতা জানিয়াছিল সেটা কার্জনের মতে গ্রহক হারানোর ভয়ে । এটা সত্য হলে এক মাত্রা " অমৃত বাজার পত্রিকার ক্ষেত্রেই ইহা সত্য হতে পারত , কিন্তু ' সঞ্জীবনী' 'সন্ধ্যা ' নিউইন্ডিয়া মিররে'র মতো অন্যান্য কাগজের ক্ষেত্রে নয় । আর ' ফ্রেন্ড ' অফ ইন্ডিয়া , স্টেটস্‌ম্যান " ও ইংলিশম্যান ' সম্বন্ধে কি বলা চলতে পারে ? কার্জনের মতে জমিদারেরা বিরোধিতা করেছিলেন খাজনা হারানোর ভয়ে । এটা সত্য যে মৈমন সিংহের মহারাজা সূর্যকান্ত পাথুরিয়াঘাটার যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর দিনাজ পুরের রাজা এবং ভাগ্যকুলের জানকী নাথ রায় প্রবল আপত্তি জানিয়ে ছিলেন । কিন্তু তাদের আপত্তি যতটা ছিল খাজনা হারানোর জন্য তার চেয়ে ঢের বেশী তারা রেভিনিউ বোর্ডের এক্তিয়ারের বাইরে হয়ে যাবেন বলে ।

সর্বশেষে উল্লেখ করা যেতে পারে কার্জনরে মতে , মধ্যবিত্ত হিন্দুরা বিরোধিতা করেছিলেন কর্ম সংস্থানের সুযোগ হারানোর ভয়ে ।

প্রকৃত পক্ষে এটা ছিল নবজাগ্রতি আত্মসচেতন বাঙালী জাতীয়তাবাদের অনুভূতি । উনবিংশ শতাব্দীর আলোক প্রাপ্তি থেকেই এই জাতীয়তাবাদ জন্ম নিয়েছিল আর আত্ম প্রকাশ করেছিল এই বিরোধিতার মাধ্যমে । সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় এর মতো নেতারা শাসনব্যবস্থার সুবিধার জন্য রাজ্যাংশের পূর্ণগঠনের বিরোধী ছিলেন না । হিন্দী ভাষী অঞ্চলকে বাদ দিয়ে একটি হিন্দু মুসলমান অধ্যুষিত ঘন সন্নিকিষ্ট বাংলা ভাষী রাজ্য গঠন করা যেত এবং সেটা অনেক ভালো হত । কিন্তু এটা হবার উপায় ছিল না । লর্ড কার্জনের উদ্দেশ্যে ছিল দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন কিছু প্রবেশ করানো যার দ্বারা তারা পৃথক হয়ে যায় । আর তা হলে কংগ্রেস সৃষ্ট জাতীয়তাবাদ ও দুর্বল হয়ে পড়ে । ১৯০০ সালে লিখিত কার্জনের অভিমত ছিল কংগ্রেসে পড়ে যাওয়ার আগে টলছে , - আমার ভারতবর্ষে অবস্থান কালে যে বড় বড় অভিলাষ গুলি আছে তার মধ্যে একটি হল - কংগ্রেসের শান্তিপূর্ণ অবসানের জন্য সহযোগীতা করা ।

বিচ্ছিন্ন করার বিষয়ে কার্জনের ভূমিকা ছিল পাহাড়ের মত কঠিন , সংকল্প ছিল অটল । সেক্রেটারী অফ স্টেটের অনুমোদন নিয়ে ১৯০৫ সালের অক্টোবর মাসে দেশ বিভাগ কার্যত সাধিত হল । বিভাগের পরে বাংলার লোকসংখ্যা দাঁড়াল ৪ কোটি ২০ হিন্দু এবং ৯০ লক্ষ মুসলমান ,

অপরদিকে নবগঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশে লোক সংখ্যা দাঁড়াল ১ কোটি ৮০ লক্ষ মুসলমান এবং ১ কোটি ২ লক্ষ হিন্দু। এই মুসলিম প্রধান প্রদেশ গঠন ভবিষ্যতের ইঙ্গিত করেছিল ১৯৪৭ এর ঘটনাগুলি ভারতের রাজনৈতিক দৃশ্যপটে তাদের ছায়া ফেলেছিল। এই যে পরিকল্পনাকে সুপ্রসারিত করা এবং শাসন ব্যবস্থার জন্য পুনগঠনকে রাজনৈতিক বিভাগে রূপান্তরিত করা, এর জন্য সম্পূর্ণ দায়ী কার্জন।

সুশাসনের দক্ষতাই যদি কার্জনের লক্ষ হত তাহলে হিন্দু ও মুসলমানদের বিবাদ না লাগিয়ে বাংলার অসুবিধা জনক আয়তনকে কমিয়ে সুবিধা জনক করা যেত। তাই এই ক্ষেত্রে কার্জনের ভূমিকা শাসকের নয়, ধূর্ত রাজনীতিবিদের।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল এই অনুভূতি থেকে যে বাংলা দেশ বঙ্গ ভাষীদের মাতৃভূমি তার সন্তানদের তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও সেই দেশকে খন্ডিত করা হয়েছে বাঙালীকে রাজনীতির দিক থেকে দুর্বল করে দেখার জন্য। এই আন্দোলন প্রধানতঃ হিন্দুদের পরিচালিত হয়েছিল। এই আন্দোলন প্রধানত ঃ হিন্দুদের ধারাই পরিচালিত হয়েছিল। এর প্রাণশক্তি যে গভীর আবেগময় জাতীয়তা মুসলমানদের স্পর্শ করে নি। আর তা ছাড়া ঢাকার নবাবের সাহায্যে ব্রিটিশেরা তাদের আন্দোলনের বাইরে রেখে দিয়েছিল।

এই আন্দোলন রূপ পরিগ্রহ করেছিল বিদেশী দ্রব্য বর্জনের মধ্যদিয়ে, এর অনিবার্য পরিনাম দেখা দিল পরিপূরক রূপে স্বদেশী দ্রব্যের ব্যবহার। এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জির মতো বড় বড় নেতারা রবীন্দ্রনাথের কবি প্রতিভাও এই আন্দোলনে যোগ না দিয়ে পারেনি। ১৯০৫ সালে গোখলের সভাপতিত্বে কংগ্রসের যে অধিবেশন হয় তাতে এই বর্জনের আন্দোলন সমর্থিত হল। ১৯০৬ সালে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হল দাদাভাই নওরোজীর সভাপতিত্বে, তাতে বর্জন আন্দোলনের ন্যায্যতা প্রতিপাদিত হল এবং দাবি করা হল এই বিভাজনের প্রত্যাহার।

ব্রিটিশ লেখকের মতে বঙ্গ বিরোধী আন্দোলন বিপ্লবী মতবাদ প্রচারের প্রচুর গুপ্ত সুযোগ দিয়েছিল। পূর্ববঙ্গ এই বর্জন আন্দোলনকে মুসলমানেরা বাধা দিয়েছিল। এবং দাঙ্গা ও বেধেছিল ঘন ঘন। জাতীয়তাবাদী লেখকের মতে এটা ঘটেছিলসরকারী প্ররোচনায় ও সমর্থনে। বিপ্লবীদের গুপ্ত সমিতিগুলি তৎপর হয়ে উঠিছিল। ভারতীয় সংবাদ পত্রগুলি সর্বান্ত করনে সমর্থন জানিয়ে ছিল এই আন্দোলনকে। এক দিকে নির্যাতন ও শুরু হয়েছিল নানাভাবে।

যাই হোক, এ আন্দোলন বিফল হয়নি। ১৯১১ সালে এই বিভাজনকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হল। তবে বাঙালী হিন্দুদের দন্ডিত করা হল বিশাল বাংলা ভাষী এলাকাকে বিহারের সঙ্গে যুক্ত করে আর ভারতের রাজধানী কলিকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত দেশ বিভাগের ফলে কার্জনের উদ্দেশ্য একদিক দিয়ে সফল হয়েছিল। অর্থাৎ হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে স্থায়ীভাবে একটা গোজাপুতে

দেওয়া হল তাদের পৃথক করে রাখবার জন্য । জাতিয়তাবাদকে'ও অনেক খানি দুর্বল করে দিল এই বিভাজন আর পূর্বাভাস দিল ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের ।

আর এক দিক থেকে দেখতে গেলে , এই বিভাজন শক্তি প্রেরণা জুগিয়ে ছিল ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে । এই বিভাজন বাঙালীর হৃদয় যে আত্মিক ক্ষতির সৃষ্টি করেছিল , বিশেষ করে পাশ্চত্য পন্থীদের মনে , তা কোন সময়ই পূর্ন নিরাময় হয়নি। এই আত্মিক ক্ষত সন্ত্রাসবাদ ও উগ্র মতবাদ জাগিয়ে তুলেছিল । এছাড়া মধ্যপন্থীদের স্বায়ত্ব শাসন প্রতিষ্ঠার প্রেরণাকে ও এই বিভাজন সফল করে তুলেছিল ।

তাই বঙ্গ বিভাগ ভারতের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে একটি সংকল্প গ্রহনের অধ্যায়কে সূচিত করে ।

বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনের সঙ্গে ধর্মীয় মনোভাব যুক্ত হয়ে পড়ে । সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী তরুন সম্প্রদায় কালী , গীতা ও বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দ মঠ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় । সন্ত্রাসবাদ ধীরে ধীরে চারদিকেছড়িয়ে পড়ে । কত ব্রিটিশ রাজকর্মচারী গুপ্ত ঘাতকের হাতে প্রান বিসর্জন দিতে বাধ্য হয় । বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত খুব জনপ্রিয়তা লাভ করে । এই সময় বিভিন্ন স্থানে গুপ্ত সমিতিও গঠিত হয় । সন্ত্রাসবাদ দমন করার জন্য ব্রিটিশ সরকার নানা প্রকার দমন মূলক আইন প্রণয়ন করে । স্যার আন্ড ফ্রেজার ও কিংস ফোর্ডকে হত্যা করার চেষ্টা করা হয় । কিংসফোর্ডকে হত্যার চেস্টায় ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী ১৯০৮ খ্রীঃ মৃত্যুবরন করেন । এই বছরই বিপ্লবী আন্দোলনে জড়িত থাকার অভিযোগে অরবিন্দ ঘোষ , বারীন ঘোষ , কানাই লাল দত্ত, সত্যেন বসু উল্লাস কর দত্ত প্রমুখ অনেকে গ্রেপ্তার হন। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন দমন করার উদ্দেশ্য ব্রিটিশ সরকার অশ্বিনীকুমার দত্ত এবং কৃষ্ণকুমার মিত্র সহ নজন জননেতাকে দ্বীপান্তরে প্রেরণ করে ।

বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত ও তার সরকারী ঘোষনা সারা বাংলাদেশে এক তীব্র ও ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। সমাজের সকল শ্রেণীর ও সকলস্তরের মানুষ এবং সংবাদপত্র ,পত্রিকার এই দুরভিসন্ধিমূলক আদেশের প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠে । বিভিন্ন সভা সমিতিতে বঙ্গভঙ্গের নিন্দা করে এবং এই সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবি জানিয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয় । স্থানীয় কর্তৃপক্ষ , বাংলাদেশের সরকার ভারত সরকার ও ইংল্যান্ডের কতৃপক্ষের কাছে শত শত প্রতিবাদপত্র পাঠানো হতে থাকে । বিভিন্ন মেলা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বঙ্গ ভঙ্গের বিরুদ্ধে গনস্বাক্ষর করা হয় । কিন্তু এই সব প্রচেষ্টার নিস্ফলতা জনগণকে এক ব্যাপকতর ও বৃহত্তর আন্দোলনের জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প করে তোলে।

সঞ্জীবনী কাগজের সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র দেশ - বাসীকে বিদেশী দ্রব্য ও স্বদেশের দ্রব্য ব্যবহারের সঙ্কল্প গ্রহনের জন্য আহবান জানালে তা সর্ব সাধারনের মধ্যে বিপুল সাড়া জাগায় । বঙ্গদর্শন পত্রিকায় রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর বাঙ্গালী সমাজের অটুট মনোবলের স্থির সঙ্কল্পের কথা পুনঃঘোষনা

করেন । ছাত্র সমাজের মধ্যেও এক অভূতপূর্ব উন্মাদনার সৃষ্টি হয় । বঙ্গ ভঙ্গ রোধে ও বন্দেমাতরম্ মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হয়ে হাজার হাজার ছাত্র বাংলাদেশ ও বাঙ্গালী জাতির ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে যোগ দিতে থাকে । বিভিন্ন সংবাদপত্র, পত্রিকা এবং সাহিত্যের মাধ্যমে " বয়কট " ও স্বদেশী এই দুই আদর্শ ও লক্ষ্য ছড়িয়ে পড়ে । রবীন্দ্রনাথ , দ্বিজেন্দ্রলাল রায় , রজনীকান্ত সেন প্রমুখ কবিদের গান , কবিতা , নাটক প্রভৃতি জনগণের স্বদেশপ্রেম ও ভাবাবেগ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে । " ব্রতী সমিতি " সনাতন সম্প্রদায় , বন্দেমাতরম্ সোসাইটি প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গুলোর স্বদেশী ভাবধারা প্রচার ও স্বদেশ প্রেমের বিকাশের তৎপর হয় । সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯০৫ খ্রীঃ ১৬ই অক্টোবর বঙ্গ ভঙ্গের সিদ্ধান্ত কার্যকরী হয় । রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাব অনুযায়ী ঐ দিনটি " রাখী বন্ধন " দিবস রূপে পালিত হয়। পূর্ববাংলা , পশ্চিমবাংলা , ধনী দরিদ্র , হিন্দু , মুসলমান , খ্রীষ্টান নির্বিশেষে ' বাঙ্গালী জাতির ভ্রাতৃত্ব ও অবিচ্ছেদ্য ঐক্যের কথা ঘোষনা করাই ছিল এই উৎসবের তাৎপর্য্য । রবীন্দ্রনাথের ভাষায় " কোন শক্তি মদমত্ত রাজশক্তিই বাঙ্গালীর ঐক্যকে ভাঙ্গতে পারবে না । " এ কথাই প্রমাণিত হল রাখী বন্ধন উৎসবে রাখীবন্ধন ছাড়া ঐ দিনটি " অরন্ধন দিবস" রূপে পালন করা হয় । সমগ্র বাঙ্গালী জাতি সেদিন রন্ধন না পালন করে ব্রিটিশ সরকারের স্বৈরাচারী নীতির মৌন প্রতিবাদ জানায় ।

বঙ্গভঙ্গের দিনটিতে জন জীবনের স্রোত বন্ধ হয়ে যায় । স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ শোভাযাত্রা ও জনসভার মধ্য দিয়া বাংলার মানুষ বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে । অল্পকালের মধ্যেই আন্দোলন এক বিরাট গন অভ্যুত্থানের আকার ধারন করে এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক নতুপ অধ্যায়ের সূত্রপাত করেন ।

বিদেশী দ্রব্য বর্জন বা বয়কট ও স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার বা-স্বদেশী এই দুই ছিল আন্দোলনের প্রধান আদর্শ ও কর্মসূচী । এই দুই লক্ষ ও নীতি ছিল পরস্পরের সমপূরক । বিদেশীদ্রব্য বর্জন কার্যকরী না হলে স্বদেশী দ্রব্যের উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি সম্ভব ছিল না । তেমনি উপযুক্ত স্বদেশী পন্যদ্রব্য সহজলভ্য না হলে প্রয়োজনীয় বিদেশীদ্রব্য সম্পূর্ণ বর্জন করা ছিল দুঃসাধ্য। বিদেশী দ্রব্য বর্জনের আর একটি লক্ষ ছিল যে , " বয়কট " আন্দোলন সফল হলে ক্ষতিগ্রস্থ ইংরেজ বনিকরা ব্রিটিশ সরকারকে তাদের নীতি পরিবর্তনের জন্য চাপ দিতে বাধ্য হবে । তা ছাড়া , সুলভ ও উৎকৃষ্ঠ বিদেশী দ্রব্যের পরিবর্তে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের ফলে জনসাধারণ স্বাধীনতার জন্য আত্মত্যাগ ওকষ্ট স্বীকারে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে । তাদের মনোবল ও আত্মনির্ভরতা বোধ বৃদ্ধি পাবে । স্বদেশী ভাবধারার অনুপ্রেরনায় বহু কাপড়ের কল , ব্যাঙ্ক , মোজা , গেঞ্জি , সাবান , চামড়া , ঔষধ ইত্যাদির কারখানা , বীমা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি গড়ে ওঠে । স্বদেশী দোকান ও বিভিন্ন স্থানে খোলা হয় । কুটির শিল্পের ও উন্নতি হতে শুরু করে । দলে দলে স্বেচ্ছাসেবক বাড়ী বাড়ী ঘুরে স্বদেশী দ্রব্য বিক্রি করতে শুরু করে। জনসভা মিছিল , বিদেশী দ্রব্যের মহোৎসব , পিকেটিং , দেশাত্মবোধক সঙ্গীত ও বক্তিতার মাধ্যমে

স্বদেশী আন্দোলনের দুর্বার গতি অব্যাহত থাকে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় , বিপিন চন্দ্র পাল , অশ্বিনীকুমার দত্ত, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এই আন্দোলনের আরও শক্তিশালী ও গনভিত্তিক করে তুলতে সচেষ্ট হন ।

বয়কট আন্দোলনের আর একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিদেশী শিক্ষা বর্জন কিন্তু বিদেশী পদ্ধতিতে গড়ে ওঠা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিত্যাগ করে বিকল্প শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যাতে শিক্ষা গ্রহনের সুযোগ পায় সে জন্য আন্দোলনের নেতৃবর্গ গভীরভাবে চিন্তা করতে শুরু করেন । এই উদ্দেশ্যে ১৯০৬ খ্রীঃ ১১ ই মার্চ ' জাতীয় শিক্ষা পর্ষৎ " গঠিত হয় । বঙ্গীয় জাতীয় স্কুল ও কলেজ স্থাপিত হয় । জাতীয় শিক্ষা পর্ষদের দায়িত্ব লাভ করেন অরবিন্দ ঘোষ । জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার জন্য রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক একলক্ষ টাকা এবং পরে ময়মানসিংহের জমিদার প্রচুর টাকা পয়সা দান করেন । এতসব দান ছাড়াও সাধারন লোকও জাতীয় পর্ষদে শিক্ষা তহবিলে প্রচুর অর্থ দান করেন । সাধারন মানুষের স্বেচ্ছা সেবায় এবং অকৃপন দানে রাতারাতি গড়ে উঠল পশ্চিমবঙ্গ ১১/১২ টি এবং পূর্ববঙ্গে ৪০ টি স্কুল । জন্ম হল যাদব পুর কারিগরী কলেজের যার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে বর্তমানের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ।

জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের উৎস ছিল জাতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য এবং জাতির মানসিকতার ভিত্তিতে জাতির প্রয়োজন মেটানো এবং আশা আকাঙ্খা পুরনের জন্য বিদেশী শাসনের ঔপনিবেশিক ভাবধারাও নিয়ন্ত্রনের বাইরে এক স্বয়ংসম্পূর্ণ শিল্প ব্যবস্থা গড়ে তোলা । তাই জাতির অতীতকে জানবার জন্য জাতীয় স্কুলগুলোর পাঠক্রমে ভারতের ইতিহাস পাঠের গুরুত্ব দেওয়া হয় । অপর দিকে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে গুরুত্ব দেওয়া হল কারিগরী বিদ্যার উপর মাতৃভাষা ও সাহিত্য এবং উচ্চতর স্বরে মানবিক বিদ্যার সঙ্গে বিজ্ঞান চর্চাকে উৎসাহ দানের ব্যবস্থা করা হয় ।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারী সুভাষচন্দ্র স্বগৃহে অন্তরীন অবস্থা থেকে ছদ্মবেশে দেশ ত্যাগ করেন এবং কাবুল উপস্থিত হন । কাবুল থেকে তিনি বার্লিনে যান । জার্মানীতে উপস্থিত হয়েই তিনি জার্মান পররাষ্ট্র মন্ত্রী রিবেনট্রপের সঙ্গে সাক্ষাত করে ইউরোপে ভারতীয় মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার পরিকল্পনা পেশ করেন । ইতিমধ্যে ১৯৪১ খ্রীঃ ৭ ই ডিসেম্বর জাপান ব্রিটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করে এবং পার্ল হারবারের মার্কিন ঘাঁটির উপর বোমা বর্ষন করে । ফলে প্রাচ্য রনাঙ্গনে জটিলতার সৃষ্টি হয় । দ্রুতগতিতে জাপান দক্ষিন পূর্ব এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে অধিপত্য স্থাপন করে ।.১৯৪২ খ্রীঃ ১০ইমার্চ জাপান সিঙ্গাপুর এবং মার্চ মাসের প্রথম দিকে ব্রহ্মদেশ অধিকার করে । জাপানের দ্রুত সাফল্যে ব্রিটিশ সরকারের মনে ত্রাসের সৃষ্টি হয় । ভারতের নিরাপত্তা বিধানের জন্য তারা ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনার জন্য ব্রিটিশ মন্ত্রী সভার সদস্য স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে ভারতে পাঠান কিন্তু তার প্রস্তাব ভারতের জাতিয়াতাবাদী আন্দোলনের আশা আকাঙ্খা পূরনে ব্যর্থ

হয় ।অপর দিকে জাপানের অভাবনীয় সাফল্য দক্ষিন পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের মনে দারুন উত্তেজনার সৃষ্টি হয় ।স্থানীয় ভারতীয়দের সঙ্ঘবদ্ধ করে মুক্তি আন্দোলন সংগঠিত করার জন্য জাপানে প্রবাসী বিপ্লবী রাস বিহারী বসু উদ্যোগী হন । ১৯৪২ খ্রীঃ ১৫ জুন ব্যাংককে ভারতীয়দের এক সমাবেশে তিনি ভারতীয় ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা উত্তোলন করেন এবং তার উদ্যোগে ভারতীয় জাতীয় সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয় ।এই সম্মেলনে গৃহীত এক প্রস্তাবে সুভাষ চন্দ্র বসুকে দক্ষিন পূর্ব এশিয়ার আগমনের জন্য আমন্ত্রন করা হয় ।ইতিমধ্যে ১৪ নং পাঞ্জাব রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন মোহন সিং এর প্রচেষ্টায় সিঙ্গাপুরের পতনের পর যুদ্ধবন্দী ভারতের সৈন্যদের সঙ্ঘবদ্ধ করে আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠনের পরিকল্পনা গ্রহন করা হয় ।অপর দিকে ব্যাংকক সম্মেলনে ভারতীয় সংঘ সুভাষ চন্দ্রকে দক্ষিন পূর্ব এশিয়ার কার্য পরিচালনার জন্য আমন্ত্রন জানালে তিনি তা সাদরে গ্রহন করেন । কিন্তু যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে জার্মানী থেকে জাপানে উপস্থিত হওয়া কোন ক্রমেই নিরাপদ ছিল না ।তথাপি ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ঃ ৮ ই ফেব্রুয়ারী জার্মানী ত্যাগ করে সাবমেরিনের সাহায্যে সুভাষ চন্দ্র টোকিও অভিমুখে যাত্রা করেন ।এই দুঃসাহসিক অভিযান সমাপ্ত করে ১৬ই মে তিনি টোকিও পৌছান ।

টোকিও পৌছেই তিনি এক সাংবাদিক সম্মেলনে জাপানের সাহায্যে ভারতে সশস্ত্র সংগ্রাম করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন ।তার পরে সুভাষ চন্দ্র সিঙ্গাপুরে এসে উপস্থিত হন এবং ২ রা জুলাই রাস বিহারী বসুর কাছ থেকে ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের দায়িত্ব গ্রহন করেন । উপস্থিত ভারতীয়গন সানন্দে তার নেতৃত্বে স্বীকার করেন এবং তাকে " নেতাজী " নামে অভিহিত করেন ।

সিঙ্গাপুরে উপস্থিত হওয়ার পরই সুভাষচন্দ্র ভারতে অভিযান পরিচালনার জন্য সামরিক বাহিনী পূর্ণ গঠন ও অস্থায়ী জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা শুরু করেন । ১৯৪৩ খ্রীঃ ২৫ শে আগষ্ট নেতাজী আনুষ্ঠানিক ভাবে আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়কের পদ গ্রহন করেন এবং সৈন্যবাহিনীর উন্নতি ও শৃঙ্খলা বিধানের দিকে মনোযোগ দেন । আজাদ হিন্দ বাহিনীর পূর্বে মোট সৈন্যসংখ্যা ছিল তেরো হাজার । তিনি তা পঞ্চাশ হাজারে পরিনত করেন । নেতাজী আজাদ হিন্দ বাহিনীকে তিনটি বিভাগে বিভক্ত করেন এবং নারী পুরুষ উভয় ধরনের বাহিনী গঠন করেন ।নারী সৈন্যদের জন্য তিনি ঝাঁসি বাহিনী নামে একটি ব্রিগেড গঠন করে । প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের জন্য তিনি দক্ষিন পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের নিকট আবেদন করেন ।

সেনাবাহিনীর পূর্ন গঠিত করার পর নেতাজী অস্থায়ী সরকার গঠনের কাজে ব্রতী হন ।সিঙ্গাপুরে ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের অধিবেশনে তিনি আজাদ হিন্দ সরকার গঠনের কথা ঘোষনা করেন । নেতাজীর মতে তার সরকারের প্রধান লক্ষ্য হল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বাদের বিরুদ্ধে শেষ চুড়ান্ত সংগ্রাম পরিচালনা করা এবং ভারতের মাটিতে বিদেশী শাসনের অবসান ঘটানো। তিনি আশা করেন যে এই সরকার ভারতের মাটিতে স্থানান্তরিত হওয়ার পর স্থায়ী জাতীয় সরকারের স্থান গ্রহন করবে ।

অস্থায়ী সরকারের মূল ধ্বনি হল জয়হিন্দ ও দিল্লী চলো । জাতীয় সরকারের রাষ্ট্রভাষা হল হিন্দুস্থানী। কংগ্রেসের ত্রির্বন রঞ্জিত পতাকা জাতীয় পতাকার মর্যাদা পায় এবং রবিন্দ্রনাথ ঠাকুরের "জনগনমন" গানটি জাতীয় সঙ্গীত রূপে নির্বাচিত হয় । শ্রীঘ্রই জাপান , জার্মানি , ইতালি , ও অন্য ছটি রাষ্ট্র আজাদ হিন্দের সরকারকে স্বীকৃতি দান করে । ১৯৪৩ খ্রীঃ ২৩ শে অক্টোবর আজাদ হিন্দ সরকার ইংল্যান্ড ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করে ।

১৯৪৩ খ্রীঃ নভেম্বর মাসে নেতাজী টোকিও শহরে অনুষ্ঠিত বৃহৎ পূর্ব এশিয়া শক্তি সম্মেলনে যোগ দেন। এই সম্মেলনে ব্রহ্মদেশের প্রধান মন্ত্রী ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সর্বাত্মক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন । জাপানের প্রধান মন্ত্রী তোজো ভারতের মুক্তিযুদ্ধে জাপানের সাহায্য দানের কথা ঘোষনা করেন । জাপানের সহযোগিতার নিদর্শন স্বরূপ আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ১৯৪৩ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে আজাদ হিন্দ সরকারের হাতে সর্মপন করা হয় । এই সম্মেলনের পরেই নেতাজী ভারতের মুক্তি সাধনের উদ্দেশ্যে সর্বাত্ম সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হন । জাতীয় বাহিনী গঠন এবং বৈদেশিক সাহায্য লাভ এই দুটির ভিত্তিতে আজাদ হিন্দ বাহিনী সশস্ত্র অভিযানের সিদ্ধান্ত গ্রহন করে। ১৯৪৪ খ্রীঃ জানুয়ারী মাসে নেতাজী আজাদ হিন্দু সরকার ও আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রধান কর্মকেন্দ্র রেঙ্গুনে স্থানান্তরিত করেন কারন ব্রহ্মদেশকে ভিত্তি করে ভারতের উপর সামরিক অভিযান পরিচালনা করা সহজতর । এই সময় সুভাষ চন্দ্র সম্মিলিত জাপানী ও আজাদ হিন্দ বাহিনীর পক্ষ থেকে চট্টগ্রাম আক্রমন করার প্রস্তাব করেন । জাপান এই প্রস্তাবে আপত্তি জানায় , কারণ জাপানী সামরিক কতৃপক্ষ আজাদ হিন্দ বাহিনীকে সম মর্যাদা দেওয়ার পক্ষপাতি ছিল না । কিন্তু সুভাষ চন্দ্র বসু আজাদ হিন্দ বাহিনীকে জাপানী সৈন্যের সহায়ক বাহিনী রূপে ব্যবহার করার বিরোধী ছিলেন । তার মতে , ভারতের মাটিতে মুক্তি যুদ্ধে আজাদ হিন্দ বাহিনীর সৈন্যরাই প্রথম রক্তবিন্দু দান করবে । শেষ পর্যন্ত সুভাষ বসু ও জাপানী সৈন্যাধ্যক্ষ কাওয়ারের মধ্যে আলোচনার ভিত্তিতে স্থির হয় যে আজাদ হিন্দ বাহিনী এবং জাপানী বাহিনী যৌথ ভাবে আরাকান ফ্রন্ট আক্রমন করবে এবং ইম্ফল অভিমুখে অগ্রসর হবে । মার্চের প্রথম দিকে অভিযান শুরু হয় এবং মাসের শেষ দিকে ইম্ফলের পতন ঘটে । এপ্রিলের প্রথম দিকে কোহিমা অবরুদ্ধ হয় ।এই সময় ঠিক হয় যে বর্ষার পর আজাদ হিন্দ ফৌজ আসাম হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করবে । কিন্তু মে মাসের শিষ দিকে আজাদ হিন্দ বাহিনী যখন কোহিমায় এসে উপস্থিত হয় তখন জাপানের সামরিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে । এই সুযোগে ইম্ফল ও কোহিমার ব্রিটিশ সৈন্যেদের ব্যাপক সমাবেশ শুরু হয় । তবু আজাদ হিন্দ বাহিনী তাদের দখলী কৃত স্থানগুলো রক্ষার জন্য বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে । কিন্তু বর্ষার সমাগমে জাপানী সৈন্যদের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে পড়ায় আজাদ হিন্দ বাহিনীর সৈন্যরা রনাঙ্গন পরিত্যাগ করতে শুরু করে।

আজাদ হিন্দ ফৌজের ব্যর্থতা সত্বে ও ভারতের জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাসে তার অভিযানের গুরুত্ব অপরিসীম গুরুত্ব অপরিসীম । ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে আজাদ হিন্দ বাহিনীর যে পরোক্ষ ভাবে সাহায্য সক্রিয় ছিল তা সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় । ব্রিটিশ সরকার এই সময় থেকেই স্পষ্ঠভাবে উপলব্ধি করে যে ভারতের উপর তাদের আধিপত্য বেশী দিন বজায় রাখা সম্ভব নয় । আজাদ হিন্দ বাহিনীর দৃষ্টান্তে উদ্বুদ্ধ হয়েই নৌবাহিনী বিদ্রোহের পথ গ্রহন করে । ভারতের জন সাধারন ও এই বাহিনীর কার্যকলাপে মুগ্ধ হয়ে পড়ে । তাই সরকার যখন ঘোষনা করে যে ব্রিটিশ রাজের প্রতি অনুগত্য ভঙ্গ এবং রাজদ্রোহের অপরাধে আজাদ্ হিন্দ বাহিনীর উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিদের বিচার করা হবে তখন সারা দেশ প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে । এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ সারা দেশে গন বিক্ষোভ দেখা দেয় । সকলেই জাতীয় বাহিনীর অফিসারদের মুক্তি দাবি করে । ভুলাভাই দেশাই , তেজ বাহাদুর সাপ্রু , কৈলাস নাথ কাটজু , আসফ আলি প্রমুখ আইন জীবিদের নিয়ে জাতীয় কংগ্রেস একটি কমিটি গঠন করে এবং বিচারাধীন অফিসারদের পক্ষ সমর্থনের দায়িত্ব এই কমিটি গ্রহন করে । দিল্লীর লাল কেল্লায় এই নাটকীয় বিচার পর্ব সম্পাদিত হয় এবং কোট মার্শালে বিচারাধীন সকল অফিসারই দোষী সাব্যস্ত এবং তাদের দন্ডাদেশ দেওয়া হয় । কিন্তু শেষ পর্যন্ত জনমতের কাছে সরকারের নতি স্বীকার করতে হয় এবং সকল নেতাই সসম্মানে মুক্তি লাভ করেন ।

ভারতে বিপ্লবী আন্দোলনের সূচনা মহারাষ্ট্রে হলেও এই আন্দোলন বাংলাদেশেই সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যাপকতা লাভ করে । ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকেই বাংলা দেশে গুপ্ত সমিতি গঠনের প্রচেষ্টা দেখা দেয় । নবগোপাল মিত্রের নেতৃত্বে হিন্দু মেলা সংগঠন ও ঠাকুর পরিবারের উদ্যোগে সঞ্জীবনী সভা যুব সম্প্রদায়কে নতুন ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করে তোলে । বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং স্বামী বিবেকানন্দের রচনা ও যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে নতুন চেতনার সৃষ্টি করতে সমর্থ হয় । ফলে ১৯০২ খ্রীঃ কলকাতায় তিনটি ও মেদিনী পুরে একটি গুপ্ত সমিতি গঠিত হয় । এই সব সমিতির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল অ নুশীলন সমিতি । অনুশীলন সমিতির নামের সঙ্গে এই সংস্থার সভাপতি ব্যারিস্টার পি. মিত্রের নাম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত থাকলে ও ১৯০২ খ্রীঃ ২৪ শে মার্চ সতীশ চন্দ্র বসুর প্রতিষ্ঠার ফলেই বাস্তব রূপ গ্রহন করে এবং শরীর চর্চার সংস্থা রূপে আত্মপ্রকাশ করে । বঙ্কিম চন্দ্রের আনন্দ মঠের অনুকরনে এই সমিতির নাম করন করা হয় । কিছু দিন পরে " যুগান্তর " নামে একটি দল গঠিত হয় । ইতিমধ্যে ১৯০১ খ্রীঃ অরবিন্দ ঘোষ বরোদা থেকে তরুন বিপ্লবী যতীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়কে কলকাতায় পাঠান এবং তিনি অ নুশীলন সমিতির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন । বাংলাদেশের তদানীন্তন প্রায় সকল জাতীয়তাবাদী নেতার সঙ্গেই অনুশীলন সমিতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে ।

ক্রমশ ঃ কলকাতার বাইরে বাংলা দেশের বিভিন্ন স্থানে এই সমিতির শাখা গড়ে ওঠে এবং কলকাতায় সমিতির প্রধান কার্যালয় স্থাপিত হয় ।

তবে ১৯০৫ খ্রীঃ পূর্বে অনুশীলন সমিতি ও বাংলাদেশের অন্যান্য সমিতিগুলো শরীর র্চচা , লাঠিখেলা প্রভৃতি কাজে নিয়োজিত ছিল এবং সক্রিয় রাজনৈতিক কার্য কলাপে জড়িত ছিল না । কিন্তু ১৯০৫ খ্রীঃ বঙ্গভঙ্গ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত হলে বাংলাদেশের বৈপ্লবিক আন্দোলন নতুন রূপে গ্রহন করে ১৯০৬ খ্রী ৩ ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশের বিপ্লবীরা প্রথম নিখিল বঙ্গ সম্মেলন আহবান করেন এবং এই সম্মেলনের ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের বিপ্লবীদের মধ্যে সংহতি দৃঢ়তর হয় তবে বাংলাদেশের বৈপ্লবিক তৎপরতা প্রকাশ্য ও গোপন এই দুটি খাতে প্রবাহিত হয় । একটি গোষ্ঠী নিষক্রিয় প্রতিরোধের মাধ্যমে প্রকাশ্য ভাবে আন্দোলন পরিচালনার পক্ষপাতি ছিল । অপর দলটি ব্রিটিশ শাসনযন্ত্র বিকল করার উদ্দেশ্যে গুপ্ত হত্যার মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের পথ অবলম্বন করে । হিংসাত্মক আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে অরবিন্দ ঘোষ , বারীন্দ্র কুমার ঘোষ ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত , অবিনাশ ভট্রাচার্য , উপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রধান ভূমিকা গ্রহন করেন । জনগনের মধ্যে বিপ্লবী আদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে বারীন্দ্র কুমার ঘোষ ।

"ভবানী মন্দির " নামক একটি গল্প প্রকাশ করেন । অরবিন্দ ঘোষের " বন্দেমাতরম " এবং ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় সম্পাদিত " সন্ধ্যা" পত্রিকাও এই বিষয়ে বিশেষ ভূমিকা পালন করে । পরে বৈপ্লবিক কর্মসূচী রূপায়নের জন্য অর্থের প্রয়োজন দেখা দিলে বিপ্লবী সংঘগুলো রাজনৈতিক ডাকাতি শুরু করে । ১৯০৭ খ্রীঃ বাংলার বিপ্লবীদল সর্ব প্রথম গুপ্ত হত্যার পরিকল্পনা গ্রহন করে । এই সময় তারা পূর্ব ও আসামের লেফটেন্যান্ট গর্ভনর ব্যামফিল্ড কুলারকে হত্যার চেষ্টা করে । কিন্তু তাদের এই চেষ্টা ব্যার্থ হয় । ইতিমধ্যে বারীন্দ্র কুমার ঘোষ , হেমচন্দ্র কানুনগো , উল্লাস কর দত্ত প্রভৃতি মানিক তলার মুরারী পুকুর অঞ্চলে বোমা প্রস্তুত করার কারখানা নির্মান করেন এবং তারা ইংরেজ কর্মচারীদের হত্যা করে শাসনতন্ত্র বিকল করার সংকল্প গ্রহন করেন । অত্যাচারী প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কিংসফোর্ড তাদের প্রধান লক্ষ্যে পরিনত হন । ব্রিটিশ সরকার কিংসফোর্ডকে কলকাতা থেকে মজঃফর পুরে বদলি করে । ক্ষুদিরাম বসু প্রফুল্ল চাকী নামক দুজন তরুন বিপ্লবীর উপর কিংসফোর্ডকে হত্যার দায়িত্ব দেওয়া হয় । কিন্তু তাদের নিক্ষিপ্ত বোমার আঘাতে মিসেস কেনেডি ও মিস কেনেডি নামে দুজন নিরপরাধ মহিলা মারা যায় । পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার থেকে অব্যাহিত পাওয়ার জন্য প্রফুল্ল চাকী নিজের গুলিতে আত্মহত্যা করেন । কিন্তু ক্ষুদিরাম ধরা পড়েন এবং বিচারে তার প্রানদন্ড হয় । অপর দিকে মুরারী পুকুরের বিপ্লবীদের আস্তানায় হানা দিয়ে পুলিশ অরবিন্দ ঘোষ সহ ছিষট্রিজন বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করে এবং আসামীদের বিরুদ্ধে বিখ্যাত আলিপুরের বোমার মামলা শুরু হয় । এই সময় নরেন গোসাই নামক একজন দুর্বল চিত্ত বিপ্লবী পুলিশের নিকট অনেক গোপন তথ্য ফাঁস করায় ঐ মামলার অপর দুই আসামী কানই লাল দত্ত ও সত্যন বসু নরেন গোসাইকে জেলের মধ্যেই গুলি করে হত্যা করেন । ফলে কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন বসুর ফাঁসি হয়।

আলিপুর বোমার মামলার ব্যারিস্টার চিত্র রঞ্জন দাসের প্রচেষ্টায় অরবিন্দ ঘোষ খালাস পেলেও অপরাপর আসামীদের অনেকেরই যাবজ্জীবন দীপান্তর হয় ।

আলিপুর বোমার মামলার পর বাংলার সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন কিছু পরিমানে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। সক্রিয় রাজনীতি থেকে অরবিন্দের বিদায় গ্রহন সরকারের কঠোর দমন নীতি এবং অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর দল নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হলে বিপ্লবীদের কার্যকলাপ অনেকাংশে বন্ধ হয়ে যায় । তা ছাড়া এইসব বিপ্লব বাদের প্রকৃতিগত পরিবর্তন দেখা যায় । প্রথম দিকে হিন্দু ধর্মের সঙ্গে বিপ্লবীদের ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টা হলেও পরে এই সম্পর্ক ছিন্ন করা হয় ।

বিপ্লবী কর্মপন্থা সংক্রান্ত ব্যাপারে ও পরিবর্তন ঘটে এবং বিক্ষিপ্ত ভাবে বোমা নিক্ষেপের পরিবর্তে সার্থক বিপ্লবের জন্য কৃষক , শ্রমিক ও সৈন্য বাহিনীর মধ্যে সভা গঠনের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয় এবং বৈদেশিক সাহায্যের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহনের কর্মসূচী তৈরী করা হয় । তা সত্ত্বেও ১৯০৮ থেকে ১৯১৭ খ্রীঃ মধ্যে বিপ্লবীগন প্রায় ৬৪ জন সরকারী কর্মচারীকে হত্যা বা হত্যাকারার চেষ্টা করেন তার মধ্যে ১৯০৮ খ্রীঃ বাংলার ছোটলাট ফ্রেজারকে হত্যার চেষ্টা , পুলিশ সাব ইনস্পেক্টর নন্দলাল বন্দোপাধ্যায়কে হত্যা , ১৯০৯ খ্রীঃ সরকারী উকিল আশুতোষ বিশ্বাসকে হত্যা ১৯১০ খ্রীঃ পুলিশ অফিসার সামসুলকে প্রাননাশ প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ।

বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন " সাহিত্যের কর্মযোগী " সুতরাং তিনি রাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে জড়িত ছিলেন কিনা তা বড় প্রশ্ন নয় । আসল কথা হল বঙ্কিমের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এবং তা দেশের রাজনৈতিক ভাবনায় কতটা সহায়ক হয়েছে ।

বঙ্গদর্শন এর প্রথম দিকে তাঁকে রাজনীতি সম্পর্কে বিমুখ দেখা যায়নি । তবে তার অনেকখানিই ঐতিহাসিক তাড়নায় এবং স্বদেশ চিন্তার প্রনোদিত । বাঙ্গালীর " বাহু বল" , " ভারতকলঙ্ক " , " ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা " প্রাচীন ভারতের রাজনীতি , বাংলার ইতিহাসে , ' বাংলার কলঙ্ক " প্রভৃতি বহু রাজ নৈতিক রচনাকা অনেক গুলো লেখা আবার সমাজতাত্ত্বিক চিন্তায় ও পরোক্ষভাবে স্বদেশ চিন্তায় উদ্বুদ্ধ । "সাম্য" বঙ্গদেশের কৃষক এবং কমলা কান্তের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত উক্তি এই শ্রেণীর অন্তর্গত । প্রথম শ্রেণীর লেখাগুলোতে যে মূল রাজনীতি ভাবনার ও চেতনার সূত্রপাত বঙ্কিমচন্দ্র করে ছিলেন তা অশিক্ষিত শ্রেণীকে স্বদেশ বিষয়ে সচেতন করে তোলার কথা পরাজিত বাঙ্গালী ও ভারতবাসীকে কিছুটা উৎসাহ দানেরও কথা । অন্যান্য অনেক লেখাই জাতীয়তার উদ্বোধন হিসাবে রাজনীতি সম্পর্কিত কমলাকান্তের পত্রে'র পলিটিক্স্ বিশ্লেষণ কুক্কুর জাতীয় ও বৃষজাতীয় পলিটিক্সের ব্যাখা একদিকে যেমন উপভোগ্য তেমনি অপরদিকে বাস্তব রাজনৈতিক বোধের প্রমান।

বঙ্কিমচন্দ্র আর একটি বিশিষ্ট কীর্তি হিন্দুধর্মের গৌরব প্রতিষ্ঠা । বারে বারে তিনি হিন্দুধর্মের

গৌরব প্রতিষ্ঠার জন্য আবেদন জানিয়েছেন । এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে হিন্দুধর্ম ও হিন্দু সমাজের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের আনুগত্য জন্মগত । যুগ শিক্ষায় সুশিক্ষিত যোগের জ্ঞান বিজ্ঞানের সহায়তায় তিনি হিন্দুধর্মের পক্ষে যা করেন তা তাঁর প্রতিভার পরিচয় । হিন্দুধর্মে সমস্ত শাস্ত্রকে আপন অভিপ্রায় অনুযায়ী পরীক্ষা করে , বিচার করে যুক্তির পর যুক্তির সাহায্যে গীতায় উক্ত নিষ্কাম ধর্মকেই একমাত্র হিন্দুধর্মরূপে ব্যাখ্যা ও কৃষ্ণকে আদর্শ মনুষ্যরূপে স্থাপন , জন্মগত বিশ্বাসকে যুগ 'সঙ্গত যুক্তির ধরাতেই পুষ্ট করে তিনি একটি নতুন দিকের উন্মোচন করেন । বঙ্কিমের এই প্রচেষ্টায় সমকালীন চিন্তাশীল ব্যক্তিদের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন রমেশচন্দ্র দত্তের লেখা থেকে জানা যায়। তিনি বলেন যে আধুনিক যুগ গ্রাহ্য হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু সমাজ গঠনের চেষ্টায় প্রথম বঙ্কিমই অগ্রনী হন। সংক্ষেপে বলা যায় যে বঙ্কিমের মধ্যে দিয়ে হিন্দুধর্মের পুনর্জীবনের আভাস দেখা যায় । সমাজ সংস্কার অপেক্ষা সংরক্ষনের দিকে তাঁর বেশি ঝোঁক থাকলেও তিনি কট্টর গোড়াপন্থী ছিলেন না । বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন জীবননিষ্ঠ এবং মানবতাবাদী সুতরাং তিনি মানবীয় , বৃত্তি সমুহের সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশের মধ্যে দিয়ে সর্বাঙ্গীন পুরুষার্থ লাভের কথা বলেছেন । ধর্মতত্ত্ব ও কৃষ্ণ চরিতের মাধ্যমে তিনি হিন্দুধর্মের নানাদিক সম্পর্কে সংগর্ভ আলোচনা করেন । বঙ্কিম কায়মনোবাক্যে হিন্দু ধর্মের উজ্জ্বল ভবিষ্যতে বিশ্বাস করতেন । সে জন্য তিনি বলেন , " যেদিন ইয়োরোপীয় বিজ্ঞান ও শিল্প ও ভারতের নিষ্কাম কর্ম একত্র হইবে সেদিন মনুষ্য দেবতা হইবে ।"

বঙ্কিমচন্দ্রের রাজনৈতিক মতবাদ স্পষ্ঠভাবে প্রকাশিত না হলেও তার রাজনৈতিক আদর্শ ভারতীয় বিশেষভাবে বাংলার রাজনীতির উপর আর গভীর প্রভাব বিস্তার করে । তাঁর দেশপ্রেম রাজনৈতিক দর্শন বহু রাজনীতি বিদকেই উদ্বুদ্ধ করে তোলে। তার সম্পর্কে বলা হয় যে তিনি স্বদেশ প্রেমকে ধর্মের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হন । শ্রীঅরবিন্দ , বঙ্কিমচন্দ্রের এই চিন্তা ধারাকে স্বদেশ প্রেমের ধর্ম বলে বর্ণনা করেন । ডক্টর রমেশ চন্দ্র মজুমদার প্রায় অনুরূপ মত প্রকাশ করে বলেন যে তিনি স্বদেশ , প্রেমকে ধর্ম এবং ধর্মকে স্বদেশ প্রেমে পরিণত করতে সমর্থ হন । কিন্তু স্বদেশ প্রেম ও ধর্ম বঙ্কিমচন্দ্রের কাজ সমর্থন ছিল সে কথা মনে করলে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি অবিচার করা হবে । তার মানবপ্রেম , কাল ও দেশের গন্ডী অতিক্রম করে এক বিশ্বজনীন মানবতাবাদে পরিনত হয় । প্রকৃত পক্ষে তার মানবপ্রেম স্বদেশ প্রেম অপেক্ষা ও অনেক বেশী গভীর ছিল । তিনি পাশ্চাত্য দেশে অনুসৃত স্বাপত্যবোধ ও দেশপ্রেম সম্মর্কে খুব উচ্চধারনা পোষন করতেন না এবং ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায় যে পাশ্চাত্যের অনুকরন করে স্বদেশ প্রেমের নতুন ব্যাখ্যা দিতে শুরু করেন বঙ্কিমচন্দ্র তা ও পছন্দ করতে পারেন নি। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে সমস্ত প্রাণীকে সমভাবে ভালবাসাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম । কিন্তু মানব সভ্যতার অপূর্ণতার জন্য সমস্ত প্রাণীকে সমভাবে ভালবাসা অসম্ভব সুতরাং স্বদেশ প্রীতিকেই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে মনে করা উচিত । তার নিজের ভাষায় " সকল ধর্মের উপর স্বদেশ প্রীতি " । তার এই স্বদেশ প্রীতির চিন্তাধারা

ভারতের চরমপন্থী রাজনৈতিক মতবাদ গড়ে তুলতে অনে কাংশে সাহায্য করে। বিশেষত এই ব্যাপারে " আনন্দমঠ ও তার অন্তভুক্ত " বন্দেমাতরম" ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নিকট গভীর অনুপ্রেরণা রূপে দেখা যায় । আনন্দমঠের সন্ন্যাসীগন অর্থাৎ সন্তানদল চরমপন্থী আন্দোলন কারীদের নিকট আদর্শ রূপে পরিগনিত হতেন । ভারতীয় বিপ্লবীদের কাছে আনন্দমঠ ছিল প্রেরনার প্রতীক নিষ্কাম স্বদেশ প্রেমের দীক্ষায়, স্বয়ং সম্পূর্ণ একটি গ্রন্থ । সমগ্র আনন্দমঠ উপন্যাসের প্রান বানী " বন্দেমাতরম " ছিল চরম পন্থীদের মহাসঙ্গীত এবং মাতৃমন্ত্র কণ্ঠে নিয়ে তারা যে কোন দুঃসাহসিক কর্মে আত্মনিয়োগ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করতেন না । আনন্দমঠের সন্তান দলের কাছে দেশই ছিল মা । এই গ্রন্থে মায়ের ত্রিমুর্তি প্রদর্শিত হয়েছে । অতীতের গৌরবোজ্জল ভারত বর্ষ স্বৈরাচারী শাসনে মা হৃত সর্বস্বা, দেশ শ্মশানে পরিনত হয়েছে মা অন্ধকারাচ্ছন্ন কালী কালিমাময়ী 'মা হইয়াছেন ' দেশ প্রেমিক সন্তান দলের ধ্যাননেত্রে সাধন ও কল্পনার উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে মায়ের এক ঐশ্বর্যময় মূর্তি - বিদ্যা, বুদ্ধি সামরিক বল, ধনৈশ্বর্য এবং গনশক্তির অপূর্ব সমন্বয়ে গড়া আগামী দিনের নতুন ভারতবর্ষ মা যা হইবেন । ' অন্ধকারাচ্ছন্না কালিমাময়ী কামে হৃত সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল আনন্দমঠের সন্তানদের একমাত্র ধর্ম লক্ষ্য, সাধনা কামনা ও বাসনা ঐ লক্ষ্যে ধাবিত ও বাসনা এই লক্ষ্যেই ধাবিত হত তাঁদের সকল ধর্ম প্রয়াস । চরম পন্থীদের নিকট বঙ্কিমচন্দ্রের এই বর্ণনা গভীর প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয় এবং তারা কালী মুর্তির আরাধনার দ্বারা শক্তি ও সাহসকে উদ্দীপ্ত করে তোলার চেষ্টা করেন । ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে আনন্দ মঠ ব্যতীত অন্য কোন উপন্যাস তরুন বাঙ্গালীর উপর এরূপ গভীর প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি । চরম পন্থীদলের অন্যতম প্রধান নায়ক অরবিন্দ ঘোষ, ১৯০৭ খ্রীঃ তার সম্পাদিত বন্দেমাতরম পত্রিকায় লেখেন, যে নতুন শক্তি জাতিকে পুনরুত্থান ও স্বাধীনতার দিকে পরিচালিত করতে সমর্থ হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রই তার উৎসাহদাতা এবং রাজনৈতিকগুরু । অরবিন্দ বঙ্কিমচন্দ্রকে নবভারতের স্রষ্টাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে করতেন । ১৯১০ খ্রীঃ ১০ ই এপ্রিল বন্দেমাতরম পত্রিকায় প্রকাশিত ।

" ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র " শীর্ষক প্রবন্ধে অরবিন্দ ঘোষ বঙ্কিমচন্দ্রকে 'ঋষি' অভিধায় ভূষিত করেন । তিনি বলেন বঙ্কিমচন্দ্র জাতিকে বন্দেমাতরম মন্ত্রদান করেছেন

## " বাঙালীরা চিরদিনই প্রতিবাদী "

দেশের মুক্তির জন্য বঙ্কিমচন্দ্র চেয়েছিলেন নৈতিক বল, যার ভিত্তি হল পুর্ন আত্মনিবেদন, সংগঠন নিয়মানুবর্তিতা এবং দেশ ও প্রেম ও আধ্যাত্মিকতার সমন্বয় । অরবিন্দের মতে বঙ্কিম রচনাবলীর মূল কথাই হল স্বদেশ প্রেম ধর্ম এবং এটাই আনন্দমঠের প্রানবানী । যে বন্দেমাতরম আজ অখন্ড

ভারতের জাতীয় সঙ্গীত সেই মহাসঙ্গীতের মধ্যে দিয়েই ঐ প্রানবানীর অনবদ্য ছন্দোময় প্রকাশ । অন্যত্র অরবিন্দ বলেন , যে , জাতির জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান হল এই যে তিনি আমাদের মাতৃভূমি দিয়ে দিয়েছেন । বঙ্কিমচন্দ্র কল্পনাতে যে ভাবে মার্তৃমুর্তি দর্শন করেন , সেই ভাবেই তা দেশবাসীর নিকট বিচিত্র করার চেষ্টা করেন । তার আদের্শেই সমগ্র জাতি মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত হয় । ১৩১৬ বঙ্গাব্দের ১১ই আশ্বিন ধর্ম পত্রিকায় তিনি লিখেছেন , স্বদেশ প্রেমের ভিত্তি মাতৃ পূজা । যেদিন বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরম গান বাহ্যেন্দ্রিয় অতিক্রম করিয়া প্রাণে আঘাত করিল , সেদিন আমাদের হৃদয়ের মধ্যে স্বদেশ প্রেম জাগিল , মাতৃভূমি প্রতিষ্ঠিত হইল । দেশ অরবিন্দের নিকট নিছক একটি জড় পদার্থ নয় । মাঠ , ক্ষেত , বন , পর্বত , বা নদী নয় - আমি স্বদেশকে মা বলিয়া জানি , ভক্তি করি পূজা করি। " বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব নিঃসন্দেহে তাঁকে এই রূপ চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করে তুলতে সমর্থ হন । ১৩১৬ বঙ্গাব্দের ধর্ম পত্রিকায় আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত যুগান্ত্রোত্রে আর স্বদেশ প্রেম ও মার্ত চিন্তার 'সম্যক পরিচয় পাওয়া যায় । কমলাকান্তের মতোই তিনি দেবী দূর্গাকে বলদায়িনী , প্রেম দায়িনী , জ্ঞান দায়িনী , শক্তি রূপিনী ভীমে , সৌম্য রৌদ্র রূপিনী বলে আহ্বান জানিয়েছেন। দেশের দুগতি নাশের জন্য মায়ের কাছে আকুল প্রার্থনা জানিয়েছে । মাতা দুর্গে ! তোমাকে পাইলে আর বির্সজন করি না , শ্রদ্ধা ভক্তি প্রেমের জোরে বাঁধিয়া রাখিব । তার রচিত ভবানী মন্দির এবং দি মাদার এর মধেও অনুরূপ চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে।

বাঙালী জাতির প্রতিবাদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ তারিখ যেমন ১) ১১৭৬ বঙ্গাব্দ ইংরেজী ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে ) বাংলাদেশের ছিয়াত্তরের মন্বন্তর প্রতিবাদে পশ্চিমবাংলা সহ বাঙালী অধ্যুষিত অঞ্চল ক্ষোভে ফেটে পেড় ।

২) ১৭৭৪ খ্রীঃ প্রতিবাদী নন্দকুমার ফাঁসী মিথ্যা জালিয়াতির অভিযোগে ।

৩) ১৮১৭ খ্রীঃ হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা ।

৪) ১৮৩৯ খ্রীঃ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতিষ্ঠা করেন ।

৫) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রভাকর ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রতিষ্ঠা করেন যাতে ইংরেজদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হতো ।

৬) ১৮৬৭ খ্রীঃ কেশবচন্দ্র সেনের উদ্যোগে মহারাষ্ট্রে প্রার্থনা সমাজ প্রতিষ্ঠা ।

৭) ১৮২৮ খ্রীঃ রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন ।

১৮৬৭ খ্রীঃ নবগোপাল মিত্রের উদ্যোগে হিন্দু মেলা শুরু হয় ।

৮) ১৮৩৭ খ্রীঃ দ্বারকানাথ ঠাকুর , কাশীনাথ রায় প্রমুখ ' বঙ্গভাষা প্রকাশিত সভা " প্রতিষ্ঠা করেন , সর্বপ্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ।

৯) ১৮৭৬ খ্রীঃ সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ভারত সভা প্রতিষ্ঠিত হয় ।

১০) ১৮৮৫ খ্রীঃ উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি ছিলেন।

১১) ১৮১৫ সালে রামমোহন রায় আত্মীয় সভা প্রতিষ্ঠা করেন ।

১২) ১৮২৫ খ্রীঃ " নববিধান " এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কেশব চন্দ্র সেন ।

১৩) " নীল দর্পন " গ্রন্থের প্রনেতা দীনবন্ধু মিত্র নীল চাষীদের অত্যাচারের প্রতিচ্ছবি এই গ্রন্থে আছে ।

১৪) আনন্দমঠ এর রচয়িতা ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যা বাঙালী যুব সমাজকে প্রেরনা যুগিয়েছিল।

১৫) ১৮৫৯ খ্রীঃ দিগম্বর বিশ্বাস ও বিষ্ণুচরন বিশ্বাস নীলবিদ্রোহ শুরু করেন ।

১৬) বাংলায় ওয়াহাবী আন্দোলনের নেতা তিতুমীর নারিকেল বেড়িয়ার বাঁশে কেল্লা নির্মাণ করিয়া ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর সহিত লড়াই চালাইয়াছিলেন ।

১৭) বাঙালীদের আন্দোলনের চাপে ইংরেজ সরকার ১৮৬৩ খ্রীঃ কলিকাতা কর্পোরেশন গঠন করেন ।

১৮) ১৮৪৯ খ্রীঃ কলিকাতায় ফিমেল স্কুল প্রতিষ্ঠা ।

১৯) ১৮৫৭ খ্রীঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ।

২০) অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর নন্দলাল বসু প্রাচ্যবকলার দু -জন প্রবক্তা ।

২১) অরবিন্দ ঘোষ উগ্র জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা ।

২২) ১৯০৫ খ্রীঃ বঙ্গভঙ্গ।

২৩) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রস্তাব অনুসারে রাখী বন্ধন অনুষ্ঠান পালিত হয় ।

২৪)১৯০৬ খ্রীঃ রাসবিহারী সর্ব প্রথম " জাতীয় শিক্ষা পরিষদের" সভাপতি ছিলেন ।

২৫) বাংলার বিপ্লবীদের দুইটি বিপ্লব গুপ্ত সমিতি হল অনুশীলন সমিতি ও সাধনা সমিতি ।

২৬) ১৮ই এপ্রিল ১৯৩০ খ্রীঃ সূর্য সেন এর নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত হয় ।

২৭) ত্রিপুরী কংগ্রেস সুভাষ চন্দ্র বসু সভাপতি পদে নির্বাচিত হন ।

এছাড়া ও দেশের ঐক্যবদ্ধতার স্বার্থে অন্যায় , অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এ রকম শত শত প্রমান ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বর্তমান ।

# " অধিকার রক্ষায় স্বাধীনোত্তর যুগে বাঙালীর অবদান ও বলিদান "

সত্যিই আমাদের আতসমীক্ষার প্রয়োজন আছে, কোথাও বা স্বল্প পরিসরে তা শুরু ও হয়েছে। বাঙালিদের বিবর্তিত বর্তমান জীবন। ইতিহাস বলে বাঙালি জাতি এক জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবে না। তাই কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনের স্রোত এসেছে তবে কেউ কেউ মনে করেন তা যেন বাঙালিত্ব ঘুচিয়ে না দেয়। পাশাপাশি জাতীয়তাবোধটুকু যেন আমাদের নষ্ট না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখার সময় এসেছে। আত্মকেন্দ্রিকতায় যেন আমাদের সত্বার ক্ষতি না হয়ে যায়। শিক্ষা, সংস্কৃতি, মননশীলতার পরিচায়ক তা বলে প্রতিবাদ করার সাহস যেন লুপ্ত না হয়। অবশ্যই প্রতিবাদ হতে হবে নৈতিক মূল্যায়নের ভিত্তিতেই নয়তো আমরা মধ্যযুগের দাসত্ব প্রথাকেই মেনে নিতে হবে। জাতি হিসাবে জাতির নিজস্ব স্বকীয়তা, স্বাজত্যাভিমান, পরিবর্তন ও আধুনিকতার পাশাপাশি মুল্যায়ণ, উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, এমনকি শহর গ্রাম, পাহাড়ের খেটে খাওয়া মানুষ, সমস্ত মানুষেরই একটা নিজস্ব স্বকীয়তা বা স্বত্বার প্রয়োজন আছে। কাজের বির্তক থাকতেই পারে, তাই বলে শিক্ষা - দিক্ষা নিয়ে আধুনিকতার ছোঁয়ায় যেন আমরা আমাদের অস্তিত্ব ভুলে না যাই। আমরা যদি আমাদের ইতিহাস ভুলে যাই তবে তা আগামীর জন্য তৈরী হবে এক ভয়ঙ্কর দুর্গম পথ। এখনো আমাদের এক বিশাল অংশের মধ্যে পুরনো মূল্যবোধ, রুচিবোধ, স্বাজ্যাত্যাভিমান, নিজস্বতা সবই আছে, আধুনিক পরিবর্তনের ঢেউ কিন্তু তা মুছে দিতে পারেনি, যদি মুছেই গেল তবে তো জাতির প্রতি অবমাননা। অনেক ভুল ত্রুটি আছে, থাকতেই পারে, জীবনতো আর জড় পদার্থ নয় যে ভুল হবে না কাজ করলেই তো ভুল হয় আর ভুল হলেই তো সংশোধনের প্রশ্ন। আগামী পথ তৈরীর জন্য ইত্যাদি ইত্যাদি। আমাদের সমাজের এক বিশালশ্রেণীর কাছে এখন একটা ক্ষুধা পরিলক্ষিত হয় তা হল " শহরের ক্ষুধা "। শহরেই নাকি সব, কেন না আমরা গ্রাম শহরের মধ্যে একটি সেতু নির্মান করি, যার মাধ্যমে সভ্যাতা আরো সুন্দরভাবে বিকশিত হতে পারে।

চিন্তা, অনুভতি, সভ্যতা, কর্মসংস্থান ইত্যাদির প্রেরক হবে গ্রাম শহরের সেতু বন্ধন। বাস্তবের আদান প্রদানই জীবনের, সমাজের, সভ্যতার বাস্তব রূপ। ঘৃণা নয়, বোঝাপড়ার মাধ্যমেই হাল হোক সমস্যার। শুধু ভোগবাদী বলিয়া কেন কিছুটা হলে কর্মবাদী চিন্তাধারার প্রয়োজন আছে। আমি বিত্তবান বলিয়া কি দারিদ্র, নিম্নবিত্তকে হেলায় বা বিদ্বেষ ফেলিয়া দেবো ? তা হলে তো তৈরী হবে ঠুনকো সভ্যতা, সংস্কৃতি ? গ্রাম শহরের মিলিত বন্ধনেই তৈরী হয় নুতন সংস্কৃতি। ধৈর্য্য, শান্তি, সৃষ্টি, কৃষ্টি, সংস্কৃতি এগুলো হলো জাতির সভ্যতার প্রতীক। সৃষ্টি শক্তিই সর্বদা শ্রেষ্ঠ ও জাতির উন্নয়নের সোপান। পরিবর্তনের জোয়ারে আমরা যেন তা থেকে ছিটকে না পরি। আমরা যেন

হারিয়ে না যাই , পিছিয়ে না পরি , শিল্প সংস্কৃতি , সাহিত্য , বিজ্ঞান , গবেষণা , কৃষিশিক্ষা , সমাজশিক্ষা , প্রযুক্তিবিদ্যা , সবদিক থেকে এগিয়ে সামাজিক ও মানবিক ভারসাম্য
তৈরী করলেই সুনির্দিষ্ট পথে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব । নিজেদের শ্রেণী বিন্যাসে যেন আমরা তলাইয়া না যাই । প্রতিযোগীতা করেই এগিয়ে যেতে হয় । সাম্প্রদায়িকতা বা কায়েমী স্বার্থ নিয়ে এগিয়ে যাওয়া অসম্ভব তাতে হয়ত ব্যক্তি বিশেষের লাভ হতে পারে কিন্তু সামগ্রিকভাবে বিশাল ক্ষতি । শিক্ষিত ও সমাজসচেতন মানুষরাই পারে সমাজের সত্যিকারের পরিবর্তন আনতে । ইতিহাস শিক্ষাদেয় , বিজ্ঞান, প্রযুক্তি , উৎপাদন সবটারই বিশেষ প্রয়োজন আছে নয়তো আমরা থমকে যাবো । ইতিহাস বলে শিক্ষা , সংস্কৃতি , বিজ্ঞান , সাহিত্যে , সবটার মধুর মিলন এবং কৌশল ও পদ্ধতিগতভাবে ব্যাবহার জাতি সমাজ দেশকে উন্নত করে । ভোগবাদ , বৈষম্যের কারণে যেন শ্রেণী বিন্যাস হয়ে না যায় তবে তো মধ্যযুগ , নিপীড়ন , দাসত্ব প্রথা উৎসাহিত হবে । মূল্যবোধের অবক্ষয় । সুতরাং আমরা তা মেনে নেবো না । হিংসা , হানাহানি , সন্ত্রাসমুক্ত , পরিবর্তনশীল,
ভেদাভেদ বিহিন সংগতি আধুনিক সমাজ হতে হবে লক্ষ্য । হয়ত কাজটা বেশ কঠিন কিন্তু অসম্ভব নয় । আর্থিক , পারিপার্শ্বিক কারণে যৌথ পরিবার হয়ত ভেঙে গেছে তা বলে পরিবার , সমাজ দ্বিখন্ডিত হবে কেন । আমাদের সময় এসেছে অতীতকে লক্ষ্য করে ভবিষ্যতের রূপ রেখা তৈরী করার । জাতির নিজস্ব স্বকীয়তা যেন আমরা ভুলে না যাই । পরিবার , গ্রাম সমাজ , জিলা , রাজ্য , দেশ একে অপরের পরিপূরক তা ভুললে সবই মিথ্যা । তবে তো দেশকে চিনতে অনেক বিলম্ব ঘটবে। নিজস্ব জাতি সত্বাকে জানা অপরাধ নয় । উদ্যমতা , ঐক্য সংস্কৃতি ও সাহস অনুপ্রেরণা নিয়ে আমাদের জানতে হবে আমাদের বরণ্যেদের তবেই তো তৈরী হবে বাঙালী জাতির আগামী সুসংহত পথ ।

ইতিহাসের পৃষ্ঠায় খুঁজতে খুঁজতে তাদের নাম পাওয়া গেছে , অনেকেরই নাম প্রচারের আলোতে বা ইতিহাসের পাতায় স্থান পায়নি যদি ও তা সত্যি বাঙালীজাতির এই বরেণ্য রা সেদিন প্রাণপনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো নামের প্রচারের জন্য নয় , পরাধীনতা ও দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মাতৃভূমিকে মুক্ত করার জন্য কেউ বা আত্মবলিদান দিয়েছেন , কেউ বা কারাবাসে , কেউ বা পঙ্গু হয়েছেন , কেউ বা নিখোঁজ । এতো ছিল মর্মান্তিক , যন্ত্রণাদায়ক এক সুদীর্ঘ ইতিহাস । তা যেন পুঁথির অন্তরালে চাপা না পড়ে যায় তারা বরেণ্য , তাদের বলিদান - আমরা স্বাধীন । তাদের ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে হলে আমাদেরকে লড়াকু মনোভাব নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই । প্রতিজ্ঞাবদ্ধ জাতি হিসেবে সমস্ত দুর্গম পথ পেরোতে হবে , তবেই তো অপেক্ষা করবে প্রস্ফুটিত আগামী ।

শ্রদ্ধাবনত মস্তকে তাদের শ্রদ্ধা জানিয়ে খুঁটে খুঁটে তাদের বীরত্ব , বলিদান , সৃষ্টিকে খুঁজে বের করে আগামী প্রজন্মের জন্য একনজরের একটি সংক্ষিপ্ত জ্বলন্ত অথচ বাস্তব প্রেরণার তথ্য তৈরী

করতে চাই ।

১) শহীদ ক্ষুদিরাম বসু (১৮৮৯ - ১৯০৮ ) মজঃফরপুরে অত্যাচারী ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যার চেষ্টায় দুই ইংরেজ মহিলাকে বোমা মেরে হত্যার মামলায় ১১ ই আগষ্ট ১৯০৮ এ মজঃফরপুর জেলে ফাঁসী হয়।

২) শহীদ সত্যেন বোস, (১৮৮২ - ১৯০৮ ) জেলের ভেতর রাজস্বাক্ষী প্রতারক / বিশ্বাসঘাতক নরেন্দ্র গোসাইকে হত্যা মামলায় ২০ই নভেম্বর ১৯০৮ ইং ফাঁসী হয় ।

৩) শহীদ কানাইলাল দত্ত, (১৮৮৮ -১৯০৮ ) একই মামলায় ১০ই নভেম্বর কানাইলাল দত্তের ফাঁসী হয়।

৪) ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯০৯ সরকারী উকিল আশুতোষ বিশ্বাসকে যিনি আলীপুর বোমা মামলার সরকারী উকিল ছিলেন , তাকে হত্যার দায়ে ১৯ শে মার্চ ১৯০৯ ইং চারুচন্দ্র বোসের ফাঁসী হয় ।

৫) আলীপুর বোমা মামলার শুনানীর সময় ডি.এস.পি . শ্যামসুল আলমকে উচ্চ আদালত প্রাঙ্গণে হত্যার দায়ে ২১ শে ফেব্রুয়ারী ১৯১০ ইং বীরেন্দ্রনাথ দত্ত গুপ্তের ফাঁসী হয় ।

৬) ইংরেজ বাহিনীর সাথে বালেশ্বরের যুদ্ধে বাঘা যতীনের দুই সহযোগী নীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ও মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত ইংরেজ বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে পরবর্তীতে উভয়ের ফাঁসী হয় ।

৭) ১৯২৫ সালে বোমা তৈরীর কারখানায় দক্ষিণেশ্বর ( কোলকাতা ) রাজেন্দ্রনাথ লাহিরী ধরা পড়েন , বিচারে উনার মৃত্যুদন্ড হয় ।

৮) প্রমোদরঞ্জন চৌধুরী ও অনন্তহরি মিত্র উভয়ে রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ীর সাথে গ্রেপ্তার হন পরবর্তীতে গোয়েন্দা অফিসার ভুপেন ব্যানার্জীকে জেলে পিটিয়ে হত্যার দায়ে ১৯২৬ এ উভয়ের ফাঁসী হয় ।

৯) ১৯২৪ এর মার্চ মাসে গোপীনাথ সাহার ফাঁসী হয় কোলকাতার রাজপথে ব্রিটিশ "ডে" কে হত্যার অভিযোগে । উনি " ডে" কে অত্যাচরী চার্লিস টেগার্ট ভেবে হত্যা করেন ।

১০) ১৯৩৩ সালের ৭ই জুলাই ২২ বছরের তরুন দীনেশ চন্দ্র মজুমদারের ফাঁসী হয় কোলকাতায় পুলিশের উপর গুলী চালানোর মামলায়।

১১) ১৯৩৪ সালের ১২ই জানুয়ারী রাত্রি ১২ টায় ফাঁসী হয় চট্টগ্রাম খ্যাত " মাষ্টার দা" অর্থাৎ সূর্যসেন এবং চট্টগ্রামের আর এক বিপ্লবী তারকেশ্বর ঘোষ দস্তিদারের । চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলায় ।

১২) ১৯৩৯ এর জানুয়ারী মাসে পুলিশ ইন্সপেক্টরকে হত্যার অভিযোগে বামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফাঁসী হয় ।

১৩) ঢাকা জেলার বিপ্লবী দীনেশ গুপ্তকে ১৯৩১ সালের ৭ই জুলাই আলীপুর জেলে ফাঁসী

দেওয়া হয় । অভিযোগ, কর্নেল সিম্পসনকে রাইটার্স এর ভেতরে ঢুকে হত্যা করার ।

১৪) তরতাজা ২০ বৎসরের যুবক প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য্যকে ১৯৩০ এর ১২ই জানুয়ারী ফাঁসী দেওয়া হয় মেদিনীপুরের জেলাশাসক ডগলাসক হত্যার অভিযোগে ।

১৫) ১৯৩৪ এর ২৫ শে অক্টোবর আর এক বিপ্লবী ব্রজকিশোর চক্রবর্তীর ফাঁসী হয় অভিযোগ মেদিনীপুরের জেলাশাসক " বার্জ " হত্যার ।

১৬) ১৯৩৪ এর ১৬ শে অক্টোবর একই মামলায় রামকৃষ্ণ এর ফাঁসী হয় ।

১৭) ১৯৩৪ এর ২৬ শে অক্টোবর বার্জ হত্যার মামলায় নির্মলজীবন ঘোষের ফাঁসী হয় ।

১৮) কচি ১৭ বছরের তরুন হরেন্দ্র চক্রবর্তীর ফাঁসী হয় ৭ই জানুয়ারী ১৯৩৪ এ অভিযোগ চট্টগ্রামে খেলার মাঠে ইংরেজ শাসককে হত্যা ।

১৯) একই মামলায় ফাঁসী হয় কচি ১৬ বছরের ছেলে কৃষ্ণ চৌধুরী এবং একই দিনে ।

২০) ১৯৩৪ এ ফাঁসী হয় ভবানী ভট্টাচার্য্যর । অভিযোগ দার্জিলিং এ রেস কোর্সে লেঃ গর্ভনর এর উপর গুলী চালানো।

২১) ১৯৩৩ এ ফাঁসী হয় কালিপদ মুখার্জীর । অভিযোগ ম্যাজিস্ট্রেট হত্যা ।

২২) মতিলাল মল্লিকের ফাঁসী হয় ১৯৪৩ এর এপ্রিল মাসে গ্রামরক্ষী হত্যার অভিযোগে ।

২৩) বিপ্লবী মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যকে ফাঁসী দেওয়া হয় ডাকাতী মামলায় ।

২৪) আর এক বিপ্লবী অসিত ভট্টাচার্যকে ফাঁসী দেওয়া হয় ডাকাতী মামলায় ।

২৫) গোয়েন্দা অফিসার, প্রফুল্ল রায়কে হত্যার অভিযোগে বিপ্লবী প্রেমানন্দ দত্তকে ফাঁসীতে ঝোলানো হয় ।

২৬) অতীন্দ্রমোহন রায় জন্ম ১৮৯৬ এ, দীর্ঘ কারাভোগে করেন ।

২৭) রাজেন্দ্র নাথ লাহিড়ী মাত্র ২৬ বছর বয়সে কাকোড়ী ট্রেন ডাকাতি মামলায় ১৯২৭ এর ১৭ই ডিসেম্বর উনার ফাঁসী হয় ।

২৮) অনন্ত হরি মিত্র আলিপুর জেলে ডেপুটি কমিশনারকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগে ১৯২৬ এর ২৮ এ সেপ্টেম্বর উনার ফাঁসী হয় ।

২৯) প্রমোদ রঞ্জন চৌধুরী একই অপরাধে একইদিনে উনার ফাঁসী হয় ।

৩০) সন্তোষ কুমার মিত্র ও তারকেশ্বর সেনগুপ্ত হিজলী বন্দিশালায় ১৯৩১ এর ১৬ আগষ্ট রাতে পুলিশের গুলিতে নিহত হন ।

৩১) নরেন্দ্র সেন, প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী, রবীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, যতীন্দ্র চন্দ্র রায়, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র পাকড়াশী, নিরঞ্জন সেনগুপ্ত স্বাধীনতার আন্দোলনে দীর্ঘদিন কারাবাস করেন ।

অনুশীলন সমিতির বই এবং বাংলার বিপ্লবীদের ইতিহাস থেকে খুঁজে পাওয়া যায় আরো অনেক বরেণ্য যাদের জীবনের বেশ বড় অংশ কারান্তরালে বা জেলে মৃত্যু বা পলাতক অবস্থায় মৃত্যু। সংগৃহীত তথ্য থেকে দেওয়া হলো ।

১) যতীন দাশ লাহোর জেলে ৬৪ দিন আমরণ অনশন করে মৃত্যু বরণ করেন ১৯২৯ সনের ১৩ই সেপ্টেম্বর ।

২) মোহিত মৈত্র - আন্দামানে সেলুলার জেলে অনশনে প্রাণত্যাগ করেন ।

৩) মোহন দাস - আন্দামানে সেলুলার জেলে প্রাণত্যাগ করেন ।

৪) হরেন্দ্র মুন্সী - ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে অনশনে প্রাণ ত্যাগ করেন ।

৫) অনিল কুমার দাস - ঢাকা জেলে মৃত্যু ১৯৩১ সালে ।

৬) মনীশনাথ ব্যানার্জী - ফতেহগড় সেন্ট্রাল জেলে অনশনে মৃত্যু ।

৭) ১৯৩১ এ ১৬ আগষ্ট ১০০ শতজন বন্দী পুলিশের গুলিতে হিজলী বন্দী খানায় গুরুতর আহত হন ।

৮) ফনী ভুষণ নন্দী - জেলে মৃত্যু , বিনা চিকিৎসায় ।

৯) হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য - আন্দামানে জেলে মৃত্যু ।

১০) মোহিত অধীকারী - জেলে মৃত্যু ।

১১) রামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী - জেলে মৃত্যু ।

১২) ধনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য - মেদিনীপুরে আত্মহত্যা ।

১৩) নবজীবন ঘোষ - পলাতক অবস্থায় আত্মহত্যা।

১৪) ইন্দুভুষণ রায় - আন্দামান সেলুলার জেলে আত্মহত্যা ।

১৫) প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তী - ১৯০৭ সনে বোমা তৈরী করার সময় নিহত হন ।

১৬) সুশীল সেন - ১৯০৭ সনে কিংসফোর্ডের নির্দ্দেশে অমানুষিক পেটানো হয় তখন বয়স মাত্র ১৫ বৎসর ।তাহার শব নদীতে খুঁজে পাওয়া যায়নি ।

১৭) নরেন দত্ত - আগ্রা জেলে অত্যাচারে তার মৃত্যু হয় ।

১৮) গোপেশ রায় - পলাতক অবস্থায় মৃত্যু হয় ।

১৯) প্রবোধ ভট্টচার্য - পলাতক অবস্থায় ১৯১৬ সনে ললিতস্বরে ফেরার সময় সাপের কামড়ে মৃত্যু ।

২০) গোপাল সেন - ১৯০৮ সনের ২ রা জুন পুলিশের গুলিতে নিহত হন ।

২১) সত্যেন সরকার - ১৯১৮ সনে পলাতক অবস্থায় মৃত্যু ।

২২) শচীন দাশগুপ্ত - পলাতক অবস্থায় রংপুরে ১৯১৭ সনে আত্মহত্যা করেন ।

২৩) যোগেশ রায় - পলাতক অবস্থায় মৃত্যু ।

২৪) নৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী - পলাতক অবস্থায় কাশীতে আত্মহত্যা করেন ।

২৫) অনুরূপ সেন - পলাতক অবস্থায় ১৯২৬ এ মৃত্যু হয় ।

২৬) শান্তনা গুহ (সাহিত্যিক ) জেলে অত্যাচারে মৃত্যু ।

২৭) সঞ্জীব রায় - ১৯১৫ সনে ময়মনসিং জেলে মৃত্যু ।

২৮) রসিক সরকার - রাজশাহী জেলে নিজের গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করেন ।

২৯) শিশির গুহ রায় - পলাতক অবস্থায় মৃত্যু ।

৩০) বিপিন বিহারী দত্ত - পলাতক অবস্থায় মৃত্যু ।

৩১) অশ্বিনী রায় (আইনজীবি) - পলাতক অবস্থায় মৃত্যু হয় ১৯২৩ সনে ।

৩২) সন্তোষ গাঙ্গুলী - ১৯৩০ সনে দেউলী জেলে গলায় ফাঁসী দিয়ে আত্মহত্যা ।

৩৩) জগদীশ চক্রবর্ত্তী - পলাতক অবস্থায় মৃত্যু ।

৩৪) সাতকড়ি ব্যানার্জি - দেতালি বন্দী নিবাসে মৃত্যু ।

৩৫) ভোলানাথ চ্যাটার্জী - পুনা জেলে আত্মহত্যা করেন ।

৩৬) জিতেন মল্লিক - লক্ষ্ণৌ জেলে মৃত্যু ।

৩৭) সুনীল চক্রবর্ত্তী - রাজশাহী জেলে মৃত্যু ।

৩৮) হর্ষ চ্যাটার্জী -পলাতক অবস্থায় মৃত্যু ।

৩৯) চন্ডী নাগ - পলাতক অবস্থায় মৃত্যু ।

৪০) রেবতী নাগ - পালাতক অবস্থায় মৃত্যু ।

৪১) জিতেন সমাদ্দার - অন্তরীন অবস্থায় মৃত্যু ।

এ যেন মৃত্যুর মিছিল কিন্তু বিপ্লবীরা মাতৃ মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ , একটুকুও বিচলিত ছিলেন না । কারাভ্যন্তরে যারা রয়েছেন হয়তো বা সব নাম সংগ্রহ ও করা যায়নি । আগামীর উদ্দীপনা তৈরী হোক , সুশৃঙ্খল যুব সমাজ তৈরী হোক বাঙালী জাতির ঐতিহ্য ও আদর্শের বলিদান - এর খন্ড খন্ড বাস্তবচিত্রগুলো তাই তুলে ধরার প্রয়াস । সমাজ , জাতি ও দেশকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সংকল্পে যা কেবল যুবক / যুবতীরাই পারে ।

কে , কতদিন , জেলে ছিলেন - (সংগৃহীত তথ্য থেকে )

১) প্রতুল চন্দ্র গাঙ্গুলী - জেলে ২৮ বৎসর , অনশন ৮০ দিন , পলাতক ১৪ মাস ।

২) রমেশচন্দ্র আচার্য - জেলে ২৭ বৎসর , অনশন ২৬ দিন , পলাতক ১০ মাস ।

৩) রবীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত - জেলে ২৭ বৎসর , অনশন ১২০ দিন , ১৮ মাস পলাতক ।

৪) যোগেশচন্দ্র চ্যাটার্জী - জেল ২৪ বৎসর ১২৩ দিন অনশন , ২৮ মাস পলাতক ।

৫) গোবিন্দ কর - জেল ২২ বৎসর ২৪ দিন অনশন ৮০ মাস পলাতক।

৬) তরণী সোম - জেল ২২বৎসর ।

৭) সতীশচন্দ্র পাকড়াশী - জেল ২১ বৎসর , ১৮ দিন অনশন , ২৪ মাস পলাতক ।

৮) মদনমোহন ভৌমিক - জেল ১৬ বৎসর , ২৪ দিন অনশন , ৩৮ মাস পলাতক ।

৯) নরেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত - জেল ১৫ বৎসর , ২২দিন অনশন , ৪২ মাস পলাতক ।

১০) অমৃত হাজরা - জেল ১৫ বৎসর , ৬০ মাস পলাতক ।

১১) চিরঞ্জীব মিত্র - জেল ১৫ বৎসর , ২২দিন অনশন , ১২ মাস পলাতক ।

১২) রবি বসু - জেল ১৫ বৎসর , ১০ দিন অনশন , ১২ মাস পলাতক ।

১৩) পুর্ণানন্দ দাশগুপ্ত - জেল ১৪ বৎসর , ২৪ দিন অনশন ।

১৪) চারু চন্দ্র রায় - জেল ১৪ বৎসর ।

১৫) খগেন্দ্র চৌদুরী - জেল ১৩ বৎসর , ২৪ মাস পলাতক ।

১৬) সুশীল চন্দ্র ঘোষ - জেল ১৩ বৎসর , ১৮ দিন অনশন , ১২ মাস পলাতক ।

১৭) রাখালচন্দ্র ঘোষ - জেল ১৩ বৎসর ।

১৮) হীরেন্দ্র মুজমদার - জেল ১২ বৎসর ২২ দিন অনশন ,

১৯) দুর্গেশ ভট্টাচার্য - জেল ১২ বৎসর , ১২ দিন অনশন , ১৩ মাস পলাতক ।

২০) ধীরেন্দ্র গাঙ্গুলী - জেল ১২ বৎসর ।

২১) সরল সেনগুপ্ত - জেলে ১২ বৎসর ।

২২) মাখন লাল দত্ত - জেল ১২ বৎসর ।

২৩) আশুতোষ দাশগুপ্ত - জেল ১১ বৎসর ।

২৪) বিজয় কৃসণ ব্যানার্জী - জেল ১১ বৎসর , ৭ মাস পলাতক ।

২৫) তারাপদ চক্রবর্ত্তী - জেল ১৬ বৎসর ।

২৬) নলীনিকান্ত ঘোষ - জেল ১০ বৎসর , অনশন ১৪ দিন , পলাতক ৪৬ মাস ।

২৭) নলিনীকিশোর গুহ - জেল ১০ বৎসর ।

২৮) আদিত্য দত্ত - জেল ১০ বৎসর , পলাতক ৩৬ মাস ।

২৯) অধির মুখার্জী - জেল ১০ বৎসর , ২৯ দিন অনশন ।

৩০) সতীশচন্দ্র রায় - জেল ১০ বৎসর ।

৩১) ধনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য - জেল ১০ বৎসর ।

৩২) বিনোদ চক্রবর্ত্তী - জেল ১০ বৎসর ।

৩৩) ভূপতি পাল - জেল ১০ বৎসর ।

৩৪) সুধীর কুশারী - জেল ১০ বৎসর ।
৩৫) ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী - জেল ৩০ বৎসর , ২৬ দিন অনশন , ৬০ মাস পলাতক ।
৩৬) জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র মজুমদার --জেল ২৬ বৎসর ।
৩৭) রমেশচন্দ্র চৌধুরী - জেল ২৫ বৎসর , ৯০ দিন অনশন পলাতক ৩৬ মাস ।
৩৮) অমূল্যচন্দ্র আধিকারী - জেল ২০ বৎসর অনশন ৫০ দিন ।
৩৯) প্রভাতচন্দ্র চক্রবর্ত্তী - জেল ১৭ বৎসর , ২৮ দিন অনশন ।
৪০) যোগেন্দ্র কিশোর ভট্টাচার্য - জেল ১৬ বৎসর , অনশন ৩৪ দিন , পলাতক ৫২ মাস ।
৪১) সতীশচন্দ্র রায় - জেল১৫ বৎসর ।
৪২) নরেশচন্দ্র সোম - জেল ১৫ বৎসর ।
৪৩) পুলিনবিহারী দাস - জেল ১০ বৎসর ।
৪৪) আশুতোষ কাহালী - জেল ২৫ বৎসর , ৭০ দিন অনশন ৯০ মাস পলাতক ।
৪৫) কেদারশ্বর সেনগুপ্ত - জেল ১৫ বৎসর , ৩২ দিন অনশন , ৫ মাস পলাতক ।
৪৬) বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় - জেল ২৪ বৎসর , ৪০ দিন অনশন , ৯৬ মাস পলাতক ।
৪৭) দীনেশচন্দ্র বিশ্বাস - জেল ১৪ বৎসর , ৩২ দিন অনশন , ৪৮ মাস পলাতক ।
৪৮) শচীন্দ্র মোহন কর - জেল ১৩ বৎসর , ১৮ দিন অনশন , ১৫ মাস পলাতক ।
৪৯) জীবন ঠাকুরতা - জেল ১২ বৎসর ।
৫০) যতীন্দ্রনাথ রায় - জেল ২৪ বৎসর , ১২০ দিন অনশন ১৮ মাস পলাতক ।
৫১) দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ - জেল ২১ বৎসর , ২৬ দিন অনশন , ১৬ মাস পলাতক ।
৫২) দেবকুমার ঘোষ - জেল ১৫ বৎসর ।
৫৩) নরেন্দ্রনাথ দাস - জেল ১৪ বৎসর ।
৫৪) তীর্থরঞ্জন চক্রবর্ত্তী - জেল ১২ বৎসর , ৩০ দিন অনশন , ২৪ মাস পলাতক ।
৫৫) তারা গুপ্ত - জেল ১২ বৎসর ।
৫৬) কুমুদ গুহ ঠাকুরতা - জেল ১২ বৎসর ।
৫৭) গোপাল মুখার্জী - জেল ১১ বৎসর ।
৫৮) প্রিয়রঞ্জন দাশগুপ্ত - জেল ১১ বৎসর ।
৫৯) যোগেশ মজুমদার - জেল ১১ বৎসর ।
৬০) নিরঞ্জন সেনগুপ্ত - জেল ১০ বৎসর ।
৬১) নিশিকান্ত পানি - জেল ১০ বৎসর , ৬৪ দিন অনশন , ১২ মাস পলাতক ।
৬২) প্রিয়লাল সরকার - জেল ১০ বৎসর ।

৬৩) ননী সেন - জেল ১০ বৎসর ।

৬৪) দিলীপ দত্ত - জেল ১০ বৎসর ।

৬৫) নলীনি দাশগুপ্ত - জেল ১০ বৎসর ।

৬৬) রমেশচন্দ্র ব্যানার্জী - জেল ১০ বৎসর ।

৬৭) অতীশ মোহন রায় - জেল ২৪ বৎসর , ৩৫ দিন অনশন , ১৮ মাস পলাতক ।

৬৮) অমূল্য মুখার্জী - জেল ১৫ বৎসর , ২০ দিন অনশন ।

৬৯) মনীন্দ্র চক্রবর্ত্তী - জেল ১৫ বৎসর , ১৮ দিন অনশন ।

৭০) যোগেশ চক্রবর্ত্তী - জেল ১২ বৎসর ১৮ দিন অনশন ।

৭১) নিকুঞ্জ পাল - জেল ১৪ বৎসর , ৪৮ মাস পলাতক ।

৭২) সুরেশচন্দ্র ভরদ্বাজ -জেলে ১২ বৎসর ।

৭৩) মথুর চক্রবর্ত্তী - জেল ১০ বৎসর , ১২ মাস পলাতক ।

৭৪ ) অতুলচন্দ্র দত্ত মজুমদার - জেল ১০ বৎসর , ২৪ মাস পলাতক ।

৭৫) সতীশচন্দ্র সিংহ - জেল ১০ বৎসর ।

৭৬) প্রফুল্ল কুমার সেন - জেল ১৫ বৎসর , অনশন ৫১ দিন , পলাতক ৪৮ মাস ।

৭৭) সুরেন্দ্র কুমার রায় - জেল ১৪ বৎসর ।

৭৮) মনীন্দ্র কুমার সেনগুপ্ত - জেল ১১ বৎসর , ১৮ মাস পলাতক ।

৭৯) নিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী - জেল ১০ বৎসর ১৪ দিন অনশন ।

তাছাড়াও বাকীদের নাম যারা কারান্তরালে দীর্ঘদিন অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করেছেন যেমন , পুলিন গুপ্ত , অনন্ত দে , পুলিন পাল , ক্ষেত্রমোহন সিংহ , ভগবান দাস , কালীপ্রসন্ন মুজমদার , অনন্ত সরকার , শশী মজুমদার , শান্তি সিংহবায় , শচীন্দ্র কায়েত , কুমুদ নাগ , জিতেন ভট্টাচার্য , প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তী , অতুল দত্ত , মাখন দত্ত , যামিনীকান্ত পাল , উপেন্দ্র চৌধুরী , অমূল্য দত্ত , নিতীশ ভৌমিক, নীহার রায় , মণি দাশগুপ্ত , দীনেশচন্দ্র ঘটক , বিশ্ব সেন, রমেশ ঘোষ , বিনোদ গোপ , রবি ভট্টাচার্য, প্রিয়নাথ ব্যানার্জী (আইনজীবি ) ,সুকুমার ভৌমিক, বীরে ন দত্ত ,তেজেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত , নীরোদ বরণ সেনগুপ্ত , দেবপ্রদাস সেনগুপ্ত , সুখময় সেনগুপ্ত , শচীন্দ্রলাল সিং ,প্রভাত রায় , চারু বিকাশ দত্ত, প্রতাপ চন্দ্র রক্ষিত , যশোদা চক্রবর্ত্তী , শ্যামাচরণ বিশ্বাস , মোক্ষদা চক্রবর্ত্তী , প্রিয়দা চক্রবর্ত্তী , মনমোহন সাহা , গিরিজা শঙ্কর চৌধুরী , মহেশ বরুয়া , কেদারেশ্বর ভট্টাচার্য মোহিনীমোহন , মহেন্দ্র মুজমদার , সুধাংশু দাস , প্রবীন দাস , ব্রজেন দাস , নরেন্দ্রবিজয় চৌধুরী , ক্ষেত্র সেন অনুকুল চক্রবর্ত্তী, উমেশ চক্রবর্ত্তী , সুবীর সিংহ রায় ,হৃষীকেশ দাশগুপ্ত , প্রতুল চৌধুরী , যোগেশ মজুমদার , শান্তিময় দত্ত , মাখন পাল , স্নেহময় দত্ত , গিরিজা দত্ত , প্রফুল্ল রায় ,প্রীতিরঞ্জন পুরকায়স্থ , সুরেশ দেব ,

প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী , সুধাংশু চৌধুরী , জিতেন লাহিড়ী , কালী মৈত্র , ক্ষিতিশ দেব , বীরেন সরকার , অমিয় সান্যাল , কেদার নাথ সিংহ , সুরেণ রায় , রাধারমন ভট্টাচার্য , অমলেন্দু বাগচী , সত্যব্রত চক্রবর্ত্তী , নরেন্দ্র কিশোর ভট্টাচার্য , মহেন্দ্র দাস , বিভুতিভূষণ লাহাড়ি  অনাথবন্ধু ঘোষ , দেবেন্দ্র দাস , বঙ্কিমচন্দ্র রায় , অমূল্য লাহিড়ী , সুধীর মজুমদার , মনীন্দ্র লাড়ী , অনাথ লাহাড়ী , অনাথ , সুধিন্দ্র সরকার , নরেন্দ্র ভট্টাচার্য , শহীদ রাজেন্দ্র লাহিড়ী , প্রতাপচন্দ্র মজুমদার , সুবোধ লাহিড়ী , সতীশ সরকার , সুশীলচন্দ্র দেব , পরেশ চন্দ্র গুহ , শহীদ নলীনি বাগচী , প্রবোধ চন্দ্র বিশ্বাস , প্রফুল্ল বিশ্বাস , ধীরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী , ত্রিদিব চৌধুরী , মিহির মুখার্জী সুকুমার রায় চৌধুরী , নিরু সেনগুপ্ত, অনন্ত ভট্টাচার্য , গৌরী প্রসাদ সেন , তারাপদ গুপ্ত , প্রফুল্ল গুপ্ত ননী ভট্টাচার্য সন্দিপ , নীরদ সরকার, নির্মলেন্দু বাগচী , অরবিন্দ ভট্টাচার্য্য , বিশ্বমোহন সান্যাল , যতীন দাস , সুশীল ব্যানার্জী , কিরণ দাস মন্মথ গাঙ্গুলী, ধীরেন্দ্র নাথ মুখার্জী , হেম দাশগুপ্ত ( সুপারিনটেনডেট যাদব পুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ) , অনাদি সেন (বিশিষ্ট্য ব্যবসায়ী , ডাক্তার সতীশ সেন , জিতেন চক্রবর্ত্তী , রামবিহারী পাল, মধুসুধন রায় , দীনেশ বিশ্বাস , সুমতি মজুমদার , সারদা ভট্টাচার্য, কেদারনাথ ভট্টাচার্য , নরেন দাস প্রফুল্ল সেন , অনাথ চক্রবর্ত্তী , হৃষী দেব শর্মা , ডাক্তার রমেশ ঘোষ , ডাঃ বিনয় সেন , নরেন ঘোষ , সঞ্জীব মুখার্জী , নবীন দাশ , প্রফুল্ল কুমার ভট্টশলী , ডাক্তার গজেন ঘোষ , হীরালাল দে ।

বাঙালী নারীরাও স্বাধীনতা আন্দোলনে পিছপা ছিলেন না , মাতৃমুক্তির বৈপ্লবিক আন্দোলনে তারাও আত্মহুতি দেন কারা বরণ করেণ যেমন লীলা রায় , রেনু সেন , শৈল সেন , কল্যানী দেবী , শান্তিসুধা ঘোষ , কমলা চ্যাটার্জী , কমলা দাশগুপ্তা , লাবণ্য প্রভা দাশগুপ্তা , উষা মুখার্জী , সুনীতি দেবী , সরযু চৌধুরী , বিমল ,প্রতিভা দেবী , ইন্দুসুধা ঘোষ , প্রফুল্ল নলিনী ব্রহ্ম, আশা দাশগুপ্তা , অরুণা সান্ন্যাল , সুষমা দাশগুপ্তা , সুপ্রভা ভদ্র , শান্তিকনা সেনগুপ্তা, মমতা মুখার্জী , হাস্যবালা দেবী , সরোজ নাগ , পারুল মুখার্জী , উষা মুখার্জী , সৌদামনী দেবী , নির্মলা আর্তনী , নিরুপমা আচার্য , শুবর্ণপ্রভা দত্ত , শান্তি দাশ , সুনীতি চৌধুরী , বীনা দাস ।

ভারতবর্ষের বাহিরে থেকেও বাঙালী অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি স্বাধীনতার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

১) ডাক্তার ভুপেশনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ) (২) তারক নাথ দাস , (৩) বীরেন্দ্র চট্রোপাধ্যায় (৪) হেরম্বলাল গুপ্ত (৫) ধীরেন্দ্র নাথ সরকার (অধ্যাপক বিনয় সরকারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ) ৬) অনিবাশ ভট্টাচার্য (৭) নরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য (৮) শিবপ্রসাদ গুপ্ত (৯) খগেন্দ্র চন্দ্র দাস (১০) বীরেন দাশগুপ্ত (১১) রাসবিহারী বসু (১২) ধনগোপাল মুখার্জী (১৩) শৈলেন ঘোষ (১৪) অবনী মুখার্জী (১৫) চন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী (১৬) হেমেন্দ্র রক্ষিত (১৭) সুরেন কর (১৮) নলিনী গুপ্ত (১৯) ডাঃ সুধীন্দ্র বসু (২০) বাসুদেব ভট্টাচার্য (২১) সত্যেন সেন (২২) জীতেন্দ্রনাথ লাহিড়ী (২৩) ডাঃ জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র দাশগুপ্ত , (২৪) অধ্যাপক শ্রীশ চন্দ্র সেন , (২৫) সতীশ চন্দ্র রায় ।

বহুগুন , বহু মেধা নেমে পড়েছিল , মাতৃমুক্তির আন্দোলনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে , যেমন ১) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ (ব্যারিষ্টার ) ২) ব্যারিষ্টার বি.সি . চ্যাটার্জী , ৩) ব্যারিষ্টার যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত (৪) বীরেন্দ্রনাথ দত্ত - ব্যারিষ্টার (৫) শরৎ চন্দ্র বসু - ব্যারিষ্টার (৬) কিরণশঙ্কর রায় - ব্যারিষ্টার (৭) নিশীথ চন্দ্র সেন - ব্যারিষ্টার (৮) সুরেন্দ্রনাথ হালদার - ব্যারিষ্টার (৯) ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় (১০) প্রফেসার নৃপেন্দ্র চন্দ্র ব্যানার্জী (১১) ডাঃ হেমেন্দ্র দাশগুপ্ত , (১২) বিজ্ঞনী ডঃ মেঘনাদ সাহা , (১৩) বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্র নাথ বসু (১৪) বিজ্ঞানী আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় (১৫) ডঃ ত্রিগুনা সেন (১৬) ডঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ ।

আরো অনেকে , অনেকের নামই লিখা হয়নি যাদের অনেকেই জীবনের বেশীরভাগ সময় জেলের অভ্যন্তরে কাটান এবং অনেকে আত্মহুতি দেন বা অনেকে ব্রিটিশ বাহিনীর হাতে জীবন বিসর্জন দেন । মাতৃভূমির ডাকে বহু ভারতীয় সৈন্য ব্রিটিশ অনুগত বাহিনীর হাতে প্রাণ ত্যাগ করেন, বিচারের নামে প্রহসন করে বহু সৈন্যকে (ভারতীয় )গুলী করে হত্যা করা হয় । বহু সৈন্যের জীবন জেলের ভেতরে কাটে , বাঙালীর জাতির মধ্যেই সেদিন জন্ম হয়েছিল সুভাষ চন্দ্র বোসের মত তেজস্বী পুরুষরা তেমনি পারুল মুখার্জী , প্রতিলতা ওয়াদ্দেদারের মত দুর্ধর্ষ সাহসিনী , তাদের ভুলে গেলে আমি মনে করি জাতির প্রতি অবমাননা করা ।

বাঙালীরা অভিমানী , ভাব প্রবণ তবে নিঃসন্দেহে প্রতিবাদী হয়ত বা পৃথিবীর আর কোনও জাতি সত্বার মতো নয় । মনে হয় বাঙালীদের সংস্কৃতি , চালচলন সব কিছুই যেন একটু আলাদা । যদিও এই বিষয়ে অনেক আলোচনা , পর্যালোচনা হয়েছে গবেষণা হয়েছে তাই ঐতিহাসিক ঘটনা ও ইতিহাসের তথ্য ঘেঁটে দেখা দরকার সত্যিই কি বাঙালীরা প্রতিবাদী বাঙালিদের আত্ম প্রকাশ , বন্ধ , পতন, অভ্যুদয় , কর্ম , চিন্তা , অজস্র আন্দোলন সংঘাত যে পথ কখনো মসৃণ ছিল না । ইতিহাস তার যুগ যুগান্তরের স্বাক্ষী । প্রথম সামাজিক বিপ্লব সম্ভবত শুরু হয় শ্রী চৈতন্য ও নিত্যানন্দ যখন দলিত জন সাধারণের বিদ্রোহকে সামাজিক বিপ্লবে রূপ দিয়েছিলেন তারপর শুরু করা যাক শিক্ষার উৎকৃষ্ট সেই রামকৃষ্ণ মিশন দিয়ে । উনবিংশ শতাব্দীতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারার সমন্বয়ের মাধ্যমে যে ধর্মীয় ও সমাজ সংস্কার আন্দোলন শুরু হয় রামকৃষ্ণ মিশন তাতে এক অগ্রনী ভূমিকা পালন করেছিল। " রামকৃষ্ণ মিশন " পরমহংসদেবের নামানুসারেই হয়েছিল । পরম পুরুষ দক্ষিণেশ্বরের কালী বাড়ির একজন পূজারী ছিলেন মাত্র । শিক্ষা বলতে প্রচলিত অর্থে যা বুঝায় তা কিন্তু উনার ছিল না। তবুও তিনি ছিলেন মহাজ্ঞানী , পুরুষ । তিনি বলতেন যে , সকল ধর্মে একই ঈশ্বরের কথা বলা হয়েছে । হিন্দু - মুসলমান বৌদ্ধ, খ্রীস্টান , সকল ধর্মের লক্ষ্য একই । ১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দে কোলকাতার বাগবাজার অঞ্চলে " রামকৃষ্ণ মিশন "সূত্রপাত হয়। যদিও পরে তা বেলুড়ে স্থানান্তরিত হয় । নরেন্দ্র নাথ দত্ত সন্ন্যাস জীবনে " স্বামী বিবেকানন্দ " নামে পরিচিত তিনিই ছিলেন রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের একজন

প্রধান শিষ্য । বিবেকানন্দ গতানুগতিকার বিরোধী হলেও ভারতের শ্বাশত আত্মাকে কোনো সময়ই অস্বীকার করেন নাই । নিষ্ঠা ও সংস্কৃতির সাহায্য নবীন জীবন গড়িয়া তোলাই ছিল তার উদ্দেশ্য । তিনি বুঝতে পেরেছিলেন আমাদের দাঁড়াতে হইলে শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে । সেই শক্তি হলো দৈহিক , মানষিক ও আধ্যাত্মিক যা পরবর্তী কালে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের শ্রীমতি অ্যানি বেশান্তও অকপটে স্বীকার করে গেছেন । তার পরে আমরা আসি রাজা রামমোহন রায় সম্পর্কে , রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাজা রাম মোহন রায় সম্পর্কে বলেছিলেন বহুযুগ ব্যাপী অন্ধতার দিনে বেশ যখন নিশ্চল তাকেই পবিত্রতা বলে স্থির করে নিস্তব্দ ছিল এমন সময়েই রাম মোহনের আর্বিভাব । অশিক্ষা , অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার গ্রস্ত সমাজ ব্যবস্থাকে যখন আমরা নির্বিবাদে মানিয়া লইয়াছিলাম তখন অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থা থেকে মুক্তির নির্মল বাতাস সঞ্চারিত করিয়া ছিলেন , রামমোহন ভারতের সর্ব প্রথম আধুনিক মানুষ যিনি শত শত বৎসরের বিকৃত সমাজ ব্যবস্থা ও সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান এবং আমাদের নূতন দিগন্তের সূচনা করেন । কুসংস্কার ও জাতিভেদ রোধে তিনিই যুক্তি নির্ভর বিজ্ঞানমিশ্রিত আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজনের কথা তুলে ধরেন । ইহা অনস্বীকার্য যে আধুনিক পাশ্চত্য শিক্ষার সংস্পর্শে আসিয়াই আমাদের জড়তা মুক্তি ঘটিয়ে ছিল শুধু তাই নয় জাতিভেদ প্রথা দুরীকরণ এবং বিদেশীরা কিভাবে আমাদের সম্পদ ও কৃষকদের শোষণ করিতেছে তা প্রথম রাম মোহন রচনায় বিস্তারিতভাবে প্রকাশিত হয় । ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে রাজা রাম মোহন রায় বাংলা সাহিত্যে গুরু গম্ভীর বিষয় আলোচনা করিয়া বাংলা ভাষার মর্যদাকে যথেষ্ঠ পরিমাণে বল বৃদ্ধি করিয়াছিলেন । ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের রচিত " বেতাল পঞ্চবিংশতি " বাংলা গদ্যের ক্ষেত্রে গযুান্তকারী বলা চলে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যকার পর্যন্ত বাংলার আর্বিভূত সে সকল সাহিত্যিক বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধি শালী করিয়া তুলিয়াছিলেন তাদের মধ্যে টেকচাঁদ ঠাকুর ওরফে প্যারিচাঁদ মিত্র , কালী প্রসন্ন সিংহ , অক্ষয় কুমার দত্ত প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য । বঙ্কিমচন্দ্র চট্রোপাধ্যায় ছিলেন বাংলার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস রচয়িতা । বঙ্কিম চন্দ্রের পরবর্তী কালে তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় , রমেশ চন্দ্র প্রমুখ উপন্যাসিক বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতি ঘটিয়ে ছিলেন । কাব্য রচনার ক্ষেত্রে যারা বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধশালী করেছিলেন তাদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত , মাইকেল মধুসূধন দত্ত , রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায় , নবীন চন্দ্র সেন প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। বাংলার প্রথম উল্লেখযোগ্য নাট্যকার ছিলেন রাম নারায়ন তর্করত্ন । তাছাড়া বাস্তব ঘটনা অবলম্বণে দীনবন্ধু মিত্রের রচিত " নীল দর্পন " নাট্য সাহিত্যে অমূল্য সম্পদ বলিয়া আজো বিবেচিত হইয়া থাকে । শুধু তাই নয় দেশীয় সাহিত্য অমূল্য সম্পদ বলিয়া আজো বিবেচিত হইয়া থাকে । শুধু তাই নয় দেশীয় ভাষার মধ্যে বাংলার প্রথম সংবাদ পত্র প্রকাশিত হয় । ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় সর্বপ্রথম " বেঙ্গল গেজেট " নামে বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় । দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদ পত্রে রাম মোহন রায়ের অবদান অনস্বীকার্য । তিনি প্রথম " সংবাদ কৌমুদী " নামে একটি

বাংলা পত্রিকার সম্পাদনা করেন । ১৮২১ খ্রীঃ এবং প্রবন্ধ আকারে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে পত্রিকায় লিখে সমালোচনা ও প্রতিবাদ করতে শুরু করেন । ইহা ছাড়াও রামমোহন ইংরেজী হিন্দী এবং পার্শী ভাষায় তিন খানি সপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদনা করতেন । ১৮২২ খ্রীঃ রামমোহন রায় , দ্বারকানাথ ঠাকুর ও কয়েকজন মিলে " বঙ্গদূত " নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন । সংবাদ পত্রের উত্তরোত্তর বৃদ্ধিতে " জান্ডাস " উক্তি করেছিলেন " লাইসেন্স বিহীন সংবাদ পত্রগুলি যদি যথেচ্ছভাবে প্রচার করিতে দেওয়া হয় তা হইলে ইংরেজ সরকারের ভিত্তি দুর্বল হইয়া পড়িবে " রামমোহন রায়, হিন্দু কলেজ বা ইয়ং বেঙ্গলের নেতৃত্বে আন্দোলন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে গঠিত কোন সভা সমিতি মাধ্যমে শুরু হয় নাই । বাঙালী রাজনৈতিক আন্দোলন কারিগণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে স্থায় সভা সমিতি ঘটনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন । ১৮৩৭ খ্রীঃ দ্বারকানাথ ঠাকুর , কালীনাথ রায় প্রমুখ ব্যক্তিত্ব " বঙ্গভাষণ প্রকাশিত সভা" নামে একটি সমিতি গঠন করেন । ইহাই বাংলা তথা সমগ্র ভারতের প্রথম রাজনৈতিক সংঘ হিসাবে বিবেচিত হইয়া থাকে ।

১৮৩৪ খ্রীঃ ভারত হিতৈষী টমসন সাহেব দ্বারকানাথ ঠাকুরের অনুরোধে কলিকাতায় আসেন । তাহার সহযোগীতায় কতিপয় বাঙালী চিন্তাশীল ব্যক্তি ইংরেজ শোষণের দোষ ত্রুটির প্রতিকার এবং ভারতীয়দের অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য " বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন । এই সমিতি ভারতবাসীর সমস্যা সম্পর্কে ইংল্যন্ডে ব্যাপক প্রচার শুরু করেছিল । ১৮৭৬ খ্রীঃ সুরেন্দ্র বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তির উৎসাহে কলিকাতার " ভারত সভা " নামে একটি শক্তিশালী সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যার উদ্দেশ্য ছিল দেশে রাজনৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করা , হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রীভাব বৃদ্ধি করা এবং এই আন্দোলনে সমস্ত জনসাধারণকে সামিল করা । ১৮৪৭ খ্রীঃ প্যারীচরণ সরকার , কালীকৃষ্ণ মিত্র প্রমুখ সভ্রান্ত ব্যক্তির উদ্যোগে কলিকাতার সন্নিকটে বারাসতেই প্রথম প্রকাশ্য বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭৩ খ্রীঃ ব্রিটিশ অধিকৃত ভারতে বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১৬৪০ বালকদের জন্য প্রাথমিক স্কুল ২৬৪৭৩ টি । পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি বাঙালী মনকেই প্রথম আলোড়িত করিয়াছিল । পাশ্চাত্য শিক্ষা - দীক্ষার , সংস্কৃতি ও ভাবাদর্শের সংঘাত বাঙালীর মনে যে নবজাগরণের সূচনা হয় তাহা সমসাময়িক সমাজ ধর্ম ও রাজনীতিকেবিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল । রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালীর জীবনে চৈতন্যের বিস্ফোরণ ঘটিয়াছিল তাহা তদানীন্তন সাহিত্যে প্রতিফলিত হইয়াছিল । ইংরেজ শাসনের প্রতি আস্থা হারাইয়া সমাজ নেতা , দেশ নেতা , কবি সাহিত্যিক , নাট্যকার সকলেই একযোগে শ্বেতাঙ্গদের বর্বরতার বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইয়াছিল । বঙ্কিমচন্দ্র ,রঙ্গলাল , তারকনাথ , নবীন চন্দ্র , অক্ষর কুমার , কামিনী রায় , দীনবন্ধু , প্রমুখের দেশ বাৎসল্য ও বিদেশী আপশাসনের বিরুদ্ধে তাহাদের প্রতিবাদ , সর্বত্র এক নতুন স্পন্দনের সৃস্টি করিয়াছিল ।

বঙ্গ ভাষায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচনাতেই সর্ব প্রথম স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি প্রগাঢ় মমত্ব বোধের পরিচয় পাওয়া যায় । পরাধীন ভারতের দুর্দশায় কবি মর্মাহিত হইয়া ছিলেন । ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাহার স্বদেশ ভাবনা মুলক কবি । তার মাধ্যমে দেশবাসীর অন্তরে পরাধীনতার বেদনা ও স্বাধীনতার বেদনা ও স্বাধীনতার মর্ম বাণী জাগাইয়া তুলিয়াছিল । এবং ভারত সন্তানদিগকে স্বদেশ সেবার আত্ম নিয়োগ করিবার আহ্বান জানাইয়া ছিলেন । অল্প কথায় , ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, গভীর দেশাত্মবোদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া এবং দেশ ও জাতির উন্নতি কামনা করিয়াই তাহার লেখনী পরিচালনা করিয়াছিল । ঈহুরচন্দ্র গুপ্তের পরবর্তী কালে যে সকল কবি ও সাহিত্যিক তাহাদের রচনায় মাধ্যমে দেশবাসীর অন্তরে স্বদেশিকতা ও দেশ বাৎসল্য জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টপাধ্যায় , দীনবন্ধু মিত্র , রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায় , মনমোহন বসু প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । বঙ্কিমচন্দ্রের মনে দেশ প্রেমের বীজ উপ্ত হইয়াছিল ঈশ্বর গু প্তের দেশ প্রেমমুলক রচনা হইতে বঙ্কিম প্রতিভার প্রধান উৎস ছিল দেশাত্মবোধ স্বাধীনতা , অপহরণকারী ইংরেজদের নিকট হইতে মাতৃভূমিকে স্বাধীন করিতে হইলে বিরূপ অনুশীলনের প্রয়োজন । বঙ্কিম চন্দ্র তাহাই " আনন্দ মঠ" সঙ্গীত এই উপন্যাসের অন্তভুর্ক্ত । ভারবাসীর অন্তরে দেশ মাতৃকার মাতৃমুক্তিটি সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে " আনন্দমঠে" দেশদ্ধার ব্রতী 'সন্তান' ভবানন্দের মুখে উচ্চারিত হইয়াছিল । আমরা অন্য মা মানি না - জননী জন্ম ভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী । আমরা বলি , " জন্মভূমিই জননী " । আনন্দমঠ উপন্যাসের রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র কতখানি স্বদেশ প্রীতির দ্বারা অনুপ্রানিত হইয়া ছিলেন উহা তাহার একটি মন্তব্য হইতে বুঝিতে পারা যায়। কবি হেমচন্দ্রের উদ্দেশ্যে লিখিত এক পত্রে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন যদি সাহিত্যের দ্বারা এদেশের মঙ্গল সাধন করা যায় না মনে করিতাম , তাহা হইলে আমি আনন্দমঠ লিখিতাম না । আমার বিশ্বাস , আমার আনন্দমঠে দেশের একদিন উপকার হইবে। বঙ্কিমচন্দ্রের এই ভবিষ্যবানী মিথ্যা হয় নাই । আনন্দমঠ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মধ্যে বিপুল অনুপ্রেরণা জাগাইয়া ছিল । আনন্দমঠ ব্যতীত " দেবী চৌধুরাণী " সীতারাম প্রভৃতি গ্রন্থেও বঙ্কিমচন্দ্রের দেশ ভক্তির আদর্শ প্রতিফলিত হইয়াছিল ।

পরাধীনতার জ্বালা অনুভব করিয়া রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায় দেশবাসীর মধ্যে দেশ প্রেম সঞ্চারিত করিবার উদ্দেশেই লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন সমসাময়িক বাংলায় এমন কোন পাঠক ছিলেন না যিনি তাহার কবিতার দ্বারা অনুপ্ররিত হন নাই। ঐতিহাসিক আখ্যান অবলম্বনে তাহার রচিত চারিটি কাব্য পদ্মিনী উপাখ্যান , কর্মদেবী , সুর সুন্দরী এবং কাঞ্চিকাবেরী স্বদেশানুরাগ ও জাতীয়তাবাদী আদর্শে পরিপূর্ণ । রঙ্গলালের দেশাত্মবোধ সম্পর্কিত একটি গান ক্লাসিক পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে । " স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে কে বাঁচিতে চায় " তাছাড়া তিনি উৎকল দর্পন সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা করেন।

পরাধীনতা তথা দাসত্বের বিরুদ্ধে মাইকেল মধুসূধন দত্ত যে বিদ্রোহের মনোভাব পোষণ করিতেন তাহাই " মেঘনাদ বধ" কাব্যের রচনায় চরিত্রে প্রতিফলিত হইয়াছিল । মেঘনাথ বধ কাব্যের রাবন ও মেঘনাধ ছিল যথাক্রমে শক্ত ও বনজাগ্রত জাতীয়তা বোধের প্রতীক । রাবনের মুখে দেশের প্রতি আত্মত্যাগের যে আদর্শ বর্ণিত হইয়াছে তাহা পরাধীন ভারতবাসীর দীক্ষামন্ত্র ছিল । জন্মভূমি রক্ষায় যে ভয়ে মরিতে, ভীরু সে মূর্খ, শতাধিক ভাবে ............ ।" অল্প বয়স হইতেই হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় পরাধীনতার জ্বালা মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছিলেন । পরিণত বয়সে তিনি স্বদেশ প্রীতি মূলক কবিতা রচনার মাধ্যমে দেশবাসীকে জাতীয়তাবোধে উদ্‌বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন । হেমচন্দ্রের " ভারত সঙ্গীত ও ভারত বিলাপ" কবিতাদ্বয় এবং " বীরবাহু কাব্যে " দেশের প্রেমের উচ্ছাস পূর্ণ উত্তেজনার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় । " ইলবার্ট বিল " উপলক্ষে আন্দোলনের সময়ে তাহার রচিত বঙ্গ কবিতা " নেভার নেভার " খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল ।

সাহিত্য সাধনার দ্বারা যে সকল কবি সাহিত্যেক দেশবাসীর মনে স্বদেশ প্রেমের উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে নবীন চন্দ্র সেন বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছেন । সর্ব প্রকার অন্যায় অবিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা এবং এই অত্যাচার হইতে দেশবাসীকে মুক্ত করাই ছিল নবীন চন্দ্রের সাহিত্য সাধনার একমাত্র উদ্দেশ্য, পরাধীনতার জ্বালায় জর্জরিত, ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ভারতকে ঐক্যের মহা বন্ধনে বাধিবার আশায় তিনি তাহার " কুরুক্ষেত্র " মহাকাব্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতিত " পলাশীর যুদ্ধ " রঙ্গমতী প্রভৃতি জাতীয়তা মূলক কাব্য ছিল নবীন চন্দ্রের অনবদ্য সৃষ্টি।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে অপর দুই জন ব্যক্তি যাহার স্বদেশ প্রীতি মূলক রচনার মাধ্যমে প্রাতঃ স্মরণীয় হইয়া আছেন তাহাদের নাম রমেশ চন্দ্র দত্ত ও ঈশান চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় । বঙ্কিমচন্দ্রের অনুপ্রেরণায় রমেশ চন্দ্র দত্ত" রাজপুত জীবন প্রভাত " ও রাজপুত জীবন সন্ধ্যা " নামক যে দুটি স্বদেশ প্রতি মূলক ঐতিহাসিক উপন্যাস বাংলা, সাহিত্যে উপহার দিয়াছেন তাহা নিঃসন্দেহে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । উপরিউক্ত দুইটি উপন্যাসের প্রথমটি একটি নিদ্রিত জাতিকে জাগাইয়া রাখবার গানে মুখর । কবিতা রচনা করিয়াছিলেন । মধুসূধনের পরবর্তী কালে নাট্যকার দীনবন্দু মিত্রের নাম উল্লেখযোগ্য । " নীল দর্পন " নাটকে দিন বন্ধুর নাট্য প্রতিভার স্ফুরণ না ঘটিলেও ইহাতে উৎপীড়িত অসহায় এক শ্রেণীর বাঙালীর প্রতি যে মর্মবেদনা ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা এই নাকটটিকে অমরত্ব দান করিয়াছে । তাছাড়া বাংলাদেশের ইংরেজ চরিত্রের প্রতি সর্বপ্রথম সর্বদলীয় ঘৃণা বিদ্বেষ সঞ্চারিত হইয়াছিল এই নাটকাভিনয় । স্বাদেশিক গণ আন্দোলনের ভিত্তি ভূমি ও ছিল এই নাটক : উনিশ শতকের শেষভাগে দীনবন্ধু মিত্র ব্যতীত অপর যে সকল ব্যক্তি নাট্যকার হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে জ্যোতিন্দ্র নাথ ঠাকুর, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রাজকৃষ্ণ রায়, অমৃতলাল বসু ক্ষীরোদ প্রসাদ, বিদ্যা বিনোদ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। " চৈত্র " বা হিন্দুমেলার অধিবেশনে সত্যেন্দ্রনাথ

ঠাকুরের রচিত " গাও ভারতের জয় " যে জাতীয় সঙ্গীতটি গাওয়া হত ভারতের রাষ্ট্রীয় মুক্তির ইতিহাসে তাহার স্থান সুনির্দিষ্ট । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ১৮৬৭ সালে হিন্দু মেলার সূচনা হয় । হিন্দুমেলার উদ্যোক্তাদের মধ্যে গনেন্দ্রনাথ ঠাকুর , নবগোপাল মিত্র, সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । বাংলার কবি সাহিত্যিক ও নাট্যকার গণ ভারত মাতার অশ্রুজল নিবারণে দেশবাসীকে যখন আহ্বান জানাইতে ছিলেন সেই সময়ে জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হয় (১৮৮৫ খ্রীঃ ) । কংগ্রেসের কর্মকর্তাগণ কবি সাহিত্যিকদের তেমন ধার না ধারিলেও তাহারা কংগ্রেসকে সহানুভুতির দৃষ্টিতে দেখিতেন । সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর যে জাতীয় মিলন সঙ্গীতের সূচনা করিয়াছিলেন পরবর্তী কালে উহার প্রসার ঘটিয়াছিল । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বাদেশিকতার আবহাওয়াতেই বর্ধিত হইয়াছিলেন । হিন্দু মেলা অনুষ্ঠানে একটি জোরালো স্বদেশী কবিতা পাঠ করিয়াছিলেন । পরবর্তীকালে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনের সহিত রবীন্দ্রনাথের মনের মিল ঘটিয়াছিল , কারণ উহার মাধ্যমে তিনি সমগ্র জাতির উত্থানের ইঙ্গিত পাইয়াছিলেন । ১৯০৪ সালে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক প্রদত্ত " স্বদেশী সমাজ " বক্তৃতা সমসাময়িক সমাজ ও রাজনৈতিক মহলে বিশেষ চাঞ্চল্য ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করিয়াছিল।

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে বঙ্গ সাহিত্যে যে স্বাদেশিকতার বন্যা লক্ষ্য করা যায় , তা অতুলনীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ , রজনী কান্ত সেন , কালী প্রসন্ন , অতুল প্রসাদ সেন, সত্যেন্দ্র নাথ দত্ত প্রমুখের আবেগময়ী গান ও কবিতা ব্যাতীত এমন সাহিত্যিক বোধ হয় খুব কমই ছিলেন যাহারা দেশ ও স্বজাতির জন্য অন্তত দুই ছত্র লিখেন নাই । স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে রবীন্দ্রনাথ বিরচিত " আমার সোনার বাংলা " " আজি বাংলা দেশের হৃদয় হতে কখন আপনি " সঙ্গীত সমুহ বাংলার আপামর মানুষের মনে উন্মাদনার সৃষ্টি করিত ।

স্বদেশী আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের অবদান নানা দিক দিয়া অসামান্য । সভা সমিতিতে বক্তৃতা , সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ , কবিতা , গল্প প্রভৃতির মাধ্যমে তিনি যে উদ্দীপনার সৃস্টি করিয়াছিলেন তাহা আমাদের জাতীয় জীবনে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে । তাহার ছাপ স্বদেশী যুগে তাহার রচিত দেশ প্রেম মূলক সঙ্গীত তাহার গভীর দেশ প্রেম এবং জাতীয় আন্দোলনে আত্মোৎসর্গেরই অভিব্যাক্তি । সেই সময় বাংলা দেশের সবর্ত্র জনসভা হাটে, মাঠে , ঘাটে রবীন্দ্রনাথের ঐ সকল সংগীত গাওয়া হইত । ইংরেজ সরকারের নৃশংস অত্যাচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে ও রবীন্দ্রনাথের লেখনী মুখরিত ছিল। জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংশ হত্যাকান্ডের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথই সর্ব প্রথম প্রতিবাদ জানাইয়াছিলেন । বড় লাটের নিকট লিখিত এক পত্রে তিনি জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ড ও পাঞ্জাবে সামরিক আইন জারির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং সরকার কর্তৃক প্রদত্ত " স্যার " উপাধি ত্যাগ করেন । এই পত্রে কবির লেখনী হইতে যে তেজময়ী প্রতিবাদ নিঃসৃত হইয়াছিল , তাহার তুলনা নাই ।

রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী যুগে অমর কথা শিল্পি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বঞ্চিতের মর্মবেদনা এবং নারী হৃদয়ের জটিল সমস্যার আলেখ্য রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন । তাহার রচিত ' পত্রের দাবীতে ' বিদেশী অপশাসনের বিরুদ্ধে সে প্রতিবাদ উত্থিত হইয়াছিল তাহা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মধ্যে প্রচন্ড উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করিয়াছিল । ইংরেজ সরকার রাজদ্রোহমূলক প্রচারের অজুহাতে তাহাকে নিষিদ্ধ গ্রন্থ বলিয়া ঘোষনা করিয়াছিল ।

কলিকাতার জোড়াসাকোর ঠাকুর বাড়ী দ্বারকানাথের প্রপৌত্র অবনীন্দ্রনাথের শিল্পাদর্শ যে ভারতীয় শিল্পে নবজাগরণের সৃষ্টি করিয়াছিল একথা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন।

হ্যাভেলের সহযোগিতায় অবনীন্দ্রনাথ ভারতীয় প্রাচীন শিল্প সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করিয়াছিলেন। হ্যাভেল অবনীন্দ্রনাথের শিল্প প্রতিভা উপলব্ধি করিয়া তাহাকে কলিকাতা আর্ট স্কুলের সহকারী অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করেন । ইতি পূর্বে আর কোনো ভারতীয়ই এই পদ লাভ করে নাই । অবনীন্দ্রনাথের শিল্পবৈশিষ্ট হইল , ভারতীয় প্রচীন শিল্প সাগর যুগোপযোগী প্রকাশ । অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিল্পে যে যুগান্তর সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহা নন্দলাল বসু অসিত কুমার হালদার , যামিনী রায় মহীশূরের ভেকটটাপ্পা প্রমুখের শিল্প সৃষ্টি র দ্বারা পুষ্টি লাভ করিয়াছিল এবং অবনীন্দ্রনাথের শিল্প পদ্ধতি এক নতনু শিল্প শৈলীতে উন্নীত হইয়াছিল ।

নন্দলাল বসু ছিলেন অবনীন্দ্র নাথের প্রধান শিল্প শিষ্য । কলিকাতা আর্টস্কুলের ছাত্র হিসাবে নন্দলাল অবনীন্দ্র নাথের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসিয়াছিলেন ছাত্রাবস্থায় তিনি " বসুমতী " ছবি আকিয়া প্রাচ্য কলায় বাঙালীর নিকট হইতে পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন । নন্দলালের অঙ্কিত অসংখ্য স্কেচ ও চিত্র পটগুলি এক অনবদ্য শিল্প সৃষ্টি । প্রকরণ পদ্ধতি ও রূপ রসের দিক দিয়া নন্দলালের শিল্প সৃষ্টি অভিনবত্বে অবনীন্দ্রনাথ অপেক্ষা কোন অংশে কম ছিল না । এই প্রসঙ্গে কানাই সামন্তের মন্তব্যটি উল্লেখ করা যাইতে পারে । অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল পরস্পরের পরিপূরক । অতিশয় সংক্ষেপে বলা যায় , পাশ্চাত্ত চিত্ররীতির প্রতিষ্ঠাভূমি হইতে প্রাচ্যরূপ কলার সন্ধানে যাত্রা করেন অবনীন্দ্রনাথ , নন্দলাল যাত্রা করেন ভারতীয় ধ্রুবচিত্র রীতি তথা স্মৃতিকথার সহজ আবিস্কারের ক্ষেত্রে হইতে ।

নন্দলাল ব্যতীত অবনীন্দ্র নাথের অন্যান্য সে সকল শিষ্য শিল্পে বাংলায় নব যুগকে সমৃদ্ধশালী করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে সুরেন্দ্রান াথ কর , সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শৈলেন্দ্র নাথ দে , মুকুল দে প্রমুখ উল্লেখযোগ্য । সুরেন্দ্রনাথ কর ওয়াল পেইন্টিং এবং মিনিচেয়চার ছবির জন্য খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। অবনীন্দ্রনাথের জেষ্ঠ্য ভ্রাতা গগনেন্দ্র নাথ ঠাকুর । (১৮৫৭ - ১৯৩৮ খ্রীঃ) ছিলেন উপরিউক্ত শিল্পি অপেক্ষা ভিন্ন প্রকৃতির । তিনি ছিলেন বাস্তববাদী শিল্পী । সমসাময়িক রাজনীতি , সমাজ ও অর্থনীতির উপর তাহার অঙ্কিত ব্যাঙ্গচিত্রগুলি জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল ।

ইংরেজ শাসনাধীন ভারতবাসীর দুর্দশা ও হতাশা যখন তাহাদিগকে পাশচত্য সভ্যতার প্রতি

বিরূপ করিয়া তুলিয়াছে সেই সময়ে স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ মনীষীর "নব হিন্দু বাদ " এর প্রচারে দেশবাসীকে ভারতের সনাতন ধর্ম ও প্রাচীন সভ্যতার প্রতি আগ্রহশীল করিয়া তুলিয়াছিল । বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ই সর্ব প্রথম যুক্তির আলোকে প্রাচীন হিন্দু ধর্মের কলষতা দূর করিয়া উহাকে স্বমহিমায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন । বঙ্কিমচন্দ্রের " বন্দেমাতরম" সঙ্গীতে হিন্দুদের আরাধ্য দেবী দুর্গার সহিত দেশ মাতৃকাকে এক করিয়া দেখিবার ফলে দেশবাসীর দেশাত্মবোধ বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল ।

বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্তী কালে ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণদেব ও তাহার প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের ধর্ম সাধনা ধর্ম ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত ভারতবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করিতে যে রূপ সাহায্য করিয়াছিল অপর কোনো ধর্মান্দোলনই তাহা করিতে পারে নাই । শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ভগবানকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিয়া প্রচলিত হিন্দুধর্মের প্রতি দেশবাসীর , বিশেষত ইংরেজ শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের বিশ্বাস ও নিষ্ঠা ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন ।

হিন্দু ধর্মে পুনরুজ্জীবনের অন্যতম পুরোহিত ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ । হিন্দু ধর্মের মূল সত্য ব্যাখ্যা করিয়া তিনি উহাকে বিশ্বের দরবারে স্বমহিমায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । তাহার ধর্ম সাধনার উদ্দেশ্য ছিল স্বদেশ গৌরববোধ হিন্দু সম্প্রদায়ের পুনরুত্থান এবং ভারতের প্রাচীন আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ সাধন । বিবেকানন্দ কেবল অতীত ভারতের গৌরবোজ্জ্বল যুগেরই প্রচারক ছিলেন না তিনি ছিলেন হিন্দু ভারতের জাগরণের ও অগ্রদূত । তিনি দেশবাসীকে দুঃখ ও দারিদ্র হইতে মুক্ত করিয়া শিক্ষা দীক্ষা সাহসে এক বলিষ্ঠ জাতিতে পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন । বিবেকানন্দের তেজদীপ্ত বাণী ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লবীদের অন্তরে গভীর প্রেরণার সঞ্চার করিয়াছিল । তাহাদের এক হাতে থাকত গীতা , অন্য হাতে তরবারী এবং অন্তরে থাকিত বিবেকানন্দের আদর্শ ।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় , স্বামী বিবেকানন্দ , দয়ানন্দ সরস্বতী প্রমুখ মনিষীর আদর্শ ও বাণী ও উপগ্রষ্টী ভাবধারা বিকাশের আদর্শগত ভিত্তি রচনা করিয়াছিল । স্বাধীনতা অপহরণকারী বিদেশী শাসকদের অত্যাচার হইতে ভারতকে মুক্ত করিতে হইলে যে শক্তি ও আত্মত্যাগের প্রয়োজন একথা বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম প্রচার করিয়া ছিলেন । বিবেকানন্দ হিন্দু ধর্মের মূল সত্য প্রকাশ করিয়া ছিলেন । এক কথায় মনীষিগণ ভারতবাসীকে কাপুরুষতা ও ভীরুতা পরিত্যাগ করিয়া শক্তি সাধনার দ্বারা স্বাধীনতা অর্জন করিবার সে আহ্বান জানাইয়াছিলেন তাহা দেশবাসীর মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও সংগ্রাম প্রেরণা জাগাইয়া তুলিয়াছিল । ভারতবাসী উপলব্ধি করিয়া ছিল যে , একমাত্র তাহাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষ বর্তমান অপেক্ষা উন্নতর অবস্থায় উপনীত হইতে পারে । ভারতের সন্ত্রাসবাদীগণ দেশ ও বিদেশ উভয় স্থান হইতেই সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন ।

বাংলায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় , স্বামী বিবেকানন্দ , অরবিন্দ ঘোষ , মহারাষ্ট্রের বাল গঙ্গাধর

তিলক , পাঞ্জাবের লালা লাজপৎ রায় , মাদ্রাজের চিদাম্বরম পিল্লাই প্রমুখের দেশাত্মবোধ ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ ভারতের যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈপ্লবিক প্রেরণা সঞ্চার করিয়া ছিল । ইহা ব্যতীত ফরাসী বিপ্লব , আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম , জাপানীদের দেশ হিতৈষনা ও রাশিয়ার জারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে নিহিলস্টদের গুপ্ত হত্যার কাহিনী প্রভৃতির ইতিহাস পাঠ ভারতীয় বিপ্লবীদের মধ্যে বৈপ্লবিক চেতনা জাগরনে বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল ।

বাংলাদেশের প্রথমে বৈপ্লবিক উদ্দেশ্যে গুপ্ত সমিতি গঠনের কৃতিত্ব প্রমথ নাথ মিত্র মহাশয়ের। তিনি খ কলিকাতায় " অনুশীলন সমিতি " নামে একটি বৈপ্লবী সংগঠন সম্পর্কে শিক্ষা দান করা হইত। ইহার উদ্দেশ্য ছিল এমন এক দল তরুন সৈনিকের সৃষ্টি করা যাহারা দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকিবে । বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করিয়া দেশব্যাপী আন্দোলন শুরু হইলে বাংলার বিপ্লবীরা ও অধিকতর সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন । সেই সময়ে " অনুশীলন সমিতি " ব্যতীত আরও অনেক গুপ্ত সমিতি বিভিন্ন স্থানে গড়িয়া উঠিয়াছিল । এই সকল সমিতির মধ্যে ময়মনসিংহের " সাধনা সমিতি " ঢাকার " অনুশীলন সমিত্তি " ফরিদপুরের " ব্রতী সমিতি " প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ইহা ভিন্ন সেই সময়ে বারীন ঘোষের নেতৃত্বে " যুগান্তর " নামে অপর একটি বিপ্লবী দল ও গড়িয়া উঠিয়াছিল । " অনুশীলন সমিতির'র প্রমথনাথ মিত্রের সহিত মত পার্থক্যের ফলেই এই নতুন গোষ্ঠীর সৃস্টি হইয়াছিল । ইতিমধ্যে অরবিন্দ ঘোষ বরোদার চাকুরীতে ইস্তফা দিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসেন । তিনি ছিলেন যুগান্তর দলের মন্ত্রণা গুরু এবং তাহার ভ্রাতা বারীণ ঘোষ ছিলেন ঐ দলের সর্বাধিনায়ক।

১৯০৭ খ্রীঃ যুগান্তর দলের সদস্যগণ কলিকাতার মানিকতলা অঞ্চলে মুরারি পুকুরের বাগান বাড়ীতে একটি গুপ্ত বিপ্লবী কেন্দ্র গড়িয়া তোলেন এবং তাহারাই ইংরেজদের বিরুদ্ধে নানা প্রকার হিংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত হন । যুগান্তর দলের নেতৃত্বে কলিকাতা আদালতের বিচারপতি কিংস্‌ফোর্ড হত্যার ষড়যন্ত্র সমসাময়িক ভারতের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা । কিংসফোর্ড ছিলেন একজন কুখ্যাত বিচারপতি । তিনি বিচারের নামে বিপ্লবীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার চালাইতেন। এই অত্যাচারী বিচারপতিকে হত্যার উদ্দেশ্যে যুগান্তর দল ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী বাংলার দুই নির্ভীক সন্তানকে নিযুক্ত করিয়াছিল । কিন্তু বিপ্লবীরা ভুলবশত কিংসফোর্ডের পরিবর্তে দুইজন ইংরেজ মহিলাকে বোমার আঘাতে হত্যা করিয়া বসেন। পুলিশের নিকট ধরা পরিবার পূর্বেই প্রফুল্ল চাকি আত্মহত্যা করেন এবং ক্ষুদিরামকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে । আদালতের বিচারে ক্ষুদিরামের ফাঁসির হুকুম হয় ।

কিংসফোর্ডের হত্যা সম্পর্কে অনুসন্ধান চালাইতে গিয়া ইংরেজ সরকার মুরারি পুকুর বাগানবাড়ীর গুপ্ত সমিতির সন্ধান পায় । এই সূত্রে যুগান্তর দলের বহু বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করা হয় ।

তাহাদের বিরুদ্ধে ইংরেজ সরকার আলিপুর ষড়যন্নত্র মামলা শুরু কেরন । মামলার বিচারে বারীন ঘোষ , উল্লাস কর দত্ত প্রভৃতিকে দীপান্তরে প্রেরণ করা হয় এবং অন্যান্য কয়েকজন প্রাণদন্ডে দন্ডিত করা হয় ।

কিংসফোর্ড হত্যার ষড়যন্ত্র বাংলার আন্দোলনের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এই হত্যা কান্ডকে কেন্দ্র করিয়া ইংরেজ সরকার বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে যে মামলা রজ্জু করিয়াছিলেন তাহাই " আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলা " নামে খ্যাত । ইহা ছিল বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে প্রথম ষড়যন্ত্র মামলা । দ্বিতীয়ত , ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকির দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জনের দৃষ্টান্ত বাংলার যুবকদের হিংসাত্মক কার্যকলাপে উৎসাহিত করিয়াছিল । এই ঘটনার অব্যবহিত পরে বাংলার সর্বত্র বিপ্লবীদের গুপ্ত হত্যা এবং রাজনৈতিক লুণ্ঠন শাসক গোষ্ঠীকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল । এই হত্যাকান্ডের সমর্থনে বাংলার বাহিরে বহু বিপ্লবী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতে থাকে । মহারাষ্ট্রের তিকল এইরূপ একটি প্রবন্ধে বাংলার বিপ্লবীকে সমর্থন জানাইলে তাহাকে কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয় । তৃতীয়ত , হত্যাকান্ডের স্বল্প কালের মধ্যেই ইংরেজ সরকার বহু সংখ্যক সমিতি ও সংগঠনকে বে - আইনী বলিয়া ঘোষণা করে । ইহার ফল স্বরূপ প্রধান্য সমিতির অন্তরালে যে গুপ্ত কর্মপন্থা চলিত তাহা বন্ধ হইয়া যায় । তখন বিপ্লবীরা লোক চক্ষুর অন্তরালে আত্মগোপন করেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিব্রত ইংরেজদের উপর চরম আঘাত হানিবার উদ্দেশ্যে ভারতে যে বিপ্লবী প্রচেষ্টা শুরু হইয়াছিল যতীন্দী নাথ মুখোপাধ্যায় ও রাসবিহারী বসু ছিলেন উহার প্রাণস্বরূপ । আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলার পরবর্তী কালে যতীন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাঘাযতীন এর নেতৃত্বে বাংলার বিভিন্ন স্থানে বৈপ্লবিক কার্যকলাপ চলিতে থাকে । যতীন্দ্রনাই বিদেশ হইতে অস্ত্র শস্ত্র আমদানি করিয়া ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পরি কল্পনা করিয়াছিলেন । তিনি এম এন রায় (মানবেন্দ্র নাথ রায় ) কে ইংরেজদের প্রধান শত্রু জার্মানিদের সহিত যোগাযোগের জন্য বাটাভিয়ায় প্রেরণ করিয়াছিলেন । ১৯১৫ খ্রীঃ জার্মানী হইতে জাহাজ বোঝাই অস্ত্র শস্ত্র বলেশ্বরে আসিয়া পৌছিতেছে এই সংবাদ পাইয়া যতীন্দ্রনাথ কয়েকজন বৈপ্লবীসহ বালেশ্বরে উপস্থিত হন । এই খবর ইংরেজ পুলিশ পুর্বেই জানিতে পারিয়া বহু সিপাহী লইয়া বিপ্লবীদের পশ্চাদ্বাচরন করেন । বুড়ীবলাম নদী তীরে ইংরেজ সিপাহীর সহিত বিপ্লবীদের প্রচন্ড লড়াই হয় । শেষ পর্যন্ত এই লড়াইয়ে বিপ্লবী চিত্ত প্রিয় রায় চৌধুরী মারা যান এবং যতীন্দ্র নাথ সহ অন্যান্যরা ধরা পড়ে । এই ভাবে বৈদেশিক সাহায্যের বাংলা বিপ্লবীদের প্রথম বিপ্লব প্রয়াস বিফলতার পর্যবসিত হইয়াছিল ।

১৯১৫ খ্রীঃ 'ভারত রক্ষা' আইনের দ্বারা শতশত যুবককে গ্রেপ্তার করা হইলে সাময়িকভাবে বাংলার বিপ্লব আন্দোলনে ভাটা পড়িয়াছিল ।

যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলায় যখন বিপ্লবী কার্যকলাপ চলিতেছিল , সেই সময়ে উত্তর

ভারতে রাস বিহারী বসু ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে একটি সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আয়োজন করেন । তাহার অক্লান্ত পরিশ্রমে দিল্লী , লাহোর , প্রভৃতি স্থানে বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি গড়িয়া উঠিয়াছিল । ১৯১২ খ্রীঃ দিল্লীতে বড়লাট , প্রভৃতির স্থানে বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি গড়িয়া উঠিযাছিল । ১৯১২ খ্রীঃ দিল্লীতে বড়লাট হার্ডিঞ্জকে হত্যার পরিকল্পনা রাসবিহারী বসুর অন্যতম উল্লেখযোগ্য বিপ্লব প্রচেষ্টা । দুই বৎসর পরে তিনি সমগ্র উত্তর ভারতব্যাপী ইংরেজদের বিরুদ্ধে এক সশস্ত্র অভুত্থানের আয়োজন করিয়াছিলেন । এই আয়োজনের মূল কেন্দ্র ছিল পাঞ্জাব । বিভিন্ন অঞ্চলের গুপ্ত সমিতির সহিত আলাপ আলোচনা করিয়া তিনি ১৯১৫ খ্রীঃ২১ ফ্রেঃ অভ্যুত্থানের দিন ধার্য করিয়াছিলেন । কিন্তু ইংরেজ সরকারের নিকট এই সংবাদ পূর্বেই ফাঁস হইয়া গেলে বিপ্লবী অভ্যুত্থানের আয়োজন ব্যর্থ হইয়াছিল । উত্তর ভারতের সর্বত্র পুলিসী তৎপরতার ফলে সেই সময়ে অনেক বিপ্লবী ধরা পড়িয়াছিলেন এবং রাসবিহারী বসুকে এক নম্বর আসামী বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল । রাসবিহারী বসু সেই সময়ে " পি ঠাকুর" ছদ্ম নামে জাপানে চলিয়া যান । বাংলায় যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও উত্তর ভারতে রাস বিহারী বসুর প্রচেষ্টা বিফলতায় পর্যবসিত হইলে ভারত সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের প্রথম পর্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছিল ।

ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে সন্ত্রাসবাদীদের ভূমিকা যেমন ছিল উজ্জ্বল তেমনি প্রেরণার উদ্দীপক । মৃত্যু ভয়কে জয় করিয়া এবং আত্ম বিসর্জনের শপথ গ্রহণ করিয়া তাহারা যেভাবে দুঃসাহসিক কাজে ঝাঁপিয়া পারিয়াছিলেন তাহাতে প্রেরণার উদ্দীপক । মৃত্যু ভয়কে জয় করিয়া এবং আত্ম বিসর্জনের শপথ গ্রহন করিয়া তাহারা যেভাবে দুঃ সাহসিক কাজে ঝাঁপাইয়া পরিয়াছিলেন তাহাতে বিদেশী শাসকবর্গ আতঙ্কিত হইয়াছিল । তারা বুঝিয়াছিল যে ভারতে তাহাদের শাসনের মেয়াদ ফুরাইয়া আসিয়াছে । তথাপি ইহা অনস্বীকার্য যে কঠোর আত্মত্যাগ সত্ত্বেও সন্ত্রাসবাদীদের সাফল্য ছিল খুবই সীমিত ।

ইহার প্রধান কারণ ছিল এই যে, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও নেতৃত্বের অভাবে সন্ত্রাসবাদীগণ ভারতীয় জন সাধারনের হৃদয়ে তেমন উৎসাহের সঞ্চার করিতে পারেন নাই । গুপ্ত সমিতিগুলিতে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের অধিপত্য ছিল , কৃষক বা শ্রমিক শ্রেণীকে এই সংগ্রামের অংশীদার করা সম্ভবপর হয় নাই । সুসংবদ্ধ লক্ষ্যের অভাবে রাশিয়ার নিহিলিষ্ট এবং আয়ারল্যান্ডের সন্ত্রাসবাদীদের ন্যায় ভারতীয় বিপ্লবীদের কার্যকলাপ ও কতিপয় অত্যাচারী সরকারী কর্মচারী হত্যা এবং সশস্ত্র বিপ্লবের পরিকল্পনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল । বঙ্গ বিভাগের পরিকল্পনা কার্জনের নীতির দ্বারা সৃষ্টি হয়নি । ইংরেজ আমলে প্রধান তিনটি রাজনীতিক বিভাগ ছিল । এরা হল - বঙ্গ প্রেসিডেন্সী , বম্বে প্রেসিডেন্সী ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী শাসকদের কাছে বঙ্গ প্রেসিডেন্সী বহু দিন ধরেই দুরূহ সমস্যা উপস্থিত করেছিএলন। প্রদেশের আয়তন ও জন সংখ্যার পরিমাণ সুষ্ঠ শাসন ব্যবস্থার পরিপন্থী ছিল । এই

বিভাজনের পদ্ধতি কার্যত আরম্ভ হয়েছিল ১৮৭৪ সালে যখন আসামকে বিভক্ত করে চীফ কমিশনারের কতৃত্বাধীন করা হয় । এতে অবশ্য সমস্যা মেটেনি । ১৮৯৬ সালে ঢাকাও ময়মনসিংহ জিলা এবং চট্টগ্রাম বিভাগকে আসামের সঙ্গে যুক্ত করার পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল । কিন্তু এটা ব্যয় বহুল হওয়ার দরুন পরিত্যক্ত হয়েছিল । শুধু এর পরিণাম স্বরূপ পার্বত্য অঞ্চল আসামে যুক্ত হয়েছিল । ১৯০১ সালের আদম সুমারীতে যখন দেখা গেল বাংলার জন সংখ্যা ৭ কোটি ৮০ লক্ষ তখন আর একটি পরিকল্পনার উদয় হয়েছিল উড়িষ্যাকে মধ্য প্রদেশের সাঙ্গ একত্রিত করা ।

এই অবস্থায় কার্জনের মাথায় এই চিন্তার উদয় হল যে " বাংলাদেশ " এক জনের পক্ষে নিঃসন্দেহে অতি বিশাল উপরন্তু কার্জনের মনে হয়েছিল - বাংলা , আসাম এবং মধ্যপ্রদেশের চতুঃসীমা - সেকেলে অযৌক্তিক ও অদক্ষতায় জন্মদাতা।

স্যার এন্ড্রোফ্রেজার কর্তৃক একটি পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল যেটা ১৯০৩ সালের ডিসেম্বরে সর্ব সাধারণের কাছে বিদিত করা হয়েছিল । চট্টগ্রাম বিভাগ , পার্বত্য , ত্রিপুরা , ঢাকা জিলা , ময়মনসিংহ জিলা আসামের ভিতর যাবে । আর ছোটনাগপুর যাবে মধ্য প্রদেশে । এর পরিবর্তে বাংলা মধ্য প্রদেশ থেকে পাবে সম্বলপুর আর মাদ্রাজ থেকে পাবে গঞ্জাম । এই পরিকল্পনার পক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তগুলি দেখানো হয়েছিল -

১) বাংলার অধিকতর নিজস্ব শাসনের ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল । পূর্ণ গঠনের পরে বাংলার লোক সংখ্যা ৭ কোটি ৮০ লক্ষ থেকে কমে ৬ কোটি ৮ লক্ষ দাঁড়াত ।

২) বাংলার পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলির কলকাতার কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত হত ।

৩) পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলির মুসলমান অধিক সুখ সুবিধা পেত ।

৪) আসামের চা বাইরে আসার পথ পেত ।

৫) সমস্ত উড়িষ্যা ভাষীরা একটি শাসন ব্যবস্থার অধীন হত । শেষ পর্যন্ত কার্জনের দ্বারা যে পরিকল্পনা অবলুণ্ঠিত হয়েছিল তাতে ছিল পূর্ববঙ্গ থেকে ১৫টি জিলা নিয়ে আসামের সঙ্গে যুক্ত করে পূর্ববঙ্গ ও আসাম নামে নতুন প্রদেশ তৈরী করা এবং রাজধানী ছিল ঢাকা । এর জনসংখ্যা ছিল ৩ কোটি ১ লক্ষ তাতে মুসলমানদেরই প্রাধান্য ।

এই শাসন ব্যবস্থা সংক্রান্ত যুক্তিগুলির পশ্চাতে এক ক্ষতি সাধক রাজনৈতিক মতলব ছিল যা ফলিত হয়েছিল লড কার্জনের " স্বদেশ " কর্তৃপক্ষের সাথে পত্র আদান প্রদানের মধ্যে । " ঐক্যবদ্ধ বাংলা একটি শক্তি " - এটি তার দ্বারাই লিখিত হয়েছিল এবং দেশ ভঙ্গের মধ্যে দিয়ে সেই শক্তিকে খর্ব করাই ছিল তার উদ্দেশ্য । তার মতলব ছিল ব্রিটিশ শাসনের একটি শক্তিশালী প্রতি পক্ষ দলকে টুকরো টুকরো করে ভেঙ্গে দুর্বল করে দেওয়া । বাঙালীরা নিজেদের একটি জাতি বলে ভেবে নিয়েছিল এই ধরনের চিন্তা ছিল ব্রিটিশ শাসনের সুপ্রতিষ্ঠিত পক্ষে বিপদজনক সুতরাং এই চিন্তাকে ধ্বংস

করাই ছিল কার্জনের লক্ষ্য । কংগ্রেস রাজনীতির কেন্দ্রস্থল ছিল কলকাতা , এই শহরটির প্রধান্য ও বৈশিষ্ট্য হরণ ছিল লক্ষ ।

অবশ্য লর্ড কার্জনের গোপন মতলবগুলি সে সময়ে সাধারণ লোক কিছুই জানত না । শুধু এটা বুঝতে পেরেছিল যে বাঙালীর সংহতি ভেঙ্গে দেওয়াটাই কার্জনের আসল অভিপ্রায় । এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে জনসাধারণের কাছে থেকে প্রবল প্রতিবাদ এসেছিল । এমন কি সেক্রেটারি অফ স্টেটের দ্বারাও একথা স্বীকৃত হয়েছিল যে , একটি সমশ্রেণীভুক্ত সম্প্রদায়কে খন্ড খন্ড করে দিলে তাদের প্রতিবাদ করাটাই স্বাভাবিক । সমালোচকদের বক্তব্য ছিল মাত্র এক কোটি দশ লক্ষ লোককে সরিয়ে নিলে শাসন ব্যবস্থার চাপ মুলতঃ হালকা হবে না । উপরন্তু, ব্যয় বৃদ্ধি পাবে এবং সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধি পাবে । এই পরিকল্পনার পেছনে যে সাম্প্রদায়িক মতলব ছিল এটা স্পিয়ারের দ্বারাও স্বীকৃত হয়েছিল । স্পিয়ারের বক্তব্য ছিল - "হিন্দু অধ্যুষিত পশ্চিমাঞ্চল , মুসলিম অধ্যুষিত পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে সুন্দর ভারসাম্য ছিল , উভয় সম্প্রদায়ের বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনগুলি পৃথক পৃথকভাবে বিবেচনা করা যেত ।

এই সাম্প্রদায়িকতার কীর্তিই কার্জনকে শক্তি জুগিয়ে ছিল ১৯০৪ তার পূর্ববঙ্গ পরিদর্শন কালে। কার্জনের পরিকল্পনা একটি রাজনৈতিক চাপ গ্রহন করেছিল । একটি মুসলিম প্রদেশ গঠনই ছিল তার উদ্দেশ্য যা হিন্দু মুসলিম ঐক্যের প্রাণ নাশক হবে । ১৯০৬ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে নবাব আতিকুল্লা খাঁ তার বক্তৃতার এই সংবাদটিকে দৃঢ়তার সঙ্গে সত্য বলে ঘোষণা করেন ।

পূর্ব বঙ্গের মুসলমানেরা সকলেই এই পরিকল্পনার অংশীদার ছিলেন না । আব্দুল রসুল ও লিয়াফৎ হোসেন , বদরুদ্দিন তায়েবজি ও শিবালী নোমানির মহান ভাবধারাকে ধরে রেখেছিল । কিন্তু ঢাকার নবাব সলিমউল্লা খাঁ কার্জনের কাছ থেকে এক লক্ষ পাউন্ড ধার পাওয়ার প্রতিশ্রুতি পেয়ে চক্রান্তের কাজে অংশ নিতে রাজী হয়েছিল । স্যার হেনরী কটনের ভাষায় বলতে গেলে " লর্ড কার্জনের নীতির সারবস্তু ছিল বর্ধিষ্ণু শক্তিগুলিকে দুর্বল করে দেওয়া আর দেশ প্রেমের চেতনা থেকে উদ্ভুত রাজনৈতিক মনোভাবকে ধ্বংস করে দেওয়া । স্পিয়ারের ভাষায় ন্যায় সঙ্গত প্রতিবাদ সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী পরিচালনায় জনগণের মধ্যে প্রবল বিক্ষোভের রূপ নিয়েছিল ।

একজন বিচক্ষন শাসকের কর্তব্য এই ধরনের বিক্ষোভকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা কিন্তু জনগণের এই বিরোধীতা কার্জনকে করে তুলল আরও অদম্য । এই বিক্ষোভ কার্জনের কাছে স্বার্থপর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য মূলক এই আখ্যা পেল , আর বলা হল এটা বাগাড়ম্বর ও অলঙ্কারপূর্ণ বক্তৃতা ছাড়া আর কিছুই নয় ।

উকিল সভার Bar বিরোধীতা কার্জনের কাজে মনে হল ডাকায় পৃথক হাইকোর্ট গঠনের ফলে কলিকাতার হাইকোট উকিল সভার কায়েমী স্বার্থের যে ক্ষতি হবে তার ভয়ে কিন্তু যদি তাই হবে , তা

হলে পূর্ববঙ্গের খ্যাত নামা উকিলের এই পরিকল্পনার বিরোধীতা করতেন না । এদের মধ্যে ছিলেন ঢাকার আনন্দ চন্দ্র রায় , শিলচরের কামিনী কুমার চন্দ্র ও বরিশালের দীনবন্ধু সেন ।

এরপরে আসে ভারতীয় সংবাদ পত্রগুলির কথা । সংবাদপত্রগুলির যে বিরোধীতা জানিয়েছিল সেটা কার্জনের মতে গ্রহক হারানোর ভয়ে । এটা সত্য হলে এক মাত্রা " অমৃত বাজার পত্রিকার ক্ষেত্রেই ইহা সত্য হতে পারত , কিন্তু সঞ্জীবনী ", সন্ধ্যা , " নিউ ইন্ডিয়া" ও ইন্ডিয়ান মিররের মতো অন্যান্য কাগজের ক্ষেত্রে নয় । আর ' ফ্রেন্ড ' অফ ইন্ডিয়া , স্টেটস্ম্যান" ও ইংলিশম্যান সম্বন্ধে কি বলা চলতে পারে ? কার্জনের মতে জমিদারেরা বিরোধীতা করেছিলেন খাজনা হারানোর ভয়ে । এক্কা সত্য যে ময়মনসিংহের মহারাজা সূর্যকান্ত পাথুরিয়াঘাটার যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর , দিনাজ পুরের রাজা এবং ভাগ্যকুলের জানকী নাথ রায় প্রবল আপত্তি জানিয়ে ছিলেন । কিন্তু তাদের আপত্তি যতটা ছিল খাজনা হারানোর জন্য তার চেয়ে ঢের বেশী তারা রেভিনিউ বোর্ডের এক্তিয়ারের বাইরে হয়ে যাবেন বলে ।

সর্বশেষ উল্লেখ করা যেতে পারে কার্জনের মতে মধ্যবিত্ত হিন্দুরা বিরোধীতা করেছিলেন কর্ম সংস্থানের সুযোগ হারানোর ভয়ে ।

প্রকৃত পক্ষে এটা ছিল নবজাতি আত্মসচেতন বাঙালী জাতীয়তাবাদের অনুভুতি । উনবিংশ শতাব্দীর আলোক প্রাপ্তি থেকেই এই জাতীয়তাবাদ জন্ম নিয়েছিল আর আত্মপ্রকাশ করেছিল এই বিরোধীতার মাধ্যমে । সুরেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায় এর মতো নেতারা শাসন ব্যবস্থার সুবিধার জন্য রাজ্যাংশের পূর্ণ গঠনের বিরোধী ছিলেন না । হিন্দী ভাষী অঞ্চলকে বাদ দিয়ে একটি হিন্দু মুসলমান অধ্যুষিত ঘন সন্নিকিষ্ট বাংলা ভাষী রাজ্য গঠন করা যেত এবং সেটা অনেক ভালো হত । কিন্তু একটা হবার উপায় ছিল না । লর্ড কার্জনের উদ্দেশ্য ছিল দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন কিছু প্রবেশ করানো যার দ্বারা তার পৃথক হয়ে যায় । আর তা হলে কংগ্রেস সৃষ্ট জাতীয়তাবাদ ও দুর্বল হয়ে পড়ে । ১৯০০ সালে লিখিত কার্জনের অভিমত ছিল - কংগ্রেসে পড়ে যাওয়ার আগে টলছে , - আমার ভারত বর্ষে অবস্থান কালে যে বড় বড় অভিলাষগুলি আছে তার মধ্যে একটি হল - কংগ্রেসের শান্তিপূর্ণ অবস্থানের জন্য সহযোগীতা করা ।

বিচ্ছিন্ন করার বিষয়ে কার্জনের ভূমিকা ছিল পাহাড়ের মত কঠিন , সংকল্প ছিল অটল । সেক্রেটারী অফ স্টেটের অনুমোদন নিয়ে ১৯০৫ সালের অক্টোবর মাসে দেশ বিভাগ কার্যত সাধিত হল । বিভাগের পরে বাংলা লোক সংখ্য দাঁড়াল ৪ কোটি ২০ লক্ষ হিন্দু এবং ৯০ লক্ষ মুসলমান , অপর দিকে নব গঠিত পূর্ব বঙ্গ ও আসাম প্রদেশে লোকসংখ্যা দাঁড়াল ১ কোটি ৮০ লক্ষ মুসলমান এবং ১ কোটি ২ লক্ষ হিন্দু । এই মুসলিম প্রদেশের গঠন ভবিষ্যতের ইঙ্গিত করেছিল ।

১৯৪৭ এর ঘটনাগুলি ভারতের রাজনৈতিক দৃশ্যপটে তাদের ছায়া ফেলেছিল । এই যে

পরিকল্পনাকে সু - প্রসারিত করা এবং শাসন ব্যবস্থার জন্য পুনঃ গঠনকে রাজনৈতিক বিভাগে রূপান্তরিত করা । এর জন্য সম্পূর্ণ দায়ী কার্জন । সুশাসনের দক্ষতাই যদি কার্জনের লক্ষ হত তা হলে হিন্দু ও মুসলমানদের বিবাদ না লাগিয়া বাংলার অসুবিধাজনকআয়তনকে কমিয়ে সুবিধা জনক করা যেত । তাই এই ক্ষেত্রে কার্জনের ভূমিকা শাসকের নয় ধূর্ত রাজনীতিবিদের মত ।

বঙ্গ ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল এই অ নুভূতি থেকে যে বাংলাদেশ বঙ্গ ভাষীদের মাতৃভূমি তার সন্তানদেব তীব্র প্রতিবাদ সত্বেও সেই সেই দেশকে খন্ডিত করা হয়েছে বাঙালীকে রাজনীতির দিক থেকে দুর্বল করে দেখার জন্য । এই আন্দোলন প্রধানত ঃ হিন্দুদের দ্বারাই পরিচালিত হয়েছিল । এর প্রাণশক্তি যে গভীর আবেগময় জাতীয়তা তা মুসলমানদের স্পর্শ করেনি। আর তা ছাড়া ঢাকার নবাবের সাহায্যে ব্রিটিশেরা তাদের আন্দোলনের বাইরে রেখে দিয়েছিল ।

এই আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করেছিল বিদেশী দ্রব্য বর্জনের মধ্যদিয়ে । এর অনিবার্য পরিণাম দেখা দিল পরিপূরক রূপে স্বদেশী দ্রব্যের ব্যবহার । এই আন্দোলনের নেতৃত্বে দিয়েছিলেন সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জির মতো বড় বড় নেতারা । রবীন্দ্রনাথের কবি প্রতিভাও এই আন্দোলনের যোগ না দিয়ে পারে নি । ১৯০৫ সালে গোখলের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের সে অদিবেশন হয় তাতে এই বর্জনের আন্দোলন সমর্থিত হল । ১৯০৬ সালে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হল দাদাভাই নওরোজীর সভাপতিত্বে, তাতে বর্জন আন্দোলনের ন্যায্যতা প্রতিপাদিত হল এবং দাবি করা হল এই বিভাজনের প্রত্যাহার ।

ব্রিটিশ লেখকদের মতে বঙ্গ বিরোধী আন্দোলন বিপ্লবী মতবাদ প্রচারের গুপ্ত সুযোগ দিয়েছিল। পূর্ববঙ্গ এই বর্জন আন্দোলনকে মুসলমানেরা বাধা দিয়েছিলেন এবং দাঙ্গা ও বেধেছিল ঘন ঘন । জাতীয়তাবাদী লেখকদের মতে এটা ঘটেছিল সরকারী প্ররোচনায় ও সমর্থনে । বিপ্লবীদের গুপ্ত সমিতিগুলি তৎপর হয়ে উঠেছিল । ভারতীয় সংবাদ গুলি সর্বান্তকরনে সমর্থন জানিয়ে ছিল এই আন্দোলনকে । একদিকে নির্যাতনও শুরু হয়েছিল নানাভাবে ।

যাইহোক ,এ আন্দোলন বিফল হয় নি । ১৯১১ সালে এই বিভাজনকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হল । তবে বাঙালী হিন্দুদের দন্ডিত করা হল বিশাল বাংলাভাষী এলাকাকে বিহারের সঙ্গে যুক্ত করে আর ভারতের রাজধানী কলিকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত করে ।

দেশ বিভাগের ফলে কার্জনের উদ্দেশ্য এক দিক দিয়ে সফল হয়েছিল । অর্থাৎ হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে স্থায়ীভাবে একটা গোজাপুতে দেওয়া হল তাদের পৃথক করে রাখবার জন্য । জাতিয়তাবাদকে ও অনেকখানি দুর্বল করে দিল এই বিভাজন আর পূর্বাভাস ছিল ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের ।

আর একদিক থেকে দেখতে গেলে , এই বিভাজন শক্তি ও প্রেরণা জুগিয়ে ছিল ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে । এই বিভাজন বাঙালীর হৃদয় যে আত্মিক ক্ষতির সৃষ্টি করেছিল , বিশেষ করে পাশ্চাত্য পন্থীদের মনে , তা কোন সময়ই পূর্ণ নিরাময় হয়নি । এই আত্মিক ক্ষত সন্ত্রাসবাদ ও

উগ্রমতবাদ জাগিয়ে তুলেছিল ।এছাড়া মধ্যপন্থীদের স্বায়ত্ব শাসন প্রতিষ্ঠার প্রেরণাকেও এই বিভাজন দখখল করে তুলেছিল । তাই বঙ্গ বিভাগ ভারতের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে একটি সংকল্প গ্রহণের অধ্যায়কে সূচিত করে ।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সঙ্গে ধর্মীয় মনোভাব মুক্ত হয়ে পড়ে ।সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী তরুন সম্প্রদায় কালী , গীতা ও বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দ মঠ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় ।স ন্ত্রাসবাদ ধীরে ধীরে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে । কত ব্রিটিশ রাজকর্মচারী গুপ্ত ঘাতকের হাতে প্রাণ বিসর্জন দিতে বাধ্য হয় । বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত বন্দোমাতরম্ সঙ্গীত খুব জনপ্রিয়তা লাভ করে ।এই সময় বিভিন্ন স্থানে গুপ্ত সমিতি ও গঠিত হয় ।সন্ত্রাসবাদ দমন করার জন্য ব্রিটিশ সরকার নানা প্রকার দমন মূলক আইন প্রনয়ণ করে ।স্যার আন্ড ফ্রেজার ও কিংস ফোর্ডকে হত্যা করার চেষ্টা করা হয় ।কিংসফোর্ডকে হত্যার চেস্টায় ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী ১৯০৮ খ্রীঃ মৃত্যুবরণ করেন ।এই বছরই বিপ্লবী আন্দোলনে জড়িত থাকার অভিযোগে অরবিন্দ ঘোষ , বারীন ঘোষ , কানাই লাল দত্ত এবং কৃষ্ণ কুমার মিত্র সহ ন'জন জননেতাকে দ্বীপান্তরে প্রেরণ করে ।

বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত ও তার সরকারী ঘোষণা সারা বাংলাদেশে এক তীব্র ও ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে । সমাজের সকল শ্রেণীর ও সকল স্তরের মানুষ এবং সংবাদপত্র পত্রিকা এই দুরভিসন্ধি মূলক আদেশের প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠে । বিভিন্ন সভা সমিতিতে বঙ্গ ভঙ্গের নিন্দা করে এবং এই সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবি জানিয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয় ।স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের সরকার ভারত দাবি জানিয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয় ।স্থানীয় কর্তৃপক্ষ , বাংলাদেশের সরকার ভারত সরকার ও ইংল্যান্ডের কর্তৃপক্ষের কাছে শত শত প্রতিবাদ পত্র পাঠানো হতে থাকে । বিভিন্ন মেলা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে গণ স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয় । কিন্তু এই সব প্রচেষ্টার নিস্ফলতা জনগণকে এক ব্যাপকতর ও বৃহত্তর আন্দোলনের জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প করে তোলে ।

সঞ্জীবনী কাগজের সম্পাদক কৃসনকুমার মিত্র দেশবাসীকে বিদেশী দ্রব্য ও স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের সঙ্কল্প গ্রহণের জন্য আহ্বান জানালে তা সর্ব সাধারণের মধ্যে বিপুল সাড়া জাগায় । বঙ্গদর্শন পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙালী সমাজের অটুট মনোবলের স্থির সংকল্পের কথা পুনঃ ঘোষণা করেন । ছাত্র সমাজের মধ্যেও এক অভূতপূর্ব উন্মাদনার সৃষ্টি হয় । বঙ্গভঙ্গ রোধে ও বন্দোমাতরম্ মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হয়ে হাজার হাজার ছাত্র বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতির ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে যোগ দিতে থাকে । বিভিন্ন সংবাদপত্র পত্রিকা এবং সাহিত্যের মাধ্যমে " বয়কট ও স্বদেশী " এই দুই আদর্শ ও লক্ষ্য ছড়িয়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ , দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রজনীকান্ত সেন প্রমুখ কবিদের গান , কবিতা নাটক প্রভৃতি জনগণের স্বদেশপ্রেম ও ভাবাবেগ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে । " ব্রতী সমিতি " সনাতন সম্প্রদায় বন্দেমাতরম্ সোসাইটি প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গুলোর স্বদেশী ভাবধারা প্রচার ও স্বদেশ প্রেমের

বিকাশের তৎপর হয় । সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯০৫ খ্রীঃ ১৬ই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত কার্যকরী হয় । রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাব অনুযায়ী ঐ দিনটি " রাখী বন্ধন " দিবস রূপে পালিত হয় । পূর্ব বাংলা , পশ্চিম বাংলা , ধনী দরিদ্র , হিন্দু , মুসলমান খ্রীষ্টান নির্বিশেষে , বাঙালী জাতির ভ্রাতৃত্ব ও অবিচ্ছেদ্য ঐক্যের কথা ঘোষণা করাই ছিল এই উৎসবের তাৎপর্য্য । রবীন্দ্রনাথের ভাষায় " কোন শক্তি মদমত্ত রাজ শক্তিই বাঙালীর ঐক্যকে ভাঙ্গতে পারবে না । " এ কথাই প্রমাণিত হল রাখী বন্ধন উৎসবে । রাখী বন্ধন ছাড়া ঐ দিনটি " অরন্ধন দিবস" রূপেও পালন করা হয় । সমগ্র বাঙালী জাতি সেদিন রন্ধন না পালন করে ব্রিটিশ সরকারের স্বৈরাচারী নীতির মৌল প্রতিবাদ জানায় ।

বঙ্গভঙ্গের দিনটিতে জন জীবনের স্রোত বন্ধ হয়ে যায় । স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ বিক্ষোভ শোভাযাত্র ও জনসভার মধ্যদিয়ে বাংলার মানুষ বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে । অল্প কালের মধ্যেই আন্দোলন এক বিরাট গণ অভ্যুত্থানের আকার ধারণ করে এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূত্রপাত করে ।

বিদেশী দ্রব্য বর্জন বা বয়কট ও স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার বা 'স্বদেশী' এই দুই ছিল আন্দোলনের প্রধান আদর্শ ও কর্মসূচী । এই দুই লক্ষ ও নীতি ছিল পরস্পরের সমপূরক । বিদেশী দ্রব্য বর্জন কার্যকরী না হলে স্বদেশী দ্রব্যের উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি সম্ভব ছিল না । তেমনি উপযুক্ত স্বদেশী পণ্যদ্রব্য সহজলভ্য না হলে প্রয়োজনীয় বিদেশী দ্রব্য সম্পূর্ণ বর্জন করা ছিল দুঃসাধ্য। বিদেশী দ্রব্য বর্জনের আর একটি লক্ষ ছিল যে " বয়কট " আন্দোলনের সফল হতে ক্ষতিগ্রস্থ ইংরেজ বণিকরা ব্রিটিশ সরকারকে তাদের নীতি পরিবর্তনের জন্য চাপ দিতে বাধ্য হবে । তা ছাড়া , সুলভ ও উৎকৃষ্ট বিদেশী দ্রব্যের পরিবর্তে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের ফলে জনসাধারণ স্বাধীনতার জন্য আত্মত্যাগ ও কষ্ট স্বীকারে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে । তাদের মনোবল ও আত্মনির্ভরতা বোধ বৃদ্ধি পাবে । স্বদেশী ভাবধারায় অনুপ্রেরণায় বহু কাপড়ের কল , ব্যাঙ্ক , মোজা গেঞ্জি , সাবান , চামড়া , ঔষধ ইত্যাদি কারখানা , বীমা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি গড়ে ওঠে । স্বদেশী দোকান ও বিভিন্ন স্থানে খোলা হয় । কুটির শিল্পের উন্নতি হতে শুরু করে । দলে দলে স্বেচ্ছাসেবক বাড়ী বাড়ী ঘুরে স্বদেশী দ্রব্য বিক্রি করতে শুরু করে । জনসভা,মিছিল, বিদেশী দ্রব্যের মহোৎসব , পিকেটিং , দেশাত্মবোধক সঙ্গীত ও বক্তৃতার মাধ্যমে স্বদেশী আন্দোলনের দুর্বার গতি অব্যাহত থাকে । সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় , বিপিন চন্দ্র পাল , অশ্বিনী কুমার দত্ত , অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এই আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী ও গণভিত্তিক করে তুলতে সচেষ্ট হন । বয়কট আন্দোলনের আর একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিদেশী শিক্ষা বর্জন কিন্তু বিদেশী পদ্ধতিতে গড়ে ওঠা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিত্যাগ করে বিকল্প শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাতে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পায় সে জন্য আন্দোলনের নেতৃবর্গ গভীরভাবে চিন্তা করতে শুরু করেন । এই উদ্দেশ্যে ১৯০৬ খ্রীঃ ১১ই মার্চ " জাতীয় শিক্ষা পর্ষদের দায়িত্ব লাভ করেন অরবিন্দ ঘোষ । জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার

জন্য রাজা সুবোধ চন্দ্র মল্লিক এক লক্ষ টাকা এবং পরে ময়মনসিংহের জমিদারগণ প্রচুর টাকা পয়সা দান করেন । এই সব দান ছাড়াও সাধারণ লোকও জাতীয় শিক্ষা পর্ষদের তহবিলে প্রচুর অর্থ দান করেন । সাধারণ মানুষের স্বেচ্ছা সেবায় এবং অকৃপন দানে রাতারাতি গড়ে উঠল পশ্চিমবঙ্গে ১১/১২ টি এবং পূর্ব বঙ্গে ৪০টি স্কুল । জন্ম হল যাদবপুরকারিগরি কলেজের যার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে বর্তমানের যাদবপুর বিশ্ব বিদ্যালয় ।

জাতীয় আন্দোলনের উৎস ছিল জাতীয় সংস্কৃতি ঐতিহ্য এবং জাতির মানসিকতার ভিত্তিতে জাতির প্রয়োজন মেটানো এবং আশা আকাঙ্খা পুরণের জন্য বিদেশী শাসনের ঔপনিবেশিক ভাবধারা নিয়ন্ত্রণের বাহিরে এক স্বয়ং সম্পূর্ণ শিল্প ব্যবস্থা গড়ে তোলা । তাই জাতির অতীতকে জানবার জন্য জাতীয় স্কুলগুলোর পাঠ্যক্রম ভারতের ইতিহাস পাঠের গুরুত্ব দেওয়া হয়। অপর দিকে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে গুরুত্ব দেওয়া হল কারিগরী বিদ্যার উপর । মাতৃভাষা ও সাহিত্য এবং উচ্চতর স্তরে মানবিক বিদ্যার সঙ্গে বিজ্ঞান চর্চাকে উৎসাহ দানের ব্যবস্থা করা হয় ।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে ১৭ই জানুয়ারী সুভাষচন্দ্র স্বগৃহে অন্তরীণ অবস্থা থেকে ছদ্মবেশে দেশ ত্যাগ করেন এবং কাবুল উপস্থিত হন । কাবুল থেকে তিনি বার্লিনে যান । জার্মানীতে উপস্থিত হয়েই তিনি জার্মান পররাষ্ট্র মন্ত্রী রিবেনট্রপের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ইউরোপে ভারতীয় মুক্তি যুদ্ধ পরিচালনার পরিকল্পনা পেশ করেন । ইতিমধ্যে ১৯৪১ খ্রীঃ ৭ই ডিসেম্বর জাপান ব্রিটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং পার্ল হারবারের মার্কিন ঘাঁটির উপর বোমা বর্ষন করে । ফলে প্রাচ্য রণাঙ্গনে জটিলতার সৃষ্টি হয় । দ্রুতগতিতে জাপান দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কতৃত্ব স্থাপন করে । ১৯৪২ খ্রীঃ ১০ই মার্চ জাপান সিঙ্গা পুর মার্চ মাসের প্রথম দিকে ব্রহ্মদেশ অধিকার করে । জাপানের দ্রুত সাফল্যে ব্রিটিশ সরকারের মনে ত্রাসের সৃষ্টি হয় । ভারতের নিরাপত্তা বিধানের জন্য তারা ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনার জন্য ব্রিটিশ মন্ত্রীসভার সদস্য স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে ভারতে পাঠান । কিন্তু তার প্রস্তাব ভারতের জাতিয়তাবাদী আন্দোলনের আশা আকাঙ্খা পূরণে ব্যর্থ হয় । অপর দিকে জাপানের অভাবনীয় সাফল্য দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের মনে দারুন উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। স্থানীয় ভারতীয়দের সঙ্ঘবদ্ধ করে মুক্তি আন্দোলন সংগঠিত করার জন্য জাপানে প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী রাস বিহারী বসু উদ্যোগী হন ।১৯৪২ খ্রীঃ ১৫জুন ব্যাংককে ভারতীয়দের এক সমাবেশে তিনি ভারতীয় ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা উত্তোলন করেন এবং তার উদ্যোগে ভারতীয় জাতীয় সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয় । এই সম্মেলনে গৃহীত এক প্রস্তাবে সুভাষ চন্দ্র বসুকে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার আগমনের জন্য আমন্ত্রণ করা হয় । ইতিমধ্যে ১৪ নং পাঞ্জাব রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন মোহন সিং এর প্রচেষ্টায় সিঙ্গাপুরের পতনের পর যুদ্ধবন্দী ভারতের সৈন্যদের সংঘবদ্ধ করে আজাদ হিন্দ বাহিনীর গঠনের পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়। অপর দিকে ব্যাঙ্ককে সম্মেলনে ভারতীয় সংঘ সুভাষ চন্দ্রকে

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার কার্য পরিচালনার জন্য আমন্ত্রণ জানালে তিনি তা সাদরে গ্রহন করেন । কিন্তু যুদ্ধ কালীন পরিস্থিতিতে জার্মনী থেকে জাপানে উপস্থিত হওয়া কোন ক্রমেই নিরাপদ ছিল না । তথাপি ১৯৩৪ খ্রীঃ ৮ই ফেব্রুয়ারী জার্মানী ত্যাগ করে সাবমেরিনের সাহায্যে সুভাষচন্দ্র টোকিও অভিমুখে যাত্রা করেন এই দুঃসাহসিক অভিযান সমাপ্ত করে ১৬ই মে তিনি টোকিও পৌঁছান ।

টোকিও পৌঁছেই তিনি এক সাংবাদিক সম্মেলনে জাপানের সাহায্যে ভারতে সশস্ত্র সংগ্রাম করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তারপরে সুভাষ চন্দ্র সিঙ্গাপুরে এসে উপস্থিত হন এবং ২রা জুলাই রাস বিহারী বসুর কাছ থেকে ভারতীয় স্বাধীনতা সংঙ্ঘের দায়িত্ব গ্রহণ করেন । উপস্থিত ভারতীয়গণ সানন্দে তার নেতৃত্বে স্বীকার করেন এবং তাকে " নেতাজী" নামে অভিহিত করেন ।

সিঙ্গাপুরে উপস্থিত হওয়ার পরই সুভাষচন্দ্র ভারতের অভিযান পরিচালনার জন্য সামরিক বাহিনী পূর্ণ গঠন ও অস্থায়ী জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা শুরু করেন । ১৯৪৩ খ্রীঃ২৫ শে আগষ্ট নেতাজী আনুষ্ঠানিকভাবে আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়কের পদ গ্রহন করেন এবং সৈন্য বাহিনীর উন্নতি ও শৃঙ্খলা বিধানের দিকে মনোযোগ দেন । আজাদ হিন্দ বাহিনীর পূর্বে মোট সৈন্যসংখ্যা ছিল তেরো হাজার । তিনি তা পঞ্চাশ হাজারে পরিণত করেন । নেতাজী আজাদ হিন্দ বাহিনীকে তিনটি বিভাগে বিভক্ত করেন এবং নারী , পুরুষ উভয় ধরনের বাহিনী গঠন করেন । সৈন্যদের জন্য তিনি ঝাঁসি বাহিনী নামে একটি ব্রিগেড গঠন করেন । প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের জন্য তিনি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের নিকট আবেদন করেন । সেনাবাহিনীর পূর্ণ গঠিত করার পর নেতাজী অস্তায়ী সরকার গঠনের কাজে ব্রতী হন । সিঙ্গাপুরে ভারতীয় স্বাধরীনত সংঘের অধিবেশনে তিনি আজাদ হিন্দ সরকার গঠনের কথা ঘোষণা করেন, । নেতাজীর মতে তার সরকারের প্রধান লক্ষ্য হল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শেষ চূড়ান্ত সংগ্রাম পরিচালনা করা এবং ভারতের মাটিতে বিদেশী শাসনের অবসান ঘটানো । তিনি আশা করেন যে এই সরকার ভারতের মাটিতে স্থানান্তরিত হওয়ার পর স্থায়ী জাতীয় সরকারের স্থান গ্রহন করবে । অস্থায়ী সরকারের মূল ধ্বনি হল জয়হিন্দ ও দিল্লী চলো । জাতীয় সরকারের রাষ্ট্রভাষা হল হিন্দুস্থানী । কংগ্রেসের ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা জাতীয় পতাকার মর্যাদা পায় এবং রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের " জনগণ মন " গানটি জাতীয় সঙ্গীত রূপে নির্বাচিত হয় । শীঘ্রই জাপান , জার্মানি , ইতালি ও অন্য ছটি রাষ্ট্র আজাদ হিন্দ সরকারের স্বীকৃত দান করে । ১৯৪৩ খ্রীঃ ২৩শে অক্টোবর আজাদ হিন্দ সরকার ইংল্যান্ডে - আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ।

১৯৪৩ খ্রীঃনভেম্বর মাসে নেতাজী টোকিও শহরে অনুষ্ঠিত বৃহৎ পূর্ব এশিয়া শান্তি সম্মেলনে যোগ দেন । এই সম্মেলনে ব্রহ্মদেশের প্রধানমন্ত্রী ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সর্বাত্মক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন । জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজো ভারতের মুক্তি যুদ্ধে জাপানের সাহায্য দানের কথা ঘোষণা করেন । জাপানের সহযোগীতার নিদর্শন স্বরূপ আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ১৯৪৩ খ্রীঃ

ডিসেম্বর মাসে আজান্দ হিন্দ সরকারের হাতে সমর্পন করা হয় । এই সম্মেলনের পরেই নেতাজী ভারতের মুক্তি সাধনের উদ্দেশ্যে সর্বাত্মক সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হন । জাতীয় হিন্দ বাহিনী সশস্ত্র অভিযানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে । ১৯৪৪খ্রীঃ জানুয়ারী মাসে নেতাজী আজাদ হিন্দ সরকার ও আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রধান কর্মকেন্দ্র রেঙ্গুনে স্থানান্তরিত করেন । কারণ ব্রহ্মদেশকে ভিত্তি করে ভারতের উপর সামরিক অভিযান পরিচালনা করা সহজতর । এই সময় সুভাষ চন্দ্র সম্মিলিত জাপানী ও আজাদ হিন্দ বাহিনীর পক্ষ থেকে চট্টগ্রাম আক্রমণ করার প্রস্তাব করেন । জাপান এই প্রস্তাবে আপত্তি জানায় কারণ জাপানী সামরিক কর্তৃপক্ষ আজাদ হিন্দ বাহিনীকে সম মর্যাদা দেওয়ার পক্ষপাতী ছিল না । কিন্তু সুভাষচন্দ্র বসু আজাদ হিন্দ বাহিনীকে জাপানী সৈন্যের সহায়ক বাহিনী রূপে ব্যবহার করার বিরোধী ছিলেন । তাঁর মতে , ভারতের মাটিতে মুক্তি যুদ্ধে আজাদ হিন্দ বাহিনীর সৈন্যরাই প্রথম রক্তবিন্দু দান করবে । শেষ পর্যন্ত সুভাষ বসুও জাপানী সৈন্যাধ্যক্ষ , কাওয়ারের মধ্যে আলোচনার ভিত্তিতে স্থির হয় যে আজাদ হিন্দ বাহিনী এবং জাপানী বাহিনীর যৌথ ভাবে আরাকান ফ্রন্ট আক্রমণ করবে এবং ইম্ফল অভিমুখে অগ্রসর হবে । মার্চের প্রথম দিকে অভিযান শুরু হয় এবং মাসের শেষ দিকে ইমফলের পতন ঘটে । এপ্রিলের প্রথমদিকে কোহিমা অবরুদ্ধ হয় । এই সময় ঠিক হয় যে বর্ষার পর আজাদ হিন্দ ফৌজ আসাম হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করবে । কিন্তু মে মাসের শেষ দিকে আজাদ হিন্দ বাহিনী যখন কোহিমায় এসে উপস্থিত হয় তখন জাপানের সামরিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। এই সুযোগে ইম্ফল ও কোহিমার ব্রিটিশ সৈন্যদের ব্যাপক সমাবেশ শুরু হয় । তবু আজাদ হিন্দ বাহিনী তাদের দখলীকৃত স্থানগুলো রক্ষার জন্য বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে । কিন্তু বর্ষার সমাগমে জাপানী সৈন্যদের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে পড়ায় আজাদ হিন্দ বাহিনী সৈন্যরা রণাঙ্গন পরিত্যাগ করতে শুরু করে ।

আজাদ হিন্দ ফৌজের ব্যর্থতা সত্বেও ভারতের জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাসে তার অভিযানের গুরুত্ব অপরিসীম । ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে আজাদহিন্দ বাহিনীর যে পরোক্ষভাবে সাহায্য সক্রিয় ছিল তা সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় । ব্রিটিশ সরকার এই সময় থেকেই স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করে যে ভারতের উপর তাদের আধিপত্য বেশি দিন বজায় রাখা সম্ভব নয় । আজাদ হিন্দ বাহিনীর দৃষ্টান্তে উদ্বুদ্ধ হয়েই নৌবাহিনী বিদ্রোহের পথ গ্রহণ করে । ভারতের জন সাধারণও এই বাহিনীর কার্যকলাপে মুগ্ধ হয়ে পড়ে । তাই সরকার যখন ঘোষণা করে যে ব্রিটিশ রাজ্যের প্রতি অনুগত্য ভঙ্গ এবং রাজদ্রোহের অপরাধে আজাদ হিন্দ বাহিনীর উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিদের বিচার করা হবে তখন সারা দেশে প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠে । এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ সারা দেশে গণ বিক্ষোভ দেখা দেয় । সকলেই জাতীয় বাহিনীর অফিসারদের মুক্তি দাবি করে ভুলাভাই দেশাই , তেজ বাহাদুর সাপ্রু , কৈলাস নাথ কাটজু , আসফ আলি প্রমুখ আইনজীবিদের নিয়ে জাতীয় কংগ্রেস একটি কমিটি গঠন করে এবং

বিচারাধীন অফিসারদের পক্ষ সমর্থনের দায়িত্ব এই কমিটি গ্রহণ করে । দিল্লীর লালকেল্লায় নাটকীয় বিচার কার্য সম্পাদিত হয় এবং কোর্ট মার্শালে বিচারাধীন সকল অফিসারই দোষী সাব্যস্ত এবং তাদের দন্ডাদেশ দেওয়া হয় । কিন্তু শেষ পর্যন্ত জনমতের কাছে সরকারের নতি স্বীকার করতে হয় এবং সকল নেতাই সসম্মানে মুক্তি লাভ করেন ।

ভারতে বিপ্লবী আন্দোলনের সূচনা মহারাষ্ট্রে হলেও এই আন্দোলন বাংলাদেশেই সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যাপকতা লাভ করে। ১৮৬০ খ্রীঃ পর থেকেই বাংলাদেশে গুপ্ত সমিতি গঠনের প্রচেষ্টা দেখা দেয় । নবগোপাল মিত্রের নেতৃত্বে হিন্দুমেলা সংগঠন ও ঠাকুর পরিবারের উদ্যোগে সঞ্জীবনী সভা সম্প্রদায়কে নুতন ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করে তোলে । বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং স্বামী বিবেকানন্দের রচনা ও যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে নতুন চেতনার সৃস্টি করতে সমর্থ হয় । ফলে ১৯০২খ্রীঃ কলকাতায় তিনটি ও মেদিনীপুরে একটি গুপ্ত সমিতি গঠিত হয় । এই সব সমিতির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল অ নুশীলন সমিতি অনুশীলন সমিতির নামের সঙ্গে এই সংস্থার সভাপতি ব্যারিস্টার পি মিত্রের নাম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত থাকলে ও ১৯০২ খ্রীঃ ২৪ শে মার্চ সতীশ চন্দ্র বসুর প্রচেষ্টার ফলেই বাস্তব রূপ গ্রহণ করে এবং শরীরা চর্চার সংস্থা রূপে আত্ম প্রকাশ করে । বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দ মঠের অনুকরণে এই সমিতির নাম করণ করা হয় । কিছুদিন করে " যুগান্তর " নামে একটি দল গঠিত হয়। ইতিমধ্যে ১৯০১ খ্রীঃ অরবিন্দ ঘোষ বরোদা থেকে তরুন বিপ্লবী যতীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়কে কলকাতায় পাঠান এবং তিনি অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন । বাংলাদেশের তদানীন্তন প্রায় সকল জাতীয়তাবাদী নেতার সঙ্গেই অনুশীলন সমিতির সর্ম্পক গড়ে ওঠে । ক্রমশ কলকাতার বাহিরে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে এই সমিতির শাখা গড়ে ওঠে এবং কলকাতার সমিতির প্রধান কার্যালয় স্থাপিত হয় ।

তবে ১৯০৫ খ্রীঃ পূর্বে অনুশীলন সমিতি ও বাংলাদেশের অন্যান্য সমিতিগুলো শরীর চর্চা , লাঠিখেলা প্রভৃতি কাজে নিয়োজিত ছিল এবং সক্রিয় রাজনৈতিক কার্যকলাপে জড়িত ছিল না । কিন্তু ১৯০৫ খ্রীঃ বঙ্গভঙ্গ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত হলে বাংলাদেশের বৈপ্লবিক আন্দোলন নতুন রূপ গ্রহন করে । ১৯০৬ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশের বিপ্লবীরা প্রথম নিখিল বঙ্গ সম্মেলন আহ্বান করেন এবং এই সম্মেলনের ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের বিপ্লবীদের মধ্যে সংহতি দৃঢ়তর হয় তবে বাংলাদেশের বৈপ্লবিক তৎপরতা প্রকাশ্য ও গোপন এই দুটি খাতে প্রবাহিত হয় । একটি গোষ্ঠী নিষক্রিয় প্রতিরোধের মাধ্যমে প্রকাশ্যভাবে আন্দোলন পরিচালনার পক্ষপাতি ছিল । অপর দলটি ব্রিটিশ শাসনযন্ত্র বিকল করার উদ্দেশ্যে গুপ্ত হত্যার মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের পথ অবলম্বন করে । হিংসাত্মক আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্র কুমার ঘোষ , ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত , অবিনাশ ভট্টাচার্য , উপেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন।

জনগণের মধ্যে বিপ্লবী আদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে বারীন্দ্র কুমার ঘোষ " ভবানী মন্দির " নামক একটি গল্প প্রকাশ করেন । অরবিন্দ বোসের " বন্দেমাতরম " এবং ব্রহ্মাবান্ধব উপাধ্যায় সম্পাদিত " সন্ধ্যা" পত্রিকা ও এই বিষয়ে বিশেষ ভূমিকা পালন করে । পরে বৈপ্লবকি কর্মসূচী রূপায়নের জন্য অর্থের প্রয়োজন দেখা দিলে বিপ্লবী সংঘগুলো রাজনৈতিক ডাকাতি শুরু করে । ১৯০৭ খ্রীঃ বাংলার বিপ্লবীদল সর্ব প্রথম গুপ্ত হত্যার পরিকল্পনা গ্রহণ করে । এই সময় তারা পূর্ব বঙ্গও আসামের লেখটেন্যান্ট গভর্নর ব্যামফিল্ড কুলারকে হত্যার চেষ্টা করে । কিন্তু তাদের এই চেষ্টা ব্যর্থ হয় । ইতিমধ্যে রবীন্দ্র কুমার ঘোষ, হেমচন্দ্র কানুনগো, উল্লাস কর দত্ত প্রভৃতি মানিক তলার মুরারী পুকুর অঞ্চলে বোমা প্রস্তুত করার কারখানা নির্মান করেন এবং তারা ইংরেজ কর্মচারীদের হত্যা করে শাসন যন্ত্র বিকল করার সংকল্প গ্রহণ করেন । অত্যাচারী প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড তাদের প্রধান লক্ষ্যে পরিণত হন । ব্রিটিশ সরকার কিংসফোর্ডকে কলকাতা থেকে মজঃফরপুরে বদলি করে। ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী নামক দুজন তরুন বিপ্লবীর উপর কিংসফোর্ডকে হত্যার দায়িত্ব দেওয়া হয় । কিন্তু তাদের নিক্ষিপ্ত বোমার আঘাতে মিসেস কেনেডি ও মিস কেনেডি নামে দুইজন নিরপরাধ মহিলা মারা যায় । পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য প্রফুল্ল চাকী নিজের গুলিতে আত্মহত্যা করেন । কিন্তু ক্ষুদিরাম ধরা পড়েন এবং বিচারে তার প্রাণদন্ড হয় । অপর দিকে মুরারী পুকুরের বিপ্লবীদের আস্তানায় হানা দিয়ে পুলিশ অরবিন্দ ঘোষ সহ ছিষট্টি জন বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করে এবং আসামীদের বিরুদ্ধে বিখ্যাত আলিপুরের বোমার মামলা শুরু হয় । এই সময় নরেন গোসাই নামক একজন দুর্বল চিত্ত বিপ্লবী পুলিশের নিকট অনেক গোপন তথ্য ফাঁস করায় ঐ মামলার অপর দুই আসামী কানাই লাল দত্ত ও সত্যেন বসু নরেন গোসাইকে জেলের মধ্যেই গুলি করে হত্যা করেন । ফলে কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন বসুর ফাঁসি হয়। আলিপুর বোমার মামলায় ব্যারিস্টার চিত্ত রঞ্জন দাসের প্রচেষ্টায় অরবিন্দ ঘোষ খালাস পেলেও অপরাপর আসামীদের অনেকেরই যাবজ্জীবন দীপান্তর হয় ।

আলিপুর বোমার মামলার পর বাংলার সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন কিছু পরিমানে নিস্ক্রিয় হয়ে পড়ে । সক্রিয় রাজনীতি থেকে অরবিন্দের বিদায় গ্রহন সরকারের কঠোর দমন নীতি এবং অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর দল নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হলে বিপ্লবীদের কার্যকলাপ অনেকাংশে বন্ধ হয়ে যায় । তাছাড়া এই সব বিপ্লবীদের প্রকৃতি গত পরিবর্তন দেখা দেয় । প্রথম দিকে হিন্দু ধর্মের সঙ্গে বিপ্লবীদের ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টা হলেও পরে এই সম্পর্ক ছিন্ন করা হয় ।

বিপ্লবীদের কর্মপন্থা সংক্রান্ত ব্যাপারে ও পরিবর্তন ঘটে এবং বিক্ষিপ্ত ভাবে বোমা নিক্ষেপের পরিবর্তে সার্থক বিপ্লবের জন্য কৃষক শ্রমিক ও সৈন্য বাহিনীর মধ্যে সভা গঠনের দিকে দৃস্টি দেওয়া হয় এবং বৈদেহিক সাহায্যের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহনের কর্মসূচী তৈরী করা হয় । তা সত্বেও ১৯০৮

থেকে ১৯১৭ খ্রীঃ মধ্যে বিপ্লবীগণ প্রায় ৬৪ জন সরকারী কর্মচারীকে হত্যা বা হত্যাকরার চেষ্টা করেন তার মধ্যে ১৯০৮ খ্রীঃ বাংলার ছোটলাট ফ্রেজারকে হত্যার চেষ্টা , পুলিশ সাব ইনসপেক্টর নন্দলাল বন্দোপাধ্যায়কে হত্যা, ১৯০৯ খ্রীঃ সরকারী উকিল আশুতোষ বিশ্বাসকে হত্যা , ১৯১০খ্রীঃ পুলিশ অফিসার সামসুল আলমের প্রাণ নাশ প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ।

বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন " সাহিত্যের কর্মযোগী " সুতরাং তিনি রাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন কিনা তা বড় প্রশ্ন নয় । আসল কথা হল বঙ্কিমের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এবং তা দেশের রাজনৈতিক ভাবনায় কতটা সহায়ক হয়েছে ।

বঙ্গদর্শন এর প্রথম দিকে তাঁকে রাজনীতি সম্পর্কে বিমুখ দেখা যায় নি । তবে তার অনেক খানিই ঐতিহাসিক তাড়নায় এবং স্বদেশ চিন্তার প্রনোদিত। বাঙালির " বাহুবল " " ভারত কলঙ্ক" ভারত বর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা" প্রাচীন ভারতের রাজনীতি , বাংলার ইতিহাস, বাংলার কলঙ্ক" প্রভৃতি বহু রাজনৈতিক রচনা । অনেক গুলো লেখা আবার সমাজতাত্ত্বিক চিন্তায় ও পরোক্ষভাবে স্বদেশচিন্তায় উদ্বুদ্ধ । " সাম্য" বঙ্গদেশের কৃষক এবং কমলাকান্তের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত উক্তি এই শ্রেণীর অন্তর্গত । প্রথম শ্রেণীর লেখাগুলোতে যে মূল রাজনীতি ভাবনার ও চেতনার সূত্রপাত বঙ্কিমচন্দ্র করে ছিলেন তা শিক্ষিত শ্রেণীকে স্বদেশ বিষয়ে সচেতন করে তোলার কথা পরাজিত বাঙালী ও ভারতবাসীকে কিছুটা উৎসাহ দানের ও কথা । অন্যান্য অনেক লেখাই জাতীয়তার উদ্বোদন হিসাবে রাজনীতি সম্পর্কিত কমলাকান্তের পত্রের পলিটিক্স্ বিশ্লেষণ, কুকুর জাতীয় ও বৃষ জাতীয় পলিটিকসের ব্যাখ্যা একদিন যেমন উপভোগ্য তেমনি অপর দিকে বাস্তব রাজনৈতিক বোধের প্রমাণ। বঙ্কিমচন্দ্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য কীর্তি হিন্দু ধর্মের গৌরব প্রতিষ্ঠা । বারে বারে তিনি হিন্দু ধর্মের গৌরব প্রতিষ্ঠার জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন । এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে হিন্দু ধর্মের ও হিন্দু সমাজের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রে আনুগত্য জন্মগত। যুগ শিক্ষায় সুশিক্ষিত যোগের জ্ঞান বিজ্ঞানের সহায়তায় তিনি হিন্দু ধর্মের পক্ষে যা করেন তা তাঁর প্রতিভার পরিচয়। হিন্দু ধর্মের সমস্ত শাস্ত্রকে আপন অভিপ্রায় অনুযায়ী পরীক্ষা করে ,বিচার করে , যুক্তি পর যুক্তির সহযোগীতায় উক্ত নিস্কাম ধর্মকেই একমাত্র হিন্দু ধর্ম রূপে ব্যাখ্যা ও কৃষ্ণকে আদর্শ মনুষ্যরূপে স্থাপন , জন্মগত বিশ্বাসকে যুগ সঙ্গত যুক্তির ধারাতেই পুষ্ট করে তিনি একটি নতুন দিকের উন্মোচন করেন । বঙ্কিমের এই প্রচেস্টা সমকালীন চিন্তাশীল ব্যক্তিদের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল । রমেশ চন্দ্র দত্তের লেখা থেকে জানা যায় । তিনি বলেন যে আধুনিক যুগ গ্রাহ্য হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু সমাজ গঠনের চেষ্টায় প্রথম বঙ্কিমই অগ্রনী হন । সংক্ষেপে বলা যায় যে বঙ্কিমের মধ্যে দিয়ে হিন্দু ধর্মের পুন জীবনের আভাস দেখা যায়। সমাজ সংস্কার অপেক্ষা সংরক্ষণের দিকে তাঁর বেশি ঝোঁক থাকলেও তিনি কট্টর গোড়াপন্থী ছিলেন না । বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন জীবননিষ্ট এবং মানবতাবাদী সুতরাং তিনি মানবীয় , বৃত্তি সমুহের সামঞ্জস্যপূর্ণ

বিকাশের মধ্যে দিয়ে সর্বাঙ্গীন পুরুষার্থ লাভের কথা বলেছেন । ধর্মতত্ত্ব ও কৃষ্ণ চরিতের মাধ্যমে তিনি হিন্দু ধর্মের নানা দিক সম্পর্কে সংগর্ভ আলোচনা করেন । বঙ্কিম কায়মনোবাক্যে হিন্দু ধর্মের উজ্জ্বল ভবিষ্যতে বিশ্বাস করতেন । সে জন্য তিনি বলেন ," সেদিন ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও শিল্প ও ভারতের নিস্কাম কর্ম একত্র হইবে সে দিন মনুষ্য দেবতা হইবে ।

বঙ্কিমচন্দ্রের রাজনৈতিক মতবাদ স্পষ্টভাবে প্রকাশিত না হলেও তার রাজনৈতিক আদর্শ ভারতীয় বিশেষভাবে বাংলার রাজনীতির উপর তার গভীর প্রভাব বিস্তার করে । তাঁর দেশপ্রেম , রাজনৈতিক দর্শন বহু রাজনীতিবিদকেই উদ্বুদ্ধ করে তোলে । তার সম্পর্কে বলা হয় যে তিনি স্বদেশ প্রেমকে ধর্মের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে সম্মত হন । শ্রী অরবিন্দ , বঙ্কিমচন্দ্রের এই চিন্তা ধারাকেস্বদেশ প্রেমের ধর্ম বলে বর্ণনা করেন । ডক্টর রমেশ চন্দ্র মজুমদার প্রায় অনুরূপ মত প্রকাশ করে বলেন, যে তিনি স্বদেশ প্রেমকে ধর্ম এবং ধর্মকে স্বদেশ প্রেমে পরিণত করতে সমর্থ হয় । কিন্তু স্বদেশ প্রেম ও ধর্ম বঙ্কিমচন্দ্রের কাজ সমর্থন ছিল সে কথা মনে করলে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি অবিচার করা হবে ।

তার মানব প্রেম সমাজ , কাল ও দেশের গন্ডী অতিক্রম করে এক বিশ্বজনীন মানবতাবাদে পরিণত হয় । প্রকৃত পক্ষে তার মানব প্রেম স্বদেশ প্রেম অপেক্ষা ও অনেক বেশী গভীর ছিল । তিনি পাশ্চাত্য দেশে অনুসৃত স্থাপত্যবোধ ও দেশ প্রেম সম্পর্কে খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন না এবং ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায় যে পাশ্চাত্যের অনুকরণ করে স্বদেশ প্রেমের নতুন ব্যাখ্যা দিতে শুরু করেন বঙ্কিমচন্দ্র তাও পছন্দ করতে পারেন নি । বঙ্কিমচন্দ্রের মতে সমস্ত প্রাণীকে সমভাবে ভালবাসা অসম্ভব সুতরাং স্বদেশ প্রীতিকেই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে মনে করা উচিত । তার নিজের ভাষায় " সকল ধর্মের উপর স্বদেশ প্রীতি" । তার এই স্বদেশ প্রীতির চিন্তাধারা ভারতের চরমপন্থী রাজনৈতিক মতবাদ গড়ে তুলতে অনেকাংশে সাহায্য করে বিশেষতঃ এই ব্যাপারে " আনন্দমঠ " ও তার অন্তর্ভুক্ত " বন্দেমাতরম" ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নিকট গভীর অনুপ্রেরণা রূপে দেখা যায় । আনন্দমঠের সন্ন্যাসীগণ অর্থাৎ সন্তানদল চরমপন্থী আন্দোলনকারীদের নিকট আদর্শ রূপে পরিগনিত হতেন । ভারতীয় বিপ্লবীদের কাছে আনন্দমঠ ছিল প্রেরণার প্রতীক নিষ্কাম স্বদেশ প্রেমের দীক্ষায় স্বয়ং সম্পূর্ণ একটি গ্রন্থ । সমগ্র আনন্দমঠ উপন্যাসের প্রাণ বানী " বন্দেমাতরম " ছিল চরমপন্থীদের মহাসঙ্গীত এবং মাতৃমন্ত্র কণ্ঠে নিয়ে তারা যে কোন দুঃসাহসিক কর্মে আত্মনিয়োগ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করতেন না । আনন্দমঠের সন্তান দলের কাছে দেশই ছিল মা। এই গ্রন্থে মায়ের ত্রিমুর্তি প্রদর্শিত হয়েছে । অতীতের গৌরবোজ্জ্বল ভারতবর্ষ " স্বৈরাচারী শাসনে মা হৃত র্স্বস্বা , দেশ শ্মশানে পরিণত হয়েছে মা অন্ধকারাচ্ছন্ন কালী কালিমাময়ী 'মা হইয়াছেন ' দেশ প্রেমিক সন্তান দলের ধ্যাননেত্রে স্বপ্ন সাধন ও কল্পনায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে মায়ের এক ঐশ্বর্যময় মূর্তি - বিদ্যা , বুদ্ধি ,সামরিক বল , ধনেশ্বর্য এবং গণশক্তির অপূর্ব সমন্বয়ে গড়া আগামী দিনের নতুন ভারতবর্ষ মা যা হইবেন । অন্ধকারাচ্ছন্ন কালিমাময়ী

মাকে হৃত সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল আনন্দময়ীর সন্তানদের একমাত্র ধর্ম লক্ষ্য , সাধনা , কামনা ও বাসনা । এই লক্ষ্যেই ধাবিতহত তাঁদের সকল কর্ম প্রয়াস । চরম পন্থীদের নিকট বঙ্কিমচন্দ্রের এই বর্ণনা গভীর প্রভাব সিস্তার করতে সমর্থ হয় এবং তারা কালী মূর্তির আরাধনার দ্বারা শক্তি ও সাহসকে উদ্দীপ্ত করে তোলার চেষ্টা করেন । ডক্টর রমেশ চন্দ্র মজুমদারের মতে আনন্দ মঠ ব্যতীত অন্য কোন উপন্যাস তরুন বাঙালীদের উপর এরূপ গভীর প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি । চরমপন্থী দলের অন্যতম প্রধান নায়ক অরবিন্দ ঘোষ ১৯০৭ খ্রীঃ তার সম্পাদিত বন্দেমাতরম পত্রিকায় লেখেন , যে নতুন শক্তি জাতিকে পুনরুত্থান ও স্বাধীনতার দিকে পরিচালিত করতে সমর্থ হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রই তার উৎসাহদাতা এবং রাজনৈতিক গুরু । অরবিন্দ বঙ্কিমচন্দ্রকে নব ভারতের স্রষ্ঠাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে করতেন । ১৯১০ খ্রীঃ ১০ই এপ্রিল বন্দেমাতরম পত্রিকায় প্রকাশিত।

" ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র " শীর্ষক প্রবন্ধে অরবিন্দ ঘোষ বঙ্কিমচন্দ্রকে " ঋষি" অভিধায় ভূষিত করেন । তিনি , বলেন বঙ্কিমচন্দ্র জাতিকে বন্দেমাতরম মন্ত্রদান করেছেন "

এই প্রবন্ধটি লেখার উদ্দেশ্যে যেমন আমরা এই বরেণ্য মনিষীদের ভুলে না যাই , তাদের কৃত কর্মকে যেন যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করি পাশাপাশি ইতিহাস যেন আমাদেরকে এই মহিমান্বিত গৌরবের কথা স্মরণ করিয়ে আমাদের উন্নত সমাজ , রাজ্য , দেশ ,গঠনে অনুপ্রাণিত করে । ইতিহাসের পর্দায় স্বাক্ষ্য বহন করে , এখানে অর্থাৎ মাতৃমুক্তির আন্দোলনে শুধু একশ্রেণীর মানুষই নয় , খেটেখাওয়া মানুষ থেকে , শুরু করে শ্রমিক শ্রেণী , কৃষক শ্রে ণী , শিক্ষক, প্রফেসর , ডাক্তার, সাহিত্যিক বার্তাজীবী , বৈজ্ঞানিক , ব্যবসায়ী , উকিল ,ব্যারিষ্টার সবাই ঝাঁপিয়ে পড়েন , মাতৃমুক্তির আন্দোলনে । কতিপয় বিশ্বাসঘাতক হয়তো ছিল তা খুবই নগণ্য । যদিও তাদের ইতিহাস ঘৃণার স্মৃতিতে প্রোথিত রাখে । উৎকণ্ঠা ছিল " মা " কে তো বিদেশীর কাছে বন্ধক রাখা যায় না । শৃঙ্খল বদ্ধ করে ও রাখা যায় না তাই মাতৃমুক্তির আন্দোলনে মুক্তির শপথ গ্রহণকারী বীরদের শ্রদ্ধা জানিয়ে , এ কথা বলতেই হয় , যা আমার মুখের ভাষা নয় , বিচক্ষন বরেণ্যদের উচিত , যুবকরাই পারে সমাজ সংস্কারক হতে, যুবকরাই পারে আগামীর মসৃণ রাস্তা তৈরী করতে । আদর্শ সমাজ , রাজ্য , দেশ , তৈরী করতে । সংগৃহীত তথ্য দিয়ে লেখা হয়ত নুতন প্রজন্মকে অতীতের বীরদের সম্বন্ধে জানতে উৎসাহ যোগাবে এবং যার থেকে অঙ্কুরোদগম হবে এক ঐতিহ্যশালী ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ।

***************

# মানব অধিকার সুরক্ষা আইন - ১৯৯৩
## (১৯৯৪ সালের ১০ নং আইন)

# মানব অধিকার সুরক্ষা আইন - ১৯৯৩
# (১৯৯৪ সালের ১০ নং আইন)

**জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠন , রাজ্য মানবাধিকার কমিশনসকল গঠন , মানবাধিকার অধিকতর সুরক্ষার জন্য মানবাদিকার আদালত সকল গঠন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির বিধান দেওয়ার জন্য একটি আইন**

**১ ধারা** - সংক্ষিপ্ত নাম , বিস্তৃতি এবং আরম্ভ [Short tile , extent and commencement ] (১) এই আইনকে ১৯৯৩ সালের মানবাধিকার সুরক্ষা আইন বলা যেতে পারে ,

২) এই আইন ভারতবর্ষের সর্বত্র প্রযোজ্য ।

শর্ত থাকে যে এই আইন জম্বু - কাশ্মীর রাজ্যের কেবলমাত্র সেই সম্পর্কিত যেকোন বিষয়াদিতে প্রযোজ্য হবে যা ঐ রাজ্যের প্রযোজ্য সংবিধানের সপ্তম তপসিলে দেওয়া ১ম বা ৩য় তালিকায় আছে।

৩) এই আইন ১৯৯৩ সালের ২৮ শে সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর হয়েছে বলে মনে করা হবে ।

**২ ধারা** - সংজ্ঞাদি [ Definitions ] (১) প্রসঙ্গ অন্য কিছু না বললে এই আইনে -

(এ) **সশস্ত্র বাহিনীসকল** [ Armed forces ] বলতে নৌ স্থল বায়ুসেনা এবং ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের যেকোন সশস্ত্র বাহিনীকে বুঝাবে,

(বি) " **সভাপতি** Chairperson ]" বলতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বা রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের যেখানে যেমন হবে , সভাপতিকে বুঝাবে ,

(সি) " **কমিশন** (Commission) " বলতে এই আইনের ৪ ধারায় গঠিত জাতীয় মানাবাধিকার কমিশনকে বুঝাবে ,

(ডি) " **মানবাধিকার** ( human right )" বলতে সংবিধান কর্তৃক গ্যারান্টি প্রদত্ত অথবা আন্তর্জাতিক চুক্তিতে থাকা এবং ভারতের আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য ব্যক্তির জীবন , স্বাধীনতা সমানতা এবং মর্যাদার সম্পর্কিত অধিকারকে বুঝায় ।

(ই) " **মানবাধিকার আদালত** (Human rights courts) বলতে এই আইনের ৩০ ধারায় ঘোষিত মানবাধিকার আদালতকে বুঝাবে ,

(এফ্) "আন্তর্জাতিক চুক্তি / সংবিধান ( International covenants) " বলতে ১৯৬৬ সালের ১৬ই ডিসেম্বর রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত নাগরিক এবং রাজনৈতিক অধিকারের উপর আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং অর্থনৈতিব , সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকারের উপর আন্তর্জাতিক চুক্তিকে বুঝাবে ,

(জি) "সদস্য ( Member)" বলতে কমিশন বা রাজ্য কমিশনের , যেখানে যেমন হতে পারে সদস্যকে এবং সভাপতিকেও বুঝাবে,

(এইচ্) সংখ্যালঘুদের জাতীয় কমিশন National Commission for minorities " বলতে ১৯৯২ সালের সংখ্যালঘুদের জাতীয় কমিশন আইনের (১৯৯২ সালের ১৯ নংআইনের) ৩ ধারায় গঠিত সংখ্যালঘুদের জাতীয় কমিশনকে বুঝাবে ,

(আই) " তপশিল জাতি ও উপজাতিগণের জাতীয় কমিশন Natioanal commission forThe Scheduled castes and Scheduled Tribes ) সংবিধানের ৩৩৮ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তপসিল জাতি বা উপজাতিগণের জাতীয় কমিশনকে বুঝাবে ,

(জে) " মহিলাগণের জাতীয় কমিশন (National Commission for Women) " বলতে ১৯৯০ সালের মহিলাগণের জাতীয় কমিশন আইনের (১৯৯০ সালের ২০ নং আইনের ) ৩ ধারায় গঠিত মহিলাগণের জাতীয় কমিশনকে বুঝাবে ,

(কে) "বিজ্ঞপ্তি ( Notification) " বলতে সরকারি গেজেটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিকে বুঝাবে ,

(এল) " ঘোষিত ( Prescribed)" বলতে ভারতীয় দন্ড বিধির ২১ ধারায় যে অর্থ করা হয়েছে তাকেই বুঝাবে ।

(এম) " লোকসেবক (Public servant) " বলতে ভারতীয় দন্ড বিধির ২১ ধারায় যে অর্থ করা হয়েছে তাকেই বুঝাবে ।

(এন)" রাজ্য কমিশন ( State Commission) " বলতে এই আইনের ২১ ধারায় গঠিত রাজ্য মানবাধিকার কমিশনকে বুঝাবে ।

(২) এই আইনে উল্লেখ করা কোন আইন যা জম্মু কাশ্মীর বলবৎ নেই তা ঐ রাজ্যের সম্পর্কে সেই অনুরূপ আইনকে বুঝাবে যে আইনে ঐ রাজ্যে বলবৎ আছে ।

## জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

**৩ ধারা** - জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের গঠন (Constitution of a National Human Rights Commission) (১) কেন্দ্রীয় সরকার এই আইনের ক্ষমতাদির প্রয়োগ এবং কার্যদির সম্পাদনের জন্য জাতীয় মানবাধিকার কমিশন নামে একটি সংস্থা গঠন করবেন ।

২) নিম্নলিখিতগণকে নিয়ে কমিশনটি গঠিত হবে যথা -

(এ) একজন সভাপতি , যিনি সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হয়েছেন ,

(বি) একজন সদস্য , যিনি সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি আছেন বা হয়েছেন ,

(সি) একজন সদস্য , যিনি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি আছেন বা হয়েছেন ,

(ডি) দুইজন সদস্য , যাঁরা সেইরূপ ব্যক্তিগণের মধ্য থেকে নিযুক্ত হবেন যাঁদের মানবাধিকার বিষয়ে জ্ঞান আছে , বা বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে ।

(৩) সংখ্যালঘুদের জাতীয় কমিশনের , তপসিল জাতি ও উপজাতিগণের জাতীয় কমিশনের এবং মহিলাগণের জাতীয় কমিশনের সভাপতিদের এই আইনের ১২ ধারার (বি) উপাংশ থেকে (জি) উপাংশে ঘোষিত কার্যাদি সম্পাদনের জন্য জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সদস্য বলে মনে করা হবে ।

(৪) জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের একজন সেক্রেটারি জেনারেল থাকবেন যিনি কমিশনের প্রধান কার্যনির্বাহী অফিসার হবেন এবং ঐ কমিশন তাঁকে যেরূপ ক্ষমতাদি ও কার্যাদি অর্পণ করতে পারেন তিনি তা প্রয়োগ করবেন এবং সম্পাদন করবেন।

(৫) জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মুখ্য কার্যালয় দিল্লীতে হবে এবং কমিশন , কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ব অনুমোদন নিয়ে , ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানাদিতে অফিস প্রতিষ্ঠা করতে পারেন ।

**৪ ধারা** - সভাপতি এবং অন্যান্য সদস্যগণের নিয়োগ (Appointment of chairperson and other members ) (১) সভাপতি এবং অন্যান্য সদস্যাগণকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করবেন ঃ

শর্ত থাকে যে এই উপধারার আওতায় প্রত্যেকটি নিয়োগ নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত কমিটির সুপারিশ নেওয়ার পরে হবে , যথা-

(এ) প্রধানমন্ত্রী - সভাপতি

(বি) লোকসভার অধ্যক্ষ - সদস্য

(সি) ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী - সদস্য

(ডি) লোক সভার বিরোধীপক্ষের নেতা - সদস্য

(ই) রাজ্য সভার বিরোধীপক্ষের নেতা - সদস্য,

(এফ) রাজ্য সভার উপাধ্যক্ষ - সদস্য ,

আর ও শর্ত থাকে যে পদে থাকা সুপ্রীম কোর্টের কোন বিচারপতি অথবা পদে থাকা কোন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে, ভারতের প্রধান বিচারপতির সাথে পরামর্শ না করে নিয়োগ করা যাবে না ।

আরও শর্ত থাকে যে পদে থাকা সুপ্রীম কোর্টের কোন বিচারপতি অথবা পদে থাকা কোন

হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে, ভারতের প্রধান বিচারপতির সাথে পরামর্শ না করে, নিয়োগ করা যাবে না।

(২) কমিটিতে কোন শূন্যপদ থাকার কারণে সভাপতি বা সদস্যের নিয়োগ অকার্যকর হবে না।

**১০ ধারা** - কার্যপ্রণালী কমিশন কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হবে - (Procedure to be regulated by the Commission) (১) সভাপতি যেরূপ ঠিক বলে মনে করতে পারেন সেরূপ সময় ও স্থানে মিলিত হবেন।

(২) কমিশন তার নিজ কার্যপ্রণালী নিয়ন্ত্রিত করবেন।

৩) কমিশনের সকল আদেশাদি এবং সিদ্ধান্ত সেক্রেটারি - জেনারেল বা এই উদ্দেশ্যে সভাপতি কর্তৃক যথাযথ অনুমেদিত কমিশনের অন্য যেকোন অফিসার কর্তৃক বিশুদ্ধ বলে স্বীকৃত হবে।

**১১ ধারা** - কমিশনের অফিসারগণ এবং কর্মিগণ ( Officers and other staff of the Commission)

(১) কেন্দ্রীয় সরকার কমিশনের জন্য নিম্নলিখিত অফিসার ও কর্মীর ব্যবস্থা করবেন, যথা -

(এ) ভারত সরকারের সেক্রেটারী পদের একজন অফিসার যিনি কমিশনের সেক্রেটারি জেনারেল হবেন এবং

(বি) পুলিশের ডাইরেক্টর জেনারেল পদের নিম্নপদস্থ নন এমন কোন অফিসারের অধীনে এরূপ পুলিশ এবং তদন্তকারী কর্মী এবং এরূপ অপরাপর অফিসার এবং কর্মী যেরূপ কমিশনের কার্যাদি দক্ষভাবে সম্পাদনের জন্য প্রয়োজন হতে পারে।

(২) কেন্দ্রীয় সরকার এই উদ্দেশ্যে যেরূপ নিয়মাদি রচনা করতে পারেন সেরূপ নিয়মাদি সাপেক্ষ কমিশন এরূপ অপরাপর প্রশাসনিক, প্রয়োগবিদ্যা সম্পর্কিত এবং বৈজ্ঞানিক কর্মী নিয়োগ করতে পারেন যেরূপ কমিশন প্রয়োজন বলে বিবেচনা করতে পারেন।

## কমিশনের কার্যাদি এবং ক্ষমতাদি

**১২ ধারা** - কমিশনের কার্যাদি (Functions of the Commission ) কমিশন নিম্নলিখিত সকল বা যেকোন কার্যাদি সম্পাদন করবেন, যথা -

(এ) নিম্নলিখিত নালিশের বিষয়ে, নিজ উদ্যোগে বা ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষ বা তার হয়ে করা কারোর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে অনুসন্ধান করবেন, যথা -

(i) মানবাধিকার লঙ্ঘন বা তার প্ররোচনা দেওয়া সংক্রান্ত নালিশ, বা

(ii) লোকসেবক কর্তৃক ঐরূপ লঙ্ঘনের নিবারণে অবহেলা করা সংক্রান্ত নালিশ।

(বি) আদালতে অমীমাংসিত থাকা মানবাধিকার লঙ্ঘনের কোন অভিযোগের কার্যবাহে, ঐ

আদালতের অনুমোদন নিয়ে হস্তক্ষেপ করবেন ,

(সি) রাজ্য সরকারকে সংবাদ দিয়ে , রাজ্য সরকারের নিযন্ত্রণাধীন যে কোন জেল বা অন্য যেকোন প্রতিষ্ঠান যেখানে চিকিৎসা , সংশোধন বা নিরাপত্তার কারণে ব্যক্তিদের আটক করে রাখা হয় বা রাখা হয় , সেখানকার বাসিন্দাদের জীবনযাত্রা ধরন - ধারণ পর্যালোচনা এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে সুপারিশ করতে , পরিদর্শন করবেন ।

(ডি) সংবিধান বা প্রচলিত কোন আইনে মানবাধিকার সুরক্ষার বিষয়ে বিধিত রক্ষাকবচ পুনর্বিচার করবেন এবং তার কার্যকর প্রয়োগের পদ্ধতি সুপারিশ করবেন ,

(ই) সন্ত্রাসবাদসহ মানবাধিকার ভোগে বাধাদানকারী উপাদানগুলি পুনর্বিচার করবেন এবং প্রতিকারের যথাযথ উপায় সুপারিশ করবেন ,

(এফ) মানবাধিকারের উপর রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে হওয়া চুক্তি এবং অপরাপর আর্ন্তজাতিক দলিল পর্যালোচনা করবেন এবং তার কার্যকর প্রয়োগের জন্য সুপারিশ করবেন ,

(জি) মানবাধিকার ক্ষেত্রে গবেষণা এবং তা আগে বাড়াবেন ,

(এইচ্) সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে মানবাধিকার শিক্ষা বিস্তার করবেন এবং মানবাধিকার সুরক্ষার জন্য প্রাপ্ত্য রক্ষাকবচের প্রকাশনা , প্রচার মাধ্যম , সেমিনার এবং অন্যান্য প্রাপ্তব্য উপায়কলের মাধ্যমে জনচেতনা বাড়াবেন ,

(আই) মানবাধিকার ক্ষেত্রে কাজ করছেন এমন বেসরকারি সংগঠন এবং প্রতিষ্ঠানাদির কাজে উৎসাহ দেবেন ,

(জে) মানবাধিকার কাজ বাড়ানোর জন্য যেরূপ প্রয়োজন হতে পারে এরূপ অপরাপর কার্যাদি করবেন।

**১৩ ধারা** - অনুসন্ধান সম্পর্কিত ক্ষমতাদি (Power relating to inquiries )(১) কমিশনের এই আইনের আওতায় নালিশাদির অনুসন্ধানকালীন , ১৯০৮ সালের দেওয়ানী বিধির আওতায় মামলা বিচারকারী দেওয়ানী আদালতের সকল ক্ষমতাই থাকবে , এবং বিশেষতঃ নিম্নলিখিত বিষয়াদির সম্পর্কে , যথা -

(এ) সাক্ষিগণকে সমন করতে এবং তাদের হাজিরা আদায় করতে এবং শপথপূর্বক তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে ,

(বি) কোন দলিলের আবিষ্কার এবং দাখিল ,

(সি) হলফনামার উপর সাক্ষ্যগ্রহণ করতে ,

(ডি) কোন আদালত বা অফিস থেকে সরকারি রেকর্ড বা তার কপি ফরমাশ করতে ,

(ই) সাক্ষী বা দলিল পরীক্ষার জন্য কমিশন জারি করতে ,

(এ্ফ) অপরাপর কোন বিষয়ে যেরূপ ঘোষিত হতে পারে ।

(২) কমিশন যেকোন ব্যক্তিকে , প্রচলিত কোন আইনে সেই ব্যক্তি যে বিশেষ অধিকার দাবি করতে পারেন তার সাপেক্ষ , এরূপ বিষয়ের উপরে খবরাখবর দিতে ফরমাশ করতে পারেন যা কমিশনের মতে অনুসন্ধান করা বিষয়ের জন্য প্রয়োজনীয় বা প্রাসঙ্গিক হতে পারে এবংঐরূপভাবে ফরমায়েশিত প্রত্যেক ব্যক্তি ভারতীয় দন্ড বিধির (১৮৬০ সালের ৪৫ নং আইনের) ১৭৬ ও ১৭৭ ধারার অর্থে উক্ত খবরাখবর দিতে আইনানুগ বাধ্য বলে মনে করা হবে ।

(৩) কমিশন বা কমিশন কর্তৃক বিশেষভাবে অনুমোদিত গেজেটেড্ পদের নিম্নপদস্থ নন এরূপ অন্য যেকোন অফিসার এরূপ যেকোন দালান বা স্থানে প্রবেশ করতে পারেন যেখানে অনুসন্ধান করা বিষয়ের প্রাসঙ্গিক কোন দলিল পাওয়া যেতে পারে বলে কমিশনের বিশ্বাস করার কারণ থাকে , এবং ১৯৭৩ সালের ফৌজদারী কার্যপ্রণালী বিধির (১৯৭৪ সালের ২ নং আইনের ) ১০০ ধারার বিধানাদি সাপেক্ষ যতদূর তা প্রযোজ্য হতে পারে , সেখান থেকে ঐরূপ যেকোন দলিল অধিগ্রহণ ( Seize) করতে পারেন বা তার অংশবিশেষ বা কপি নিতে পারেন ।

(৪) কমিশনকে দেওয়ানি আদালত বলে মনে করা হবে এবং যখন ভারতীয় দন্ড বিধির (১৮৬০ সালের ৪৫ নং আইনের ) ১৭৫ , ১৭৮ ,১৭৯ , ১৮০ বা ২২৮ ধারার কোন অপরাধ কমিশনের দৃষ্টিতে বা উপস্থিতিতে সংঘটিত হয় , তখন কমিশন অপরাধটির তথ্যাদি এবং ১৯৭৩ সালের ফৌজদারী কার্যপ্রণালী বিধিতে বিধিমত অভিযুক্তের বিবৃতি রেকর্ড করার পর , ঐ মামলা বিচার করার ক্ষেত্রে সম্পন্ন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে মামলাটি পাঠিয়ে দেবেন এবং যে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ঐরূপ কোন মামলা পাঠানো হয় তিনি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে নালিশটির শুনানী নিতে এমনভাবে এগোবেন যেন ঐ মামলাটি , ১৯৭৩ সালের ফৌজদারী কার্যপ্রণালী বিধির ৩৪৬ ধারার আওতায় পাঠানো হয়েছে ।

(৫) কমিশনের সম্মুখে হওয়া প্রত্যেক কার্যবাহকে (Proceeding কে) ভারতীয় দন্ড বিধির ১৯৩ ধারা এবং ২২৮ ধারার অর্থে , এবং ১৯৬ ধারার প্রয়োজনে ন্যায়িক কার্যবাহ (Judicial Proceeding) বলে মনে করা হবে এবং কমিশনকে ১৯৭৩ সালের ফৌজদারী কার্যপ্রণালী বিধির (১৯৭৪ সালের ২ নং আইনের )১৯৫ ধারা এবং ২৬ অধ্যায়ের প্রয়োজনে দেওয়ানি আদালত বলে মনে করা হবে ।

**১৪ ধারা** - তদন্ত (Investigation) (১) অনুসন্ধানের সম্পর্কযুক্ত যেকোন তদন্তের প্রয়োজনের জন্য কমিশন কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকারের , যেখানে যেমন হতে পারে , ঐকমত্যে কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকারের , যেকোন অফিসার বা তদন্তকারী সংস্থাকে উপযোগ করতে পারেন ।

(২) অনুসন্ধানের সম্পর্কযুক্ত যেকোন বিষয়ের তদন্তের প্রয়োজনের জন্য , উপধারা (১) এর আওতায় যে অফিসার বা সংস্থার সেবা উপযোগ করা হয় সেই অফিসার বা সংস্থা কমিশনের নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষ , -

(এ) যেকোন ব্যক্তিকে সমন করতে এবং তার উপস্থিতি আদায় করতে পারেন এবং জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারেন ,

(বি) যেকোন দলিলের আবিষ্কার-এবং দাখিল ফরমাশ করতে কারেন , এবং

(সি) যে কোন অফিস থেকে যেকোন সরকারি রেকর্ড চাইতে পারেন ।

(৩) **উপধারা (১)** এর আওতায় যে অফিসার বা সংস্থা সেবা উপযোগ করা হয় সেরূপ কোন অফিসার বা সংস্থার কাছে কোন ব্যক্তির রাখা কোন বক্তব্যের সম্পর্কে এই আইনের ১৫ ধারার বিধানাদি সেরূপভাবে প্রযোজ্য হবে যেরূপভাবে কমিশনের কাছে সাক্ষ্য দেওয়াকালীন কোন ব্যক্তির রাখা বক্তব্যের সম্পর্কে তা প্রযোজ্য হয় ।

(৪) **উপধারা** - (১) এর আওতায় সে অফিসার বা সংস্থা সেবা(Service) উপযোগ করা হয় সেই অফিসার বা সংস্থা অনুসন্ধানের সম্পর্কযুক্ত কোন বিষয়ের তদন্ত করবেন এবং তার উপরে একটি রিপোর্ট কমিশনের বলে দেওয়া সময়সীমার মধ্যে দাখিল করবেন ।

৫) **উপধারা (৪)** এর আওতায় দাখিল করা রিপোর্ট থাকা তথ্যাদি এবং সিদ্ধান্তের , যদি থাকে, বিষয়ে কমিশন নিজে সন্দেহমুক্ত (Satisfy) হয়ে নেবেন এবং এই প্রয়োজনের জন্য যেরূপ যথাযথ মনে করবেন (যারা তদন্ত পরিচালনা করেছিলেন বা তাতে সহায়তা করেছিলেন তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা সমেত ) সেরূপ অনুসন্ধানকরতে পারেন ।

**১৫ ধারা** - কমিশনের কাছে ব্যক্তিদের রাখা বক্তব্য (Statement made by person to the Commission) কমিশনের কাছে সাক্ষ্য দেওয়ার সময় কোন ব্যক্তির রাখা কোন বক্তব্য দেওয়ানি বা ফৌজদারী কার্যবাহে তার বিরুদ্ধে ব্যবহার হবে না কিন্তু উক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে সে অসত্য সাক্ষ্য দিয়ে থাকলে তার বিরুদ্ধে মামলা হবেঃ

শর্ত থাকে যে সেই বক্তব্য -

(এ) কমিশনের চাওয়া প্রশ্নের উত্তরে রাখা হয়েছে , বা

(বি) অনুসন্ধান প্রাসঙ্গিক বিষয়ের হবে ।

## কার্যপ্রণালী

**১৭ ধারা** - নালিশাদির অনুসন্ধান ( Inquiry into complaint) মানবাধিকার লঙ্ঘনের নালিশাদির অনুসন্ধান করতে গিয়ে কমিশন (i) কেন্দ্রীয় সরকার বা কোন রাজ্য সরকার বা তাদের

অধস্তন যেকোন কর্তৃপক্ষ বা সংগঠনের কাছ থেকে ,যেরূপ নির্দিষ্ট করে দিতে পারেন সেরূপ সময়সীমার মধ্যে , সংবাদ বা রিপোর্ট চাইতে পারেন ঃ

শর্ত থাকে যে -

(এ) যদি সংবাদ বা রিপোর্ট কমিশনের ধার্য করে দেওয়া সময় সীমার মধ্যে পাওয়া না যায় তবে কমিশন নিজেই তা অনুসন্ধান করতে অগ্রসর হতে পারেন,

(বি) ঐ সংবাদ বা রিপোর্ট পাওয়ার পর , কমিশন যদি এরূপ সন্দেহমুক্ত (Satisfied) হন যে আর কোন অনুসন্ধানের প্রয়োজন নেই অথবা সংশ্লিষ্ট সরকার বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ লওয়া আরম্ভ হয়েছে বা গ্রহণ করা হয়েছে , তবে কমিশন ঐ নালিশ নিয়ে আর অগ্রসর নাও হতে পারেন এবং তদনুযায়ী নালিশকারীকে জানিয়ে দিতে পারেন ।

**১৮ ধারা** - অনুসন্ধানের পরের পদক্ষেপ ( Steps after inquiry)) এই আইনের আওতায় করা অনুসন্ধান সম্পূর্ণ হওয়ার পর কমিশন নিম্নলিখিত যে কোন পদক্ষেপ গ্রহন করতে পারেন , যথা - (১) যেক্ষেত্রে অনুসন্ধান করার পর দেখা যায় যে , মানবাধিকার লঙ্ঘন করা হয়েছে বা কোন লোকসেবক কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন নিবারণে অবহেলা করা হয়েছে তখন কমিশন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলার জন্য অথবা কমিশন যেরূপ যথাযথ মনে করতে পারেন সেরূপ অপর কোন পদক্ষেপের জন্য কার্যবাহ রুজু করাতে , সংশ্লিষ্ট সরকার বা কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ করতে পারেন ,

(২) সুপ্রীম কোর্ট বা সংশিষ্ট হাইকোর্টের কাছে এরূপ নির্দেশ আদেশ বা রিটের জন্য মনোযোগ আকৃষ্ট করাতে পারেন যেরূপ উক্ত আদালত প্রয়োজন বলে মনে করতে পারেন ।

(৩) সংশ্লিষ্ট সরকারের কাছে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি বা তার পরিবারের সদস্যদের এরূপ অন্তবর্তী সাহায্য মঞ্জুর করার জন্য সুপারিশ করতে পারেন যেরূপ কমিশন প্রয়োজন বলে বিবেচনা করতে পারেন ,

৪) উপাংশ (৫) এর বিধানাদি সাপেক্ষ আবেদনকারী বা তার প্রতিনিধিকে অনুসন্ধান রিপোর্টের একটি কপি দিতে পারেন ,

(৫) কমিশন তাঁর সুপারিশসহ অনুসন্ধান রিপোর্টের একটি কপি সংশ্লিষ্ট সরকার বা কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠাবেন এবং সেই সংশ্লিষ্ট সরকার বা কর্তৃপক্ষ একমাস বা কমিশন যেরূপ মঞ্জুর করতে পারেন সেরূপ আরও অধিক সময়কালের মধ্যে , উক্ত রিপোর্টের উপর , গৃহীত বা প্রস্তাবিত পদক্ষেপের বিষয় সমেত তাঁর মন্তব্য কমিশনকে পাঠিয়ে দিবেন ,

(৬) কমিশন , সংশ্লিষ্ট সরকার বা কর্তৃপক্ষের মন্তব্যসহ , যদি কিছু থাকে , এবং কমিশনের সুপারিশে সংশ্লিষ্ট সরকার বা কর্তৃপক্ষের গৃহীত বা প্রস্তাবিত পদক্ষেপসহ তাঁর অনুসন্ধান রিপোর্ট

সর্বসাধারণ্যে প্রকাশ করবেন ।

**১৯ ধারা** - সশস্ত্র বাহিনীর সম্পর্কে কার্যপ্রণালী (Procedure with respect to armed forces) (১) এই আইনের যা -ই বলা থাক না কেন , সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘনের নালিশ নিয়ে চর্চা করাকালীন , কমিশন নিম্নলিখিত কার্যপ্রণালী অবলম্বন করবেন , যথা -

(এ) কমিশন নিজ উদ্যোগে বা আবেদন পেয়ে , কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকেরিপোর্ট চাইতে পারেন ,

(বি) রিপোর্ট পাওয়ার পর , কমিশন নালিশটি নিয়ে হয় অগ্রসর হবেন না নতুবা যেখানে যেমন হতে পারে , সেই সরকারকে তাঁর সুপারিশটি জানাবেন ।

(২) কেন্দ্রীয় সরকার , কমিশনের সুপারিশের উপর তাঁর গৃহীত পদক্ষেপের বিষয় , তিন মাস বা কমিশন আরও যে সময় দিতে পারেন সেই সময়সীমার মধ্যে , কমিশনকে জানাবেন ।

(৩) কমিশন কেন্দ্রীয় সরকারকে দেওয়া তাঁর সুপারিশসহ তাঁর রিপোর্ট এবং ঐ সুপারিশের উপর সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ সর্বসাধারণ্যে প্রকাশ করবেন ।

(৪) কমিশন উপধারা (৩) এর আওতায় প্রকাশিত রিপোর্টের একটি কপি আবেদনকারী বা তাঁর প্রতিনিধিকে দেবেন।

**২০ ধারা** - কমিশনের বাৎসরিক এবং বিশেষ রিপোর্ট ( Annual and special reports of the Commission) (১) কমিশন কেন্দ্রীয় সরকার এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের কাছে বাৎসরিক রিপোর্ট দেবেন এবং বাৎসরিক রিপোর্ট দেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে ঠিক হবে না এরূপ গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী বলে কোন বিষয় বিবেচনা করলে যেকোন সময়ে ঐ বিষয়ে বিশেষ রিপোর্ট দিতে পারেন ।

(২) কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার , যেখানে যেমন হতে পারে , কমিশনের বাৎসরিক এবং বিশেষ রিপের্টে , যথাক্রমে সংসদের উভয় সভায় বা রাজ্য বিধানসভায় যেখানে যেমন হতে পারে , উক্ত কমিশনের সুপারিশে গৃহীত বা প্রস্তাবিত পদক্ষেপের বিষয় এবং সুপারিশ গ্রহন না করলে তার কারণ সম্বলিত একটি বিবরণী সমেত পেশ করবেন ।

## রাজ্য মানবাধিকার কমিশন

**২১ ধারা** - রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের গঠন ( Constitution of State Human Rights Commision) (১) এই অধ্যায়ের আওতায় রাজ্য কমিশনকে অর্পন করা ক্ষমতাদির প্রয়োগ এবং কার্যাদি সম্পাদন করার জন্য যেকোন রাজ্য সরকার “ (রাজ্যের নাম ) মানবাধিকার কমিশন ” , আখ্যা দিয়ে একটি সংস্থা গঠন করতে পারেন ।

(২) রাজ্য মানবাধিকার কমিশন নিম্নলিখিতগণকে নিয়ে গঠিত হবে -

(এ) একজন সভাপতি , যিনি কোন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হয়েছেন ,

(বি) একজন সদস্য , যিনি কোন হাইকোর্টের বিচারপতি আছেন বা হয়েছেন ,

(সি) একজন সদস্য , যিনি ঐ রাজ্যের জেলা জজ আছেন বা হয়েছেন

(ডি) দুইজন সদস্য , সেই রূপ ব্যক্তিগণের মধ্যে থেকে নিযুক্ত হবেন যাঁদের মানবাধিকার বিষয়ে জ্ঞান আছে ,বা বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে ।

(৩) রাজ্য কমিশনে একজন সেক্রেটারি থাকবেন যিনি রাজ্য কমিশনের প্রধান কার্যনিবাহী অফিসার হবেন এবং রাজ্য কমিশন যেরূপ ক্ষমতাদি ও কার্যাদি অর্পণ করতে পারেন তিনি সেরূপ ক্ষমতাদি প্রয়োগ করবেন ও কার্যাদি সম্পাদন করবেন।

(৪) রাজ্য কমিশনের প্রধান কার্যলিয় সেরূপ স্থানে হবে যেরূপ রাজ্য সরকার বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ঠিক করে দিতে পারেন।

(৫) কোন রাজ্য কমিশন কেবলমাত্র সেই সকল মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে অনুসন্ধান করতে পারবেন যা সংবিধানের সপ্তম তপসিলের ২ নং এবং ৩ নং তালিকায় বলা কোন বিষয়ের সম্পর্কিত ঃ

শর্ত থাকে যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বা প্রচলিত কোন আইনে যথাযথভাবে গঠিত অন্য কোন কমিশন ইতিমধ্যেই যে বিষয়ে অনুসন্ধান করছেন রাজ্য কমিশন সেই বিষয়ে অনুসন্ধান করবেন না ।

**২৯ ধারা** - জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সম্পর্কিত নির্দিষ্ট কিছু বিধানাদি রাজ্য কমিশনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে । (Application of certain provisions relating to National Human Commission to State Commission) ৯, ১০ ,১২,১৩,১৪,,১৫,১৬,১৭ এবং ১৮ ধারার বিধানাদি নিম্নলিখিত সংশোধন পূর্বক , রাজ্য কমিশনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে , যথা -

(এ) তথায় " কমিশন " বলতে " রাজ্য কমিশনকে " বুঝতে হবে,

(বি) ১০ ধারার (৩) উপধারায় উল্লেখিত " সেক্রেটারী জেনারেল " কে সেক্রেটারী ' বলে বুঝতে হবে ,

(সি) ১২ ধারার (এফ্) উপাংশ বাতিল বলে ধরতে হবে ,

(ডি) ১৭ ধারার (আই) উপাংশে উল্লেখিত "কেন্দ্রীয় সরকার বা কোন" কথাটি বাতিল বলে ধরতে হবে।

**৩০ ধারা** - মানবাধিকার আদালত ( Special Public Prosecutor) মানবাধিকার লঙ্ঘন থেকে উদ্ভুত অপরাধাদির দ্রুত বিচারের ব্যবস্থা করার জন্য , রাজ্য সরকার হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির সাথে ঐকমত্যে পৌঁছিয়ে , বিজ্ঞপ্তি দিয়ে , উক্ত অপরাধাদি বিচার করতে প্রত্যেক

জেলার জন্য একটি দায়রা আদালতকে মানবাধিকার আদালত বলে ঘোষণা করতে পারেন ঃ

শর্ত থাকে যে এই ধারার কোন কিছুই প্রযোজ্য হবে না যদি অন্য কোন প্রচলিত আইনের আওতায় উক্ত অপরাধাদির জন্য -

(এ) কোন দায়রা আদালত ইতিমধ্যেই কোন বিশেষ আদালত বলে ঘোষিত হয়ে থাকে , বা

(বি) কোন বিশেষ আদালত ইতিমধ্যেই গঠিত হয়ে থাকে ।

**৩১ ধারা** - বিশেষ সরকারি অভিযোজক (Special Public Prosecutor) প্রত্যেক মানবাধিকার আদালতের জন্য , রাজ্য সরকার বিজ্ঞপ্তি দিয়ে সেই আদালতে মামলাদি পরিচালনার কারণে বিশেষ সরকারি অভিযোজক হিসাবে একজন সরকারি অভিযোজককে p.p কে ঘোষণা করতে পারেন বা এ্যাড্ভোকেট হিসাবে সাত বছরের কম নয় এরূপ বৃত্তিকারী এ্যাড্ভোকেটকে সেরূপ নিযুক্ত করতে পারেন।

**৩৬ ধারা** - জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ক্ষেত্রাধীন নয় এমন বিষয়াদি [ Matters not subject to jurisdicition of the Commission ] (১) রাজ্য কমিশন বা প্রচলিত কোন আইনে যথাযথভাবে গঠিত অন্য কোন কমিশনের কাছে অমীমাংসীত থাকা কোন বিষয়ে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অনুসন্ধান করবেন না ।

(২) জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বা রাজ্য মানবাধিকার কমিশন , মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী কাজটি যেদিন করা হয়েছে বলে অভিকথিত হয় সেই দিন থেকে এক বছর পার হয়ে গেলে সেই বিষয়ে আর অনুসন্ধান করবেন না ।

**৩৭ ধারা**- বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন [ Constitution of special investigation teams] প্রচলিত অন্য কোন আইনে যা-ই বলা থাক না কেন , যেক্ষেত্রে সরকার সেরূপ করা প্রয়োজন বলে মনে করেন , মানবাধিকার লঙ্ঘন থেকে উদ্ভূত অপরাধদির তদন্ত এব মামলার জন্য, যেরূপ প্রয়োজন মনে করেন সেরূপ পুলিশ অফিসারদের নিয়ে এক বা একাধিক বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করতে পারেন ।

**৩৯ ধারা** - সদস্যগণ এবং অফিসারগণ লোক সেবক হবেন [ Members and officers to be public servant ] জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এবং রাজ্য মানাবাধিকার কমিশনের প্রত্যেক সদস্যকে এবং এই আইনের আওতায় কাজ করতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বা রাজ্য মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক নিযুক্ত বা অনুমোদিত প্রত্যেক অফিসারকে ভারতীয় দন্ড বিধির (১৮৬০ সালের ৪৫ নং আইনের )২১ ধারার অর্থে ' লোক সেবক ' বলে মনে করা হবে ।

**৪০ ধারা** - নিয়মবিধি তৈরী করতে কেন্দ্রীয় সরকার ক্ষমতা [ Power of Central Government to make rules ]

**(৪০ এ ধারা - অতীত সম্পর্কে প্রযোজ্য নিয়মবিধি তৈরী করার ক্ষমতা [ Power to make rules retrospectively]** ৪০ ধারার (২) উপধারার (বি) উপাংশের আওতায় নিয়মবিধি তৈরী করার ক্ষমতার মধ্যে এই আইন রাষ্ট্রপতি যেদিন অনুমোদন দিয়েছেন সেই দিনের আগের নয় এমন কোন আগের দিন থেকে কার্যকর করে ঐরূপ নিয়মবিধির সকল বা তাদের মধ্যে কোন নিয়মবিধি তৈরী করার ক্ষমতাকেও বুঝাবে , কিন্তু ঐ নিয়মবিধি ঐরূপভাবে অতীত থেকে কার্যকর করানো যাবে না যদি তাতে যে ব্যক্তিদের উপর ঐ নিয়মবিধি প্রযোজ্য হয় তাদের স্বার্থ ক্ষতিকরভাবে প্রভাবিত হয় ।

************************

## পরাধীন ভারতবর্ষে স্বাধীনতা অধিকারের আন্দোলন ,
## ধর্মীয় স্বাধীনতা আন্দোলন

# পরাধীন ভারতবর্ষে স্বাধীনতা অধিকারের আন্দোলন ,ধর্মীয় স্বাধীনতা আন্দোলন

ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে নৈতিক অবনতির বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদ স্বরূপ ওয়াহাবি আন্দোলনের সূত্রপাত হয় । সপবিত্র ' ইসলাম ধর্ম থেকে যে কোন প্রকার বিচ্যুতি সম্পর্কে এই আন্দোলন ছিল বিরোধী এবং গোঁড়া মনোভাবাপন্ন । এর নামকরণ হয়েছিল এই আন্দোলনের উদ্যোগে আবদুল ওয়াহাব এর ( ১৭০৩ - ১৭৮৭ ) নামানুসারে । তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে আরবের অন্তর্গত নেজদ্ নামক স্থানে এর সূচনা করেন। **এই আন্দোলনের কতকগুলি ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য ছিল -**

(১) এর প্রকৃতি ছিল উগ্ররূপে বিদেশী বিরোধী আরবে এটা ছিল তুর্কীবিরোধী এবং ভারতের ক্ষেত্রে ছিল ব্রিটিশ বিরোধী । (২) এ আন্দোলন প্রাচীন মুসলীম ধর্ম গুরুদের আদর্শের পুনঃপ্রতিষ্ঠা দাবী করেছিল , যার বিশেষত্ব ছিল আচার - ব্যবহারের সরলতা এবং পবিত্র জীবন যাপন । (৩) অনেক প্রচলিত ধর্মীয় উপাখ্যান ও উৎসব ওয়াবিপন্থীরা বর্জন করেছিল , কারণ তাদের মতে ওগুলির মাধ্যমে পৌত্তিলিকতার প্রসার ঘটেছিল । (৪) নাস্তিকতা ধ্বংস করে চরম আত্মস্বার্থত্যাগের মাধ্যমে তাদের ধর্মনীতিকে প্রচার করাই ওয়াহাবিপন্থীদের ঐকান্তিক ও গোঁড়া উদ্দেশ্য । (৫) ইমামের কর্তৃত্ব সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করা হয়েছিল । (৬) ওয়াহাবি মতাবলম্বীরা জনৈক মাহ্‌দির অস্তিত্বে বিশ্বাস করত - যিনি শেষ বিচারের দিনে আবিভূর্ত হবেন । সেদিন মঙ্গলের সঙ্গে অমঙ্গলের এক চূড়ান্ত সংগ্রাম হবে আর তার পরিণামে আন্তরিক শুভ বিশ্বাসেরই জয় হবে । (৭) তাদের মতবাদ প্রচারের সুবিধার জন্যে ওয়াহাবিপন্থীরা পার্থিব শাস সম্প্রদায়ের সাহচর্য কামনা করেছিল ।

**২)সৈয়দ আহমদের কর্মসূচী ও কার্যকলাপ ঃ-**

ভারতে এই আন্দোলনের নেতৃত্বে দিয়েছিলেন সৈয়দ আহমদ ( ১৭৮৬ -১৮৩১ )। তাঁর বাসস্থান ছিল উত্তর প্রদেশের রায়বেবিলী । একজন ধর্মপ্রচারকরূপে তাঁর জীবন শুরু হয়েছিল । ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে ক্রমে ক্রমে যে সব অনাচার প্রবেশ করেছিল সেগুলিকেই তিনি ভারতে ইসলাম ধর্মের অবনতির জন্য দায়ী বলে চিহ্নিত করেছিলেন । ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মক্কা অভিমুখে তীর্থযাত্রায় বের হন এবং ওয়াহাবি মতাবলম্বীদের সংস্পর্শে আসেন । তিনি নিজেকে একজন ঈশ্বরের প্রতিনিধিরূপে অভিহিত করেছিলেন । তাঁর ধর্মাপরায়ণতা ও নিজ উদ্দেশ্য সাধনে একাগ্রতার ফলস্বরূপ শ্রীঘ্রই তাঁর খ্যাতি

চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল । মাত্র ছয় সাত বৎসরের মধ্যে পেশোয়ার সীমান্ত থেকে বাংলার ব-দ্বীপ পর্যন্ত তাঁর প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । তিনি কলকাতা ও পাটনাসহ উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন আর এই ভ্রমণের মাধ্যমে তিনি প্রভূত লোকবল ও অর্থসংগ্রহে সমর্থ হন ।

ওয়াহাবিপন্থীরা ভেবেছিলেন যে মুসলমান সম্প্রদায় যদি রাজনৈতিক ক্ষমতা করায়ত্ত না করতে পারে তবে ইসলামধর্মের পুনরুজ্জীবন সম্ভব হবে না । সে কারণে একদিকে যেমন আভ্যন্তরীন ক্ষয় পচন নিবারণের জন্য সমাজ ও ধর্মসংক্রান্ত দুনীর্তির মূলোৎপাটন প্রয়োজন ছিল , অপরদিকে রাজনৈতিক ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে নাস্তিক শাসকদের বিরুদ্ধে এক সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করা হয়েছিল । সৈয়দ আহ্‌মদ ভারতবর্ষকে দার-উল-হারব (শত্রু বা বিধর্মীদের দেশ ) বলে অভিহিত করেছিলেন এবং তাকে দা- উল - ইসলাম এ (বিশ্বাসীদের দেশ ) রূপান্তরিত করার আহ্বান জানিয়েছিলেন।

তাঁর মতে , সমস্ত সৎ মুসলমানদের কর্তব্য অ-মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে 'জেহাদ ' পবিত্র যুদ্ধ ঘোষণা করা , অথবা মুসলমান শাসিত কোন দেশে গিয়ে বাস করা । তাঁর লক্ষ্য পাঞ্জাবের শিখ রাজ্যে এবং বাংলা ও উত্তর ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটিয়া একটি মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা । তিনি তাঁর অনুচরবৃন্দসহ সশস্ত্র প্রতিরোধের ব্যবস্থা নিয়েছিলেন । ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি শিখদের কাছ থেকে পেশোয়ার জয় করতে সমর্থ হন , কিন্তু ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি শিখদের সঙ্গে যুদ্ধ পরাজিত হন এবং অবশেষে শের সিং এর হাতে মৃত্যুবরণ করেন ।

### ৩) আন্দোলনের অগ্রগতি ঃ

সৈয়দ আহমদের মৃত্যুর পরেও এই আন্দোলন অব্যাহত থাকে । পাটনা ছিল ওয়াহাবিপন্থীদের প্রধান কর্মকেন্দ্র । সৈয়দ আহমদের বাণী একদিকে কাবুল থেকে ঢাকা এবং অপরদিকে বোম্বাই থেকে হায়দ্রাবাদ পর্যন্ত প্রচারিত হয়েছিল । ওয়াহাবিপন্থীরা তাঁদের ধর্মীয় চাঁদা আদায়ের একটি নিয়মিত ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল । তাঁরা ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে অনাস্থাসূচক মনোভাব প্রসারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন জেলাগুলিতে স্থায়ী সংগঠন গড়ে তুলেছিল । ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর ওয়াহাবীপন্থীরা কিছুটা সাফল্য অর্জন করেছিল । ব্রিটিশ শাসকদের অনেকগুলি ব্যয়বহুল সীমান্ত সংঘর্ষে লিপ্ত হতে তারা বাধ্য করিয়েছিল । বিচারকালে কয়েকজন ওয়াহাবীপন্থীকে কঠোর সাজা দেওয়ার ফলশ্রুতিস্বরূপ বাংলার প্রধান বিচারপতি জনৈক মুসলমান ঘাতকের হাতে প্রাণ দিলেন (১৮৭১ ) । তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড মেয়ো আন্দামানে শের আলি নামক একজন ওয়াহাবিপন্থী দন্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত আসামীর হাতে নিহত হলেন । সিতানা ছিল ওয়াহাবিপন্থীদের একটি প্রদান কর্মকেন্দ্র । এমন আশংকা প্রকাশ করা হয়েছিল যে যদি আফগান বা রুশদের সাথে যুদ্ধ বাধে , তবে ওয়াহাবি পন্থী ও তাদের সহযোগী জ্ঞাতিরা হয়ত ব্যাপক ক্ষতিসাধন করতে পারবে ।

### ৪) প্রকৃতি ঃবিভিন্ন মত ঃ

প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি পর্যালোচনা করার পর ঐতিহাসিকরা এই আন্দোলনের প্রকৃতি বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন । কতিপয় লেখক এই আন্দোলনকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনারূপে গণ্য করা কর্তব্য মনে করেন । তাঁদের যুক্তি হল - ওয়াহাবিপন্থীরা ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদ কল্পে এক সুপরিকল্পিত এবং সুসংগঠিত পরিচালনা করেছিল । ভারতের স্বাধীনতাই ছিল তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য । এ ছাড়া এই আন্দোলন এক অখিল ভারতীয় রূপ ধারণ করেছিল। পেশোয়ার থেকে ঢাকা পর্যন্ত সমগ্র উত্তর ভারতে , এমন কি মাদ্রাজ ও দাক্ষিণাত্যেও এই আন্দোলন জড়িয়ে পড়েছিল ।

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ভিন্ন রূপ মত পোষণ করেন । তিনি লিখেছেন - " এর সুদূরপ্রসারী চরিত্র এবং ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চারক বৈশিষ্ট্য থাকা সত্বে ও ওয়াহাবি আন্দোলনকে জাতীয় আন্দোলনরূপে গণ্য করাযায় না । এটি ছিল মুসলিমদের দ্বারা পরিচালিত মুসলিমদের জন্য এক আন্দোলন । হিন্দুরা সম্প্রদায়গতভাবে এই আন্দোলন থেকে নিজেদের পৃথক করে রেখেছিল । এমন কি একটি হিন্দুও এই আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেনি । ওয়াহাবিপন্থীরা ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত করার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল সন্দেহ নেই , কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা অর্জন তাদের সংগ্রামের লক্ষ্য ছিল না - তাদের উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম আধিপত্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ........ এমন কি ব্রিটিশদের বিতাড়নের জন্য সর্বাধিক সুবিস্তৃত ও সুসংগঠিত আন্দোলনকেও সর্বক্ষেত্রে স্বাধীনতার জন্য জাতীয় সংগ্রামরূপে গণ্য করা যায় না । "

### ৫) মিশ্র আন্দোলন ঃ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ ঃ

এটা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে অন্ততঃ প্রাথমিক অধ্যায়ে ধর্মীয় ধারণাগুলিই ছিল আন্দোলনের মূল ভিত্তি হান্টার মতে মুঘল অধিকারের পুনরুদ্ধার সৈয়দ আহমেদের লক্ষ্য ছিল না , বরং তিনি চেয়েছিলেন আদি মুসলিম সম্প্রদায়ের ধাঁচে ভারতের সীমান্তগুলিতে কিছু গড়ে তুলতে । তিনি ভেবেছিলেন - এর ফলে একদিন মুসলমানেরা ঈশ্বরের জন্য ভারত জয়ে উৎসাহী হবে । যাই হোক, ক্রমশঃ এই আন্দোলন একটা অর্থনৈতিক রূপ পরিগ্রহ করল । বিশেষভাবে বঙ্গদেশের ক্ষেত্রে এর যথার্থতা অনুভব করা যায় , সেখানে হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ভুক্ত জমিদারদের বিরুদ্ধে কৃষক অভ্যুত্থান ঘটেছিল । এমন কি মসজিদ সংলগ্ন সামান্য কয়েক একর জমির অধিকারী মৌলবিরাও রেহাই পান নি । হান্টারের মতে - " ওয়াহাবিরা ছিল ধারণা ও বিশ্বাসের দিক থেকে এ্যানার্যাপটিষ্ট ও ফিফথ মনার্কি গোষ্ঠীর মত আর রাজনীতির ক্ষেত্রে ছিল সাম্যবাদী ও উগ্র প্রজাতন্ত্রীদের মত । " সকল শ্রেণীর সম্পত্তির অধিকারী ও কায়েমী স্বার্থের অধিকারীদের কাছে ওয়াহাবিরা ছিল মূর্তিমান বিভীষিকা । ডিস্পিয়ারের বর্ণনানুযায়ী ওয়াহাবিরা ছিল ৮০,০০০ মানুষের একটি গোষ্ঠী যারা সমাজের

নিম্ন শ্রেণী থেকে উঠে এসে নিজেদের মধ্যে পূর্ণ সাম্য প্রতিষ্ঠিত করেছিল । সৈয়দ আহমদের বাণী মুসলিম সমাজের নিম্ন শ্রেণী , প্রাক্ শিল্প ভিত্তিক সমাজের নিম্ন মধ্যবিত্ত , ক্ষুদ্র ভূস্বামী, মোল্লা শিক্ষক, ক্ষুদ্র দোকানদার , সামান্য কর্মচারী , কারিগর প্রভৃতি সকলের মনেই সাড়া জাগিয়েছিল । সুতরাং কায়েমী স্বার্থ যাদের দখলে , হিন্দু ও মুসলিম নির্বিচারে তারা যে ওয়াহাবিপন্থীদের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হবে - এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই ।

**৬) পরিশেষের মন্তব্য ঃ-**

এই আন্দোলনের প্রকৃতি যে মুলতঃ ব্রিটিশ বিরোধী বা বিদেশী বিরোধী ছিল তা অস্বীকার করা চলে না , তবে একে ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে প্রথম মুক্তি সংগ্রাম বলা হলে সম্ভবতঃ অতিরঞ্জন হবে। হান্টার কর্তৃক এই আন্দোলনকে বিদ্রোহরূপে বর্ণনা ঘাতকের হাতে বিচারপতি নরম্যানের মৃত্যু সরকারকে এই আন্দোলনের বিপজ্জনক রাজনৈতিক অর্থ সম্বন্ধে সচেতন করে তুলেছিল । পরবর্তীকালে স্যার সৈয়দ আহমেদ সরকারের প্রতি মুসলিমদের আনুগত্য প্রচারে ব্যগ্র হয়ে এই তত্ত্ব উপস্থিত করলেন যে ওয়াহাবিরা ছিল শিখ বিরোধী ব্রিটিশ বিরোধী নয় । তাঁর মতে ওয়াহাবি মতবাদ জনগণকে আকৃষ্ট করে নি । বিধর্মী শাসক ইসলাম ধর্মে হস্তক্ষেপ না করলে মুসলমান প্রজাদের আনুগত্য পাবেন । যাই হোক , প্রকৃতপক্ষে এই আন্দোলনকে ধর্মীয় , অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ের সংমিশ্রণ বলা চলে । হার্ডির মতে - " ভারতীয় মুসলমানেরা ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতে একত্রিত হয়ে ক্রমশ ঃ একটি রাজনৈতিক সত্তার দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন । " একই সময়ে বাংলার দুদু মিঞা ও তিতুমিরের ধর্মীয় ও সামাজিক কার্যকলাপ , সাম্প্রদায়িক ছদ্মবেশ ধারণ করা সত্ত্বে ও সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সংগ্রামের সম্ভাবনা নিয়ে এসেছিল ।

## পরাধীন ভারতবর্ষে অধিকারের আন্দোলন

যদি ঊনবিংশ শতাব্দীর আশী সালের মধ্যেই ওয়াহা - আন্দোলন কার্যত.ঃ বিনষ্ট হয়েছিল , তবু এর কয়েকটি মুল চিন্তাধারা পরবর্তীকালে মুসলিমদের প্রভাবিত করেছিল আর পরবর্তীকালের ইতিহাসে বিস্তার করেছিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

**১) ধর্মীয় অবদান এবং ব্রিটিশদের উপর তার প্রতিক্রিয়া ঃ-**

ওয়াহাবিদের উপদেশগুলি ছিল এইরূপ (১) অন্যধর্মে বিশ্বাসীদের দ্বারা শাসিত দেশে মুসলমানেরা বাস করবে না ।
(২) তাঁদের কর্তব্য হবে এমন একটি দেশে গিয়ে আশ্রয় নেওয়া যাকে বলা যাবে দার -উল ইসলাম ।
(৩) দেশকে বিধর্মীর শাসন থেকে তারা মুক্ত করবে । এই ভাবেই তখন পরবর্তীকালের দেশ বিভাগ আন্দোলনের বীজ বপন করা হয়েছিল । ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে বলতে গেলে বলতে হয় ওয়াহাবি আন্দোলন ছিল আলিগড় আন্দোলন ,সমস্ত মুসলমান ধর্মীদের আন্দোলন এবং পরিশেষে পাকিস্তান

আন্দোলনের অগ্রদূত । এই আন্দোলন ব্রিটিশ বিরোধী অনুভূতির ক্ষেত্রকে উর্বর করেছিল - যার চূড়ান্ত প্রকাশ দেখা গিয়েছিল সিপাহী বিদ্রোহ । সৈয়দ আহমদ ও দুদু মিঞার সমর্থকেরা যুদ্ধে রত ছিল এই উদ্দেশ্য নিয়ে যাতে তাদের আঘাতে ব্রিটিশের রাজনৈতিক কৌশল নিদারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং এই আঘাতের ফল হয় গভীর ও সুদূরপ্রসারী । এর দ্বারা ব্রিটিশের মনে এই ধারণা জন্মেছিল যে মুসলমানেরা মূলতঃ ধর্মান্ধ ও আপোষ মীমাংসার দ্বারা আয়ত্তে আনার বাইরে । একমাত্র সৃদৃঢ়তা ও মিষ্টি ব্যবহারের মধ্যে সুসংহতি আনতে পারলে তাদের আয়ত্তে রাখা যেতে পারে । ব্রিটিশকে এই সিদ্ধান্তই নিতে হয়েছিল । এটাও তাদের উপলব্ধি হয়েছিল যে অভিজাত, নির্দিষ্ট পেশাধারী, শহরবাসী ও ভবিষৎদর্শী মুসলমানদের ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে এই ধরনের রক্ষণশীল প্রতিরোধ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা যেতে পারে । সুতরাং তারা মুসলমানদের সম্পর্কে তাদের নিজস্ব ঐক্যনাশক নীতিরই আশ্রয় নিয়েছিল । ১৮৫৭ সালের আগের এবং তার অব্যাহতি পরেও সমগ্র মুসলিম সমাজের প্রতি ব্রিটিশের মনোভাব শুভেচ্ছামূলক ছিল না । ধন্যবাদ জানাতে হয় ওয়াহাবি আন্দোলনকে আর সিপাহী বিদ্রোহ মুসলমানদের অংশগ্রহণকে । এই ঘটনাপ্রবাহের ফলেই বিদেশী শাসক মুসলমানদের এক বিদ্রোহী সম্প্রদায় ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারেনি ।

**(২) মুসলমান ও ব্রিটিশের পরিবর্তিত চিন্তাধারা ঃ**

কিছুকাল অতিবাহিত হওয়ার পর মধ্যবিত্ত মুসলমান শ্রেণী স্যার সৈয়দ আহমদের নেতৃত্বে ব্রিটিশ বিরোধী উত্তেজনাকে হিন্দু বিদ্বেষে রূপান্তরিত করল । স্যার সৈয়দ এই তত্ত্ব প্রচার করতে লাগলেন যে ওয়াহাবিরা ছিলেন শিখ বিরোধী ব্রিটিশ বিরোধী নয় । তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন যে ওয়াহাবি আন্দোলন সাধারণ মানুষের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি । তিনি আরও বললেন - বিধর্মী শাসক যদি তাঁদের ধর্মে কোন হস্তক্ষেপ না করে, তবে মুসলমানদের কর্তব্য সেই শাসকের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা । এই বিপরীত ধারায় চিন্তা অগ্রসর হওয়ার ফলে ওয়াহাবি আন্দোলন আলিগড় আন্দোলনকে ডেকে আনল । এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য হল ব্রিটিশ শাসনকে প্রতিরোধ করা নয় - বরং সেই শাসনের প্রতি আনুগত্য দেখানো, তার সঙ্গে সহযোগীতা করা । ব্রিটিশ বিরোধী অনুভূতি তাই বিদেষী মনোভাবে রূপান্তরিত হল । মুসলমানদের মনে এই আনুগত্যের জাগরণ ব্রিটিশ রাজকর্মকারীদের মনে সন্তোষজনক সাড়া জাগিয়ে তুলল । হান্টার কর্তৃক যুক্তি প্রদর্শিত হল - ওয়াহাবির আন্দোলনের মধ্যে নিহিত ব্রিটিশ বিরোধীতা যদি বিনষ্ট হয়ে থাকে তবে সরকারেরও উচিত মুসলমানদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা । মুসলমানেরা খুবই ভদ্র ও সু স্বভাব সম্পন্ন বলে ক্যাম্পবেল কর্তৃক বর্ণিত হলেন । তদানীন্তন ভাইসরয় লর্ড ডাফরিনের বক্তব্য হল " আমাদের ভারতীয় দুনিয়ার মুসলমানেরা দুটি শক্তিশালী রাজনৈতিক গোষ্ঠীর একটি ।

**৩) সমগ্র ইসলাম সম্প্রদায়ঃ**

ওয়াহাবি আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল আরবে । এই আন্দোলনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল পবিত্র ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করা। বিধর্মীদের দ্বারা শাসিত দেশ (দারউল্হারব) ভআরতবর্ষ থেকে মুসলমানদের অন্য কোনো মুসলিম রাজ্যে চলে যাওয়ার প্রস্তাবও ছিল এই আন্দোলনে । এখানেই আমরা লক্ষ্য করতে পারি - সমগ্র মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের সমন্বয়ের সূচনা । আশীর দশকের গোড়ার দিকে জামালউদ্দিন আল আফগানের ভারত সফর এই সমন্বয়ের প্রবণতাকে সুদৃঢ় করে তুলেছিল ।

**৪) সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ফলাফল ঃ**

হার্ডির মতে ওয়াহাবিদের সংস্কার আন্দোলন (ঘটনার দিক থেকেপরিপূর্ণ রূপ লাভ না করলেও) ধীরে ধীরে ভারতীয় মুসলমান সমাজকে একদল ধর্মবিশ্বাস গোষ্ঠী থেকে একটি রাজনৈতিক সংঘে রূপান্তরিত করল । তাদের মধ্যে দেখা দিল সম্মিলিত ভাবে কিছু করার ইচ্ছা । সৈয়দ আহমদ মোগলদের পুনরুদ্ধার চান নি , তিনি চেয়েছিলেন ভারতের সীমান্তে পূর্বকালীন মুসলমান সমাজের একটি নিদর্শন তৈরী করতে । তাঁর বাণী প্রাক্ শিল্পভিত্তিক নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজকে আকৃষ্ট করেছিল । এই সমাজের মধ্যে ছিলেন ক্ষুদ্রভূস্বামী , শিক্ষক , দোকানদার , কারিগর ও ক্ষুদ্র সরকারী কর্মচারী । বিংশ শতাব্দীতে রাজনীতিতে ধর্মের অনুপ্রবেশ এই শ্রেণীর মানুষগুলির জন্যই সম্ভব হয়েছিল । উল্লেখযোগ্য হল এই যে ওয়াহাবি আন্দোলন ক্ষয়িষ্ণু মোগল সংস্কৃতির উপর তীব্র আঘাত হেনেছিল।

**রাজনৈতিক ও ধর্মীয় পটভূমি ঃ**

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহে ব্যাপকভাবে মুসলমানদের ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছিল । যদিও আনুগত্যহীনতা ও বিরক্তির স্ফুলিঙ্গ প্রথমে হিন্দু সিপাহীদের মনেই প্রজ্বলিত হয়েছিল । তবু এই আন্দোলনের প্রসার ঘটিয়েছিল মুসলমানেরা , পরিচালনারও ভার নিয়েছিল তারা । ধর্মীয় দুর্দশার বোঝা তাদের পথ দেখিয়েছিল রাজনৈতিক ক্ষমতায় উত্তরণের । ব্রিটিশের মতে - মুসলমানদের গুপ্ত চক্রান্তই এই বিদ্রোহকে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে রূপান্তরিত করেছিল। ব্রিটিশদের অধিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই মুসলমানেরা তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা হারানোর ক্ষতিটাকে কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না ।

**২) দিল্লী ঃ**

এই বিদ্রোহের মূলে সক্রিয় অংশ ছিল - তার অনেক প্রমাণও পাওয়া যায় । দেশী অশ্বারোহী বাহিনীর নিম্নপদস্থ অশ্বারোহীরা ছিলেন মুসলমান । তাঁরা কুচকাওয়াজ করে মীরাট থেকে দিল্লী এলো বাহাদুর শাহকে তাঁদের বিদ্রোহের নেতার পদে অভিষিক্ত করতে । বাহাদুর শাহ ইউরোপীয়দের একবারেই সুনজরে দেখছিলেন না - তারা তাঁর কর্মচারীবর্গ ও ব্যয়ের পরিমাণ কমিয়ে দিতে চেষ্টা করে । তিনি সম্রাট রূপে ঘোষিত হয়েই প্রধান সেনাপতির পদে প্রতিষ্ঠিত হলেন মিরজা মোগল নামে

এক মোগল রাজকুমার । দিল্লী ও তার আশে পাশের জায়গীরদারদের (যথা -রহমন খান , জিয়া আল দিন আহমদ) সম্রাটের রাজসভায় ডাকা হল । মোগল সম্রাটের নামে একটি ঘোষণাও প্রচারিত হল । - নিজের ধর্মকে যারা রক্ষা করতে চান তাঁরা সকলেই সৈন্যদলে যোগ দেন ।

### ৩) অযোধ্যা ঃ-

অযোধ্যার ঘটনাবলী এই বিদ্রোহে মুসলমানদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার সাক্ষ্য দেয় । অযোধ্যার নির্বাসিত রাজার নাবালক পুত্র বিরজিস কাদিরকে কেন্দ্র করে সিপাহীরা একত্রে সমাবেশ রচনা করেন । মুসলমানদের বিদ্রোহকে কেন্দ্র ছেড়ে না যাওয়ার জন্য আগ্রার চীফ কমিশনার ফ্রেজার কর্তৃক হুঁশিয়ারী জ্ঞাপন করা হয় । বেগম হজরত মহল ব্রিটিশের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং তার পুত্রের পাশে দাঁড়ানোর জন্য বিদ্রোহীদের আহ্বান করেন ।

### ৪) উত্তর পশ্চিম প্রদেশের গ্রামাঞ্চল ঃ

গ্রামাঞ্চলের ঘটনাগুলি বিদ্রোহে মুসলমানদের প্রকৃতি ও আচরণের পরিচয় দেয় । আলিগড়ে তন্তুবায়ের মত নিম্নশ্রেণীর মুসলমানেরা জিহাদের ধ্বনি তোলে । মহম্মদ খাঁ নামে একটি লোক আলিগড়ে নিজেকে বাহাদুর বলে দাবী করে । ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ কর্তৃক রোহিলাখন্দ অধিকার সেখানকার মুসলমানদের ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট করে । খান বাহাদুর খাঁ বাহাদুর শাহের পক্ষ থেকে নবাব - নাজিম উপাধি গ্রহণ করলেন এবং মুবারক শাহকে বদাউনের শাসনকর্তা রূপে নিয়োগ করলেন । এলাবাদে অত্যাচারিত অভিজাত মুসলমানেরা এবং শহরবাসী মুসলমানেরা ঐক্যবদ্ধ হলেন । সম্রাটের নামে তত্ত্বাবধানের ভার নিলেন মৌলভী লিয়াকৎ আলি ।

### ৫) ধর্মীয় শক্তি ঃ

মুসলিম ধর্মের নেতৃস্থানীয় লোকেরাও এই বিদ্রোহে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছিলেন । ফৈজাবাদের মৌলভী আহম্মদ আল্লা শাহ ১৮৫৮ সালে ক্যাম্পেবেলের বাহিনী অযোধ্য জয় করতে গেলে সেই বাহিনীকে নাস্তানাবুদ করেছিলেন । মুজাফফর নগরের বিদ্রোহে নেতৃত্বে দিয়েছিলেন মৌলানা রহমৎ উল্লা । ওয়াহাবিদের সন্দেহের চোখে দেখা হয়েছিল এবং পাটনাতে তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল । ১৮৫৭ সালের জুলাই মাসে টংক থেকে একজন মুসলমান সেনাপতি আসেন - তাঁরই নেতৃত্বে মুসলমান সৈন্যরা দিল্লী আক্রমণের সময় বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেন।

মুসলিম উইলায়াতিরা ও গুজরাটের দখলদারেরা বিরূপতা বিরক্তিতে ভরে ছিল । ১৮৫৭ খ্রীষ্টব্দের জুলাই মাসে বরোদার দোহাদ দুর্গে একটি মুসলিম বিদ্রোহ দেখা দেয় । কিছু পরে সুন্থে আর একটি বিদ্রোহ হয় যার - নেতৃত্বে নিয়েছিলেন মুস্তাফা খাঁ । উত্তর পশ্চিম প্রদেশের ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব ক্যাম্পবেল কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে ।

**৬) মুসলমানদের অসহযোগের ঘটনা ঃ**

এটাও উল্লেখযোগ্য যে মুসলমানেরা বিদ্রোহের সূত্রপাতের সময় কোন উদ্যম দেখান নি । মুল সিপাহী বিদ্রোহ হিন্দু সিপাহীদের দ্বারাই উদ্ভাবিত হয়েছিল । অসামরিক অভ্যুত্থান বেশীর ভাগ জায়গাতেই হিন্দুদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল । ব্যক্তিগত, জাতিগত, শ্রেণীগত ও আঞ্চলিক বিভেদ মুসলমানদের পৃথক পৃথক ভাগে বিভক্ত করে রেখেছিল । হায়দ্রাবাদের নিজাম ও রামপুর করনাল, মুরাদাবাদ এবং ঢাকার নবাবদের মত অভিজাত শ্রেণী আনুগত্যই রক্ষা করেছিলেন । আবার ফারাক্কাবাদ ও ডান্ডার নবাবেরা বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিলেন । মুসলিম রাজকর্মচারীরাও অনুরূপ বিভক্ত ছিলেন । আলিগড় ও রোহিলাখন্দে তাঁদের বেশীর ভাগই বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিলেন । কিন্তু সৈয়দ আহম্মদ খাঁ (বিজনোরে সদর আমিন রূপে নিযুক্ত) ব্রিটিশের সঙ্গে সহযোগীতাই করেছিলেন । এমনকি পাটনাতে যেখানে মুসলমানদের আনুগত্যহীনতার একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল - সেখানে টেলরের প্রধান সাহায্যকারী হয়েছিলেন মুসলমানেরা । এঁদের মধ্যে ছিলেন বক্স্ শাহ্ কবীর রমজান আলি এবং উলিয়াৎ খাঁ । বাংলার মুসলমানেরা ব্রিটিশ শাসনে আর্থিক ও অন্যান্য দুর্দশা ভোগ করিলেও কোন বিদ্রোহ প্রকাশ করেননি । পাঞ্জাবে মুসলমানেরা সীমান্তের মুসলমান উপজাতিদের সঙ্গে মিলিত হয়ে দিল্লীর নিকট ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিল । এই মুসলমান সেনাদল রেইকী প্রমুখ রাজপুরুষদের আস্থা ও প্রশংসা অর্জন করেছিল ।

**৭) স্যার জর্জ ক্যাম্পবেলের মত ঃ**

ঘটনাগুলি একটা মোটামুটি সুসম ও প্রামাণিক বিবরণ ক্যাম্পবেল কর্তৃক প্রদত্ত হয়েছে । তার মতে এই - বিদ্রোহ মূলতঃ ছিল হিন্দুস্থানী বিদ্রোহ । উত্তর পশ্চিম প্রদেশের প্রভাবশালী হিন্দু ও মুসলিমদের দ্বারাই এটা পরিচালিত হয়েছিল । তাই একে ধর্মীয় বিদ্রোহ না বলে অভিজাত সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ বলাই সঙ্গত । সাধারণ মুসলমানেরা এতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন নি । এই বিবরণে প্রদর্শিত হয়েছে যে বিহার ও বেনারসের মুসলমানেরা ও জমিদারেরা বিদ্রোহ যোগ দেন নি । প্রকৃত নিষ্ঠাবান ও গোঁড়া মুসলমানেরাও দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় - (বাংলার ফরাইজি ও মালাবারের মোপলাহদের কথা ) বিদ্রোহী হন । প্রধান প্রধান মুস্লিম ঈশ্বরতত্ত্ব বেত্তারাও সক্রিয় সহানুভূতি দেখান নি । এমনকি বিদ্রোহের প্রধান কর্মকেন্দ্র উত্তর পশ্চিম প্রদেশেও সাধারণ মুসলমানেরা সরকারের অনুগত ছিলেন । কিন্তু এ কথাও ক্যাম্পবেল কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছে যে বিদ্রোহী রাজকর্মচারীদের অধিকাংশই ছিলেন মুসলমান সম্প্রদায়ের । কিন্তু বাহাদুর শাহের বিদ্রোহে জড়িত হওয়া কোনক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ ছিল না, কারণ তিনি বিদ্রোহীদের দ্বারা মীরাট থেকে ব্যবহৃত হয়েছিলেন ।

**৮) ক্যানিংয়ের মত ঃ**

মূলতঃ হিন্দুদের দ্বারাই এই উত্থান সংঘটিত হয়েছিল - এই মত ক্যানিং কর্তৃক একেবারেই

স্বীকৃত হয়নি। বোর্ড অফ কন্ট্রোলের সভাপতি ভারমান স্মিথের কাছে প্রেরিত পত্রে এই তথ্য পাওয়া যায় যে হিন্দু আন্দোলন দিয়ে আরম্ভ হলেও স্থানীয় অসন্তোষের সঞ্চয়ের জন্যই ক্রমে ক্রমে মুসলমানেরাও এসে যোগদান করেছিল । ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ অংশ মুসলমানদের দ্বারা গঠন ও বহুলাংশে এই বিদ্রোহের জন্য দায়ী ।

**৯) বাউরিং কর্তৃক পরিমাণ ও মূল্য নির্ণয় ঃ**

১৮৫৯ সালে বাউরিং কর্তৃক রচিত একটি ঘটনা ও মূল্য নির্ণায়ক বিবরণী ক্যানিংয়ের নিকট প্রদত্ত হয় । মুসলমানেরাই বিদ্রোহের প্রধান পরিচালক ছিলে এরূপ মত এই বিবরণীতে অস্বীকার করা হয় ।একথা স্বীকৃত হয়েছিল ভারতের বিভিন্ন অংশের মুসলমানেরা সরকারের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন না ।এই ধারণাও স্বীকৃত হয়েছিল যে মুসলমানেরা ব্রিটিশ শাসনের চেয়ে মুসলমান শাসনই পছন্দ করবে । যাই হোক , এসম্বন্ধে তার সন্দেহ ছিল না যে মুসলমানেরা এই বিদ্রোহে আংশিক দায়িত্ব নিয়েছিল এবং তাও বিদ্রোহ সম্প্রসারিত হওয়ার পরে । বাউরিং এর মতে ব্যারাকপুরে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আগে মুসলিমদের সহযোগিতার কোন নিদর্শন নেই । এমন কি দিল্লী দখলও আকস্মিকভাবে সংঘটিত হয়েছিল , পূর্ব পরিকল্পিত ছিল না । দিল্লীর জনসাধারণ ও সিপাহীরা মীরাট থেকে বিদ্রোহী সৈন্যদের আগমনের জন্য প্রস্তুত ছিল না । বাংলার মুসলমানদের নিস্ক্রিয়তা ও পাঞ্জাবী মুসলিমদের সক্রিয় আনুগত্য বাউরিং কর্তৃক প্রদর্শিত হয়েছে । এ ছাড়া বাউরিং এর প্রশংসা অর্জন করতে পেরেছেন প্রধান প্রধান মুসলমান নবাবদের যারা আনুগত্য দিয়ে সরকারের সেবা করেছেন । এদেঁর মধ্যে ছিলেন হায়দ্রাবাদের নিজাম , মুর্শিদাবাদের নবাব ও রামপুরের নবাব । পরিশেষে উল্লেখযোগ্য হল এই যে বিদ্রোহের নায়কত্ব নিয়েছিলেন নিম্নপদস্থ কর্মচারীরা অভিজাত মুসলমানেরা নয় । পরবর্তীকালে স্যার সৈয়দ আহমেদ মুসলমানদের একটি পুরুষাক্রমে অনুগত সম্প্রদায় বলে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন ।

## পরাধীন ভারতবর্ষে স্বাধীনতা অধিকারের আন্দোলন

১৫২২ থেকে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অটোমান বংশীয় তুরস্কের সম্রাট ছিলেন মুসলিম দুনিয়ার খলিফা । খলিফা শব্দটির অর্থ উত্তরাধিকারী এবং প্রতিষ্ঠানটির নাম খিলাফৎ । পয়গম্বরের ধর্ম প্রবর্তন ব্যতীত অন্যান্য সব দায়িত্ব ও কাজের উত্তরাধিকারী ছিলেন খলিফা । মুসলিম জগতের তিনিই ছিলেন একমাত্র অধিকর্তা । ভারতের মুসলিম সম্প্রদায়ও খলিফার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করত ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তুরস্ক জার্মানীর পক্ষ অবলম্বন করে । ফলে গ্রেট ব্রিটেন তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বাধ্য হয় এবং যুদ্ধে তুরস্কের পরাজয়ের আশঙ্কায় খলিফার মর্যাদা ও প্রতিপত্তি

ক্ষুন্ন হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয় । খলিফার মর্যাদাহানির আশঙ্কায় ভারতের মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দিতে শুরু করে । ভারতীয় মুসলিমদের আশঙ্কা দূর করার উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে ইংলন্ড তুরস্ক সাম্রাজের সমৃদ্ধ এশিয়া মাইনর ও থেস অঞ্চল বঞ্চিত করার জন্য কোন ভাবেই চেষ্টা করবে না । কিন্তু যুদ্ধে মিত্রপক্ষের জয়ের পর ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে মিত্রপক্ষ তুরস্ক সাম্রাজ্যের উপর সেভরেস চুক্তি জোর করে চাপিয়ে দেয় এবং এই চুক্তির শর্ত অনুসারে তুরস্ক , ইজিপ্ট , সুদান , সাইপ্রাস , ত্রিপোলিতানিয়া , মরক্কো ,টিউনিসিয়া , আরব প্যালেস্তাইন , মেসোপোটামিয়া ও সিরিয়ার উপর তার কতৃত্ব ত্যাগ করতে বাধ্য হয় । ফলে তুরস্কের খলিফার অধিকারে একাত্র পর্বতাকীর্ণ আনতোলিয়া ও ইয়োরোপের সামান্য কিছু অঞ্চলের উপর কর্তৃত্ব বজায় থাকে । যুদ্ধ অবসানের পর তুরস্কের উপর যে কঠোর শর্ত আরোপ করা হবে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের মুদ্রস্ এর যুদ্ধবিরতি চুক্তিতেই তার পূর্বাভাস পাওয়া যায় । মেসোপোটামিয়া , আরব , সিরিয়া , প্যালেসতাইন প্রভৃতি মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের তীর্থ স্থানসমূহ অবস্থিত , সুতরাং ওই সকলস্থানের উপর খলিফার আধিপত্য বিনষ্ট হওয়ায় ভারতীয় মুসলিমগণ অত্যন্ত ক্ষুদ্ধ হয় । তবে মিত্রপক্ষের এইরূপ ব্যবহারে শুধুমাত্র ভারতীয় মুসলমান নয় , পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের মুসলমানগণও অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয় । পূর্ব ক্ষমতায় খলিফাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ১৯১৯ খ্রী ১১ই নভেম্বর বোম্বাই শহরের সেন্ট্রাল খিলাফৎ কমিটি গঠিত হয় ।

**২) গান্ধীজি ও খিলাফৎ আন্দোলন ঃ**

সেভরেস্ এর চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পূর্বেই ভারতের মুসলিম নেতৃবর্গ খিলাফতের সমস্যা সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করতে শুরু করেন ।১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের জাতীয় কংগ্রেসের অমৃতসর অধিবেশনে মুসলিম নেতাগণ এই প্রসঙ্গে গান্ধীজীর সঙ্গে আলোচনা করেন এবং গান্ধীজী এই বিষয়ে তাঁদের সহযোগিতা করতে সম্মত হন । আলি ভ্রাতৃদ্বয় - মোহম্মদ আলি ও সৌকৎ আলি - খিলাফৎ আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে একটি ইস্তাহার প্রকাশ করে খিলাফৎ আন্দোলন শুরু হয় । ইসলামে বিশ্বাসীদের ইহজগৎ ও ধর্মজগতের প্রতিষ্ঠানরূপে খলিফা প্রভাব ও প্রতিপত্তি স্থায়ীভাবে রক্ষা করার দাবিই ছিল এই আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য । এই দাবি পূরণ করার জন্য মুসলিম নেতৃবর্গ ভারতের ভাইসরয় লর্ড চেমস্ ফোর্ড এবং ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধীজী ঘোষণা করেন যে ভারতের মুসলমানদের মনোভাব ব্রিটিশ সরকার সহানুভূতির সঙ্গে বিচার না করলে এবং তুরস্কের সহিত মিত্রপক্ষের সম্পাদিত তুক্তির শর্তসমূহ সন্তোষজনকভাবে পুনর্বিবেচিত না হলে তিনি অসহযোগ আন্দোলন আহ্বান জানাতে বাধ্য হবেন । মুসলিম সম্প্রদায়ের জীবন মরণের প্রশ্নে ব্রিটিশ সরকারের উদাসীনতা তাঁকে অত্যন্ত বিচলিত করে তোলে এবং তিনি ঘোষণা করেন যে " England cannot expect a meek subimssion by is to an unjust usurption

of rights which to Muslims means a matter of life and death."

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে তুরস্কের মিত্রপক্ষের চুক্তির শর্ত প্রকাশ করা হয় ।ইংলন্ডের ব্যবহারে মুসলিম সম্প্রদায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয় । এই সময় পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ডের তদন্ত সম্পর্কে হান্টার কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ভারতবাসী অত্যন্ত মর্মাহত হয় । জাতীয় কংগ্রেস অনন্যো পায় হয়ে অসহযোগ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং সেন্ট্রাল খিলাফৎ কমিটিও গান্ধীজীর আন্দোলনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে ।

**৩) খিলাফৎ ও জাতীয় কংগ্রেসঃ**

কলকাতার বিশেষ অধিবেশনে গান্ধীজির নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেস ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর আন্দোলনের প্রস্তাব গ্রহণ করে । সেই অধিবেশনেই খিলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলন একসঙ্গে পরিচালনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।খিলাফৎ আন্দোলন হতাশাব্যঞ্জক মন্টেগু চেমসফোর্ড সংস্কার এবং জালিয়ান- ওয়ালাবাগের হত্যাকান্ডের ফলে হিন্দু - মুসলমান নির্বিশেষে ভারতবাসীর মন অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ ছিল এবং ব্যাপক রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য তারা প্রস্তুত ছিল । এই সম্পর্কে পট্টভি সীতারামায়া মন্তব্য করেন , " The Tribeni of the Khilafat and the punjab wrong and the invisible flow of inadequate reforms , became full to the brim , and by their confluence enriched both in volume and content the stream of national discontent ." গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাবের পক্ষে ১৮৮৬ টি ভোট এবং বিপক্ষে ৮৮৪ টি ভোট পড়ে । ব্রিটিশ সরকারের দুটি অন্যায়ের প্রতিবাদে অসহযোগ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় -

১) খলিফার ক্ষমতাচ্যুতিতে মুসলমান সম্প্রদায়ের ক্ষোভ এবং (২) পাঞ্জাবের জনসাধারণের লাঞ্ছনা । গান্ধীজির প্রস্তাবে মুসলিমদের দাবির সমর্থন জানাবার জন্য হিন্দুদের প্রতি আহ্বান জানানো হয় । ... it is the duty of every times non Muslim Indian in every legitimate manner to assist his Muslims brother in his attempt to remove the religious calamity that has overtaken him."

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ শে ডিসেম্বর নাগপুর সাধারণ অধিবেশনে অসহযোগ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।

নানা বাধা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে অসহযোগ আন্দোলন পরিচালিত হয় । শান্তিপূর্ণভাবে অসহযোগ আন্দোলন পরিচালিত হলেও কোথাও কোথাও এই আন্দোলন হিংসাত্মক আকার ধারণ করে । বিশেষতঃ মালাবার অঞ্চলের মোপলা বিদ্রোহ নানারূপ অশান্তির সৃষ্টি করে । ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের খিলাফৎ সম্মেলনে করাচী অধিবেশনে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে মুসলিমদের ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীতে যোগদানের উপর নিষেধ আজ্ঞা জারী করে । এই অধিবেশনে মুসলমানদের

পক্ষ থেকে ইংলন্ডে স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন এবং কামাল পাশার নেতৃত্বে তুরষ্কের নবগঠিত জাতীয় সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।এই আন্দোলন দুর করার উদ্দেশ্যে এই সময় ব্রিটিশ সরকার আলি ভ্রাতৃদ্বয়কে বন্দী করেন । ব্রিটিশ সরকারের নীতির প্রতিবাদে জাতীয় কংগ্রেস প্রত্যেক প্রদেশকে নিজের দায়িত্বে করপ্রদান বন্ধ করা সহ আইন অমান্য আন্দোলন করতে নির্দেশ দেন । খিলাফৎ আন্দোলনের সময হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতিও যথেষ্ঠ বৃদ্ধি পায় ।

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধীজি গুজরাটের বরদোলি তালুকে সরকারী কর প্রদান বন্ধ করার আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন । ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের উত্তর প্রদেশের চৌরি চৌরার ঘটনা অহিংসা আন্দোলনের গতি পরিবর্তিত হয়। বোম্বাই ও মাদ্রাজে হিংসাত্মক আন্দোলন শুরু হয় । এরূপ আন্দোলন বন্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন ।ব্রিটিশ সরকার গান্ধীজিকে গ্রেপ্তার করে দু বছরের জন্য কারাবদ্ধ করার নির্দেশ দেয় ।

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধীজি গুজরাটের বরদোলি তালুকে সরকারী কর প্রদান বন্ধ করার আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন । ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের উত্তর প্রদেশের চৌরি চৌরার ঘটনা অহিংসা আন্দোলনের গতি পরিবর্তিত হয়। বোম্বাই ও মাদ্রাজে হিংসাত্মক আন্দোলন শুরু হয় । এরূপ আন্দোলন বন্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন ।ব্রিটিশ সরকার গান্ধীজিকে গ্রেপ্তার করে দু বছরের জন্য কারাবদ্ধ করার নির্দেশ দেয় ।

আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খিলাফৎ আন্দোলনের সময় সহযোগিতার ভিত্তিতে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যে প্রীতির সর্ম্পক গড়ে ওঠে তা -ও বিনষ্ট হয়ে যায় । ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের শেষদিকে মুলতানে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে মারাত্মক দাঙ্গা শুরু হয় ।পরের বছর বাংলাদেশ ও পাঞ্জাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখা দেয় হিন্দু মুসলমানের প্রীতির সর্ম্পক বিনষ্ট হওয়ায় ব্রিটিশ সরকার অত্যন্ত আনন্দিত হয় এবং এই সম্পর্কে একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী মন্তব্য করেন , " The structure so painfully erected by Mr. Gandhi had crumbled hopelessly."

ইতিমধ্যে তুরষ্কের রাজনীতিতে বিরাট পরিবর্তন দেখা যায় । সেভবেস এর চুক্তির পরিবর্তে মিত্রপক্ষ ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে তুরষ্কের সহিত লজনের চুক্তি সম্পাদন করে ।অপর দিকে জাতীয় আইন সভা ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের তুরস্কের রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে এই মর্মে এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে ।তবে এই আইনসভা ধর্মীয় অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য উন্নত চরিত্র ও শিক্ষাগত যোগ্যতা বিচার করে অটোমান রাজ পরিবারের কোন ব্যক্তিকে খলিফা পদে নিযুক্ত করতে সম্মত হয় ।কিন্তু কামালপাশার বিপ্লবী সরকারের নীতির সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য হীন বলে ১৯২৪খলিফার পদ চিরদিনের জন্য বিলোপ করা হয় । ফলে ভারতের মুসলমানদের নিকট খলিফা বা খিলাফৎ সম্পূর্ণ মুলহীন হয়ে

পড়ে।

**৪) খিলাফৎ আন্দোলনের ত্রুটি ঃ**

খিলাফৎ আন্দোলনের অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি ছিল এবং এই আন্দোলনের পরিধিও ছিল খুবই সংকীর্ণ । প্রথমতঃ খিলাফৎ প্রকৃত পক্ষে মুসলিমদের আন্দোলন জাতীয়তাবাদী আন্দোলন নয় । খিলাফতের প্রশ্ন ইংলন্ডের বৈদেশিক নীতির সহিত জড়িত , ভারতসরকারের সেই সম্পর্ক কিছু করণীয় ছিল না । জাতীয়কংগ্রেস আন্দোলনের সহিত যুক্ত হয়ে খিলাফৎ আন্দোলনকে জনপ্রিয় করে তোলার ব্যবস্থা করে । কিন্তু ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায় তুরস্কের অপেক্ষা ব্রিটিশ সরকারকে বেশি ভয় ও ভক্তি করত । প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তারা খলিফার নির্দেশ অনুযায়ী ব্রিটিশের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতে সম্মত হয় নি । যুদ্ধের সময়ও তারা ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে কুণ্ঠা বোধ করে নি ।

**দ্বিতীয় ঃ**

দুর্বল ও পতনোম্মুখ খলিফার জন্য ভারতীয় মুসলিমদের সহানুভতি সমর্থন ছিল সম্পূর্ণভাবে অবান্তর ও হাস্যকর । প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে নতুন নতুন রাষ্ট্র গঠিত হয় । জাতীয় রাষ্ট্র গঠনই এই যুগের প্রধান বৈশিস্ট্য । কিন্তু তার সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যহীন আন্তর্জাতিক সংস্থা খিলাফতের অস্তিত্ব রক্ষার চেষ্টা কোন ক্রমেই যুক্তিযুক্ত ছিল না । রাজনৈতিক দিক থেকে বিচার করলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজয়ের ফলে তুরস্ক সাম্রাজ্য ধ্বংস হয় । অটোমান সাম্রাজ্যের ধ্বংস স্তূপের উপর জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতে গঠিত সুসংহত তুরস্কে খলিফার কোন স্থান ছিল না । তুরস্কেই যখন খলিফার কোন স্থান ছিল না , তাঁর জন্য ভারতের মুসলমানদের দুঃখ প্রকাশ ছিল সম্পূর্ণ নিরর্থক । নিজেদের রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতির জন্য কোন চেষ্টা না করে খিলাফতের নেতাগণ বিদেশী খলিফাও সুলতানের জন্য আন্দোলন শুরু করেন । তাছাড়া ভারতের সাধারণ মুসলমানেরা এই আন্দোলনের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারে নি । পাশ্চত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মোহম্মদ আলি জিন্নাহ প্রমুখ মুসলিম নেতৃবর্গও এই আন্দোলনের কোন অংশ গ্রহণ করেন নি । এই সব নেতৃবন্দ শাসনতান্ত্রিক সংস্কার ও সংবিধান সংশোধনের জন্য সচেষ্ট হয়ে ওঠেন । ফলে খিলাফৎ আন্দোলনের তীব্রতা ক্রমেই হ্রাস পায় ।

**তৃতীয়ত ঃ**

ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রধান ধারার সঙ্গে খিলাফৎ আন্দোলনকারীরা কোন সম্পর্ক স্থাপন করতে ব্যর্থ হন । গান্ধীজীর সমর্থন লাভ ও অসহযোগী আন্দোলনের সহিত যুক্ত হওয়ার ফলে খিলাফৎ আন্দোলন জনপ্রিয় হয়ে ওঠলেও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা , বিশেষত , মোপলা বিদ্রোহ হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতি ধ্বংস করে । জাতীয় কংগ্রেস ও হিন্দুদের সমর্থন থেকে

বঞ্চিত হওয়ার ফলে খিলাফৎ আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়ে ।

**চতুর্থত ঃ**

গ্রেট ব্রিটেন ও ভারত সরকারের কঠোর নীতির ফলেও খিলাফৎ আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়ে । খিলাফৎ আন্দোলনকারীদের কোন প্রকার সুযোগ সুবিধা দিতে ব্রিটিশ সরকার অস্বীকার করে । খিলাফৎ আন্দোলনের প্রতিনিধিবর্গও শূন্যহস্তে ইংলন্ড থেকে বিদায় গ্রহণ করতে বাধ্য হয় । তুরস্কে নতুন সরকার গঠিত হওয়ার ফলেই ব্রিটিশ সরকার খিলাফৎ আন্দোলনের উপর কোন প্রকার গুরুত্ব আরোপ করতে অস্বীকার করে । অসহযোগ আন্দোলন ও খিলাফৎ আন্দোলনের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করে । ভাইসরয় লর্ড রীডিং এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেন । এই সব কারণের জন্য খিলাফৎ আন্দোলনের পক্ষে সাফল্য ঘটেনি।

## পরাধীন ভারতবর্ষে স্বাধীনতা অধিকারের আন্দোলন

বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত ও তার সরকারী ঘোষণা সারা বাংলাদেশে এক তীব্র ও ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে । সমাজের সকল শ্রেণী ও সকল স্তরের মানুষ এবং সংবাদ পত্র -পত্রিকা এই দুরভিসন্ধিমূলক আদেশের প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে । বিভিন্ন সভা সমিতিতে বঙ্গভঙ্গের নিন্দা করে এবং এই সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবি জানিয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয় । স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের সরকার ভারত সরকার ও ইংলন্ডের কতৃপক্ষের কাছে শত শত প্রতিবাদ পত্র পাঠানো হতে থাকে । বিভিন্ন মেলা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে গণ স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয় । কিন্তু এই সব প্রচেষ্টার নিষ্ফলতা জনগণকে এক ব্যাপকতর ও বৃহত্তর আন্দোলনের জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প করে তোলে ।

সঞ্জীবনী কাগজের সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র দেশবাসীকে বিদেশী দ্রব্য বর্জন ও স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের সঙ্কল্প গ্রহণের জন্য আহ্বান জানালে তা সর্ব সাধারণের মধ্যে বিপুল সাড়া জাগায় । বঙ্গদর্শন পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙ্গালী সমাজের অটুট মনোবলের স্থির সঙ্কল্পের কথা পুণঘোষণা করেন । ছাত্র সমাজের মধ্যে ও এক অভূত পূর্বল উন্মাদনার সৃষ্টি হয় । বঙ্গভঙ্গের রোধের দৃঢ় পণ ও বন্দেমাতরম' মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হয়ে হাজার হাজার ছাত্র বাংলাদেশ ও বাঙ্গালী জাতির ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে যোগ দিতে থাকে । বিভিন্ন সংবাদ , পত্রিকা এবং সাহিত্যের মাধ্যমে 'বয়কট' ও 'স্বদেশী' এই দুই আদর্শ ও লক্ষ্য ছড়িয়ে পড়ে । রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় , রজনীকান্ত সেন প্রমুখ কবিদের গান , কবিতা , নাটক প্রভৃতি জনগণের স্বদেশ প্রেম ও ভাবাবেগ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে । 'ব্রতী সমিতি' সনাতন সম্প্রদায় ' বন্দোমাতরম ' ডন সোসাইটি ' প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠাগুলো ও স্বদেশী ভাবধারা প্রচার ও স্বদেশ প্রেমী বিকাশের তৎপর হয় ।

**আন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধি ঃ**

সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত কার্যকরী হয়। রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাব অনুযায়ী ঐ দিনটি 'রাখীবন্ধন' দিবসরূপে পালিত হয়। পূর্ব বাংলা পশ্চিম বাংলা, ধনী দরিদ্র, হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান নির্বিশেষে বাঙ্গালীজাতির ভ্রাতৃত্ব ও অবিচ্ছেদ্য ঐক্যের কথা ঘোষণা করাই ছিল এই উৎসবের তাৎপর্য। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় " কোন শক্তি মদমত্ত রাজশক্তিই বাঙ্গালীর ঐক্যকে ভাঙ্গতে পারবে না, একথাই প্রমাণিত হল রাখী বন্ধন উৎসবে। রাখী বন্ধন ছাড়া ঐ দিনটি 'অরন্ধন দিবস' রূপেও পালন করা হয়। সবগ্র বাঙ্গালীর জাতি সেদিন অরন্ধন পালন করে ব্রিটিশ সরকারের স্বৈরাচারী নীতির মৌন প্রতিবাদ জানায়। বঙ্গভঙ্গের দিনটিতেজনজীবনের স্রোত বন্ধ হয়ে যায়। স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ, শোভাযাত্রা ও জনসভার মধ্য দিয়ে বাংলার মানুষ বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। অল্পকালের মধ্যেই এই আন্দোলন এক বিরাট গণ অভ্যুত্থানের আকার ধারণ করে এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূত্রপাত করে।

**৩) আন্দোলনের কর্মসূচী ঃ**

বিদেশী দ্রব্য বর্জন বা বয়কট ও স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার বা'স্বদেশী' - এই দুই ছিল আন্দোলনের প্রদান আদর্শ ও কর্মসূচী। এই দুই লক্ষ্য ও নীতি ছিল পরস্পরের সমপূরক। বিদেশী দ্রব্য বর্জন কার্যকরী না হলে স্বদেশী দ্রব্যের উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি সম্ভব ছিল না। তেমনি উপযুক্ত বিকল্প স্বদেশ পণ্যদ্রব্য সহজলভ্য না হলে প্রয়োজনীয় বিদেশী দ্রব্য সম্পূর্ণ বর্জন করা ছিল দুঃসাধ্য। বিদেশী দ্রব্য বর্জনের আর একটি লক্ষ্য ছিল যে 'বয়কট' আন্দোলন সফল হতে ক্ষতিগ্রস্থ ইংরেজ বণিকরা ব্রিটিশ সরকারকে তাদের নীতি পরিবর্তনের জন্য চান দিতে বাধ্য হবে। তা ছাড়া সুলভ ও উৎকৃষ্ট বিদেশী দ্রব্যের পরিবর্তে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের ফলে জনসাধারণ স্বাধীনতার জন্য আত্মত্যাগ ও কষ্টস্বীকারে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে। তাদের মনোবল ও আত্মনির্ভরতাবোধ বৃদ্ধি পাবে। স্বদেশী ভাবধারার অনুপ্রেরণায় বহু কাপড়ের কল, ব্যাঙ্ক ,গেঞ্জি, সাবান, চামড়া ,ঔষধ ইত্যাদি কারখানা, বীমা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি গড়ে ওঠে। স্বদেশী দোকানও বিভিন্ন স্থানে খোলা হয়। কুটির শিল্পের উন্নতি হতে শুরু করে। দলে দলে স্বেচ্ছাসেবক বাড়ী বাড়ী ঘুরে স্বদেশী দ্রব্য বিক্রয় করতে শুরু করে। জনসভা, মিছিল, বিদেশী দ্রব্যের বহ্যুৎসব পিকেটিং দেশাত্মবোধক সঙ্গীত ও বক্তৃতার মধ্য দিয়ে স্বদেশী আন্দোলনের দুর্বারগতি অব্যাহত থাকে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় বিপিন চন্দ্র, অশ্বিনীকুমার দত্ত, অরবিন্দ ঘোষ, প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এই আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী ও গণভিত্তিক করে তুলতে সচেষ্ট হন।

বয়কট আন্দোলনের আর একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিদেশী শিক্ষা বর্জন করা কিন্তু বিদেশী পদ্ধতিতে গড়ে ওঠা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিত্যাগ করে বিকল্প শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাতে শিক্ষাগ্রহনের সুযোগ পায় সে জন্য আন্দোলনের নেতৃবর্গ গভীরভাবে চিন্তা করতে শুরু করেন। এই উদ্দেশ্যে ১৯০৬

খ্রীষ্টাব্দে ১১ই মার্চ ' জাতীয় শিক্ষা পর্ষৎ' গঠিত হয় । বঙ্গীয় জাতীয় স্কুল ও কলেজ স্থাপিত হয় । জাতীয় শিক্ষা পর্ষদের দায়িত্ব লাভ করেন অরবিন্দ ঘোষ । জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার জন্য রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক একলক্ষ টাকা এবং পরে ময়মনসিংহের জমিদারগণ প্রচুর টাকা দান করেন । এই সব দান ছাড়াও সাধারণ লোকও জাতীয় শিক্ষা পর্ষদের তহবিলে প্রচুর অর্থদান করেন । সাধারণ মানুষের স্বেচ্ছা - সেবায় এবং অকৃপণ দানে রাতারাতি গড়ে উঠল পশ্চিমবঙ্গ ১১/১২ টি এবং পূর্ববঙ্গে ৪০টি স্কুল । জন্ম হল যাদবপুর কারিগরী কলেজের যার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে বর্তমানের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ।

জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল -জাতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য এবং জাতির ভাব মান তার ভিত্তিতে জাতির প্রয়োজন মেটানো এবং আশা আকাঙ্খা পূরণের জন্য বিদেশী শাসনের ঔপনিবেশিক ভাবধারা ও নিয়ন্ত্রণের বাইরে এক স্বয়ং সম্পূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলে । তাই জাতির অতীতকে জানাবার জন্য জাতীয় জাতীয় স্কুলগুলোর পাঠক্রমে ভারতের ইতিহাস পাঠের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় । অপর দিকে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে গুরুত্ব দেওয়া হল কারিগরী বিদ্যার উপর। মাতৃভাষা ও সাহিত্য এবং উচ্চতর স্তরে মানবিক বিদ্যার সঙ্গে বিজ্ঞান চর্চাকে উৎসাহ দানের ব্যবস্থা করা হয় ।

ক্রমশ স্বদেশী আন্দোলনের মূল আদর্শ গুলো বাংলার বাইরেও বিস্তার লাভ করে । স্বদেশী ও জাতীয় শিক্ষার আদর্শ বোম্বাই, মাদ্রাজ, উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার প্রভৃতি অঞ্চলে জনপ্রিয়তা অর্জন করে । ব্রিটিশ সরকার এই আন্দোলন দমন করার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করে। কুখ্যাত কার্লাইল সারকুলার বিধিবদ্ধ করে ব্রিটিশ সরকার ছাত্রদের কঠোরভাবে দমন করার ব্যবস্থা করে । কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের দমন নীতিকে উপেক্ষা করে দলে দলে ছাত্র স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেয়। সরকারের পক্ষে থেকে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি দেওয়াও নিষিদ্ধ করা হয় । কিন্তু দেশের জনসাধারণ তখন নতুন জাতীয়তাবাদের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে ব্রিটিশ শাসনকে উপেক্ষা করতে শুরু করে এবং আন্দোলনকারীদের পক্ষ থেকে কার্লাইল সারকুলারের প্রতিবাদে সারকুলার বিরোধী সোসাইটি গঠিত হয় এবং তাদের তরফ থেকে 'বয়কট' সারকুলার ' প্রচার করা হয় ।

### ৪) স্বদেশী আন্দোলন ও মুসলমান সমাজ ঃ

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সহিত স্বদেশী আন্দোলন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত । মুসলমানরা স্বাভাবিকভাবেই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের বিরুদ্ধে ছিল। তাদের ধারণা ছিল যে লর্ড কার্জন মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্য পূর্ববঙ্গ ও আসাম নামে পরিচিত নুতন প্রদেশটি গঠন করেন । তাছাড়া লর্ড কার্জন নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ঢাকার নবাবের সমর্থন লাভ করতে সক্ষম হন । তা ছাড়া সৈয়দ আহমেদ ও মহসীন -উল- মুলকের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত শিক্ষিত মুসলমানগণও বঙ্গভঙ্গ সমর্থন

করে এবং বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের বিরোধিতা শুরু করেন । অপরদিকে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও স্বদেশী আন্দোলনের পরিচালনার দায়িত্ব হিন্দু সম্প্রদায়ই প্রায় এককভাবে গ্রহণ করেন । মুষ্টিমেয় জাতীয়তাবাদী মুসলমান এই আন্দোলনে যুক্ত হলেও মুসলিম সমাজের উপর তাদের প্রভাব খুবই সামান্য ছিল । আবদুল রসুল , লিয়াকৎ হোসেন, আবদুল হালিম জগনভীর মতো মুসলমান নেতৃবর্গ এই আন্দোলনে যোগাদন করেন । কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে তাঁরা যথেষ্ঠ প্রভাবশালী হলেও সাধারণ মুলসিম সমাজের উপর তাদের প্রভাব খুবই সীমাবদ্ধ ছিল । অপর দিকে মুসলমান কৃষকসমাজ এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করার জন্য কোন প্রকার আগ্রহ প্রদর্শন করেনি । কারণ ব্যবসা বাণিজ্যর সহিত যোগাযোগ কম ছিল । সুতরাং বিলাতি দ্রব্য বর্জন ও স্বদেশী বাণিজ্যের সহিত তাদের যোগাযোগ কম ছিল । সুতরাং বিলাতি দ্রব্য বর্জন ও স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের তাৎপর্য তাদের নিকট সুস্পষ্টভাবে কখনও প্রকাশিত হয়নি । ঢাকার নবাবও সাধারণ মুসলমানদের এই আন্দোলন থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করেন এবং বঙ্গভঙ্গের ফলে মুসলমানদের যে প্রভূত উন্নতি ও সুযোগ লাভের সম্ভাবনার কথা তিনি নানাভাবে প্রচার করার চেষ্টা করেন ।

ব্রিটিশ সরকারের নীতির ফলেও মুসলমান সমাজ এই আন্দোলনকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করে । বাংলাদেশের গর্ভণর অ্যান্ড্রু ফ্রেজার পূর্ব বঙ্গের গভর্ণর বমফিল্ড ফুলার মুসলমানদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করতে শুরু করেন । কলকাতা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মিষ্টার বস এবং বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র সচিব মিষ্টার বিজলিও স্বদেশী আন্দোলনে মুসলমানগণ যাতে অংশ গ্রহণ না করেন সে জন্য সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করেন । এমন কি যে সব মুসলিম নেতা আন্দোলনের সহিত যুক্ত ছিলেন তাঁদের ও তারা তীব্রভাবে সমালোচনা করেন । বরিশাল সম্মেলনের সভাপতি আবদুল রসুলকে তারা হিন্দু অ্যাটর্নীদের মুখাপেক্ষী অযোগ্য ব্যারিষ্টার বলে সমালোচনা করেন । কলকাতা সম্মেলনের সভাপতি হাসান খানকে তাঁরা রাজনীতির অনভিজ্ঞ ছাত্র , স্বদেশী আন্দোলনকারী অর্থ ভোগী বলে আখ্যা দেন । ফলে যে সমস্ত মুসলিম নেতৃবর্গ স্বদেশী আন্দোলনের সহিত জড়িত হয়ে পড়েন ব্রিটিশ সরকারের চেষ্টার ফলে তাঁদের সামাজিক ও রাজনৈতিক মর্যাদা যথেষ্ঠ ক্ষুন্ন হয় । ব্রিটিশের এই নীতির ফলেই মুসলমানদের পক্ষে স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়া অসম্ভব হয়ে ওঠে ।

স্বদেশী আন্দোলনের নেতৃবর্গও মুসলমান সমাজকে এই আন্দোলন থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য অংশত দায়ী । স্বদেশী আন্দোলনের সহিত হিন্দু দেব-দেবী এবং ধর্মীয় বহু অনুষ্ঠান ধীরে ধীরে যুক্ত হয়ে পড়ে । বিশেষতঃ শক্তির অধিকারিণী কালীমুর্তি হিন্দু আন্দোলনকারীদের প্রতীকে পরিণত হয় । হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ গীতাও আন্দোলনকারীদের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে । এই সব ধর্মীয় অনুষ্ঠান স্বাভাবিকভাবেই মুসলিম সমাজকে স্বদেশী আন্দোলনের বিরূপ করে তোলে । সেজন্য শুধুমাত্র

রাজনৈতিক কারণে নয় ধর্মীয় কারণেও সমাজ স্বদেশী আন্দোলন থেকে বিচ্ছন্ন থাকাই অধিকতর পছন্দ করে ।

## সিপাহী বিদ্রোহ

সিপাহী বিদ্রোহের প্রকৃতি সম্পর্কে প্রথম থেকেই ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা যায়। সাধারণ ভাবে এই বিদ্রোহের প্রকৃতি সর্ম্পকে দুটি মত প্রাধান্য লাভ করে । স্যার জন লরেন্সের মতে সেনাবাহিনীর অসন্তোষই এই বিদ্রোহেব উৎস এবং চর্বি মিশ্রিত বন্দুকের টোটাই এই বিদ্রোহের মূল কারণ । বিদ্রোহের প্রারম্ভে কোন ষড়যন্ত্র বা সুষ্ঠু পরি কল্পনা ছিল না । কিন্তু পরে স্বার্থান্বেষী বহু ব্যক্তি বিদ্রোহে যোগ দেওয়ার ফলে সিপাহিদের শক্তি ক্রমেই বৃদ্ধি পায় । স্যার জন সীকিও মনে করেন যে নেতৃত্ববিহীন , জনসাধারণের সমর্থহীন দেশপ্রেমরহিত স্বার্থপর সিপাহিরাই এই বিদ্রোহের পরিচালক।

কিন্তু জেনারেল আউট রামের মতে হিন্দুদের অসন্তোষ মূলধন করে ষড়যন্ত্রকারী মুসলিম সম্প্রদায় এই বিদ্রোহ গড়ে তোলার ব্যবস্থা করে । কিন্তু জনগণের সমর্থন লাভের ক্ষেত্র উপযুক্তভাবে তৈরী হওয়ার পূর্বেই চর্বি মিশ্রিত বন্দুকের টোটা বিদ্রোহকে ত্বরান্বিত করে । ভারতের জাতীয়তাবাদের ঐতিহাসিকদের লেখায় জেনারেল আউট রামের মতই সমর্থিত হয়। সাভারকার সিপাহী বিদ্রোহকে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম রূপে বর্ণনা করেন । অশোক মেহতার মতে সিপাহীরাই এই বিদ্রোহের উদ্যোক্তা এবং ব্রিটিশ সরকারের সমস্ত অত্যাচার তারাই প্রধানতঃ সহ্য করতে বাধ্য হলেও , বিদ্রোহীদের সঙ্গে জনসাধারণের যোগাযোগ না থাকলে বিভিন্ন স্থানে এত দ্রুত বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়ত না । বিশেষতঃ এই বিদ্রোহের সময় হিন্দু -মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ ও প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠে তা প্রকৃত পক্ষে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিচয় বহন করে । এমন কি ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা সম্ভব হয় নি । হিন্দুদের সন্তুষ্ট করার জন্য মোগল বাদশাহ দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ গোহত্যা বন্ধ করার জন্য নির্দেশ দেন । রাজপুতনার রাজাদের কাছে পত্র লিখে ব্রিটিশ শক্তিকে বিতাড়িত করার জন্য তিনি তাঁদের সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং সুস্পষ্ট ভাবে তাঁদের জানিয়ে দেন যে এদেশ থেকে ব্রিটিশ শক্তি বিতাড়িত হলে সর্বসম্মতিক্রমে মনোনীত যেকোন ব্যক্তির উপর ভারতের শাসন দায়িত্ব অর্পণ করতে তিনি প্রস্তুত। হিন্দু নেতৃবর্গ ও বাদশাহের এই প্রস্তাব মেনে নিতে সম্মত হয় । নানাসাহেব মোগল বাদশাহের আনুগত্য স্বীকার করেন । শিখ সৈন্যগণও বিদ্রোহের প্রথমদিকে নিরপেক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করে । ব্রিটিশ কর্তৃক দিল্লী অধিকৃত হওয়ার পরই তারা ইংরেজদের পক্ষে যোগদান করে । এই সব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সিপাহী বিদ্রোহকে সীমিতভাবে স্বাধীনতার পুনরুদ্ধারের জন্য জাতীয় আন্দোলন বলা যেতে পারে ।

**২) বিদ্রোহের নেতৃবর্গের স্বরূপ ঃ**

তবে বিভিন্ন কারণে সিপাহি বিদ্রোহের পটভূমিকা প্রস্তুত হয় বলে এই ঘটনার প্রকৃতি নির্ণয় করা খুবই দুষ্কর । ঐতিহাসিক টম্পসন ও গ্যারাট মনে করেন যে " The Mutiny may be considered either as a military revolt , or as a bid for recovery of their property and privileges by dispossessed princes and landlords , or as an attempt to restore the Mughal empire , or as a peasants ' war". সাধারণভাবে ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে যাদের স্বার্থে সবচাইতে প্রচন্ড আঘাত লাগে তারাই এই বিদ্রোহের প্রধান ভুমিকায় অবতীর্ণ হয় । মোগল সম্রাট , দেশীয় নৃপতি বর্গ ও ভূস্বামীগণ এবং কৃষক সম্প্রদায় এই বিদ্রোহের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েন । রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণেই উপরি উক্ত ব্যক্তিরা এই বিদ্রোহকে সমর্থন করেন । কিন্তু কোন সুসংগঠিত প্রচেষ্টার ফলে এই বিদ্রোহ গড়ে ওঠেনি । নানা কার্যকারণের সংমিশ্রণে এই বিদ্রোহের উৎপত্তি এবং নানা শাখা প্রশাখায় তার বিস্তৃতি। অথচ সর্বভারতীয় ঐক্যবদ্ধতা এই বিদ্রোহের ভিত্তি ছিল না । এই বিদ্রোহে সক্রিয় অংশ গ্রহণকারী কোন না কোন ব্যক্তিগত কারণে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ ছিল - কেউ ছিলেন রাজ্যচ্যুত , কেউ ছিলেন বৃত্তি প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত আবার কেউ কেউ ছিলেন জাতিনাশ বা ধর্মনাশের ভয়ে আতঙ্কিত । উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন দেশীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে প্রায় একজনও বিদ্রোহীদের সমর্থন করেন নি ।

অপরদিকে পাতিয়ালা ও কয়েকটি রাজ্য সক্রিয়ভাবে ইংরেজদের সহায়তা করে । তাছাড়া নামমাত্র মোগল বাদশাহকে দিল্লীর মসনদে অধিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা মুসলমানদের মধ্যেও বিশেষ কোন উৎসাহের সৃষ্টি করতে পারেনি । তালুকদারের মধ্যে একমাত্র অযোধ্যার তালুকদারগণই বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করে , তবে তারাও সংগঠিতভাবে অংশ গ্রহণ করার কোন চেষ্টা করে নি । নর্মদার দক্ষিণে সর্বত্র এবং নর্মদার উত্তরে অধিকাংশ অঞ্চলেই সাধারণ শাসন ব্যবস্থা কায়েম ছিল । নিয়মিত শাসন ব্যবস্থা সর্বত্র ধ্বসে পড়ার ঘটনা কোথাও ঘটেনি । উভয় পক্ষের যুদ্ধরত লোকের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কমই ছিল এবং বিদ্রোহ ঘোষিত হওয়ার চার মাসের মধ্যেই ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে ইহা দমন করা সম্ভব হয় । এই বিদ্রোহ প্রকৃত জাতীয় আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করলে মাত্র চার মাসের মধ্যে তা দমন করা ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে কখনও সম্ভব হত না । তাছাড়া এই বিদ্রোহ পরিচালনায় ভারতীয় নেতৃবর্গ যে ব্যর্থতার পরিচয় দেয় তা থেকেই প্রমাণিত হয় যে পূর্ব পরিকল্পিত ও সুবিবেচিত কোন কর্মসূচি গ্রহণ না করেই বিদ্রোহীরা ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় ।

**৩) আধুনিক মতামত ঃ**

ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন সিপাহি বিদ্রোহের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে কয়েকটি সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ করেন। তাঁর মতে বিদ্রোহের পরিকল্পনা, ষড়যন্ত্র ও প্রচার বহু পূর্বেই শুরু হয়। 'চাপাটি' বিতরণের কাহিনীই তাঁর প্রত্যক্ষ প্রমাণ। সিপাহিরা এই বিদ্রোহের সূত্রপাত করলেও ধীরে ধীরে সংক্রামক ব্যধির মতো তা অন্যান্য শ্রেণীর লোকের মধ্যে বিস্তৃত হয়ে পড়ে। বিদ্রোহী সৈন্যদলে হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিরাই বিনা প্রতিবাদে যোগ দেয়। নানা সাহেবের অন্যতম বিশ্বস্ত সহচর ছিলেন আজিম উল্লা খান, বাহাদুর খানের প্রধান অনুচর ছিল শোভারাম এবং ঝাঁসির রাণীর শক্তির প্রধান উৎস ছিল আফগান প্রতিরক্ষা বাহিনী।

অযোধ্যা ও শাহাবাদ ছাড়া কোথাও বিদ্রোহীদের সঙ্গে জনসাধারণের বিশেষ কোন সম্পর্ক ছিল না এবং এই বিদ্রোহ জাতীয় আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করে নি। কিন্তু সেজন্য ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহকে কেবলমাত্র সিপাহিদের বিদ্রোহ বলে আখ্যা দেওয়াও সমীচীন নয়। মীরাটের বিদ্রোহীরা দিল্লীর বাদশাহের আনুগত্য স্বীকার করলে বিদ্রোহ রাজনৈতিক বিপ্লবের রূপ নেয় এবং বহু ভূস্বামী এবং সাধারণ লোক বিদ্রোহীদের পক্ষ অবলম্বন করে বাদশাহের জন্য সংগ্রাম করতে প্রস্তুত হয়। ধর্মীয় কারণে যে বিদ্রোহের প্রথম সূচনা, ঘটনাচক্রে সে বিদ্রোহ স্বাধীনতা সংগ্রামে পরিণত হয়। What began as a fight for religion ended as a war of independence, for there is not the Slightest doubt that the rebels wanted to get rid of the alien Government and restore the old order of which the king of Delhi was the rightful representative." প্রকৃত পক্ষে অযোধ্যার বিভিন্ন স্থানে এই বিদ্রোহ পুরোপুরি জাতীয় সংগ্রামে পরিণত হয়। বিদেশী শাসক ইংরেজদের বিরুদ্ধে শাসিতদের ঘৃণা ও বিদ্বেষ এই বিদ্রোহের মূল কারণ। ধর্মোন্মাদ এই বিদ্বেষকে আরও বাড়িয়ে তোলে। স্বাভাবিকভাবেই পরাধীন জাতি তাদের শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার চেষ্টা করে। ভারতবাসীরাও তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু যেহেতু ভারতে একমাত্র সিপাহিরাই সশস্ত্র, সুতরাং তারাই এই বিদ্রোহে প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার সুযোগ পায়। সিপাহিদের বিদ্রোহ শুরু হলে ভারত থেকে বিদেশীদের বিতাড়িত করার জন্য অনেকেই তাদের সঙ্গে যোগদান করে।

কিন্তু ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার সিপাহি বিদ্রোহকে কোন ক্রমেই জাতীয় আন্দোলন রূপে গ্রহণ করতে সম্মত নয়। সমসাময়িক তথ্য বিশ্লেষণ করে তিনি এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে এই বিদ্রোহের প্রত্যেক নেতাই নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য সচেষ্ট ছিলেন। জাতীয়তা বোধের দ্বারা তাঁরা কেউই উদ্বুদ্ধ ছিলেন না। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যেও কোন সম্প্রীতি ছিল না। বাহাদুর শাহ আন্তরিকভাবে বিদ্রোহীদের সমর্থন করেন নি। ঝাঁসীর রাণী প্রথমদিকে বিদ্রোহীদের প্রতি কোনভাবেই সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন না। পরে বাধ্য হয়ে তিনি বিদ্রোহে যোগ দেন। হিন্দুগণ পেশোয়া নানাসাহেব এবং মুসলমানগণ বাহাদুরশাহকে দিল্লীর, সিংহাসনে স্থাপন করতে চেষ্টা করে। মুসলমান নবাবগণ

বিদ্রোহের সময়ও হিন্দু প্রজাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করে নি । ফলে এই বিদ্রোহের সময় হিন্দু মুসলমানের দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে নি ।

ডক্টর মজুমদারের মতে ক্ষমতাচ্যুত মুসলমানদের ব্রিটিশের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ ও আক্রোশ ছিল । তথাপি বিদ্রোহের সময় মুসলমানগণ বহু হিন্দুকে হত্যা করে । ভারতের স্বাধীনতার জন্য সিপাহিও প্রাণ বিসর্জন দিতে রাজি ছিল না। কিন্তু পরে ব্রিটিশ সরকার বিদ্রোহ দমন করতে শুরু করলে প্রাঁণ বাঁচানোর জন্যই সিপাহিরা প্রাণপণে যুদ্ধ করতে শুরু করে ।

সিপাহি বিদ্রোহ দ্বারা সংগঠিত ও পরিচালিত হলেও এই বিদ্রোহের গুরুত্ব অপরিসীম । বহু রাজনৈতিক , অর্থনৈতিক ও সামাজিক অত্যাচার ও অবিচারের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ এই বিদ্রোহের ইন্ধন যোগায় । বিদ্রোহের পর ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক পটভূমিকায় অনেক পরিবর্তন দেখা যায়। The rebellion of 1857 was more than a Sepoy Mutiny , was an erruption of the social volcano where many pent up force found vent. After the erruption the whole social topography had changed . The scars of the rebellion remained deep and shining ." অপরদিকে জাতীয়তাবাদ শব্দটি সিপাহি বিদ্রোহের সময় ভারতের নেতৃবর্গের কাছে একেবারেই অপরিচিত ছিল । আসমুদ্র হিমাচল রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখাও তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না । অত্যন্ত সীমিত অর্থে এই আন্দোলনকে জাতীয় আন্দোলন বলা গেলেও এই আন্দোলনের গুরুত্ব সাধারণ লোকের কাছে খুবই কম ছিল । অভিজাত সম্প্রদায়ের স্বার্থ পুনরুদ্ধার করাই ছিল এই আন্দোলনের একমাত্র লক্ষ্য । সংগঠনহীন কৃষকগণ কোথাও কোথাও এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করলেও কোথাও তারা আন্দোলনের পুরোভাগে স্থান লাভ করে নি । কিন্তু পরবর্তীকালের ভারতের ইতিহাসে এই বিদ্রোহের গুরুত্ব ও প্রভাব বিচার - বিবেচনা করলে সিপাহি বিদ্রোহকে ভারতের জাতীয়তাবাদের উৎপত্তি প্রথম সুদৃঢ় পদক্ষেপ বলা যেতে পারে । সিপাহি ক্রটি বিচ্যুতির কথা বিস্মৃত হয়ে তার ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ভারতবাসী স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হয় । এই প্রসঙ্গে ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের মন্তব্য যথার্থই তাৎপর্যপূর্ণ - " The true signifcance of 1857 lies in the inspiration which its memory afforded to later freedom movements and for such inspirational purposes , it matters nothing that the sorrow did and unhappy facts have become shrouded in a fog of pious make believes"

## পরাধীন ভারতবর্ষে স্বাধীনতা অধিকারের আন্দোলন

চরমপন্থীদের উদ্ভবের কারণ ঃ জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে চরমপন্থীদের উদ্ভবের অনেক কারণ দেখা যায় । ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের কাউন্সিল অ্যাক্ট নরমপন্থীদের সন্তুষ্ট করতেও ব্যর্থ হয় । আবেদন - নিবেদনের

মাধ্যমে কোন কিছু লাভ করা করা যে সম্ভব নয় তা সকলেই বিশেষভাবে উপলব্ধি করতে সমর্থ হন। প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেসের এই নীতিকে ব্রিটিশ সরকার দুর্বলতা বলে মনে করতে শুরু করেন । বিপিনচন্দ্র পাল কংগ্রেসের এই ভিক্ষার মনোবৃত্তিকে তীব্র ভাষায় সমালোচনাকরেন । বি.জি. তিলকও কংগ্রেসের নরমপন্থী নেতৃবর্গের আবেদন নিবেদনের নীতির কঠোর সমালোচনা করে মন্তব্য করেন , 'Political rights will have to be fought for . The Moderates thinks that these can be won by persuasion . We think that they can only be obtained by strong pressure.

বিদেশী শাসকদের শোষণের ফলে ভারতের অর্থনীতি সম্পূর্ণভাবে বিপর্যপ্ত হয়ে পড়ে । ডি. ওয়াচা , আর সিদত্ত দাদাভাই নওরোজী প্রমুখ ব্যক্তিগণ যুক্তিসহকারে প্রমাণ করেন যে ব্রিটিশ সরকারের অনুসৃত নীতির ফলেই ভারতের জনসাধারণের দারিদ্র্য দিন দিন বৃদ্ধি পায় এবং তাঁদের এই সব রচনা খুব জনপ্রিয়তা লাভ করে। ইংলন্ডের শিল্পপতিদের স্বার্থে ভারতের শিল্প ধ্বংস করা হয় এবং ভারতের শিল্প ধীরে ধীরে ধ্বংসোম্মুখ হয়ে পড়ে ।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষও চরমপন্থীদের উদ্ভবের অন্যতম কারণ । খাদ্যাভাবে যখন লক্ষ লক্ষ লোক মৃত্যু পথযাত্রী ঠিক সেই সময়ই সরকার মহারাণী ভিক্টোরিয়া জুবিলী উ ৎসবে ব্যস্ত । বিশেষতঃ খাদ্যক্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাহায্যের অর্থ জুবিলী উৎসবে ব্যয় করায় ভারতবাসীদের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের নির্মম মনোভাব অনেকেই ব্যথিত করে তোলে । অপরদিকে এই সময় বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে প্লেগ মহামারীর রূপ নেয় । যদিও ব্রিটিশ সরকার এই মহামারী দুর করার জন্য বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে , তাহলেও পুনের প্লেগ কমিশনার মিস্টার র‍্যান্ডের অত্যাচারে জনসাধারণ অতিষ্ট হয়ে ওঠে । বি.জি টিলক সরকারের প্লেগ নীতিকে তীব্রভাবে সমালোচনা করেন । শেষ পর্যন্ত অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষার জন্য ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে র‍্যান্ড ও তাঁর সহকারী আয়েস্টকে হত্যা করা হয় ।

হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান ও চরমপন্থীদের উদ্ভবের আর একটি প্রধান কারণ । ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত ধর্মমহাসম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দু ধর্মকেশ্রেষ্ঠত্ব ব্যাখা করেন । ভারতের আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার উপর বিবেকানন্দের প্রচন্ড বিশ্বাস ছিল এবং তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে মনে করতেন যে পরাধীন ভারতের পক্ষে এই চিন্তাধারা কার্যকারী করা সম্ভব নয়। স্বামীজির এই চিন্তাধারা ভারতের অনেকেকেই উদ্বুদ্ধ করে তোলে । আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠান দয়ানন্দ সরস্বতী কুসংস্কার মুক্ত মন ও বলিষ্ঠ চিন্তাধারাও শিক্ষিত ভারতীয়দের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে । শ্রীঅরবিন্দও জাতীয় জীবনের পুনজাগরণের জন্য হিন্দু ধর্মের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন । তাঁর মতে , Independence is the goal of life and Hinduism alone will fulfill this aspiration of our's." বি.জি টিলকের কার্যকলাপের মধ্যে হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের বাস্তব রূপ গ্রহণ করে । তিনি হিন্দুদের বিভিন্ন উৎসবের উপর যথেষ্ঠ গুরুত্ব করেন এবং ভারতের মুক্তির জন্য সমস্ত হিন্দু

ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে দানও অনস্বীকার্য। স্যার ভ্যালেন্টাইন চিরলের মতে, " The advent of the theosphist headed by mademe Blavatski Colonel Olkott and Mrs. Besant gave a fresh impetus to the revival and certainly no Hindu has so much organised and consolidated the movement as Mrs. Besant. Who has openly proclaimed the superiority of the whole Hindu system to the vaunted civilisation of the west." বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ সাহিত্যিকদের রচনা ও ভারতীয়দের নুতন চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ করে তোলে।

উচ্চপদস্থ সরকারী পদে শিক্ষিত ও দক্ষ ভারতীয়দের অনুপযুক্ত বিবেচনা করার ফলেও ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাবের সৃষ্টি হয়। লর্ড কার্জনের ভারত বিরোধী নীতির ফলে এই মনোভাব আরও বৃদ্ধি পায়। লর্ড কার্জন ঘোষণা করেন, " The highest rank of civil employment must as a general rual be held by English men ." শাসনতান্ত্রিক যে কোন সংগঠন থেকেই ভারতীয়দের বঞ্চিত করার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ক্যালকাটা করপোরেশন অ্যাক্ট ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ইন্ডিয়ান ইউনিভার্সিটিস অ্যাক্ট এবং অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট বিধিবদ্ধ করেন। এই সব আইনের দ্বারা ভারতীয়দের অনেক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হয় এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করা হয়। ফলে দেশের সর্বত্র অসন্তোষ দেখা দেয়। কিন্তু লর্ড কার্জন জনমতকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ করেন। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন শুধুমাত্র বাংলাদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না এই আন্দোলন ধীরে ধীরে প্রায় সমগ্রভারতেই বিস্তৃত হয়ে পড়ে। পার্সিভাল স্পিয়ারের মতে বঙ্গভঙ্গের ফলে বাংলাদেশ, পশ্চিমভারত ও পাঞ্জাবে সন্ত্রাসবাদের সূচনা হয়। বাংলাদেশ এই আন্দোলনের সহিত শক্তির অধিকারিণী কালী, মহারাষ্ট্রে শিবাজীর আদর্শ ও সামরিক শক্তির ঐতিহ্য এবং পাঞ্জাব অর্থনৈতিক দুর্দশার সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হয়ে পড়ে।

**(২) চরমপন্থী নেতৃবর্গ ঃ**

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে চরমপন্থীদল মহারাষ্ট্রে বাল গঙ্গাধর তিলকের মতো একজন সুযোগ্য নেতার নেতৃত্বে পরিচালিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে। শিবাজী উৎসব পালন এবং 'ডেকান সভার স্থাপনের ফলে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই মহারাষ্ট্রে চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের মধ্যে কংগ্রেসের সংগঠন বিভক্ত হয়ে পড়ে। কয়েক বছর পরে বাংলাদেশের বিপিনচন্দ্র পাল চরমপন্থীদলে যোগদান করেন। রাজনীতিবিদ্ না হলেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনেক রচনায় চরমপন্থীদলে যোগদান করেন। রাজনীতিবিদ্ না হলেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনেক রচনায় চরমপন্থীদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আদর্শ সুস্পষ্টভাবে প্রতি ফলিত হয়। অরবিন্দ ঘোষ ও বিশ্বাস করতেন যে বিপ্লবের মাধ্যমেই, স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করা সম্ভব, 'বি জাতীয় কংগ্রেসের or (Un national Congress) দুর্বল প্রচেষ্টায় তা কখনই সম্ভব

নয় । পাঞ্জাবের লাল লাজপৎ রায় ১৮৯৩ থেকে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জাতীয় কংগ্রেসের কোন অধিবেশনে যোগ দেন নি । তাঁর মতে কংগ্রেসের নেতৃবর্গ ছিলেন ' অবকাশ সময়ের দেশপ্রেমিক (holiday patriots) বিংশ
শতাব্দীর প্রথমদিকে লাল বাল পাল ছিলেন চরমপন্থী আন্দোলনের অবিসম্বাদী নেতা ।

**৩) চরমপন্থীদের রাজনৈতিক আদর্শের বৈশিষ্ট্য ঃ**

চরমপন্থীদল বয়কট , স্বদেশী ও জাতীয় শিক্ষা পদ্ধতিতে বিশ্বাসী ছিলেন । বয়কট নীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল বিদেশী প্রাপ্ত সরকারী চাকুরী , খেতাব , উপাধি প্রভৃতি বর্জন । বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন খুবই সার্থকতা লাভ করে । বয়কট নীতির সাফল্য সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে কলকাতার The Englishman মন্তব্য করে " In boycott , the encmies of Raj have found a most effective weapon for injuring British interests in the country. জাতীয় কংগ্রেসের অনুসৃত আবেদন নিবেদন পদ্ধতির তাঁরা একান্ত বিরোধী ছিলেন । লাল লাজপৎ রায় ঘোষণা করেন যে ইংরেজ জাতি ভিক্ষুকদের খুব ঘৃণার চোখে দেখে , আমরা তাদের কাছে প্রমাণ করতে চাই যে যে আমরা ভিক্ষুক নই । " বি.জে তিলকও অনুরূপ মত প্রকাশ করেন , " Our mottol is self reliance and not mendicancy " তবে চরমপন্থীদলের নেতৃবর্গ রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করেন ।অরবিন্দ ঘোষণা করেন , " জাতীয়তাবাদ একটি ধর্ম , ঈশ্বর যার অনুপ্রেরণার উৎস । " দেশাই-র মতে, " চরমপন্থী নেতাগণ হিন্দুদের বৈদিকযুগের ঐতিহ্য এবং অশোক ও চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালের গৌরবময় যুগ পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করেন , রানা প্রতাপ ও শিবাজীর বীরত্ব এমন কি ঝাঁসীর রানী লক্ষীবাঈও ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহা বিদ্রোহের নেতৃবর্গ তাঁদের অনুপ্রেরণার প্রধান স্থান গ্রহণ করেন ।" দুর্গা , কালী ভবানী এবং অন্যান্য হিন্দুদের দেব দেবীর পূজার্চনা প্রচলিত হয় এবং দেশের মুক্তির জন্য তাঁদের অনুগ্রহ একান্ত প্রয়োজনীয় বলে বিবেচনা করা হয় ।

**৪) চরমপন্থী বনাম নরমপন্থী নেতৃবর্গ ঃ**

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্বে জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যন্তরে চরমপন্থীদের সহিত নরম পন্থীদের মতবিরোধতা শুরু হলেও বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই এই বিরোধীতা প্রকাশ্য সংঘর্ষে পরিণত হয় । আন্দোলনের আদর্শ ও কৌশলই ছিল এই সংঘর্ষের মূল কারণ । আবেদন নিবেদনের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের ফলে আত্মনিয়ন্ত্রিত ঔপনিবেশিকসরকার স্থাপন করাই ছিল নরমপন্থীদের চরম আদর্শ । কিন্তু চরমপন্থীরা এই আদর্শের ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং নিজেদের ক্ষমতার দ্বারা রাজনৈতিক শক্তি অর্জন করাই ছিল তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য । এই প্রসঙ্গে বিপিনচন্দ্র পাল বলেন , " IF the Government were to come and tell me to day

Take Sharaj , I would say , ' Thank you , for the gift , But I will not have that which I cannot acquire by my own hands." বি.জি.তিলককে সমগ্র ভারতে পরিভ্রমণ করে বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দিয়ে জনসাধারণকে বোঝাবার চেষ্টা করেন সয নরমপন্থীদের পক্ষে দেশের মঙ্গল সাধন করা সম্ভব নয় । চরমপন্থীদের সম্বন্ধে তিনি বলেন , " What the NEW party wants you to do this to realize the fact that your future rests entirely in your hands."

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের সুরাট অধিবেশনে জাতীয় কংগ্রেস চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের মধ্যে দুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে । সুরাট অধিবেশনের পর জনমত গঠনের উদ্দেশ্য বি.জি. টিলক ভারতের বিভিন্ন স্থানে বহু জনসভার আয়োজন করেন । তাঁর এই সব জনসভার প্রদত্ত বক্তৃতার মূল কথাই ছিল , " We are masters of our fortunes and can govern them if we only make up our minds to do so. Saraj is no , far off from us . It was come to us if we learn to stand on our own legs . Swaraj is my birth right and I will have it"

বাল পাল লাল এই তিন নেতার অক্লান্ত চেষ্টায় চরমপন্থীদল খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করে । ব্রিটিশ সরকার চরমপন্থীদের দমন করার জন্য বিভিন্ন প্রকার কঠোর আইন প্রণয়ন করে । অপরদিকে শাসকগোষ্ঠী নরমপন্থীদের সাহায্যে মর্লি মিন্টো সংস্কার কার্যকরী করে চরমপন্থীদের শক্তি খর্ব করার জন্যও সচেষ্ট হয়ে ওঠে ।

ভারতের জাতীয় আন্দোলনে চরমপন্থীদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের কার্যকলাপ প্রকৃতপক্ষে কোন স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে অসমর্থ হয় । তাঁদের রাজনৈতিক সাফল্য ছিল অত্যন্ত নগন্য । মর্লি মিন্টো সংস্কারের ফলে ভারতের শাসনতন্ত্রে বিশেষ কোন পরিবর্তন সাধিত হয় নি । বিপিনচন্দ্র পালের দাবি অনুযায়ী স্বরাজ লাভ করা ত দূরের কথা ভারতে সাংবিধানিক শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের কোন ব্যবস্থাই মর্লি - টিন্টো সংস্কারে করা হয় নি । অর্থনৈতিক সাফল্যও তাঁদের কোন ক্রমেই উল্লেখযোগ্য নয় । বয়কট আন্দোলনের সাফল্য ছিল নিতান্ত সীমিত । ব্রিটিশের বাণিজ্যিক সংস্থাগুলোকে তাঁরা কোনক্রমেই বিপদগ্রস্থ করতে পারেন নি , ভারতীয় শিল্প খুব বেশি উন্নতি করার সুয়োগ পায় নি । শিক্ষার ক্ষেত্রেও তাঁদের সাফল্য নিতান্তই কিঞ্চিৎকর। মাত্র পচিঁশটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও তিনশটি প্রাথমিক বিদ্যালয় তাঁদের প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠার সুযোগ পায় । অপরদিকে হিন্দুদের দেবদেবীর পূজার্চনা প্রচলনের ফলে সাম্প্রদায়িকতার সূচনা দেখা দেয় ।

চরমপন্থীদের ব্যর্থতার কারণ নির্ণয় করা খুবই সহজ । ব্রিটিশ সরকার পদাঘাত ও চুম্বনের নীতি (Policy of kicks and kisses) গ্রহণ করে । চরমপন্থীদের দমন ও নরমপন্থীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করাই ছিল এই সময়ের ব্রিটিশ শাসকদের মূল নীতি । চরমপন্থীদের বিরোধী মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিও ব্রিটিশ সরকার উদ্দেশ্য মুলকভাবে অনুগ্রহ প্রকাশ করতে শুরু করে । ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে নিখিল

ভারত মুসলিম লীগ গঠিত হওয়ার পরই ব্রিটিশ সরকার dividedt empere নীতিকে পুরোপুরি কাজে লাগাবার সুযোগ পায় । অপরদিকে রবীন্দ্রনাথ চরমপন্থী রাজনীতি থেকে সমর্থন তুলে নেন । অরবিন্দ ঘোষ রাজনীতি পরিত্যাগ করে সন্ন্যাসীর জীবন পালন করতে শুরু করেন । তাছাড়া ভারতের অধিবাসীরা তখনও চরমন্থীদের বৈপ্লবিক চিন্তাধারাকে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত ছিল না । বিশেষত ঃ বি.জে. তিলকের মান্দালয়ে নির্বাসিনের ফলে চরমপন্থীদের শক্তি যথেষ্ঠ হ্রাস পায় ।

## পরাধীন ভারতবর্ষে স্বাধীনতা অধিকারের আন্দোলন ।

### ১) ভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায় ও খলিফা ঃ-

তুরস্কের অটোমান বংশীয় সুলতান মুসলিম জগতের অধিপতি বা খলিখার পদ অলংকৃত করতেন । ভারতের মুসলিম সম্প্রদায় ও তুরস্কের খলিফার প্রতি আনুগত্য স্বীকার করত ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তুরস্ক জামনীর পক্ষে যোগদান করে । স্বাভাবিক ভাবেই গ্রেট ব্রিটেন তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে খলিফার পদচ্যুতি ও লাঞ্ছনার আশঙ্কা দেখা দেয় । মুসলিম জগতের অধিকর্তা খলিফার অসম্মানের আশঙ্কায় ভারতের মুসলিম সম্প্রদায় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে । তবে ভারতের মুসলিমদের উদ্বেগ দূর করার উদ্দেশ্য ইংলন্ডের প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে " প্রধানত ঃ তুর্কীজাতির দ্বারা অধ্যুষিত সমৃদ্ধ ও সুপ্রসিদ্ধ এশিয়া মাইনর ও থ্রেস অঞ্চলের আধিপত্য থেকে তুরস্ককে বঞ্চিত করার জন্য গ্রেট ব্রিটেন তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয় নি । কিন্তু যুদ্ধে জয়লাভ করার পর গ্রেট ব্রিটেন ও তার মিত্র রাষ্ট্র সমূহ তুরস্কের সুলতানের উপর ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে সেভরেসের চুক্তি কঠোর শর্তসমূহ আরোপ করে । এই চুক্তির শর্ত অনুসারে তুরস্ক হইতে ইজিপ্ট , সুদান , সাইপ্রাস , ত্রি পোলিতানিয়া, মরক্কো , টিউনিসিয়া , আরব , প্যালেস্টাইন , মেসোপোটামিয়া ও সিরিয়া সমপর্ণ করতে বাধ্য হয় । সাম্রাজের এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল পরিত্যাগ করার পর তুরস্কে র সুলতানের সাম্রাজ্য একমাত্র পর্বতসঙ্কুল আনাতোলিয়া ও ইয়োরোপের সামান্য এক - প্রান্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে । দুবছর পূর্বে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে সম্পাদিত মুদ্রসের যুদ্ধ বিরতি চুক্তির মধ্যেই এইরূপ কঠোর শর্তের পূর্বোভাস পাওয়া যায় । মুসলিম ধর্মের পবিত্রস্থান রূপে পরিচিত মেসোপোটামিয়া , আরব , সিরিয়া এবং প্যালেস্তাইন প্রভৃতি স্থানের উপর তুরস্কের সুলতানের আধিপত্যের বিলুপ্তি ভারতের মুসলমানদের পক্ষে স্বীকার করে নেওয়া সম্ভব ছিল না । ফলে পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের মতো ভারতের মুসলমানদের মধ্যেও প্রচন্ড অসন্তোষের সূত্রপাত হয়।

### ২) গান্ধিজী ও খিলাফৎ আন্দোলন ঃ

সেভরেসের চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পূর্বেই ভারতের মুসলিম সমাজের কতিপয় নেতা খলিফার সমস্যা ও খিলাফতের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করতে শুরু করেন । ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের

অমৃতসরে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় মুসলিম নেতৃবর্গ এই সম্পর্কে কংগ্রেসের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেন এবং গান্ধীজির সহযোগিতা লাভ করতে সমর্থ হন । ইতিপূর্বে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর বোম্বাই শহরে কেন্দ্রীয় খিলাফৎ কমিটি গঠিত হয় এবং ভারতীয় মুসলিম সমাজের অসন্তোষে সহানুভূতি ও তাদের প্রতি সমর্থন জানান লোকমান্য তিলক, মদনমোহন মালব্য, মতিলাল নেহেরু ,মোহন দাস করমচাঁদ গান্ধী প্রমুখ নেতৃবর্গ।

ভারতে খিলাফৎ আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন আলি ভ্রাতৃদ্বয় নামে পরিচিত মোহম্মদ আলি ও সৌকৎ আলি । ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে দেশের জনসাধারণের প্রতি একটি ইস্তাহারে প্রচারের মাধ্যমে ভারতে খিলাফৎ আন্দোলন শুরু হয় । এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম ধর্মের অন্যতম প্রধান ও অপরিহার্য নীতি অনুসারে ঐহিক ও পারত্রিক জগতের অধিকর্তা খলিফার অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অক্ষতভাবে রক্ষার প্রচেষ্টা করা । তাঁদের এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য মুসলিম নেতাগণ ভঅরতের ভাইসর ও গভর্ণর জেনারেল এবং ইংলন্ডের প্রধান মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁদের বক্তব্য প্রকাশ করেন। কিন্তু এই সাক্ষাৎকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় । ইতিমধ্যে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধীজি ঘোষণা করেন যে তুরস্কের সহিত মিত্রপক্ষের সম্পাদিত চুক্তির শর্ত ভারতীয় মুসলমানদের সন্তুষ্টি বিধানে অসমর্থ হলে তিনি ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনা করেন । তুরস্ক সম্পর্কে গ্রেট ব্রিটেনের নীতির তিনি কঠোর সমালোচনা করেন ।

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে মে মাসে মিত্রপক্ষের সহিত তুরস্কের চুক্তির শর্তসমুহ প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করা হয় । ইংলন্ডের আচরণ ভারতের মুসলিমদের মনে গভীর অসন্তোষের কারণ রূপে দেখা দেয় । অপরদিকে পাঞ্জাবের মর্মান্তিক ঘটনার কারণ অনুসন্ধানের জন্য নিযুক্ত হান্টার কমিশনের বিবরণী ও এই সময় প্রকাশিত হয় । হান্টার কমিশনের বিবরণী ভারতীয়দের মনে পুঞ্জীভূত অসন্তোষকে আরও শতগুনে বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে । ফলে খি লাফতের প্রশ্ন নিয়ে যে বিক্ষোভ পূর্বেই দেখা দেয় হান্টার কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশের ফলে ভারতের হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদাই একযোগে আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয় । কেন্দ্রীয় খিলাফৎ কমিটিও গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব সমর্থন করে ইংরেজ সরকারের নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে সম্মত হয় ।

গান্ধীজি কলকাতার অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে ৮ই সেপ্টেম্বর অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন । এই সময় খিলাফৎ আন্দোলন , জালিয়ানওয়ালাবাগের র্মমান্তিক ঘটনা এবং মন্টফোর্ডের সংস্কারের বিরুদ্ধে জনসাধারণের মন প্রচন্ডভাবে বিক্ষুব্ধ ছিল । এই বিক্ষোভের ফলেই গান্ধীজির পক্ষে অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব কাযকরী করা সম্ভব হয়ে ওঠে । এই সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে পট্টভি সীতারামাইয়া বলেন , " The Tribeni of the Khilafat and Punjab wrong and the invisible flow of

inadequate reforms became full to the brim , and by their influence enriched both in volume and content the stream of national discontent." গান্ধীজির উত্থাপিত অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাবের পক্ষে ১৮৮৬ ভোট এবং বিপক্ষে ৮৮৪ টি প্রদত্ত খিলাফতের প্রশ্নে মুসলিম সম্প্রদায়ের বিক্ষোভ এবং পাঞ্জাবের জনসাধারণের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের অমানুষিক অত্যাচার - এই দুইটি অন্যায়ের প্রতিবিধানের উদ্দেশ্যে অসহযোগ আন্দোলন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় । অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাবে মুসলমান সম্প্রদায়ের দাবি আদায়ের জন্য হিন্দুদের সমর্থন করতে অনুরোধ জানান হয় । এই প্রস্তাবে বলা হয় যে "........ It is the duty of every non muslim Indian in every legitmate manner to assist his Muslim Brother in his attempt to remove the religious calamity that has over-taken him." পরে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের নাগপুর অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশন অসহযোগ আন্দোলনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।

নানারূপ বাধা - বিপত্তির মধ্যেই ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে যুগ্মভাবে অসহযোগ আন্দোলন ও খিলাফৎ আন্দোলন পরিচালিত হয় । জনসাধারণ ও এই আন্দোলন অভূতপূর্ব সাড়া দেয় । আন্দোলন মোটামুটিভাবে শান্তিপূর্ণ থাকলেও কোথাও কোথাও এই আন্দোলন হিংসাশ্রয়ী হয়ে ওঠে । বিশেষতঃ মালাবার অঞ্চলের মোপলা আন্দোলন অহিংসা রূপ গ্রহণ করে । এই অঞ্চলে মুসলিম ধর্মাবলম্বী আরব বংশোদ্ভুত মোগলদের বসবাস । মালাবারে স্বাধীন খিলাফৎ রাজ্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে মোপলারা ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে । ধর্মান্ধ মুসলিমদের ব্যাপক আক্রমণে এ অঞ্চলের বহু হিন্দু নিহত হয় এবং অনেকে প্রাণ রক্ষা করতে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয় । পাহাড় ও বনে দুর্গম মালাবার অঞ্চল গেরিলা যুদ্ধের আদর্শ স্থান বলে মোপলাদের দমন করতে কয়েক মাস সময় লাগে । ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে অবস্থা সম্পূর্ণ আয়ত্তে আসে। অপর দিকে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে করাচিতে অনুষ্ঠিত খিলাফৎ সম্মেলনে মুসলিমদের ইংরেজ সরকারের অধীনে সামরিক বিভাগে চাকরী - বাকরী করার উপর নিষেধ আজ্ঞা জারী করে এবং ঘোষণা করে যে ব্রিটিশ সরকার কামাল পাশের নেতৃত্বে গঠিত তুরস্কের জাতীয়তাবাদী সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করলে মুসলিমগণ স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করবে । ইংরেজ সরকার তখন এই আন্দোলন দমন করার জন্য আলিভ্রাতৃদ্বয়কে গ্রেপ্তার করে । জাতীয় কংগ্রেস ও ব্রিটিশ সরকারের এই নীতির প্রতিবাদে প্রাদেশিকসরকার সমূহকে নিজ নিজ রাজস্বপ্রদান বন্ধসহ দায়িত্বে আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনার অনুমতি দেয় ।

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধীজি গুজরাটের বারদলৌতালুকে রাজস্ব প্রদান বন্ধের আন্দোলন পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন । এই সময় যুক্ত প্রদেশের চৌরাচোরার ঘটনা ঘটার ফলে সমস্ত পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয় । ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারী এক ক্রুদ্ধ জনতা যুক্তপ্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার চৌরাচোরা থানা আক্রমন করে কয়েকজন পুলিশকে গৃহে আবদ্ধ অবস্থায় পুড়িয়ে হত্যা করায় অসহযোগ

আন্দোলনের হঠাৎ রূপান্তর ঘটে এবং ঐ হিংসা যাতে আরও ছড়িয়ে না পড়ে সেজন্য গান্ধীজি অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। বারদৌলিতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের কার্যনির্বাহিক কমিটির সভায় আন্দোলন স্থগিত রাখার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের যুগ্ম আন্দোলনেও অবসান ঘটে। কারণ খিলাফৎ আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সাময়িকভাবে সম্প্রীতি ও ঐক্যের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে মুলতানে প্রচন্ড রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা শুরু হয়। পরবর্তী বছরে পাঞ্জাব ও বাংলাদেশে ও সাম্প্রদায়ি দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। হিন্দু মুসলিম সম্প্রদায়ের সাময়িক ঐক্য প্রতিষ্ঠা হওয়া সম্পর্কে একজন ব্রিটিশ রাজকর্মচারী ম ন্তব্য করেন, "The structure infully crected by Mr. Gandhi has crumbled hopelessly."

ইতিমধ্যে তুরস্কে সূদুর প্রসারী রাজনৈতিক পরিবর্তন সাধি ত হয়। সেভরেসের বিরক্তি পরিবর্তে মিত্রপক্ষ ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্কের সহিত লজনের চুক্তি সম্পাদন করে। অপর দিকে তুরস্কের নুতন ঘটিত গ্রান্ড ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলী সরকারীভাবে ঘোষণা করে যে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দেই তুরস্কের রাজতন্ত্রের অবসান হয়। তবে সঙ্গে সঙ্গে এই অ্যাসেম্বলী আরও ঘোষণা করে যে শিক্ষা এবং চরিত্রের ভিত্তিতে অটোমান রাজবংশের কোন ব্যক্তিকে খলিফার পদে স্থাপন করা হবে। কিন্তু ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে খলিফার পদ চিরদিনের জন্য বাতিল করা হয়, কারণ কামালপাশা প্রবর্তিত বিপ্লবী রাজনৈতিক পরিস্থিতিও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে খলিফার পদ সম্পূর্ণ ভাবে সামঞ্জস্যহীন হয়ে পড়ে। ফলে খিলাফৎ আন্দোলন ভারতীয় মুসলমানদের নিকট একেবারেই অর্থহীন রূপে পরিগণিত হতে শুরু করে।

খিলাফৎ আন্দোলনের গতি ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে স্পষ্টভাবে বুঝতে পারা যায় যে, এই আন্দোলনের সহিত জড়িত হয়ে পড়া জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষে কোন রকমেই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয়। খিলাফৎ আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের ধর্মীয় আন্দোলন এবং খিলাফতের প্রশ্ন ইংলন্ডের সরকারের বৈদেশিক প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত। সুতরাং, ভারতের ব্রিটিশ সরকারের এই বিষয়ে কোন কিছু করার ক্ষমতা ছিল না। তা ছাড়া কংগ্রেসের জাতীয় আশা - আকাঙ্খা বা রাজনৈতিক আদর্শের সহিতও খিলাফৎ আন্দোলনের কোন সর্ম্পক ছিল না। এমনকি অসহযোগ আন্দোলনের প্রধান দুই কারণ, খিলাফৎ আন্দোলন ও পাঞ্জাবের মর্মান্তিক ঘটনার মধ্যেও কোন সম্পর্ক ছিল না। তুরস্কের রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে মুসলিম সম্প্রদায় অসহযোগ আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং গান্ধীজির হিন্দু মুসলিম ঐক্যের প্রচষ্টো সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়ে পড়ে।

**Q.29. Discuss briefly the Khilafat Movement and point out whether it helped or hindered Gandhi's-coperation Movement.**

**Ans ভূমিকা ঃ-**

খলিফা কথাটির অর্থ উত্তরাধিকারী , প্রতিষ্ঠানটির নাম খিলাফৎ । পয়গম্বর মোহম্মদ এর মৃত্যুর পর ৬৩২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মোট ৯৮ জন খলিফা মুসলিম দুনিয়ার প্রধানরূপে স্বীকৃতি লাভ করেন। পয়গম্বরের ধর্ম প্রবর্তন ছাড়া অন্য সব দায়িত্ব ও কাজের উত্তরাধিকারী হচলেন খলিফা ।

১৫১২ থেকে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ পযলন্ত তুরস্কের অটোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট ছিলেন মুসলিম দুনিয়ার খলিফা। খলিফাই ছিলেন মুসলিম জগতের অধিকর্তা । সুতরাং ভারতের মুসলিম সম্প্রদায়ও তুরস্কের সম্রাটের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করত ।

**২) খিলাফৎ আন্দোলন ঃ**

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক জার্মানীর পক্ষ অবলম্বন করে মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় । মিত্রপক্ষের অন্যতম অংশীদাররূপে ইংলন্ড তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য হয় । যুদ্ধে অক্ষশক্তির পরাজয় শুরু হলে তুরস্কের অধিপতি খলিফার পদচ্যুতি ও লাঞ্ছনার আশঙ্কা দেখা দেয় । ফলে ভারতের মুসলিমদের মধ্যে বিক্ষোভের মনভাবের সৃষ্টি হয় । ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের আশঙ্কা দূর করার উদ্দেশ্যে ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ ঘোষণা করেন যে তুরস্ককে প্রধানত ঃ তুর্কী জাতি অধ্যুষিত সমৃদ্ধ ও সুপ্রসিদ্ধ এশিয়া মাইনর অঞ্চল ও থ্রেস থেকে বঞ্চিত করার কোন ইচ্ছাই মিত্র পক্ষের নেই । কিন্তু যুদ্ধে ইংলন্ড ও তার মিত্র শক্তির জয়লাভের পর ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে সেভরেসের কঠোর চুক্তি তুরস্কের উপর আরোপ করা হয় এবং এই তুক্তির ফলে তুরস্ক ইজিপ্ট , সুদান , সাইপ্রাস , ত্রিপোলিতানিয়া , মরক্কো , টিউনিসিয়া , আরব , প্যালেস্তাইন , মেসোপোটামিয়া ও সিরিয়া মিত্রপক্ষের হস্তে সমর্পণ করতে বাধ্য হয় ।এই চুক্তির পর একমাত্র আনাতোলিয়ার পার্বত্য অঞ্চল ও ইউরোপে মহাদেশের একপ্রান্তে তুরস্ক সাম্রাজ্যের নামমাত্র অস্তিত্ব বজায় থাকে । তবে সেভরেসের চুক্তির কঠোর শর্তের পূর্বাভাস দু বছর পূর্বে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে সম্পাদিত মুদ্রসের যুদ্ধ বিরতির চুক্তির মধ্যেই নিহিত ছিল । ভারতের মুসলিম সম্প্রদায় মেসোপোটোমিয়া , আরব , সিরিয়া প্যালেস্তাইন প্রভৃতি স্থানের উপর খলিফার অধিকার বিলুপ্ত হওয়ায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয় । বিশেষতঃ মুসলিমদের অনেক তীর্থস্থানই এই সব অঞ্চলে অবস্থিত । তবে শুধু ভারতবর্ষে নয় , খলিফার ক্ষমতা লোপ পাওয়ায় সমগ্র মুসলিম জগতেই প্রচন্ড আলোড়নের সূচনা হয় ।

**৩) গান্ধীজি ও খিলাফৎ আন্দোলন ঃ**

সেভরেসের চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পূর্বেই ভারতের কয়েকজন মুসলিম নেতা খিলাফতের প্রশ্নটির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে শুরু করেন । ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর বোম্বাই শহরে 'সেনট্রাল ' খিলাফৎ কমিটি গঠিত হয় । ভঅরতের মুসলিম সমাজের অসন্তোষের সহানুভূতি

এবং তাদের প্রতি সমর্থন জানান লোকম্যন্য তি লক , মদন মোহন মালব্য, মতিলাল নেহেরু , মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী প্রমুখ কংগ্রেস নেতৃবর্গ । ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে একটি ইস্তাহারের মাধ্যমে ভারত ব্যাপী খিলাফৎ আন্দোলনের কথা প্রচার করা হয় । মুসলিম জগতের ঐহ্যিক ও পারত্রিক অধিকর্তারূপে খলিফার পদ অক্ষুন্ন রাখাই ছিল এই আন্দোলনের মুল দাবি । ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই মার্চ গান্ধীজি ফিলাফৎ দাবির সমর্থনের অসহযোগ আন্দোলনেণ কর্মসূচী প্রকাশ করেন । ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ শে মে সেন্ট্রাল খিলাফৎ কমিটির কনফারেন্সেরও ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় । ইতিমধ্যে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে অমৃতসরে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে খিলাফৎ আন্দোলনের নেতৃবর্গ জাতীয় কংগ্রেসের নেতাদের সঙ্গে আন্দোলনের কর্মসূচী সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা করেন এবং গান্ধীজির সমর্থন লাভ করতে সমর্থ হন । আলি ভ্রাতৃদ্বয় নামে পরিচিত মোহম্মদ আলি ও সৌকৎ আলি ভারতের খিলাফৎ আন্দোলনের নেতৃত্বে গ্রহণ করেন । এই আন্দোলনের অন্যান্য নেতাদের মধ্যে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ , হাকিম আজমল খানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ।

খিলাফতের প্রশ্নের সুষ্ঠ ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য ভারতের মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিবর্গ ভাইসর ও গভর্ণর জেনারেল এর সহিত এবং ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করেন । কিন্তু এই সাক্ষাৎকার সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয় । গান্ধীজি ইতিমধ্যে ঘোষণা করেন যে তুরস্কের মিত্রপক্ষের শান্তি চুক্তি সন্তোষজনক না হলে তিনি অসহযোগ আন্দোলনের পথ বেছে নিতে বাধ্য হবেন । তাঁর ঘোষণায় বলা হয় যে , England cannot expect a meek submission by us to an usprption of roght which to Muslim means a matter of life and death."

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে তুরস্কের মিত্রপক্ষের চুক্তির শর্তসমূহ প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হয় । ইংলন্ডের প্রবঞ্চণায় মুসলিম সম্প্রদাযের মধ্যে গভীর উত্তেজনার সৃষ্টি হয় । অপরদিকে এই সময় পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগের মর্মান্তিক ঘটনার অনুসন্ধানের জন্য নিযুক্ত হান্টার কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয় এবং এই রিপোর্টকে কেন্দ্র করে সমস্ত ভঅরতবাসীর মনে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণার ও ক্রোধের সৃষ্টি হয় । জাতীয় কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিকারের কোন পথের সন্ধান না পেয়ে অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব গ্রহণ করে । কেন্দ্রীয় খিলাফৎ কমিটিও কংগ্রেসের এই প্রস্তাব সমর্থন করে অহযোগ আন্দোলনের যোগদান করতে প্রস্তুত হয় ।

**৩) খিলাফৎ বনাম জাতীয় কংগ্রেস ঃ**

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে মোহনদাস করম চাঁদ গান্ধী অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন । খিলাফৎ আন্দোলন মন্টফোর্ড সংস্কারের ত্রুটি বিচ্যুতি এবং জালিয়ানওয়ালার ঘটনার ফলে ভারতের জনসাধারণের বিক্ষোভ তখন চরমে

উঠে এবং গান্ধীজি পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনকে তীব্র করে তোলার ব্যবস্থা করেন । ডক্টর পট্টভি সীতারামাইয়ার মতে " The Tribeni of the Khikafat and the punjab wrong , and the invisible floe of ibadequate reforms became full to the brim , and by their confluence enriched both in volume and content the stream of national discontent." গান্ধীজি প্রস্তাবের পক্ষে ১৮৮৬ টি ভোট পেড় এবং এই প্রস্তাবের বিপক্ষে ৮৮৪ টি ভোট পড়ে। দুটি বিষয়ের প্রতিকারের জন্য অহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় - খিলাফতের প্রশ্ন এবং পাঞ্জাবের জনসাধারণের উপর ব্রিটিশ সরকারের অন্যায় অত্যাচার । তবে প্রস্তাবে খিলাফতের প্রশ্নের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং মুসলিম সম্প্রদায়কে এই আন্দোলনের যোগ দিয়ে অসহযোগ আন্দোলনকে সাফল্যমন্ডিত করে তোলার জন্য আহ্বান জানানো হয় । ." It is the duty of every non - Muslim Indian in every legitimate manner to assist his Muslim brother in his attempt to remove the religious calamity that has over taken him .' অসহযোগ আন্দোলনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে নাগপুরে অনুষ্ঠিত জাতীড কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশনে গ্রহণ করা হয় ।

নানারূপ বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়ে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলন একযোগে পরিচালিত হয় । দেশের সর্বত্র এই আন্দোলনের যথেষ্ঠ জনপ্রিয়তাও লাভ করে । তবে কোথাও কোথাও এই আন্দোলপের সঙ্গীন হয়ে ওঠে । বিশেষঃত মালাবার অঞ্চলে মোপলা বিদ্রোহ ভীষণ আকার ধারণ করে । ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে করাচী শহরে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় খিলাফৎ কমিটির অধিবেশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের ব্রিটিশ সৈন্যে বিভাগে যোগদানের উপর বাধা নিষেধ আরোপ করা হয় । এই সিদ্ধান্তে আরও বলা বলা হয় যে ব্রিটিশ সরকার কামাল পাশার নেতৃত্বে গঠিত তুরষ্কের নতুন জাতীয়তা বাদী সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে ভারতের মুসলিম সম্প্রদায় স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করবে। ব্রিটিশ সরকার খিলাফৎ আন্দোলন ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে আলী ভাতৃদ্বয়কে গ্রেপ্তার করে । জাতীয় কংগ্রেস এই প্রত্যেকটি প্রাদেশিক সরকারকে নিজ নিজ দায়িতব রাজস্ব প্রদান বন্ধ করা সহ আইন অমান্য আন্দোলন ঘোষণা করতে নির্দেশ দেয় ।

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধীজী গুজরাটের বারদৌলি তালুকে সরকারের রাজস্ব বন্ধ করার জন্য আন্দোলন শুরু করেন । এই সময় যুক্তপ্রদেশের চৌরিচোরার ঘটনা সমস্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আমূল পরিবর্তন সাধন করে । বোম্বাই ও মাদ্রাজেও দাঙ্গা হাঙ্গামা শুরু হয় । ফলে বাধ্য হয়ে গান্ধীজি অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত রাখার নির্দেশ দেন । ব্রিটিশ সরকার গান্ধীজিকে গ্রেপ্তার করে ছ বছরের কারাদন্ডে দন্ডিত করে ।

অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতির সম্পর্কেরও অবসান ঘটে । হিন্দুমুসলমানের প্রীতির সম্পর্কই ছিল খিলাফৎ আন্দোলনের অন্যতম প্রধান ভিত্তি । ইতিমধ্যে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে মুলতানে প্রচন্ড রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয় । পরবর্তী বাংলাদেশ ও পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থানেও দাঙ্গাহাঙ্গামা দেখা দেয় । হিন্দু মুসলমানের সম্পর্কের উপর একজন ব্রিটিশ রাজর্কমচারী এই সময় মন্তব্য করেন , " The structure so painfully crected by Mr. Gandhi had crumbled hopelessly."

ইতিমধ্যে তুরস্কের রাজনীতিতে বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয় । সেভরেসের চুক্তির পরিবর্তে মিত্রপক্ষ ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্কের সহিত লজনের চুক্তি সম্পাদিত করে । তাছাড়া গ্রান্ড ন্যাশনাল অ্যাসম্বলী ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দেই তুরস্কের রাজতন্ত্রে অবসানের কথা সাড়ম্বরে ঘোষণা করে । গ্রান্ড ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলীর এই ঘোষণায় আরও উপযুক্ত ব্যক্তিকে খলিফার পদে নিযুক্ত করা হবে । কিন্তু কামাল পাশার দ্বারা পরিচালিত গণতান্ত্রিক সরকারের সহিত খলিফাপদের অস্তিত্ব সম্পুর্ণ সামঞ্জস্যহীন বলে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে খলিফার পদই বিলুপ্ত করা হয় । ফলে খলিফার আন্দোলন মূল্যহীন হয়ে পড়ে এবং ভারতীয় মুসলিমগণও এই আন্দোলনের পরিত্যাগ করে ।

**৪) খিলাফৎ আন্দালন ও অসহযোগ আন্দোলন ঃ**

খিলাফৎ আন্দোলনের মাধ্যমে গান্ধীজি ভারতীয় মুসলমানদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সহিত যুক্ত করার সুযোগ গ্রহণ করেন । গান্ধীজি ধারণা ছিল যে অসহযোগ আন্দোলনের সহিত খিলাফৎ আন্দোলন যুক্ত করলে সমগ্র দেশব্যাপী বিরাট আন্দোলন পরিচালনা করার সুযোগ অবশ্যম্ভাবী । কিন্তু গান্ধীজির এই আশা পূর্ণ হওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না কারণ আলী ভাতৃদ্বয় , মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, আজমল খান প্রভৃতি মুসলিম সম্প্রদায়ের এই আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করলে ও বেশির ভাগ মুসলমান নেতাই এই আন্দোলন থেকে দূরে থাকতে চেষ্টা করেন । বিশেষতঃ মুসলিমলীগের তরুণ সদস্যদের এই আন্দোলনের প্রতি কোন প্রকার আকর্ষন ছিল না । অপরদিকে মালাবার অঞ্চলের উগ্র ও ধর্মান্ধ মোপলা নামে পরিচিত আরবের মুসলিমদের বংশরগণ খিলাফৎ আন্দোলনের নামে হিন্দুদের উপর অকথ্য অত্যাচার করে এবং বহু হিন্দু প্রাণরক্ষার উদ্দেশ্যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয় । ফলে হিন্দুদের মধ্যেও খিলাফৎ তথা অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে বিতৃষ্ণা দেখা যায় । তবে জুডিথ ব্রাউনের মতে খিলাফৎ আন্দোলনই গান্ধীজি সর্বভারতীয় নেতৃত্বের পদে স্থাপন করতে সাহায্য করে । তথাপি একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে অসহযোগ আন্দোলনের সহিত খিলাফৎ আন্দোলন যুক্ত হওয়ার ফলে অসহযোগ আন্দোলনের শক্তি কোনপ্রকারেই বৃদ্ধি পায় নি । অপর দিকে খিলাফতের মতো একটি আর্ন্তজাতিক সমস্যার সহিত ভারতের জাতীয়াতাবাদী আন্দোলন যুক্ত হওয়ার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পক্ষে তা কোন প্রকারেই হিতকর হয় নি । ব্যক্তিগতভাবে গান্ধীজি লাভবান হলেও অসহযোগ

আন্দোলনের সহিত খিলাফৎ আন্দোলন যুক্ত হওয়ার জাতীয়তাবাদী আন্দোলন যথেষ্ঠ ক্ষতিগ্রস্থ হয় ।

**অসহযোগ আন্দোলন**

অসহযোগ আন্দোলনই মহাত্মাগান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত প্রথম সর্বভারতীয় মুক্তি আন্দোলন । প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অবসানের পর ভারতের রাজনীতি অত্যন্ত জটিল আকার ধারণ করে । মন্ট - ফোর্ড সংস্কার ভারতীয়দের জাতীয় আশা - আকাঙ্খা পূরণ করতে ব্যর্থ হয় । ফলে ভারতীয়দের অসন্তোষ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। তাছাড়া ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ১৩ই মার্চ রাউলাট আইনের ঘোষণা , ঐ বছরের ১৩ ই এপ্রিলের জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ড ও পাঞ্জাবে ইংরেজ সরকারের নিষ্ঠুর দমননীতি ভারতের রাজনৈতিক আবহাওয়াকে আরও জটিল করে তোলে । অপরদিকে খিলাফতের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে ভারতীয় সম্প্রদায়ের মনোভাবও ব্রিটিশ বিরোধী হয়ে ওঠে এবং ব্রিটিশ বিরোধী সক্রিয় আন্দোলন অংশ গ্রহণ করার জন্য তারাও প্রস্তুত হয় । এই সময় ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে পর্যালোচনা করার জন্য ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করা হয় । এই অধিবেশনেই গান্ধীজি অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব উত্থান করেন । গান্ধীজির এই প্রস্তাবে বলা হয় যে প্রধানতঃ দুটি কারণে অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। প্রথমতঃ খিলাফতের প্রশ্নে ভারতীয়দের পক্ষে নীরবতা অবলম্বন করা সম্ভব নয় । কারণ , ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী স্বেচ্ছাকৃতভাবে তাঁর অঙ্গীকার লঙ্ঘন করেন এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত তুরস্কের সাম্রাজ্যের এক বিরাট অঞ্চল অধিকার করে মুসলিম জগতের অধিকর্তা খলিফার পদ ও সম্মানের প্রতি বিন্দুমাত্র মর্যাদা প্রকাশ করেন নি । এই প্রস্তাবে বলা হয় যে ইসলাম ধর্মের এই বিপদের সময় ভারতের প্রত্যেক অমুসলিম নাগরিকেরই কর্তব্য তার মুসলিম ভ্রাতার সহিত সর্বান্তঃ করণে সহযোগিতা করা ।

দ্বিতীয়, ব্রিটিশ সরকারের পাঞ্জাবের অনুস্ঠিত নিষ্ঠুর নীতির বিরুদ্ধে এবং ইংলন্ডের পার্লিয়ামেন্টের হাউস অফ লর্ডসে স্পষ্টভাবে ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ্‌দের ভারতীয়দের প্রতি সহানুভূতিহীন দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিবাদে অসহযোগ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা একান্ত কর্তব্য । প্রস্তাবে আরও বলা হয় যে এই দুটি অন্যায়ের প্রতিকার না হওয়া পর্যন্ত ভারতবাসীদের পক্ষে সন্তুষ্টি প্রকাশের কোনই কারণ নেই । এবং এইরূপ পরিস্থিতিতে ভারতীয়দের ধীরে ধীরে সম্প্রসারিত এবং অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের পথ গ্রহণ করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই এবং যতদিন পর্যন্ত এই অন্যায়ের প্রতিকার না হয় ও স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত না হয় ততদিন পর্যন্ত এই আন্দোলন অব্যাহত থাকবে ।

প্রচন্ড বিরোধিতা সত্ত্বেও ১৮৮৬ টি ভোটে গান্ধীজির প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং এই প্রস্তাবের বিপক্ষে ৮৮৪টি ভোট পড়ে। তবে জাতীয় কংগ্রেসে বাংলাদেশের প্রতিনিধিগণ গান্ধীজির এই প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দেন এবং চিত্তরঞ্জন দাশ গান্ধীজির উত্থাপিত অসহযোগ আন্দোলনের কঠোর সমালোচনা

করেন ।

**(২) অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী ঃ**

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ শে ডিসেম্বর নাগপুরে অনুস্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সভায় অসহযোগ আন্দোলনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় । গান্ধীজি একক প্রচেষ্টাই জাতীয় কংগ্রেসকে এই গুরুত্বপুর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য করে এবং নাগপুরের জাতীয় কংগ্রেসের এই অধিবেশনের ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে গান্ধীজির ব্যক্তিগত জয়ের ইতিহাস । কংগ্রেসের প্রবীণ ও অভিজ্ঞ সদস্যগণ গান্ধীজির নীতির বিরোধিতা করলেও তাঁরা গান্ধীজি মতামত উপেক্ষা করতে পারেন নি । ডক্টর পট্টভি সীতারামাইয়ার মতে , " The session was a personal triumph for Gandhi , It left everyone of the older Congressmen - Senior , Leaders and patri-archs - against , asking themselves and each other , Who is this man that speaketh this with a tone of authority and whence doth he come ? Seasoned men like pal and Malaviya and Jinnah and Khaparde , stal-warts like C.RDas and lala Laipat Raj were simply overowered"১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে নাগপুর অধিবেশনের সময় গান্ধীজি জাতীয় কংগ্রেসের উপর যে একাধিপত্য স্থাপন করেন ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত সে অধিকার তাঁর সমানভাবে অব্যাহত থাকে ।

নাগপুর অধিবেশনে অসহযোগ আন্দোলনকে একটি বাস্তব সমস্ত রূপ দেওয়া হয় এবং এই আন্দোলনের একটি ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় । ঘরে ঘরে চরকায় সূতা কাটা ও খদ্দর পরিধান মাদকদ্রব্য বর্জন , অস্পৃশত্যা দুরীকরণ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রচার , সেই বিদেশী পণ্য বর্জন বিদেশী খেতাব বর্জন , বিদেশী শিক্ষা ব্যবস্থা ও বিচার ব্যবস্থার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ ব্রিটিশ সরকারের দ্বারা গঠিত আইন পরিষদ বর্জন এবং একই সঙ্গে সকল ক্ষেত্রে সরকারের সঙ্গে অসহযোগ করে আত্মনির্ভরশীল হওয়াই ছিল অসহযোগ আন্দোলনের প্রধান কর্মসূচী । তবে সম্পূর্ণ অহিংসভাবে এই আন্দেলন পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় । গান্ধীজি প্রতিশ্রুতি দেন যে অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী সঠিকভাবে অনুসৃত হলে এক বছরের মধ্যে স্বরাজলাভ অবশ্যম্ভাবী ।

**৩) অসহযোগ আন্দোলন (১৯২১ - ১৯২২)**

নাগপুর অধিবেশনের সিদ্ধান্ত সমগ্রভারতে বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি করে এবং বিভিন্নস্তরের মানুষ এই আন্দোলনে যোগদান করতে এগিয়ে আসে । এই আন্দোলনের প্রত্যক্ষফল হিসাবেই এদেশে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠনা গড়ে ওঠে । চরকাকে কেন্দ্র করে গ্রামীণ অর্থনীতি শক্তিশালী হয় এবং আদালত ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ত্যাগী এক বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় জাতীয় আন্দোলনের পুরোভাগে এগিয়ে আসায় এদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের শক্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায় ।

ব্রিটিশ সরকারও এই আন্দোলন বন্ধ করার জন্য অত্যন্ত কঠোর দমন নীতি অবলম্বন করে ।

সরকারের এই নীতির প্রতিবাদে জাতীয় কংগ্রেসও প্রিন্স অফ ওয়েলসের ভারত ভ্রমণ উপলক্ষে আয়োজিত সমস্ত অনুষ্ঠান বর্জন করার জন্য জনসাধারণকে অনুরোধ করে ।আইন অমান্য আন্দোলনের কর্মসূচী সম্পর্কে এই সময় বিচার বিবেচনা শুরু হয় । ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ব্যক্তিগতভাবে আইন অমান্য আন্দোলন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় । ইতিমধ্যে খিলাফৎ আন্দোলনের দুই প্রধান নেতা মোহম্মদ আলি ও সৌকৎ আলিকে গ্রেপ্তার করা হলে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি প্রতিটি প্রদেশকে নিজ নিজ দায়িত্বে রাজস্ব প্রদান বন্ধ সহ আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনা করার সম্মতি দেয় । ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধীজি গুজরাটের বারদৌলি তালুকে সরকারের প্রতি রাজস্ব বন্ধের জন্য আন্দোলন পরিচালনা করেন ।

প্রথম দিকে অসহযোগ আন্দোলন শান্তিপূর্ণ ছিল এবং সারা ভারতে প্রায় ত্রিশ হাজার নরনারী অসহযোগ আন্দোলনের জন্য কারারুদ্ধ হয় ।বিশেষতঃ অসহযোগ আন্দোলন ও খিলাফৎ আন্দোলন এক সঙ্গে চলতে থাকায় দেশে হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতিও বৃদ্ধি পেতে থাকে । কিন্তু জনসাধারণের প্রতি অহিংসা উপায়ে অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনার জন্য জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেও বিভিন্নস্থানে ও এই আন্দোলনের হিংসাত্মক হয়ে ওঠে । মালাবার অঞ্চলের মোপলা নামে উপর অকথ্য অত্যাচার শুরু করে ।মোপলাদের অত্যাচারের ফলে বহু হিন্দু নিহত হয় এবং অনেকে প্রাণরক্ষার জন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয় ।অপর দিকে ১৯২২ খ্রীস্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারী এক ক্রুদ্ধ জনতা উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার চৌরিচৌরা থানা আক্রমণ করে কয়েকজন পুলিশকে গৃহে অবরুদ্ধ অবস্থায় পুড়িয়ে হত্যা করায় আন্দোলনের হঠাৎ রূপান্তর ঘটে এবং ঐ হিংসা যাতে আরও ব্যাপ্ত হতে না পারে সেজন্য গান্ধীজি অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের সংকল্প গ্রহণ করেন । বারদৌলিতে কংগ্রেস কার্যনিবাহক কমিটির সভায় আন্দোলন স্থগিত রাখার প্রস্তাব গৃহীত হয় । তবে সামগ্রিকভাবে অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহৃত হলেও ব্যক্তিগতভাবে আইন অমান্য আন্দোলন ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চলতে থাকে ।

গান্ধীজি অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভারতের সর্বত্র কঠোর সমালোচনা শুরু হয় ।কারান্তরাল থেকে লাল লাজপৎ রায় এবং মতিলাল নেহেরু গান্ধীজিকে দীর্ঘ পত্র পাঠান । তাঁরা মনে করেন যে একটি স্থানে অনুষ্ঠিত অন্যায়ের জন্য গান্ধীজি সমস্ত জাতিকে শাস্তি প্রদান করেন। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির পরবর্তী বৈঠকে মিস্টার মুনজি গান্ধীজির বিরুদ্ধে একটি নিন্দাসূচক প্রস্তাব আনয়ন করেন কিন্তু সংখ্যাগুরুর ভোটে এই প্রস্তাব নাকচ হয়ে যায় ।তবে এই ঘটনার কিছুদিন পরে গান্ধীজিকে গ্রেপ্তার করে ছ ' বছরের জন্য কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয় ।

অসহযোগ আন্দোলন প্রথমদিকে সাফল্য অর্জন করলেও কোনরূপ স্থায়ী ফল লাভ করতে ব্যর্থ হয় । তবে এই আন্দোলনের ফলে ভারতীয়দের জাতীয় চেতনা যথেষ্ঠ পরিমাণে বৃদ্ধি পায় ।এই

ঐতিহাসিক আন্দোলনের ফলাফল সম্পর্কে মন্তব্য করা হয় , " The old feeling of impotent rage and unfortunate requests gave place to a new sense of reponsibility a spirit of self - reliance people realised that if they would be free they must strike the blow themselves . It was a definite call to them to cross the Rubicon and burn their boats . They cheerfully agreed to the course and began to march forward."

অসহযোগ আন্দোলন বিশেষতঃ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিশেষভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় । এই আন্দোলনের সময় হিন্দু ও মুসলমানের মিলিত প্রচেষ্টায় যে খিলাফৎ আন্দোলন গড়ে ওঠে অসাফল্যের ফলে হিন্দু মুসলমানের ঐক্যের অন্যতম প্রধান ভিত্তি বিনষ্ট হয় । হিন্দু মুসলমানের ঐক্যের জন্য মহাত্মাগান্ধী বিশেষভাবে চেষ্টা করেন , কিন্তু তাঁর প্রচেষ্টা সফল হয় নি । বিশেষতঃ খিলাফৎ আন্দোলনী সহিত ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কোন সম্পর্ক ছিল না । খিলাফৎ আন্দোলন এবং পাঞ্জাবে ব্রিটিশ সরকারের দমনমূলক নীতিকে কেন্দ্র করে অসহযোগ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও এই দুটি সমস্যার মধ্যে কোন যোগ সূত্রছিল না । আন্তর্জাতিক সমস্যা খিলাফতের সহিত জাতীয় সমস্যা ভারতের স্বরাজ্য লাভের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করতে গিয়ে গান্ধীজি অসহযোগ আন্দোলনের ভিত্তিকেই শিথিল করে তোলেন । অপর দিকে তুরস্কের রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে খলিফার পদ ও মর্যাদা বিলুপ্ত হওয়ার ফলে ভারতের মুসলিম সম্প্রদায়ের খিলাফৎ আন্দোলন মূল্যহীন হয়ে পড়ে এবং তারা জাতীয় কংগ্রেস ও অসহযোগ আন্দোলনের সহিতঃ সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে । ফলে হিন্দু মুসলমানের ঐক্যের জন্য গান্ধীজির সমস্ত প্রচেষ্টাই বিফল হয় ।

অসহযোগ আন্দোলন বনাম আইন অমান্য আন্দোলন ঃ

১৯৩০ থেকে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের আইন অমান্য আন্দোলনের কারণগুলো সাধারণ ভাবে ১৯২১ - ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের অসহযোগ আন্দোলনের কারণের অনুরূপ । বিশেষতঃ অসহযোগ আন্দোলনের পশ্চাতের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দাবিগুলো পরবর্তী দশ বছরেও ব্রিটিশ সরকার পূরণ করার চেষ্টা করে নি । অসহযোগ অন্দোলন সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হলেও গান্ধীজি ঘোষণা করেন যে প্রয়োজনবোধে যে কোন মুহূর্তে আবার আন্দোলনের পথ গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে । সুতরাং সেদিক থেকে বিচার করলে আইন আমন্য আন্দোলনকে একটি ব্যাপক ও বৃহত্তর অধ্যায় হিসাবে মনে করা যেতে পারে । তবে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের অসহযোগ আন্দোলনের অন্যতম প্রধান দাবি স্বরাজের কোন সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নিরুপণ করা সম্ভব হয় নি , কিন্তু ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে স্বরাজ অর্থাৎ পূর্ণ স্বাধীনতাই আইন অমান্য আন্দোলনের চরম লক্ষ্য বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় । ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে গাপধীজি ভারতের জাতীয় আন্দোলনে নবাগত নেতারূপে পরিচিত ছিলেন কিন্তু ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বীহীন নেতারূপে স্বীকৃতি লাভ করেন । তাছাড়া ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে গণ আন্দোলনের জন্য উপযুক্ত

ক্ষেত্র প্রস্তুত না করেই অসহযোগ আন্দোলনের আহ্বান জানানো হয় , কিন্তু ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে গণ আন্দোলনের প্রাথমিক প্রস্তুতি সম্পন্ন হওয়ার পরই আইন অমান্য আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হয় । ডক্টর পার্সিভাল স্পিয়ার খুব সুন্দরভাবে এই দুটি আন্দোলনে র বৈশিষ্ট্য ব্যাখা করেন, " Both were avowedly nonviolent but whereas the first was passively the second was actively revolutionary . The hoped to bring the government to a stansstill by withdrawing from the administration , the second sough to paralyse the government by the mass performance of specific illegal acts."

**২) আইন অমান্য আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য ঃ**

উপযুক্তভাবে ক্ষেত্র প্রস্তুত করে সংগঠিত আইন অমান্য আন্দোলনের কয়েকটি লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল । **প্রথমতঃ** ব্যাপকহারে সভা - সমিতি মিছিল সংগঠন করা এবং হরতাল ও ধর্মঘটের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারের নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা ।এমনকি গান্ধীজির নির্দেশ অমান্য করেও জনসাধারণ শান্তভাবে প্রতিবাদ জানানোর পরিবর্তে উগ্র ও সক্রিয় পথ গ্রহণ করতে শুরু করে । সরকারী নীতির ফলেই হরতাল ঘোষণা করার সুযোগের সংখ্যা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায় । বোম্বাই অঞ্চলে আইন অমান্য আন্দোলন সবচাইতে ব্যাপকতা লাভ করে । প্রকৃতপক্ষে বোম্বাই অঞ্চলে সরকারী শাসনের অবসান ঘটে এবং জনসাধারণই আঞ্চলিক শাসনের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করতে সক্ষম হয় ।

**দ্বিতীয়ত,** সংরক্ষণশীল ও অভিজাত পরিবারের মহিলারা এই আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন । বিশেষতঃ উত্তর ভারতের বিভিন্ন শহরে দোকান পাট, হাট বাজারে পিকেটিং এ অংশ গ্রহণ করেন ।

**তৃতীয়ত ঃ** আইন অমান্য আন্দোলন উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের স্বাধীনতা প্রিয় কিন্তু অনগ্রসর অধিবাসীদের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করে । ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে খান ভ্রাতৃদ্বয়ের নেতৃত্বে পাঠানরা কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে যোগ দেয় এবং এই অধিবেশনেই আইন অমান্য আন্দোলনেণর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় । এই সময় উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে খান আবদুল গফুর গানের নেতৃত্বে গঠিত অহিংসা আদর্শে বিশ্বাসী সমাজসেবী মুক্তি সেনাবাহিনী গঠিত হয় । এই বাহিনী লালকুর্তা এবং খোদা -ই - খিদমতগার নামেও পরিচিত । ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে খোদাই - খিদমতগার কংগ্রেসের অংশরূপে স্বীকৃতলাভ করে এবং ১৯৩০ - ৩৪ খ্রীষ্টাব্দের আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে এই বাহিনী ইংরেজ সরকারের প্রচন্ড অত্যাচার ও উৎপীড়ত সহ্য করতে বাধ্য হয় । পেশোয়ারের গণ মিছিলের উপর ব্রিটিশ সরকার প্রচন্ড অত্যাচার করে । এমনকি পুলিশ নির্বিচারে জনসাধারণের উপর গুলিবর্ষন করে । কিন্তু নির্যাতিন সত্ত্বেও খোদা - ই খিদমতগার অহিংস আদর্শের বিশ্বাসে অবিচল থাকে ।

**চতুর্থত ঃ-** আইন অমান্য আন্দোলনের সময় ব্রিটিশ সরকারের শক্তির প্রধান উৎস সৈন্যবাহিনীরও ব্রিটিশের দমনমূলক নীতির প্রতিবাদ জানাতে শুরু করে । জাতীয়তাবাদী ও বিপ্লবিক চিন্তাধারা সৈন্যবাহিনীর উপরও যথেষ্ঠ প্রভাব বিস্তার করে। পেশোয়ারে একদল হিন্দু গাড়োয়ালী সৈন্য নিরস্ত্র জনসাধারণের উপর গুলিবর্ষণ করতে আপত্তি জানায় এবং জনসাধারণের দাবি দাওয়া প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করে । এই ঘটনার বিবরণ দ্রুত বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে এবং অনেক জায়গাই সৈন্যবাহিনী গাড়োয়ালী সৈন্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে শুরু করে । তবে ব্রিটিশ সরকার এই সংবাদ গোপন রাখার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে । জহরলাল নেহেরু মনে করেন যে সৈন্যবাহিনীর ধারণা হয় যে ব্রিটিশ রাজত্বের দ্রুত অবসান অবশ্যম্ভাবী , সুতরাং তারা ব্রিটিশের স্বার্থবিরোধী কার্যে লিপ্ত হতে দ্বিধাবোধ করে নি ।

**পঞ্চমতঃ** আইন অমান্য আন্দোলনের প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জরহলাল নেহেরু কর বন্ধের আন্দোলন শুরু করেন । সামগ্রিক পরিস্থিতি এই আন্দোলনের অনুকূল ছিল । কারণ দ্রব্যবূল্য বৃদ্ধির ফলে কৃষকদের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে ওঠে । কিন্তু সর্তক ও দূরদর্শী রাজনীতিবিদ্ নেহেরু জাতীয় কংগ্রেসের শ্রেণী চরিত্র সম্পর্কে খুব সচেতন ছিলেন। সুতরাং ব্রিটিশ সরকারই যে সব অঞ্চলের জমির মালিক গান্ধীজি বেছে বেছে সে সব অঞ্চলে কর প্রদান বন্ধের আন্দোলন শুরু করেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অঞ্চল , বিহার ও বাংলাদেশ এই আন্দোলন শুরু হয় - তবে এই সব অঞ্চলে কর প্রদান বন্ধ আন্দোলন কেবলমাত্র চৌকীদারী কর প্রদান বন্ধের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়। গুজরাটে এই আন্দোলন খুব সাফল্য লাভ করে । বিশেষতঃ বরোদার কৃষকগণ ভূমি রাজস্ব কর দিতে অস্বীকার করে । বাংলাদেশের মেদিনীপুর জেলার কাঁথি এবং ঢাকা ও বিক্রমপুরে এই আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করে । সরকার পক্ষের প্রচন্ড অত্যাচার সত্ত্বেও কৃষকদের মনোবল হ্রাস পায় নি।

**ষষ্ঠত ঃ** আন্দোলন দমন করার উদ্দেশ্যে বিধিবদ্ধ বিভিন্ন সরকারী অর্ডিন্যান্সের বিরুদ্ধে জনসাধারণ তীব্র প্রতিবাদ জানাতে শুরু করে । ফলে পরোক্ষ ভাবে সরকারের নীতির ফলে আইন অমান্য আন্দোলনের তীব্রতা আরও বৃদ্ধি পায় । অর্ডিন্যান্সগুলো সাধারণভাবে সভাসমিতি , গণমিছিল এবং সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে জারী করা হয় । সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে এবং অর্ডিন্যান্সের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ কংগ্রেসের নেতৃবর্গ পত্র - পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ করার জন্য জাতীয়তাবাদী সাংবাদিকদের অনুরোধ করেন। পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে আবার পত্র - পত্রিকা প্রকাশিত হতে শুরু করে কিন্তু অমৃতবাজার পত্রিকার প্রকাশনা অনেক দিন পর্যন্ত বন্ধ রাখা হয় ।

**সপ্তমতঃ** আইন অমান্য আন্দোলনের কর্মসূচীর মধ্যে পরে বিদেশী পণ্য বর্জনের নীতিও অন্তভূক্ত করা হয়। ভারতের শিল্পের কলকারখানা ও কুটির শিল্পের পৃষ্ঠপোষক তার প্রতি বিশেষ দৃস্টি দেওয়ার জন্য চেষ্টা শুরু হয়। জনসাধারণ সিগারেটের পরিবর্তে বিড়ি থেকে শুরু করে । ফলে বিড়ি শিল্প খুব

দ্রুত উন্নতি লাভ করে ।

**৩) আইন অমান্য আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য (১৯৩২ -১৯৩৪ খৃষ্টাব্দ)**

ক) ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে সরকার দমনমূলক বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করে আইন অমান্য আন্দোলনের গতি পরিবর্তন করতে সমর্থ হয় । ফলে আইন অমান্য আন্দোলনের পরিচালনার কর্তৃত্ব জাতীয় কংগ্রেসের হাত থেকে ব্রিটিশ সরকারের হাতে চলে যায় । জাতীয় কংগ্রেসের সংগঠনিক দুর্বলতা এবং ব্রিটিশ সরকারের কঠোর নীতীর ফলে আন্দোলনও ধীরে ধীরে অন্য পথ গ্রহণ করতে শুরু করে।

খ) কিন্তু সাংগঠনিক ক্রটি বিচ্যুতি থাকা সত্বেও কংগ্রেসের ডাকে জনসাধারণের অভূতপর্ব সাড়া পাওয়া যায় । কংগ্রেস গোপন সংবাদ আদান প্রদানের জন্য সমগ্র ভারতব্যাপী শক্তিশালী ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সমর্থ হয় । জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে গোপনে বুলেটিনও প্রকাশ করা হতে থাকে।

গ) আন্দোলন শুরু হওয়ার প্রথম পর্বে জাতীয় কংগ্রেসের বুর্জোয়া সমর্থকগণ আন্দোলণকারীদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করলেও পরে বিষয়সম্পত্তি হারাবার ভয়ে তাদের সহানুভূতি সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয় । কিন্তু কংগ্রেস বিরোধী প্রচার উপেক্ষা করেও কৃষকগণ নিজেদের অর্থনৈতিক দুর্দশার জন্যই এই আন্দোলন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে।

ঘ) জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন আহ্বানের উপর নিষেধ আজ্ঞা জারী হওয়া সত্ত্বেও কংগ্রেস দিল্লী ও কলকাতার দুটি অধিবেশন সংগঠন করতে সমর্থ হয় । কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের পথিমধ্যে অবরোধ এবং গ্রেপ্তার করা হয় , তথাপি বহু লোক এই অধিবেশনে যোগ দেন এবং প্রকাশ্যে তাঁরা ব্রিটিশ সরকারকে উপেক্ষা করার চেষ্টা করেন ।

ঙ) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অত্যাচার করার জন্য ব্রিটিশ সরকারগণ গ্রেপ্তার ,মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত , আঞ্চলিক ভিত্তিতে জরিমানা আদায় এবং গ্রামঞ্চলে শান্তিরক্ষার জন্য বিশেষ পুলিশবাহিনী মোতায়েন করার নীতি গ্রহণ করে । উ ত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে পাঠানদের দমনের জন্য সামরিক বাহিনী নিযুক্ত করা হয় । বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে যুবক ও যুবতীদের বাধ্যতামূলক ভাবে পরিচয় পত্র ব্যবহার করার প্রথা চালু করা হয় । চাবুকের ব্যবহার খুবই সাধারণ ঘটনায় পরিণত হয় । মহিলাদের প্রতিও কোন বিশেষ সহানুভূতি প্রদর্শন করা হত না । একমাত্র রাজভক্ত ব্যক্তিদের উপর নির্ভর করেই ব্রিটিশ সরকার শাসনকার্য পরিচালনার ব্যবস্থা করে । যে সমস্ত অঞ্চলে কংগ্রেস কৃষকদের সংগঠিত করার সুযোগ লাভ করে , সেই সব জায়গায় স্থানীয় নেতাদের শাস্তি প্রদান করে অথবা অযোগ্যতা প্রমাণ করে ব্রিটিশ সরকার আন্দোলনের শক্তি ধ্বংস করার ব্যবস্থা করে । অপরদিকে ব্রিটিশ সরকার জাতীয় কংগ্রেসের উপর নানাপ্রকার মিথ্যা দুর্নাম আরোপ করে সংগঠনের ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা করে । ব্রিটিশ সরকার নিজেকে গণতন্ত্রের বিশ্বাসী এবং জাতীয়

কংগ্রেসকে একনায়কতন্ত্রের পূজারীরূপে বর্ণনা করার চেষ্টা করে । কানপুরের দাঙ্গাহাঙ্গামা এবং দ্রব্য মূল্যবৃদ্ধির জন্যও তারা কংগ্রেসকে দায়ী করার চেষ্টা করে । ইঙ্গ ভারতীয় সংবাদপত্রগুলো ও সাংবাদিকগণ ব্রিটিশ সরকারের মতামতের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে শুরু করে ।

অসহযোগ আন্দোলনের মতো আইন অমান্য আন্দোলনও গগণচুম্বী আশা আকাঙ্খা সৃষ্টি করার পর ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় । তবে উভয় ক্ষেত্রেই গান্ধীজি আন্দোলনের ব্যর্থতার সমস্ত দায়িত্ব জনসাধারণের স্কন্ধে আরোপ করেন । তাঁর মতে আন্দোলনের মুলনীতি জনসাধারণের পক্ষে উপলব্ধি করা কখনও সম্ভব হয় নি । ফলে প্রতিবারই প্রচন্ড হতাশার মধ্যে আন্দোলন স্থগিত নির্দেশ দিতে বাধ্য হন । ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তিনি এই সম্পর্কে মন্তব্য করেন , I fell that the mass have not received the full message of satyagraha owning to its adultera-tion in the process of transmission . It has become clear to me that spiri-tual instruments suffers in their potect when their use is taught through non -spiritual media."

**অর্থনৈতিক কারণ ঃ**

মন্ট ফোর্ড সংস্কার কার্যকরী হওয়ার অব্যবহিত পরেই ভারতের অর্থনৈতিক প্রচন্ড মন্দা দেখা দেয় । কৃষি ও শিল্পের ক্ষেত্রে উৎপাদন দ্রুত হ্রাস পায় এবং পণ্য দ্রব্য এবং অন্যন্য বিষয়ে সরকারী অর্থ বিনোয়োগও যথেষ্ঠ পরিমাণে কমে যেতে শুরু করে । কে এম . মুখার্জীর মতে ভারতের কৃষিজাত উৎপাদনের বৃদ্ধির সূচক ১৯২২-২৩ খ্রীষ্টাব্দে খুব হ্রাস পায় , ১৯২৭ - ২৮ খ্রীষ্টাব্দে বৃদ্ধি পায় , কিন্তু পুনরায় ১৯৩১ - ৩২ খ্রীষ্টাব্দে বিশেষভাবে হ্রাস পায় । পণ্য দ্রব্য ও অন্যান্য বিষয়ে সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ ১৯২২-২৩ খ্রীষ্টাব্দে বৃদ্ধি পায়ে ৩৭০°৪০ কোটি টাকায় পরিণত হয় কিন্তু ১৯২৪ -২৫ খ্রীষ্টাব্দে এই অর্থের পরিমাণ সাংঘাতিক ভাবে হ্রাস পেয়ে ৩২৪ কোটি টাকায় পরিণত হয় । প্রাদেশিক আয় ব্যয়ের ক্ষেত্রেও এই লগ্নীকৃত অর্থ হ্রাসের যথেষ্ঠ প্রতিক্রিয়া দেখা যায় । ১৯২২ -২৩ খ্রীস্টাব্দে পাঞ্জাবে আদায়ী কৃত আয়করের মোট পরিমাণ ছিল ৭৫ লক্ষ টাকা , কিন্তু পরবর্তী বছরে এই অর্থের মোট পরিমাণ ৭১ লক্ষ টাকায় পরিণত হয় । আয়করের হ্রাস প্রকৃতপক্ষে বিত্তশালী শ্রেণীর অর্থনৈতিক নিশ্চলতার পরিচায়ক ।

**২) অর্থনৈতিক নিশ্চলতা ও উন্নতির অভাব ঃ**

প্রাদদেশিক শাসনক্ষেত্রে দ্বৈতশাসনের প্রবর্তনের অর্থনৈতিক ফলাফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মনে প্রচন্ড হতাশার সৃষ্টি হয় । মন্টফোর্ড বিবরণীতে বলা হয় যে যে, কেন্দ্র ও প্রদেশের আয়ের উৎসগুলোকে সুস্পষ্টভাবে পৃথক করা প্রয়োজন । এই বিবরণীর অনুমোদন অনুযায়ী রাষ্ট্রের আয়ের প্রধান উৎস সমূহ , যথা ভূমিরাজস্ব , আয়কর প্রভৃতি কেন্দ্র অথবা প্রদেশের উপর নির্দিষ্ট করে দেওয়া উচিত । কিন্তু মেস্টনের অনুমোদন অনুযায়ী আয়কর শুষ্ক , লবণের উপর ধার্য আবগারী শুল্ক , সরকারী

দলিল দস্তাবেজে ব্যবহৃত স্ট্যাম্পের ধার্যকর প্রভৃতি প্রদেশের জন্য নির্দিষ্ট করা হয় । মেস্টন অনুমোদনের কর্মকর্তাগণের ধারণা ছিল যে এই সব থেকে আদায়কৃত অর্থের উদ্বৃত্ত অংশ প্রাদেশিক সরকার জাতির গঠনমূলক কাজে ব্যয় করার সুযোগ পাবে । কিন্তু ইতিমধ্যে দ্রব্যমুল্য বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়ে যায় এবং সরকারী কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি করার বিশেষ প্রয়োজন দেখা দেয় । অপরদিকে সঙ্গতিসম্পন্ন জমিদার শ্রেণীর নির্বাচকমন্ডলীর উপর বর্দ্ধিত হারে ভূমিরাজস্ব ধার্য করা ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে সম্ভব ছিল না । দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে ১৯২২ থেকে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রধানতঃ স্ট্যাম্প কাগজ , সেজখালের তীরবর্তী উপনিবেশের জমির মালিক এবং আদালতের ফী বৃদ্ধি করে ৬৪ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত কর আদায় করার ব্যবস্থা করা হয় । কিন্তু এই নীতির ফলে গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের উপর আর্থিক চাপের সৃষ্টি হয় । ১৯২০র দশকে বাংলাদেশের চারকোটি দশ লক্ষ লোকের শিক্ষাখাতে প্রতি বছর দশ লক্ষ পাউন্ড খরচ করার সামর্থ প্রাদেশিক সরকারের ছিল না । সরকারের পক্ষ থেকে অর্থ ব্যয় হ্রাস পাওয়ায় জনসাধারণের উন্নতিমূলক সকলপ্রকার কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয় । ঐতিহাসিক P Hardy র মতে " India was prey in the 1920 to the tension generated by the respectable classes finding that a stagnant or logging economy was throwing their rising expectations".

**৩) কৃষক আন্দোলন ঃ**

১৯২৭ খ্রীষ্টব্দে থেকে শুরু করে পর পর কয়েক বছর কৃষি উৎপাদনের বিরাট সঙ্কট দেখা দেয়। পরপর কয়েক বছর অজন্মার ফলে কৃষকরা নিয়মিত কর দিতে অসমর্থ হলে ভূস্বামীগণ তাদের জমি থেকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করতে শুরু করে। অসহযোগ আন্দোলনের শুরু থেকেই কৃষকদের আন্দোলন জমিদারদের অধীনস্থ এলাকায় প্রজা বিদ্রোহের রূপ ধারণ করে । বিশেষতঃ যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও বাংলাদেশে এই জমিদার ও প্রজার সংঘর্ষ প্রবল আকার ধারণ করে । জমিদার ও প্রজার এই সংঘর্ষ বহুস্থানেই সামন্ত শ্রেণীর দ্বারা কৃষকদের শোষণের রূপ প্রতিফলিত হয় । যুক্ত প্রদেশে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে শুরু হয় এবং অবিচ্ছিন্নভাবে ঐ শতাব্দীর তৃতীয় দশক পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। ইতিমধ্যে সাম্যবাদী ও সমাজতন্ত্রীদলগুলো কৃষক আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে শুরু করে এবং আমূল ভূমি রাজস্ব সংস্কারের জন্য জনমত গঠন করার চেষ্টা করে। জাতীয়তাবাদী নেতৃবর্গও কৃষক আন্দোলনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার চেষ্টা করেন, কারণ ভারতের অধিবাসীদের প্রায় নব্বই শতাংশই কৃষিজীবি সুতরাং তাদের শক্তিকে উপেক্ষা করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না । করাচিতে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসে গৃহীত বিশটি মূল প্রস্তাবের মধ্যে ভূমি রাজস্বের পঞ্চাশ শতাংশ হ্রাস ও ক্ষুদ্র চাষীদের ভূমিরাজস্ব প্রদানের হাত থেকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

**৪) শিল্পক্ষেত্রে অশান্তিঃ**

শিল্পক্ষেত্রে এই সময় দারুণ বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি দেখা দেয় । শ্রমিকসংঘগুলোর মধ্যে সাম্যবাদ বিশ্বাসী নেতৃবর্গ শ্রেণী সংগ্রামের মতবাদ প্রচার করতে শুরু করেন । জাতীয় কংগ্রেসের বিশ্বাসী সদস্যগণ জহরলাল নেহেরু , সুভাষ চন্দ্র বসু আয়েঙ্গার প্রমুখ নেতৃবর্গের পরামর্শ অনুযায়ী কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সহিত যুক্ত করতে চেষ্টা করেন । ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে পর্যন্ত নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস জাতীয়তাবাদী ও নরমপন্থী নেতৃবর্গের দ্বারা পরিচালিত হত । প্রথম বিশ্বযুদ্ধের যুগে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের শ্রমিক আন্দোলন সবচাইতে প্রবল হয়ে ওঠে । বোম্বাই বয়ন শিল্পের সব কারখানাগুলোই শ্রমিক ধর্মঘটের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয় । কমিউনিস্ট নেতৃবর্গ বোম্বাই শোলাপুর যুক্তপ্রদেশের কানপুরের বয়ন শিল্পের শ্রমিক সংগের উপর যথেষ্ঠ প্রভাব বিস্তার করে । বিহারের জামসেদপুরের লৌহ ও ইস্পাতের কারখানার কলকাতা ও তার পার্শ্ববতী অঞ্চলের পাটশিল্পের এবং উত্তর ভারতে বিভিন্ন স্থানের রেলপথের শ্রমিকদের উপরও কমিউনিষ্ট নেতাদের আধিপত্য স্থাপিত হয় । শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য নিযুক্ত রয়াল কমিশনের বিবরণীতে বলা হয় অন্যান্য কারণ অপেক্ষা অর্থনৈতিক কারণই শ্রমিক আন্দোলনের অশান্তির জন্য মূলত, দায়ী। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশনের সময় এক শ্রমিকদের এক বিরাট মিছিল সংগঠিত করা হয় ।

**৫) জাতীয়তাবাদ অর্থনৈতিক বিক্ষোভ ঃ**

আইন অমান্য আন্দোলনের প্রাক্কালে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরে জাতীয় কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় এবং অধিবেশনে ভারতের সঙ্কটাপন্ন অর্থনৈতিক পরিস্থিতির বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় । গান্ধীজী এবং ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের দ্বারা প্রস্তুত এক ইস্তাহারে বলা হয় যে " India has been ruined economically ." এই ইস্তাহারে আরও বলা হয় যে ভারতবাসীদের আয়ের অনুপাতে সরকার অনেক বেশি রাজস্ব আদায় করে । ভারতবাসী গড়ে প্রতিদিন আয় ৭ পয়সা মাত্র এবং বেকার কতৃক আদয়ীকৃত রাজস্বের বিশ শতাংশ ভূমি রাজস্ব থেকে এবং তিন শতাংশ লবণের উপর ধার্য শুল্ক থেকে আদায় করা হয় । ভূমিরাজস্ব ও লবণ বিশেষভাবে গরীবদের উপর প্রচন্ড চাপের সৃষ্টি করে ।

এই ইস্তাহারে আরও বলা হয় যে ব্রিটিশ সরকারের নীতির ফলে হাতে কাটা সূতোয় কাপড় তৈরীর মতো কুটির শিল্পগুলো সম্পুর্ণভাবে ধ্বংস পায় । ফলে বছরে কমপক্ষে চার মাস কৃষকদের অলসভাবে জীবন কাটাতে হয় অপরদিকে ধ্বংস প্রাপ্ত হস্ত শিল্পের পরিবর্তে অন্য কোন শিল্প গ্রামের মানুষের নিকট প্রচলিত করার জন্য সরকার কোন প্রকার চেষ্টা করে নি । শুল্ক আদায়ের পদ্ধতি এবং নুতন মুদ্রা সুকৌশল প্রচলনের ফলে কৃষকদের উপর করের বোঝা আরও বৃদ্ধি লাভের সুযোগ পায়। আমদানি পণ্য দ্রব্যের বেশিভাগই ইংলন্ড থেকে আনয়ন করার ব্যবস্থা করা হয় । আমদানি রপ্তানি

বাণিজ্যও সুকৌশল ও নিজেদের স্বার্থে পরিচালনার করার ব্যবস্থা ব্রিটিশ সরকার গ্রহণ করে । ফলে লক্ষ লক্ষ টাকা ভারতের বাইরে চলে যাওয়ার সুযোগ দেখা দেয় ।

**আন্দোলনের প্রস্তুতি ঃ**

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ শে জানুয়ারী পূর্ণ স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয় । এই উপলক্ষে ভারতবাসীরা একটি শপথ বাক্য পাঠ করে এবং বছরের পর বছর এই ঘটনা ও শপথ বাক্যের পুনরাবৃত্তি করা হয় । এই শপথ বাক্যে বলা হয় যে , We belive that it is the inalienable right of the Indian people to have freedom and enjoy the fruits of their toil and have the neceessities of life , so that they may have full opportunities of growth ." তবে জাতীয় কংগ্রেস অহিংসা উপায়েই পূর্ণস্বাধীনতা লাভ করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে এবং এই প্রস্তাবের শেষাংশে অহিংস আন্দোলনের কথা উল্লেখ করা হয় । পূর্ণস্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণের পর ভাইসরয়ের নিকট কয়েকটি সুযোগ দাবি করেন । তবে রাজনৈতিক দিক থেকে এই সব সুযোগ ছিল একান্তই গুরুত্বহীন । লবণের উপর ধার্য কর রহিত করা এবং ভূমি রাজস্ব হ্রাস করাই ছিল এই সব দাবির মধ্যে প্রধান । কিন্তু ভাইসরয় এই সব দাবি পূরণ করার জন্য কোন প্রকার চেষ্টা করেন নি । ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি গান্ধীজিকে এবং অহিংস আন্দোলন বিশ্বাসী ব্যক্তিদের আইন অমান্য আন্দোলন ঘোষণা করার অধিকার দান করে। পরবর্তীকালে অনুরূপ সিদ্ধান্ত নিখিল ভারত কংগ্রেস কটিটি গ্রহণ করে এবং প্রত্যেক ভারতবাসীকেই আইন অমান্য আন্দোলন অংশ গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানানো হয় । ১৯৩০ খ্রীষ্টাবে মার্চ মাসে গান্ধীজি ভাইসরয় ও গর্ভ্নার জেনারেল লর্ড আরউইনকে লবণ আইন ভঙ্গের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেন । লর্ড আরউইনের নিকট প্রেরিত পত্রে গান্ধীজি লিখলেন , " I regard this tax to be the most iniquitious of all from the poor man's standpoint . As the Independence Movement is essentially for the poorest in the land , the beginning will be made with this evil ." লবণ আইন ভঙ্গের উদ্দেশ্যে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মার্চ ৭৯ জন সত্যাগ্রহী সহ গান্ধীজি সবরমতীর আশ্রম থেকে সমুদ্র তীরবর্তী পদব্রজে ডান্ডি অভিমুখে যাত্রা করেন । ২৪১ মাইল পথ অতিক্রম করে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল গান্ধীজি ডান্ডিতে পৌঁছান ও পরদিন ভোরে সমুদ্র উপকূল থেকে একমুঠো লবণ সংগ্রহ করে আবগারী আইন লঙ্ঘন করেন । সেইদিন থেকে , অর্থাৎ ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে ৬ই এপ্রিল সারা ভারতে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয় ।

**ভারত ছাড়া আন্দোলন ঃ**

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টে ম্বর মাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে আন্তর্জার্তিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির আকস্মাৎ পরিবর্তন দেখা দেয় । ভারতের রাজনীতিতেও তার প্রভাব বিস্তৃত হয় । অপর দিকে

১৯৩০ - ৩৪ খ্রীষ্টাব্দের আইন অমান্য আন্দোলনের পরে ভারতে আর কোন ব্যাপক জাতীয় আন্দোলন গড়ে ওঠে নি । বিশেষতঃ এই সময় ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে জাপান মিত্র পক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের নিজের একাধিপত্য স্থাপন করে এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার রাজ্যগুলোর উপর অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিতে নিজের কর্তত্ব স্থাপন করার সুয়োগ পায় । জাপানের অভাবনীয় সাফল্যে ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের মনে নতুন আশার সঞ্চার হয় এবং তাঁরা ব্রিটিশ শক্তির দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠেন । ইতিমধ্যে সুভাষচন্দ্র বসু ব্রিটিশ সরকারকে সমস্ত সর্তকতাকে ব্যর্থ করে দিয়ে জামর্নীতে আশ্রয় গ্রহণ করার সুযোগ লাভ করেন ।

কিন্তু ইতিমধ্যে ভারত ব্রিটেনের অধীন দেশ বলে ব্রিটিশ সরকার ভারতবাসীর কোন রূপ অভিমত যাচাঈ না করেই ভারতকে যুদ্ধমান দেশরূপে ঘোষণা করে । কংগ্রেস ব্রিটিশের এই নীতিতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয় এবং ব্রিটিশজাতির সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্য উপলব্ধি করে এই যুদ্ধ প্রচেষ্টায় কোনরূপ সহযোগীতা না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে । কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় গণতন্ত্র এবং সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে তাদের নীতি ঘোষণা করার জন্য হবে তাও স্পষ্টভাবে ব্যাখা করতে অনুরোধ করে । কিন্তু কংগ্রেসের এই আহ্বানে ব্রিটিশ সরকার সাড়া না দেওয়ায় কংগ্রেস যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সাহায্য করতে অস্বীকার করে প্রদেশগুলোতে তাদের দ্বারা গঠিত মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেয় । কোন কোন প্রদেশে কংগ্রেস বিরোধী দলগুলো দিয়ে ব্রিটিশ সরকার মন্ত্রিসভা গঠন করে এবং কোন কোন প্রদেশে তা সম্ভব না হওয়ায় গভর্ণরের একক স্বৈরশাসন প্রতিষ্ঠিত হয় ।

অপর দিকেএই সময় মুসলিম লীগ অত্যুগ্র সাম্প্রদায়িকতা প্রচারে নেমে পড়ে । মিস্টার জিন্নাহ্‌র নেতৃত্বে মুসলিম লীগ কংগ্রেসকে নিছক একটি হিন্দুদল বলে বর্ণনা করে এবং হিন্দু শাসনের বিরুদ্ধে সংগঠিত হতে মুসলমানদের প্রতি আহ্বান জানান । কংগ্রেস যে অল্পকাল প্রাদেশিক শাস ন পরিচালনা করে সেই সময়ের মধ্যেই মিস্টার জিন্নাহ্‌ মুসলমানদের উপর কংগ্রেসের অত্যাচারের কাল্পনিক কাহিনী প্রচার করতে শুরু করেন । যুদ্ধের প্রতিবাদে কংগ্রেস যখন প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা পরিত্যাগ করে মিস্টার জিন্নাহ্‌ তখন রাজনৈতিক চাল হিসাবে মুসলমান সম্প্রদায়কে পরিত্রাণ দিবস' পাল ন করতে আহ্বান জানান , কিছুদিন পরে মিস্টার জিন্নাহ্‌ দাবি করেন যে ভারতের মুসলমানগণ নিছক একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নয় , তাদের সহিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সর্ববিষয়ে এতই পার্থক্য যে তাদের একটি স্বতন্ত্র জাতিরূপে গন্য করা উচিত এবং তদানুযায়ী রাজনৈতিক মর্যাদা দেওয়া উচিত । ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে মিস্টার জিন্নাহ প্রকাশ্যেই পাকিস্তান গঠনের দাবি জানান ।

**২) ক্রিপস মিশনের ব্যর্থতা ঃ**

ইতিমধ্যে যুদ্ধের গতি ক্রমশই গ্রেটব্রিটেনের প্রতিকূল হতে শুরু করে । অবশেষে ১৯৪১

খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে জাপান অক্ষশক্তির সহিত যোগদান করে দূরপ্রাচ্যে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তড়িৎ গতিতে রাজ্য জয় করে ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করে । এই নতুন বিপদের সম্মুখীন হয়ে ব্রিটিশ সরকার ভারতবাসীকে সন্তুষ্ট করে ভারতের আন্তরিক সহযোগিতা লাভের প্রয়োজন উপলব্ধি করে । ফলে ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মার্চ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিষ্টার চার্চিল ঘোষণা করেন যে ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের পক্ষ থেকে তাঁর অন্যতম সদস্য স্যার স্ট্যাফোর্ড কিরপস্ ভারতের শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতির কতিপয় প্রস্তাব নিয়ে অবিলম্বে ভারতে উপস্থিত হবেন এবং ঐ সম্পর্কে জাতীয় নেতৃবৃন্দের সহিত আলাপ আলোচনা করবেন । ঐ ঘোষণার ঠিক এগারো দিন পরে ১৯৪২ সালের ২২ মার্চ স্যার ক্রিপস ফোর্ড দিল্লীতে উপস্থিত হন । কংগ্রেসের নেতৃবর্গ দাবি করেন যে ভারতের স্বাধীনতার দাবি স্বীকৃত হোক এবং অবিলম্বে ভারতীয় নেতৃবৃন্দকে যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সাহায্যের জন্য ক্ষমতা ও দায়িত্ব দেওয়া হোক । কেন্দ্রে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হোক এবং বড়লাট নিয়মতান্ত্রিক প্রধানরূপে অবস্থান করবেন । মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ দাবি করেন যে মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান নাম স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করা হোক এবং অখন্ড ভারতের অভিন্ন শাসনতন্ত্র প্রণয়নে সাহায্য করতে তাঁরা আদৌ প্রস্তুত নন । কিন্তু ক্রিপসের প্রস্তাবে এই সব দাবির কোন স্বীকৃত ছিল না । ফলে ব্রিটিশ সরকারের শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের প্রস্তাব এবং ক্রিপসের আলাপ আলোচনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং ১৩ই এপ্রিল স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস ভারত পরিত্যাগ করেন ।

**৩) ভারত ছাড়ো আন্দোলনঃ**

ক্রিপসের প্রচেষ্টায় অসাফল্য ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে পুনরায় নৈরাশ্যজনক করে তোলে । ব্রিটিশ সরকারের আন্তরিকতার অভাব এবং অবিশ্বাসের মনোভাব এবং রাজনৈতিক দম্ভই স্বাধীনতাকামী ভারতবর্ষকে আরও অসহিষ্ণু করে তোলে । যখনই কোথাও ব্রিটিশের সামরিক পরাজয় ঘটে তখন সমগ্র ভারতে একটা চাপা আনন্দের ঢেউ দেখা দিতে শুরু করে । মহাত্মা গান্ধী ঘোষণা করেন যে ভারতে ব্রিটিশ জাতির উপস্থিতিই জাপানকে ভারত আক্রমণে প্রলোভিত করে তুলবে , ব্রিটিশগণ ভারত ত্যাগ করলেই ভারতের বিপদ কেটে যাবে । " The Presence of the British in India is an invitation to Japan to invade India. Their withdrawal removes this bait ...." ব্রিটিশগণ ভারতবাসীর মধ্যে আভ্যন্তরীণ অনৈক্যের যে অজুহাত তুলে থাকে তার উত্তরে গান্ধীজি হরিজন পত্রিকায় লিখলেন যে ব্রিটিশগণ ভারতকে ঈশ্বরের হাতে বা নৈরাজ্যের হাতেই ছেড়ে যাক । সকল দলগুলো তখন কুকুরের মতো কামড়াকামড়ি করতে পারে অথবা প্রকৃত দায়িত্বের সম্মুখিন হয়ে তারা আপোস মীমাংসায় পৌঁছতে পারে । " Leave India in God's hands or in modern parlance to anarchy . The all parties will fight one another like dogs when real responsibility faces them , come to a reasonable agreement ." তারপর তিনি আরও বলেন যে ব্রিটিশ জাতির কোন কারণেই

ভারতে থাকার কোন অধিকার নেই । মহাত্মা গান্ধীর এই সব উক্তির মধ্যেই সমগ্রজাতির চরম অসহিষ্ণুতা ও রাজনৈতিক ধৈর্যের শেষ সীমানায় উপস্থিতি প্রকাশ পায় ।

অবশেষে ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এই মর্মে একটি প্রস্তাব পাশ করে যে ব্রিটিশ যদি ভারত ছেড়ে যাওয়ার দাবি না মানে তাহলে গান্ধীজির নেতৃত্বে ভারত অনিচ্ছাসত্ত্বেও অতি ব্যাপক কিন্তু অহিংস সংগ্রামে লিপ্ত হতে বাধ্য হবে । ওয়ার্কিং কমিটির এই প্রস্তাব বোম্বাই শহরে অনুষ্ঠিত নিখলি ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ৮ ই আগষ্ট অনুমোদিত হয় । কংগ্রেস এই উপলক্ষে ঘোষণা করবে , সম্মিলিত জাতিসমূহকে উদ্দেশ্যে সাফল্যের জন্য এবং ভারতের স্বার্থে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের আশু অবসান একান্তই প্রয়োজন । " .... the immediate ending of British rule in India is an urgent necessity , both for the sake of India and for the success of the united nations. The continuation of the rule is degrading and enfeebling and making her progressivel less capable of defending herself and of contri buting to the cause of world freedom ."

কংগ্রেসের এই উগ্রমনোভাবের বিরুদ্ধে লর্ড লিনলিথগো কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেন । ৯ই আগষ্ট সমগ্র দেশব্যাপী ধর পাকড় শুরু হয় । গান্ধীজি , পন্ডিত নেহেরু, এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অপর সকল সদস্য এবং বহু কংগ্রেস নেতা গ্রেপ্তার হন । কংগ্রেস কমিটিগুলোকে বে - আইনী প্রতিষ্ঠান বলে ঘোষণা করা হয় । নেতৃবৃন্দকে সহসা এইরূপ গ্রেপ্তার করে কঠোর নীতি গ্রহণের ফলে দেশবাসী চতুর্দিকে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে । ক্ষিপ্ত জনতার আক্রমণ বহুস্থানেই সহিংস বিপ্লবরূপে দেখা দেয় । লর্ড লিনলিথগোর সরকার অত্যন্ত কঠোর দমন নীতি প্রয়োগ করে বিদ্রোহ দমন করার চেষ্টা করে । তাঁর শাসন পরিষদের তথাকথিত জাতীয়তাবাদী সদস্যগণ দেশবাসীর উপর এই উৎপীড়নে তাঁকে যথেষ্ঠ সাহায্য করেন । অপরদিকে জনগণের এই সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য গান্ধীজি ব্রিটিশ সরকারেকেই দায়ী করেন । ১৯৪৩ খ্রীষ্টরব্দে তিনি কারাগারেই অনশন ধর্মঘট করেন । অনশনে তাঁর জীবন বিপন্ন বলে তাঁকে মুক্তিদানের দাবি উত্থিত হল কিন্তু লিনলিথগো এই দাবির উপর কোন গুরুত্ব দিতে অসম্মত হন । তিনি ঘোষণা করেন যে সরকারের উপর অনশনের চাপ দিয়ে মুক্তি আদায় করা সঙ্গত নয় , সম্ভবও নয় । এই সময় তাঁর শাসন পরিষদের তিনজন সদস্য পদত্যাগ করে মুখ রক্ষা করেন । পরে ১৯৪৪ সালের ৬ই মে গান্ধীজিকে মুক্তি দেওয়া হয় । অপরদিকে যুদ্ধের গতি ব্রিটিশের অনূকূলে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলনও স্তিমিত হয়ে পড়ে।

**৪) ভারত ছাড়ো আন্দোলনের প্রকৃতি ঃ**

জাতীয় কংগ্রেসের মতে ভারত ছাড়ো প্রৃতপক্ষে সাংবিধানিক আন্দোলন । জাতীয় কংগ্রেসের

পূর্বে গৃহীত পূর্ণ স্বাধীনতার সিদ্ধান্তের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করেই ভারত ছাড়ো আন্দোলনের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় । কিন্তু জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দকে আন্দোলনের শুরুতেই গ্রেপ্তার করার ফলে অবস্থার যথেষ্ঠ অবনতি ঘটে এবং বিভিন্ন স্থানে আন্দোলন সহিংস রূপ গ্রহণ করে। সরকারী বিবরণ অনুযায়ী ২৫০ টি রেলওয়ে স্টেশন , ও ৫০০ টি পোস্ট অফিস ক্ষতিগ্রস্থ হয় । আন্দোলনের সময় ১৫০ জন পুলিশ আক্রান্ত হয় এবং কয়েকজন সরকারী কর্মচারী ও সৈন্য মারা যায় এবং প্রায় ৯০০ জন বেসামরিক ব্যক্তি প্রাণ হারায় । উত্তর প্রদেশে , বিহার ও বাংলাদেশের কোন কোন স্থানে সামরিকভাবে ব্রিটিশ সরকারের অবলুপ্তি ঘটে । বাংলাদেশের মেদিনীপুরে এই সময় স্বাধীন জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় । উত্তর প্রদেশের বলিয়া জেলায়ও এই আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে ।

আগষ্ট আন্দোলনের আর একটি বৈশিষ্ট্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ । অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন গান্ধীজির নেতৃত্বে এবং তাঁর প্রত্যক্ষ নির্দেশ অনুযায়ী পরিচালিত হয় । কিন্তু আগষ্ট আন্দোলনের প্রকৃত নেতৃত্বে গ্রহণ করে দেশের জনসাধারণ জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সারির সমস্ত নেতাই তখন কারাদন্ডকালে অন্তরীণ । ফলে সাধারণ লোক কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে । স্থানীয় নেতারাই তাদের নেতৃত্বে গ্রহণ করেন । বিশেষতঃ ইংরেজ রাজত্বের অবসানের সম্ভাবনায় সাধারণ লোক এই আন্দোলনের সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে এবং অনেক সময় সহিংস উপায়ের আশ্রয় গ্রহণ করতে প্ররোচিত হয় ।

**৫) আন্দোলনের গুরুত্ব ঃ**

১৯৪২ সালের ভারত ছাড়া আন্দোলন ভারতের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । এই আন্দোলনের ভারতের বিভিন্ন শ্রেণীর ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে । মিস্টার জিন্নাহর নেতৃত্বে মুসলিম লীগও এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করতে অসম্মত হয়। তিনি ঘোষণা করেন যে , The object of the movements was not only to turn out the Englishmen from India , but also to subjugate the Muslims and the Muslim Leaguue . Moreover , the movement was directed to coerce the British Government to head over to the Hindus the administration of the country .". ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে আন্দোলন সম্পর্কে Dr . P Hardy. মন্তব্য করেন যে , in fact , though not even from party an effort to destroy the power of the Muslim Legue - by removing the British as the Third party preventing a direct confrontation between Congress and the League ."

**ভারতীয় স্বাধীনতা আইন ঃ**

ভারতকে স্বাধীনতাদানের উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকার ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারত স্বাধীনতা আইন প্রণয়ন করে । ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই এই বিল পার্লামেন্টে উত্থাপিত হয় এবং ১৮ই জুলাই পালামেন্ট

দ্বারা অনুমোদিত হয়ে রাজস্বাক্ষর লাভ করে তা ভারত স্বাধীনতা আইন (Indian Independence Act, 1947) নামে পরিচিত হয়।

এই আইনে বলা হয় যে ১৯৮৭ সালের ১৫ই আগষ্ট থেকে ভারতবর্ষে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের বা ডোমিনিয়নের সৃষ্টি হবে। পাকিস্তানের অন্তভূর্ক্ত অঞ্চল থেকে গণপরিষদে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ স্বতন্ত্র্যভাবে পাকিস্তান গণপরিষদ গঠন করবে। তবে পূর্বে গঠিত গণপরিষদই ভারতের শাসনতন্ত্র রচনা করবে। বিভক্ত প্রদেশগুলোর সীমানা নির্দ্ধারণের জন্য একটি সীমানা কমিশন নিযুক্ত হবে। প্রত্যেক ডোমিনিয়নে একজন করে গর্ভণর জেনারেল নিযুক্ত হবেন। প্রত্যেক ডোমিনিয়নের গণপরিষদই সংশ্লিষ্ট ডোমিনিয়নের ক্ষমতার অধিকারী হবে। এই গণপরিষদ শাসনতন্ত্র রচনা ডোমিনিয়নের জন্য আইন প্রণয়ন করবে। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট বা ব্রিটিশ সরকারের দ্বারা জারীকৃত কোন আইন ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্টের পর কোন ডোমিনিয়নে প্রযোজ্য হবে না। তবে সংশিষ্ট গণপরিষদ সম্মত হলে এই সব আইন প্রচলিত থাকতে পারে। এইরূপ দুটি ডোমিনিয়ন যাতে স্থাপিত হতে পারে সেই উদ্দেশ্যে বিস্তারিত খুঁটিনাটি বিধান গভর্ণর জেনারেল প্রদান করতে পারবেন। বিশেষতঃ তিনি ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ভারত শাসন বিধিকে পরিবর্তন করে পরিবর্তিত অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রেখে সংশোধিত আকারে তা যে কোন আকারে প্রচলিত আইনগুলো নতুন ডোমিনিয়ন সমূহে চালু রাখার, সশস্ত্র বাহিনীকে দুটি ডোমিনিয়নের মধ্যে ভাগ করে দেওয়ার এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিবিধ ব্যবস্থা অবলম্বনে ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন। নিদ্ধারিত দিন থেকে ভারত সচিবের অধীন কৃত্যক (Secretary of state's Services) শেষ হয়ে যাবে তবে যে সকল কর্মচারী এই তারিখের পরেও নুতন সরকারের অধীনে কাজ করতে ইচ্ছুক থাকবেন তাঁরা পরিবর্তিত অবস্থার মধ্যে যতটা সম্ভব পূর্বেকার সুযোগ ও সুবিধা ভোগ করবেন। নিধারিত দিবসের পর সংশ্লিষ্ট সরকার বা সরকার সমূহের সহিত সম্পর্কিত কতিপয় কার্য সম্পাদনের জন্য একজন রাষ্ট্রসচিব বা অন্য কোন মন্ত্রী থাকবেন, তবে ভারত সচিবের পরামর্শদাতা সংসদের বিলোপ সাধন করা হবে। পূর্বে বড়লাটকে এবং প্রাদেশিক গভর্ণরদের তাঁদের কার্য সম্পাদনের পদ্ধতি সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকার যে সব উপদেশ পত্র দেন সেগুলোও বাতিল করা হয়। তাছাড়া গভর্ণর জেনারেল এবং গভর্ণরদের ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের শাসনবিধি অনুযায়ী যে সকল বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছিল, তাও এই নতুন আইনে বাতিল করা হয়। ইংলন্ডের সহিত ভারতীয় দেশীয় রাজ্য সমূহের নৃপতিবৃন্দের যে সকল সন্ধিপত্র ও চুক্তি ছিল সেগুলোকেও বাতিল করা হয়। ফলে ব্রিটিশ সরকার দেশীয় রাজ্যগুলোর উপর তাদের চরম কতৃর্ত্বের অধিকার প্রত্যাহার করে। দীর্ঘ অধিকারের আন্দোলনের ফলে অনেক প্রাণের আত্মহুতির ফলে ভারতের স্বাধীনতার অধিকার অর্জিত হয়েছে।

# একাদশ অধ্যায়

উপসংহার ঃ- মানুষের অধিকার রক্ষার্থে অনেক আইন প্রনয়ণ হয়েছে, কমিশন গঠিত হয়েছ যেমন

1) The protection of Human right Act -1993.

2) The national Human Rights commission (procedure ) Regulations, 1994.

3) Universal Declaration of Human rights , 1948.

4) International coverent on Economic , Social and culture rights , 1966 .

5) International Covenat on civil and political rights , - 1966.

6) International convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination - 1966.

7) American Convention on Human rights -1969.

8) A frican charter on Human rights and people rights , 1981.

9) The National commission for Back ward classes Act -1993.

10) The National commission for Minorities Act - 1992 . ইত্যাদি তা ছাড়াও মৌলিক অধিকারের আর্ট ১৪ থেকে ৫১ এবং কর্তব্য বিষয়ক ৫১ - A সূচীগুলি জ্ঞাতসারের উদ্দেশ্যেই দেয়া গেল। অধিকার সংক্রান্ত আলোচনায় বিভিন্ন বইয়ের সহযোগীতায় এবং আইনের ধারা উপধারা ও পবিত্র সংবিধানের সাহায্য এবং স্বাধীনোত্তর ইতিহাসের সাহায্যে ক্রমে এই বই প্রকাশের প্রচেষ্টা করা হইয়াছে। সংবিধানগত মৌলিক অধিকারের তালিকা নিম্নরূপ

## Rights to Equality

1) Equality before law.
2) Prohibition of discrimination on grounds of religion , race , caste Sex or place of birth.
3) Equality of opportunity in matters of public employment
4) Abolition of Untouchability
5) Abolition of titles

## Right to Freedom

6) Protection of certain rights regarding freedom of speech etc.

7) Protection in respect to conviction offences
8) Protection of life and personal liberty
21-A. Right to education
9) Protection against arrest and detention in certain cases.

**Right against Exploitation**

10) Prohibition of traffic in human beings and labour.
11) Prohibition of employment of Children in factories , etc.

**Right to freedom Religion**

12) freedom of conscience and free profession , practice and propagation
of religion
13) Freedom as to payment of taxes for promotion of any particular religion
14) Freedom as to attendance at religious instruction or religious worship
in certain education institutions.

**Cultural and Educational Rights**

15) Protection of Interests of minorities
16) Rights of minorities to establish and administer educational institutions.

**Rights to property [omitted]**

17) Compulsory acquisition of property [omitted]

**Saving of Certain Laws**

18) A. Saving of laws providing for acquisition of estates , etc .
19) B. Validation of certain Acts and Regulations
20) C. Saving of laws giving effect to certain directive principles
21)D. Saving of laws in respect of anti national activities [omitted]

Right to constitutional Remedies

23) Remedies for enforcement of rights conferred by this part'
24) Con situtional Validity of state laws not to be considered in
Proceedings under Article 32 (omitted)
25) Power of parliament to modify the rights conferred by this part in their
application , etc.
26) Restriction on rights conferred by this part while martial law is in force in
any area.
27) Legislation to give effect to the provisions of this part .

DIRECTIVE PRINCIPLES OF STATE POLICY

28) Definition
29) Application of the principles contained in this part.
30) State to secure a social order for the promotion of welfare of the people.
31) Certain principles of policy to be followed by the state.
32) Equal Justice and free legal aid
33) Organization of village panchayats
34) Right to work , to education and to public assistance in certain cases,.
35) Provision for just and humane conditions of work and maternity relief.
36) Living wage , etc , for workers
37) A. Participation of workers in management of industries
38) Uniform civil code for the citizens
39) Provision for early childhood care and education to children below the age of six years.
40. Promotion of educational and economic interests of Scheduled Castes
Schedule Tribes and other weaker sections.
41) Duty of the State to raise the level of nutrition and the standard of living and improve public health
42) Organizations of Agriculture and animal Husbandry
43) Protection and improvement and safeguarding of forests and
wildlife

44) Protection of monuments and places and object of national importance

45) Separation of judiciary from executive

## PART IV -A
## FUNDAMENTAL DUTIES

47 . A Fundamental duties

অধিকার বইটির শেষ প্রান্তে আমি মনে করি অধিকারের লড়াই হোক , দুনীর্তির বিরুদ্ধে , সামাজিক বঞ্চনার বিরুদ্ধে অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে , ঘৃণার বিরুদ্ধে , জাত পাতের বিরুদ্ধে , কর্মসংস্থানের পক্ষে , দেশকে ,জাতিকে এগিয়ে নেওয়ার পক্ষে , অধিকারের লড়াই হোক অবক্ষয় ও ক্ষুধার বিরুদ্ধে, তবেই ই তো অধিকারের সার্থকতা ।

## সংশ্লিষ্ট গ্রন্থ পঞ্জী (সংগ্রহকৃত)


**1) Human right - A.N.SEN**

**2) Human rights Democratic right and Popular Protest - Siddhartha Guha Roy**

**3) Constitution of India - V.N . Shukla & Mahendra P. Singh**

**4) In Pursuit of happiness - Dr. Y.S. Rajan.**

**5) International Releations - Prof. S. ghose**

**6) Major Criminal Acts - B.L.Munshi.**

**7) The Juvenile Justice Act - 2000 - K. Arora.**

**9) Modern India - Prof. S. Ghose**

**10) Various Indian Law reports and Journals.**

**11) History of Bengal - Prof S. Ghattacharjee.**

**12) History of Bengal - Dr. R. C. Majumder.**